সরল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুশীলন

সম্পাদনা

অধ্যাপিকা সেবন্তী সিন্‌হা

বি. এ. অনার্স (ফার্স্ট ক্লাস), এম. এ. (ফার্স্ট ক্লাস), (কলি),
এম. ফিল. (কলি). বি. এড. (ফার্স্ট ক্লাস),
পি. এইচ. ডি. স্কলার (যাদবপুর)
অধ্যাপিকা
মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজ
শ্যামবাজার, কলকাতা

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

শ্রী দেবাশিস ভট্টাচার্য্য
৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the holders of copyright of this book.

প্রকাশক :
শ্রী দেবাশিস ভট্টাচার্য্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

© গ্রন্থের সর্বসত্ব লেখিকার পিতা আশিস সিন্‌হা এবং মাতা নিবেদিতা সিন্‌হা কর্তৃক সংরক্ষিত।

ডাকযোগে গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ : 8017929233 / 9433903734 / 03325294957

প্রথম প্রকাশ ঃ ৩রা মে, ২০২২
সংশোধিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১লা জানুয়ারি, ২০২৩
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১লা জানুয়ারি, ২০২৪
সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ ঃ জুলাই, ২০২৫

ISBN No : 978-81-19611-15-7

মূল্য : ৪৫০.০০ টাকা

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণে :
দি নিউ জয়কালী প্রেস
১/১, দীনবন্ধু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

ওঁ তৎ সৎ

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুঃ চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥

বহু পরিশ্রমে লিখিত আমাদের একমাত্র সন্তান আমাদের ভাগ্যহীনা কন্যার এই গ্রন্থখানি আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব ১২৯ বর্ষীয় জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মাৎসর্য-আশা-আকাঙ্খা-আসক্তি-রোগ বর্জিত, ত্রিতাপ জ্বালার অনুভূতিশূন্য, বালব্রহ্মচারী পুণ্যাত্মা ভগবান পদ্মশ্রী স্বামী শিবানন্দ বাবার করকমলে সমর্পণ করলাম।

আশিস্ সিন্‌হা
নিবেদিতা সিন্‌হা

তৃতীয় সংস্করণের নম্র নিবেদন

আমার পরম আরাধ্য গুরুদেব ১২৭ বর্ষীয় স্বামী শিবানন্দ বাবার পরম আশীর্বাদে ও গীতাপ্রেমী সুধীগণের অনুপ্রেরণায় আমার একমাত্র সন্তান কোভিড ১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে অকাল প্রয়াতা আমার কন্যার রচিত 'সরল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুশীলন' গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। প্রুফ চেকিং এর কাজে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে প্রথম সংস্করণে বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গিয়েছিল ও বেশ কিছু অংশ বাদ পড়ে গিয়েছিল। সেইজন্য বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে সেই ত্রুটিগুলি দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তথাপি এই রকমের কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। সেই জন্য এই তৃতীয় সংস্করণে আমি সেই সমস্ত অবাঞ্ছিত ত্রুটিসমূহ দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু যদি তথাপি এই ধরণের ত্রুটি এই তৃতীয় সংস্করণে আরও কিছু থেকে যায় তাহলে পাঠককুলের নিকট ক্ষমাভিক্ষা ক'রে বলছি যে আর আমার সেই ত্রুটিগুলি দূর করার সাধ্য নাই। কন্যার অকাল প্রয়াণের কারণে আমার শরীর তথা মন ভয়ানকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। তাছাড়া চোখের দৃষ্টি শক্তিও দিনে দিনে দ্রুত ক্ষীণতর হয়ে আসছে। এই দুরূহতম গ্রন্থের প্রুফ চেকিং এর ক্ষমতা আমি হারিয়েছি। তাই যদি এই সংস্করণেও কিছু ত্রুটি থেকে যায় তাহলে সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট এই সত্তরোর্ধ সন্তপ্ত অবসাদগ্রস্ত বৃদ্ধের করজোড়ে একান্ত অনুরোধ যে আমার সেই নিদারুণ কষ্টদায়ক অক্ষমতাকে দয়া ক'রে নিজগুণে ক্ষমা করবেন। এর পর থেকে এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ সংস্করণই প্রকাশিত হবে।

ইতি
কৃপাভিখারী আশিস্ সিন্‌হা

দ্বিতীয় সংস্করণের নম্র নিবেদন

আমার কন্যা তার এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করার বাসনা অন্তরে সুপ্ত রেখেই মাত্র ৩৩$^{+}$ বছর বয়সে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে সহসা অমৃতলোকে গমন করার পর এই বইখানি অতি সাধারণ পাঠকদের পাঠ ও বোঝার সুবিধার্থে প্রকাশ করার তার বাসনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য আমি বহুকষ্টে এই গ্রন্থখানি প্রকাশে আগ্রহী হই। এব্যাপারে আমাকে সংস্কৃত বুক ডিপোর শ্রী অভয় বর্মণ মহাশয় এবং দি নিউ জয়কালী প্রেসের শ্রী চিত্ত পান মহাশয় প্রভূত সাহায্য করার জন্য এ বিষয়ে নিতান্ত অকৃতী অধম আমার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। প্রথম সংস্করণে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গিয়েছিল। আমার প্রুফ চেকিং এর ব্যাপারে মোটেই কোন যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা নাই। তথাপি আমি দুঃসাহসে ভর ক'রে এই কাজে ব্রতী হয়েছিলাম। তখন আমার নিতান্ত মানসিক অবস্থা খারাপ থাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার শারীরিক অবস্থাও যৎপরোনাস্তি খারাপ ছিল। তথাপি সেই ভগ্ন মন ও ভগ্ন শরীর নিয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। ফলে খুবই স্বাভাবিক কারণেই আমার সেই প্রুফ চেকিং এর কাজে ঘাটতি থেকে গিয়েছিল। তাছাড়া প্রথম সংস্করণে কিছু শ্লোকের ব্যাখ্যাও বাদ পড়ে গিয়েছিল। সেই সমস্ত ত্রুটি যথাসাধ্য দূর ক'রে আমি আমার একমাত্র সন্তান আমার কন্যার দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে সহজপাঠ্য ও সহজবোধ্য ক'রে তোলার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য তার গ্রন্থটির এই দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশ করার আয়োজন করেছি। জানিনা আমি কতখানি ত্রুটিমুক্তভাবে বিষয়টি সম্পাদন করার কাজে সমর্থ হয়েছি। গীতার মত এত দুরূহ তত্ত্ব সমন্বিত এত বৃহৎ গ্রন্থকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপিত করা বড়ই কঠিন ব'লে আমার মনে হয়েছে।

পরিশেষে আমার মনে হয় যে, গ্রন্থখানি সম্ভবত কোন কোন অংশে হয়ত কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে। কারণ যিনি এর স্রষ্টা তাঁকে বিধির অমোঘ বিধানে নিতান্ত অসময়ে সহসাই পরমেশ্বরের পরম ধামে আশ্রয় গ্রহণ করতে হল। যে কোন শিল্পীই তাঁর শিল্পকর্ম চূড়ান্ত করার পূর্বে তার মধ্যে তাঁর অন্তিম স্পর্শ দান করেন যার দ্বারা তাঁর সেই শিল্পকর্ম অনেক বেশী সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে। তার জন্য তাঁর সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমার কন্যা সেই সময় পায়নি। না ফুটতেই ফুল ধরণীবক্ষে ঝরে পড়ল, নদীর ধারা সহসাই মরুপথে হারিয়ে গেল। সেইজন্য হয়তো এই গ্রন্থে আরও অনেক কিছু বিষয় সংযোজন, সংশোধন, পরিবর্ধন, পরিমার্জনের প্রয়োজন ছিল যা করা আর তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আমার কন্যা তার সৃষ্টির অঙ্গে তার তুলির অন্তিম আঁচর দিয়ে যেতে পারেনি। এর জন্য যদি গ্রন্থের মধ্যে কোন পাঠকের দৃষ্টিতে কোন কিছুর অভাব ধরা পড়ে তাহলে দয়া ক'রে সহানুভূতির সঙ্গে এই অভাবটি মার্জনা করবেন। আর সাধারণ পাঠকের পক্ষে আমার কন্যা সম্পাদিত এই গ্রন্থ থেকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মহান অমৃত তত্ত্বের রস আহরণ করা সহজসাধ্য বোধ হলে আমার ভাগ্য বিড়ম্বিত কন্যার আত্মা শান্তি লাভ করবে এবং পিতা হিসাবে আমিও চিত্তের কিছুটা প্রশান্তি লাভ করতে পারি।

—আশিস্ সিন্‌হা

প্রথম সংস্করণের নম্র নিবেদন

আমি এক হতভাগ্য পিতা যার একমাত্র সন্তান এই গ্রন্থের লেখিকা সেবন্তী সিন্‌হা বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. ও এম. ফিল. এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের পি. এইচ. ডি. স্কলার এবং কলিকাতার শ্যামবাজারের নিকটস্থ মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজের সহকারী অধ্যাপিকা কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৩+ বছর বয়সে ০৩. ০৫. ২০২১ তারিখে অতি প্রত্যুষে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ ক'রে বিষ্ণুলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ছাত্রজীবন থেকেই তার বই লেখার প্রতি খুবই ঝোঁক ছিল। ইতিপূর্বে সে আরও তিনখানি গ্রন্থ রচনা করে। আরও কত গ্রন্থ প্রকাশ করার তার প্রবল বাসনা ছিল! কিন্তু পৃথিবীর বুকে এক কালরোগ নেমে এসে তার সব বাসনাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। হঠাৎ একদিন আমি তার আলমারিতে অনেক কাগজের স্তূপের মধ্যে তার একটি হস্তলিখিত কাগজের বাণ্ডিল খুঁজে পাই যার মধ্যে লেখা ছিল সমগ্র গীতার আলোচনা। সারাদিন ঘরে বসে বসে সে তো কত কিছুই লিখত, আবার তাদের মধ্যে কিছু কিছুকে পুস্তক আকারে প্রকাশ করত। একাকী আপন খেয়ালে সে কাজ করে যেত। ঘর থেকে বাইরে খুব কমই বের হত। হঠাৎ তার এই লেখাগুলো খুঁজে পেয়ে আমার মনে হল যে সে তো চলেই গিয়েছে! তার এই লেখাটি গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করে তার পরিশ্রমের একটা স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থা করা উচিত। সেইজন্য অতি যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ে আমি কয়েকজনের অনুপ্রেরণায় এই গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হই। তবে আমি জানিনা যে গ্রন্থটিকে ঠিক এইভাবেই প্রকাশ করার বাসনা তার ছিল কিনা। আমি তো সংস্কৃত জানি না। তবে কন্যার সঙ্গে থেকে থেকে সঙ্গগুণে অতি সামান্য কিছু জ্ঞান অর্জন করেছিলাম। সেই বিদুরের খুদ সম্বল করে তার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে টাইপ করার ব্যবস্থা করে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণায় এই গ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী হই। আমার কন্যা থাকলে গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বে আরও ভালো করে দেখতে পারতো, হয়ত বা আরও কিছু পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংযোজন, বিয়োজন করত। তাছাড়া প্রুফ রিডিং এর কাজটা সে নিজেই করত। ফলে গ্রন্থটির মান নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেত। কিন্তু তার অভাবে সেসব কিছুই হল না। এই গ্রন্থের বিভিন্ন শ্লোক সম্বন্ধীয় আরও

বেশকিছু আলোচনা তার পাণ্ডুলিপিতে আছে। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে আপাতত বাদ রেখেছি। জানি না আমার এই পদক্ষেপ ভুল হল কিনা এবং হলে তা কতখানি ভুল হল। তাছাড়া সে সমগ্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এবং যাঁরা বাংলা অক্ষর চেনেন না তাঁদের জন্য গীতার ৭০০টি শ্লোকই International Alphabet of Sanskrit Transliteration-এর অক্ষরে লিখে রেখেছে। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হবার কারণে সেই অংশটি আপাতত বাদ রেখেছি। জানিনা আমার সেই সিদ্ধান্ত ভুল হল কিনা।

গীতার মত ভূতলে অতুল মহাগ্রন্থের সুগভীর তত্ত্ব পরিবেশনের ক্ষেত্রে আমার পরম স্নেহের কন্যা তো নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশু। তাই এই গ্রন্থের মধ্যে পরিবেশনের ক্ষেত্রে তার ভাবের অগভীরতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পরলে সহৃদয় পাঠক/পাঠিকাগণ আমার অকাল প্রয়াতা কন্যাকে আপন সন্তান/ভগিনী জ্ঞানে গ্রন্থ পরিবেশনের ক্ষেত্রে তার মুনশিয়ানার ঘাটতিকে উদার হৃদয়ে মানিয়ে নিয়ে যদি এই গ্রন্থের মধ্যে কোন আনন্দের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে সেইটুকুকেই আত্মানন্দের সঙ্গে উপভোগ ক'রে আমার অকাল প্রয়াতা কন্যাকে আশীর্বাদ করেন তাহলে আমার মত হতভাগ্য পিতার তাপিত হৃদয় কিছুটা হলেও শীতল হবে।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, গ্রন্থটি পাঠ ক'রে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা দয়া ক'রে গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও অভিমত ৮০১৭৯২৯২৩৩ এই ফোন ও হোয়াটস্অ্যাপ নাম্বারে জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

আশিস্ সিন্হা
গোপীনাথপুর,
কান্দি, মুর্শিদাবাদ।
বর্তমান—
সিটি রেসিডেন্সি,
১০/২৫ কবি ভরতচন্দ্র রোড
কলকাতা — ৭০০ ০২৮
দূরভাষ— ৮০১৭৯২৯২৩৩/
৯৪৩৩৯০৩৭৩৪

কৃষ্ণ বন্দনা

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

হরিঃ পিতা হরিঃ মাতা হরিঃ ভ্রাতা হরিঃ সুহৃৎ।

হরিং সর্বত্র পশ্যামি হরেঃ অন্য ন ভাতি মে।।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।

যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।।

নমস্তে দেবতানাথ নমস্তে গরুড়ধ্বজ।

শঙ্খচক্রগদাপাণে বাসুদেব নমোহস্তু তে।।

নমস্তে নির্গুণানন্ত অপ্রতর্ক্যায় বেধসে।

জ্ঞানাজ্ঞান নিরালম্ব সর্বালম্ব নমোহস্তু তে।।

রজোযুক্ত নমস্তেহস্তু ব্রহ্মমূর্তে সনাতন।

ত্বয়া সর্বমিদং নাথ জগৎসৃষ্টং চরাচরম্।

সত্ত্বাধিষ্ঠিত লোকেশ বিষ্ণুমূর্তে অধোক্ষজ।

প্রজাপাল মহাবাহো জনার্দন নমোহস্তু তে।।

ভূরিয়ং ত্বং জগন্নাথ জলাম্বরহুতাশনঃ।

বায়ুর্বুদ্ধির্মনশ্চাপি শর্বরী ত্বং নমোহস্তু তে।।

ধর্মো যজ্ঞস্তপঃ সত্যমহিংসা শৌচমার্জবম্।

ক্ষমা দানং দয়া লক্ষ্মীর্ব্রহ্মচর্যং ত্বমীশ্বরঃ।।

ত্বং সাঙ্গাশ্চতুরো বেদাস্ত্বং বেদ্যো বেদপারগঃ।

উপবেদা ভবানীশ সর্বোহসি ত্বং নমোহস্তু তে।।

মঙ্গলাচরণ

চন্দ্রার্ধং কলসং ত্রিকোণধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকাং
শঙ্খং সব্যপদেহথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকম্।
চক্রং ছত্রযবাঙ্কুশং ধ্বজপবী জম্বূর্ধ্বরেখাম্বুজং
বিভ্রাণং হরমূনবিংশতিমহালক্ষ্ম্যার্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে।।

যিনি বামচরণে অর্ধচন্দ্র, কুম্ভ, ত্রিকোণচিহ্ন, ধনু, আকাশ, গোষ্পদ, মৎস ও শঙ্খ এবং দক্ষিণপদে অষ্টকোণ, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজা, বজ্র, জম্বুফলসমাকার চিহ্ন, ঊর্ধ্বরেখা ও পদ্ম এই সকল চিহ্ন ধারণ করেন এবং এই ঊনবিংশতি মহালক্ষ্মী কর্তৃক যাঁহার শ্রীচরণযুগল অর্চিত হন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি।

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থাবলী

(১) VIDUṢAKA - BHĀSA AND KĀLIDĀSA-A COMPARATIVE STUDY
(২) ভারতের কৃষ্ণভাবনা
(৩) ছোটদের বই — ছড়ার তোড়া
(৪) আচার্য জয়দেব বিরচিত চন্দ্রালোক : একটি সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ
(৫) কালিকা পুরাণ (১ম খণ্ড)

ভূমিকা

সর্বোপনিষদো গাবো # দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা # দুগ্ধং গীতা-অমৃতং মহৎ।।
সারথ্যম্ অর্জুনস্য আদৌ # কুর্বন্ গীতা-অমৃতং দদৌ।
লোকত্রয়ঃ উপকারায় # তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ।।

(**অর্থ** :-উপনিষদসমূহ হল গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন (গোয়ালাপুত্র) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হলেন দোহনকারী, অর্জুন সেই গাভীর বৎস এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল সেই গাভীর অমৃতোপম দুগ্ধ। সুধীগণ সেই অমৃতোপম দুগ্ধ পান করেন।

প্রথমে অর্জুনের রথের সারথি হয়ে যিনি ত্রিলোকের কল্যাণের নিমিত্ত এই গীতারূপ অমৃত দান করেন সেই পরম পরমাত্মা করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।)

সংস্কৃত আমার প্রিয় ভাষা, সংস্কৃত শাস্ত্র আমার প্রিয় শাস্ত্র। সেই কারণে বিভিন্ন সময়ে সংস্কৃত শাস্ত্রের বিষয়ে আমি মাঝে মাঝে কিছু কিছু লিখতে প্রয়াসী হয়েছি। কিন্তু শঙ্করাচার্য, শ্রীধরস্বামী, রামানুজ, ঋষি অরবিন্দ, লোকমান্য তিলক, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, প্রভুপাদ এ. সি. ভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, আমার ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চনের পক্ষে সেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ন্যায় মহাপারাবার সদৃশ মহাগ্রন্থের সম্পাদনা করার প্রয়াস নিতান্ত ঔদ্ধত্য ব্যতীত কিছু নয়। সেইজন্য আমি এখানে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ঠিক সম্পাদনা করিনি। কেবল যে কোন সাধারণ মানুষ যাতে সহজে এই মহাগ্রন্থ পাঠ ও তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে তার জন্য শ্লোকগুলি ও তার অর্থ ও ব্যাখ্যা সহজ ও সরল ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেছি। বস্তুত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এক অপূর্ব, অদ্ভুত অতুলনীয় গ্রন্থ। কয়েক হাজার বছর আগে লেখা এই গ্রন্থে কোন প্রাচীনযুগের সংস্কার, গ্রাম্যতা এসব কিছুই পাওয়া যায় না। এখানে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে কথোপকথন শুনে কখনও কি মনে হয় যে সেটি সেই কোন প্রাচীন, সভ্যতার আলোকবিহীন সময়ের রচনা? মনে হয় কি সভ্যতার আলোকবিহীন অনুন্নত সমাজের কোন গ্রাম্য চেতনাসম্পন্ন মানুষ অসংলগ্ন, অবাস্তব, কাল্পনিক বক্তব্য সাজিয়ে এই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন? বস্তুত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মত এত আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন গ্রন্থ

আর দ্বিতীয় নাই। এই মহাগ্রন্থ পাঠ করতে করতে মনে হয় যেন এই একবিংশ শতাব্দীর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কেউ কথাগুলি বলছেন। সত্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আধুনিকতা প্রশ্নাতীত। পূর্ণিমার রজনীতে যখন মধ্যগগনে চাঁদ অবস্থান করে তখন যতদ্রুত যতদূরেই যাওয়া যায় সর্বদা চাঁদকে মাথার উপরেই দেখা যায়, কারোরই পক্ষে চাঁদকে অতিক্রম করা সম্ভব হয় না, তেমনই যতদিনই অতিক্রান্ত হোক, যতই তথাকথিত আধুনিক সভ্যাতার অগ্রগতি হোক, গীতার আধুনিকতাকে অতিক্রম করা কারোরই পক্ষে সম্ভব হবে না।

আলোচনার প্রারম্ভে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নামের অর্থটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা প্রয়োজন। আমাদের সামনে দুটি মহাগ্রন্থ আছে — শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং অপরটি হল শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ। একটিতে 'ভগবৎ' অপরটিতে 'ভাগবত'। এবিষয়ে পাঠকের মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে একটির ক্ষেত্রে 'ভগবৎ' অপরটির ক্ষেত্রে 'ভাগবত' লিখব কেন এবং এবিষয়ে তাঁরা প্রায়শই বানান ও উচ্চারণে ভুল করেন। সেইজন্য এই বিষয়টি ব্যাখ্যা ক'রে দিলে তাঁদের মনের সংশয় দূর হয়ে যাবে ব'লে মনে করি। 'শ্রী' শব্দের অর্থ হল ঐশ্বর্যপূর্ণ আর 'ভগবৎ' শব্দের অর্থ হল পরম পূজনীয় ভগবান্। তাহলে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' শব্দের অর্থ হল পরম ঐশ্বর্যপূর্ণ পরম পূজনীয় গীতা। আর 'ভাগবত' শব্দের অর্থ হল ভগবানের ভক্ত, পূজক বা ভজনাকারী। তাহলে 'শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ' শব্দের অর্থ হল সেই পরম ঐশ্বর্যপূর্ণ পুরাণ যিনি ভগবানের পূজা বা ভক্তি করেন। তাহলে গীতা হল পরম ভগবৎ অর্থাৎ পরম পূজনীয় স্বয়ং শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। গীতা কোন গ্রন্থ নয়। ইনি শ্রীকৃষ্ণেরই আর এক রূপ, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিষ্ণুর পূর্ণাবতার। তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আমাদের মায়াবদ্ধ আপাত দৃষ্টিতে দৃষ্ট রক্ত-মাংসের অবতার নন, তিনি হলেন অক্ষরের আকারে বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণাবতার অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণের আখরাবতার (এ বিষয়ে আমার অপর গ্রন্থ 'ভারতের কৃষ্ণভাবনা'তে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে)। তাই শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরম পূজনীয় তেমনই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও আমাদের পরম আরাধ্য, পরম পূজনীয়। সেইজন্য গীতাকে ভগবৎ অর্থাৎ পরম পূজনীয় গীতা বলা হয়েছে। সেইজন্য আমরা যখনই বলি 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' তখনই আমাদের আপনা আপনিই বলা হয়ে যায়— পরম পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণ। সেইজন্য কোন ভক্ত যেমন অনন্যচিত্তে নিষ্কামভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করলে কৃষ্ণের দর্শন, আনুকূল্য, কৃপা লাভ করবেন তেমনই তিনি যদি নিত্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঠন, অনুশীলন করেন তাহলেও তিনি একইভাবে কৃষ্ণের দর্শন, আনুকূল্য, কৃপা লাভ করবেন।

গীঃ বা গিরা শব্দের অর্থ হল বাক্য, বচন, বাণী, ভাষা। সেইজন্য বাগদেবী অর্থাৎ বাক্যের দেবী সরস্বতীর অপর নাম গীর্দেবী। সুতরাং যাঁর মধ্যে শ্রীভগবানের বাণী

উত্তমরূপে বর্ণিত বা গীত হয়েছে তাকেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলা হয়। এই মহা পবিত্র গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে স্বয়ং ভগবান্ যে কি চোখে দেখতেন তা তিনি নিজ মুখে শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে ঘোষণা ক'রে গিয়েছেন—

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ # গীতা মে সারম্ উত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানম্ অত্যুগ্রং # গীতা মে জ্ঞানম্ অব্যয়ম্।।
গীতা মে চ উত্তমং স্থানং # গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং # গীতা মে পরমো গুরুঃ।।
গীতা আশ্রয়ে অহং তিষ্ঠামি # গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য # ত্রিলোকীং পালয়ামি অহম্।।

অর্থাৎ গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার সারসর্বস্ব, গীতাই আমার অত্যুগ্র ও শাশ্বত জ্ঞান, গীতাই আমার উত্তম স্থান, গীতাই আমার পরম পদ, গীতাই আমার পরম গোপনীয় শাস্ত্র, গীতাই আমার পরম গুরু। গীতাকে আশ্রয় ক'রেই আমি অবস্থান করি, গীতাই আমার পরম গৃহ, গীতার জ্ঞান আশ্রয় করেই আমি স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল এই ত্রিলোক পালন ক'রে থাকি।

সংক্ষেপে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং 'শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ' হলেন শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত, পূজক বা ভজনাকারী। সুতরাং পাঠকের এই 'ভগবৎ' ও 'ভাগবত' শব্দ দুটির অর্থ সম্যক জেনে রাখা প্রয়োজন।

প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি সংবিধান থাকে। সেই সংবিধানে রাষ্ট্রের করণীয় কর্মের উল্লেখ ও নির্দেশ থাকে। সেই সংবিধানকে অতিক্রম ক'রে কোন কাজ করা কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়, সংবিধান অগ্রাহ্য ক'রে কোন কাজ করতে গেলে সেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পরে। তেমনই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল সমগ্র মানবজীবনের সংবিধান স্বরূপ। উন্নত মানবজীবন লাভ করতে গেলে মানবের কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় তার প্রতিটি দিকের যথাযথ উল্লেখ আছে এই মহাগ্রন্থে। এই সমস্ত উপদেশ ও নিষেধ পালন ক'রে জীবন অতিবাহিত করলে মানবের জীবন হয়ে উঠবে স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত। কিন্তু এর বিপরীত কর্ম করতে প্রয়াসী হলে মানবের জীবন তথা সমাজে অবশ্যম্ভাবীভাবে নেমে আসবে ধ্বংস। সংস্কৃতের ছাত্রী হিসাবে আমি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে সমাজের অসংখ্য মানুষ গীতা পাঠ ক'রে আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করতে চান। কিন্তু আমি বড়ই দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে সমাজের বিশাল সংখ্যক মানুষ গীতাপাঠ করতেই পারেন না। খুব উৎসাহ সহকারে সাধারণ পাঠকদের কেউ কেউ গীতাপাঠে অগ্রসর হলেও দু/একটি শ্লোক পাঠ ক'রেই পাঠ অসমাপ্ত রেখেই পাঠে নিরস্ত হতে বাধ্য হন। কারণ গীতার বহু শ্লোকেই এক

বা একাধিক এমন সন্ধিবদ্ধ পদ আছে যা পাঠকের মাতৃভাষার লিপিতে লিখিত হলেও তার পাঠোদ্ধার করা সেই সাধারণ পাঠকের পক্ষে সম্ভব হয় না। সেই কারণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ন্যায় মহাগ্রন্থ পাঠের আনন্দ থেকে তাঁদের বঞ্চিত থাকতে হয়। অথচ আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি যে সেই সন্ধিবদ্ধ পদগুলি সন্ধি বিচ্ছেদ করে দিলেই সেই পাঠকই খুব সহজেই তা পাঠ করতে পারেন এবং এমনকি সেই সমস্ত পদের অর্থও তাঁরা অনেকটাই বুঝতে পারেন। যেমন তৃতীয় অধ্যায়ের ২৫তম শ্লোকটির অংশবিশেষ "কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্", পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকের অংশবিশেষ "তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ", ষষ্ঠ অধ্যায়ের নবম শ্লোকটির অংশবিশেষ "সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু", নবম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকটির অংশবিশেষ "মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং" প্রভৃতি পদগুলি এখানে উদ্ধৃত করা হল। এই পদগুলি সাধারণ পাঠকের সামনে উপস্থিত হলে প্রথমত তিনি এদের সহজে পাঠোদ্ধারই করতে পারবেন না। যদিবা কোন প্রকারে এগুলি পাঠ করেও ফেলেন তাহলেও তিনি এদের অর্থ কিছুই উপলব্ধি করতে পারবেন না এবং এরকম পদ পরপর কয়েকটি পদ তাঁর সামনে উপস্থিত হলে তিনি গীতাপাঠের ধৈর্যই হারিয়ে ফেলবেন। কিন্তু যদি 'কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্' পদটির সন্ধিবিচ্ছেদ ক'রে "কুর্যাৎ বিদ্বান্ তথা অসক্তঃ চিকীর্ষুঃ লোকসংগ্রহম্' এইভাবে বা "তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ" পদটির সন্ধি ভেঙ্গে 'তৎ বুদ্ধয়ঃ তৎ আত্মানঃ তৎ নিষ্ঠাঃ তৎ পরায়ণাঃ' এইভাবে অথবা "সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু" পদটির সন্ধি ভেঙ্গে 'সুহৃৎ-মিত্র-অরি- উদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু' এইভাবে বা "মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং" পদটির সন্ধিবিচ্ছেদ ক'রে 'মন্ত্রঃ অহম্ অহম্ এব আজ্যম্ অহম্ অগ্নিঃ অহং এইভাবে লিখিত আকারে উপস্থাপিত করা যায় তাহলে সেই পাঠকই অতি সহজে শ্লোকটি পাঠ করতে সক্ষম হবেন এবং পাঠকালেই তার অর্থও কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন।

সেইজন্য এই গ্রন্থে আমি সন্ধিবদ্ধ পদগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ ক'রেই উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী হয়েছি। অবশ্য সমস্ত সন্ধিবদ্ধ পদগুলিই যে ভেঙেছি তা নয়, যে সব সন্ধিবদ্ধ পদ না ভাঙলে পাঠকের পড়তে বা বুঝতে অসুবিধা হয় না বা যে শ্লোকটিকে শুনে শুনে তারা খুবই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, বা যেখানে সন্ধি ভাঙলে পড়ার বা ছন্দের সাবলীলতা ব্যাহত হয় সেখানে সন্ধি ভাঙিনি। লুপ্ত 'অ'কারের ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জন করেছি কারণ সাধারণ পাঠকের পক্ষে লুপ্ত 'অ'কারের ব্যাপারটা বোঝা সম্ভব নয়। বড় বড় পদগুলির মধ্যে কখনও কখনও হাইফেন চিহ্ন দিয়েছি যাতে সাধারণ পাঠক সহজে সেগুলি পড়তে পারেন। সন্ধি ভেঙে শ্লোকগুলি লেখার আর একটি

কারণ হল যে শ্লোকের পদের সঙ্গে শব্দার্থের শব্দগুলির বিভক্তির পার্থক্য থাকলে সাধারণ পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন। সেইজন্য শ্লোক ও শব্দার্থে ব্যবহৃত শব্দের আকারের সঙ্গতি রাখার জন্য শ্লোকে সন্ধি ভেঙে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া ছন্দের পাদ বিভাজনের প্রয়োজনেও অনেক স্থানে সন্ধিবিচ্ছেদ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অবশ্য অনেক পুস্তকে যেখানে শ্লোকের অন্বয় দেওয়া আছে সেখানে সন্ধি ভেঙ্গে অর্থ বলা থাকে। কিন্তু কোন সাধারণ পাঠক যখন গীতা পাঠ করতে চান তখন তাঁর পক্ষে অন্বয় মিলিয়ে মিলিয়ে পাঠ ক'রে তার রস আহরণ করা কোনমতেই সম্ভব নয়। আর এই কারণেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমার মূল উদ্দেশ্য হল সাধারণ পাঠককে সহজে গীতা পাঠ করতে সাহায্য করা। একাজে অনেকক্ষেত্রে হয়ত ব্যাকরণের সঙ্গে কিছুটা আপস করতে হয়েছে। আবার সংরক্ষণবাদীরা হয়ত খড়্গহস্ত হয়ে বলতে পারেন যে এই গ্রন্থে গীতা পরিবেশনের প্রচলিত প্রথাকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। কিন্তু সে যাই হোক, বাংলার শহরে-গঞ্জে-গ্রামে-হাটে-বাজারে সর্বত্রই যদি বিশেষ ক'রে সংস্কৃতের জ্ঞানবিহীন আগ্রহী পাঠকগণ আমার এই গ্রন্থের সাহায্যে অনায়াসে সাবলীলভাবে গীতাপাঠের অনাবিল আনন্দ লাভ করতে পারেন তাহলে আমি আমার পরিশ্রম সার্থক ব'লে মনে করব। আমার বক্তব্য হল ক্ষুধার্ত মানুষ আগে খেয়ে তার প্রাণটাকে রক্ষা করুক, তারপর তার শরীরের পুষ্টির কথা চিন্তা করা যাবে। গীতার শ্লোকের অর্থ লেখাটি তেমন কিছু নূতন বিষয় নয়। বাজারে অনেক গীতাগ্রন্থ আছে যাদের সকলেরই অনুবাদ প্রায় একই রকম। তবে অনেক গ্রন্থের ভাষা অনেক ক্ষেত্রে গুরুগম্ভীর এবং অনুবাদের মধ্যে গীতার তত্ত্বের এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলি একটু বিশ্লেষণ ক'রে না বললে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। সেইজন্য আমি এখানে মূল শ্লোকের বাংলা ও ইংরেজিতে বঙ্গানুবাদ অতি সরল ভাষায় করেছি এবং যতখানি সম্ভব অনুবাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ তত্ত্ববহনকারী শব্দগুলির অর্থ বিশ্লেষণ ক'রে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি যাতে ক'রে যে কোন পাঠকই তার মর্ম উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে বাংলা অক্ষরের সঙ্গে যে সমস্ত পাঠকগণের পরিচিতি নেই তাঁরাও যাতে সহজে গীতাপাঠ করতে পারেন সেইজন্য শ্লোকগুলিকে বাংলায় লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্কৃত বর্ণমালা (IAST —International Alphabet of Sanskrit Transliteration)তেও লিপিবদ্ধ করেছি এবং ইংরেজীতে অনুবাদ করেছি এবং সেই IAST এর বর্ণগুলি কিভাবে পাঠ করতে হবে তার বিস্তারিত নির্দেশিকা দিয়েছি। একটু চেষ্টা করলেই যে কোন পাঠকই এই IAST বর্ণমালাযুক্ত শ্লোকগুলি সহজেই পাঠ করতে সক্ষম হবেন।

সমগ্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থখানি মূলত প্রতি পাদে ৮টি অক্ষরবিশিষ্ট অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। অবশ্য প্রতি পাদে ১১ অক্ষরবিশিষ্ট ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের কতিপয় শ্লোকও আছে। শ্লোকগুলি যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটানে পড়ে যাওয়া যায় তাহলে শ্লোকগুলির অর্থ ও রস সম্যক উপলব্ধির পথে বাধা সৃষ্টি হবে। সেইজন্য যে শ্লোক যে ছন্দে রচিত সেই ছন্দের নিয়ম অনুসরণ ক'রে শ্লোকগুলি পাঠ করলে তবেই শ্লোকগুলির অর্থ ও রস সম্যক উপলব্ধি হবে। শ্লোকগুলির প্রতিটি পঙ্ক্তিতে দুইটি ক'রে পাদ থাকে এবং প্রতিটি পঙ্ক্তির প্রথম পাদের অন্তে সামান্য যতি অর্থাৎ বিরাম দিয়ে পরবর্তী পাদ পাঠ করতে হয়। সাধারণ পাঠকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় কোথায় পূর্বের পাদ শেষ হয়ে পরবর্তী পাদ শুরু হল এবং ছন্দের নিয়ম শেখানোর স্থানও এটি নয়। আর সাধারণ পাঠকের পক্ষে প্রতিটি পাদের ৮টি বা ১১টি অক্ষর কোনগুলি, প্রকৃতপক্ষে কোথায় যতি হবে তাও অনেকাংশে মূল গ্রন্থ পাঠ ক'রে বোঝা সম্ভব হবে না কারণ সেখানে এমন এমন সন্ধিবদ্ধ পদ আছে, লুপ্ত 'অ'কারের ব্যবহার আছে, হসন্তযুক্ত বর্ণ আছে যে তাঁদের পক্ষে সেখান থেকে অনুষ্টুপ্ ছন্দের আটটি বা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের এগারটি অক্ষর নিরূপণ করা প্রায় দুঃসাধ্য। তবে অতি সংক্ষেপে বলে রাখি যে অক্ষরগুলি গণনার সময় যুক্ত অক্ষরগুলিকে একটা অক্ষর গণনা করতে হবে এবং হলন্ত চিহ্নযুক্ত বর্ণগুলি এই গণনার মধ্যে আসবে না। আবার আমার এই গ্রন্থে সাধারণ পাঠকদের পাঠের সুবিধার জন্য মূল শ্লোকের সন্ধিবদ্ধ পদগুলির অধিকাংশেরই সন্ধি বিচ্ছেদ করেছি এবং প্রতিটি পঙ্ক্তির প্রথম পাদের অন্তে কোথায় যতি বা বিরাম হবে তা সহজে বোঝার জন্য যেখানে যতি হবে সেখানে একটি ক'রে '**#**' চিহ্ন স্থাপন করেছি। আশা করি এর পর পাঠকদের পক্ষে ছন্দগুলির নিয়ম অনুযায়ী কোথায় যতি বা বিরাম হবে তা অনায়াসে বুঝে নিয়ে সেইভাবে পাঠ করতে অসুবিধা হবে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকগুলির ছন্দ ও বিরাম ঠিকমত পালন ক'রে পাঠ করতে পারলে শ্লোকগুলির অর্থ উপলব্ধি করা অনেক সহজ হয়ে যায়। সাধারণ পাঠকগণের কাছে যখন আমার এই গ্রন্থের মাধ্যমে গীতাপাঠ সরল ও সহজ হয়ে যাবে তখন তাঁরা ইচ্ছা হলে সন্ধিবদ্ধ শ্লোকসম্বলিত মূল গ্রন্থ পাঠ করলে গীতাপাঠ তাঁদের নিকট আরও আকর্ষণীয় ও আত্মানন্দের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উঠবে।

পরিশেষে সংস্কৃত বর্ণ 'য' এবং অনুনাসিক বর্ণ যথা অনুস্বার ও 'ম্' এর লিখন ও উচ্চারণ পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। সেইজন্য এখানে খুব সংক্ষেপে এ বিষয়ে আলোচনা করা হল যাতে সাধারণ পাঠক সহজে বিষয়টি বুঝতে পারেন।

(১) সাধারণ পাঠক দেখে থাকেন যে কোথাও কোথাও কখনও কখনও পাশাপাশি দুটি শব্দের (পদের) শেষে একটির ক্ষেত্রে লেখা হচ্ছে অনুস্বার আর অপরটির ক্ষেত্রে লেখা হচ্ছে 'ম্'। তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগে এরকম তফাতের কারণ কি এবং তিনি নিজে যদি লেখেন তাহলে কখন অনুস্বার লিখবেন এবং কখন 'ম্' লিখবেন। এবিষয়ে তাঁদের অনেকেই আমাকে প্রশ্নও করেছেন। তাই সাধারণ পাঠকের মন থেকে এই সংশয় দূর করার জন্য এ বিষয়ে আমি নিম্নে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করছি—

(ক) যে সমস্ত শব্দের শেষে অনুস্বার বা 'ম্' লেখার প্রশ্ন আসবে সেই শব্দের পরেই যে শব্দটি থাকবে সেটি যদি ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে শুরু হয় তাহলে তার পূর্বের শব্দটির শেষে অনুস্বার বসবে অর্থাৎ অতি সংক্ষেপে— পরে ব্যঞ্জন বর্ণ আছে তাহলে পূর্বের বর্ণ অনুস্বার হবে যেমন— গ্রামং গচ্ছতি। এখানে যেহেতু 'গচ্ছতি' শব্দটি 'গ' এই ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে তাই তার পূর্বের শব্দ 'গ্রাম' এর শেষে অনুস্বার বসেছে। আর একটি উদাহরণ— উত্তরস্যাং দিশি। এখানে পরের শব্দ 'দিশি' 'দ' এই ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে তাই তার পূর্বের শব্দ 'উত্তরস্যাং'এর শেষে অনুস্বার বসেছে।

আবার যদি দেখা যায় যে, যে সমস্ত শব্দের শেষে অনুস্বার বা 'ম্' লেখার প্রশ্ন আসবে সেই শব্দের পরেই যে শব্দটি থাকবে সেটি যদি স্বরবর্ণ দিয়ে শুরু হয় তাহলে তার পূর্বের শব্দটির শেষে 'ম্' বসবে অর্থাৎ অতি সংক্ষেপে— পরে স্বরবর্ণ আছে তাহলে পূর্বের বর্ণ 'ম্' হবে যথা— অহম্ অস্মি। এখানে 'অহম্' শব্দের পরের শব্দ 'অস্মি' এই শব্দটি 'অ' এই স্বরবর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে। সেইজন্য 'অহম্' শব্দটির অন্তে 'ম্' বসেছে। আর একটি উদাহরণ— বীজম্ অব্যয়ম্। এখানে 'বীজম্' শব্দের পরের শব্দ ''অব্যয়ম্ এই শব্দটি 'অ' এই স্বরবর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে। সেইজন্য 'বীজ' শব্দের শেষে 'ম্' বসেছে।

প্রসঙ্গত বলে রাখি যে যদি কোন শব্দের পর আর কোন শব্দ না থাকে (যেমন শ্লোকের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি বা লাইনের শেষে) তাহলে সেই শেষ শব্দের শেষে অনুস্বার বা 'ম্' লেখার প্রশ্ন আসলে সেখানে সর্বদা 'ম্' বসবে যেমন শ্লোকের অন্তে সর্বদাই 'ম্' বসবে।

এবার অনুস্বার ও 'ম্' এর পাশাপাশি অবস্থানের উদাহরণ দেওয়া যাক— 'অহং

স্বধা অহম্ ঔষধম্’। এখানে ‘স্বধা’ শব্দটি শুরু হয়েছে ‘স’ এই ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে। সেইজন্য তার আগের শব্দের অন্তে অনুস্বার ব’সে ‘অহং’ হয়েছে। আবার ‘ঔষধম্’ শব্দটি ‘ঔ’ এই স্বরবর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে। সেইজন্য তার আগের শব্দের অন্তে ‘ম্’ ব’সে ‘অহম্’ হয়েছে।

(খ) এ তো গেল লিখন পদ্ধতি। এখন উচ্চারণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। যাঁরা বাংলা লিপিতে সংস্কৃত পাঠ ক’রে থাকেন তাঁরা সংস্কৃত বর্ণগুলি বাংলা ভাষার উচ্চারণের রীতি অনুসরণ ক’রে উচ্চারণ ক’রে থাকেন যা সংস্কৃত ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে চলবে না। সেইজন্য কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(১) সংস্কৃতে ‘য’ এর সর্বদা উচ্চারণ হবে — ‘ইয়’, কখনও বাংলায় ‘জ’এর মত নয়। যেমন ‘যোগ’ শব্দের উচ্চারণ হবে ‘ইয়োগ’, ‘যমুনা’ শব্দের উচ্চারণ হবে ‘ইয়মুনা’। ‘যন্ত্র’ শব্দের উচ্চারণ হবে ‘ইয়ন্ত্র’ প্রভৃতি।

অনুস্বারের উচ্চারণ যেরকম বাংলায় সর্বত্র একই প্রকার হয়ে থাকে, সংস্কৃতে সে রকম হবে না। সহজ ভাষায় যদি বলা হয় তাহলে সংস্কৃতে বাক্যান্তর্গত শব্দে অনুস্বার ব্যবহৃত হলে শব্দে তার অবস্থান অনুযায়ী পাঁচ প্রকারের যথা — ঙ, ঞ, ণ, ন ও ম এদের কোন একটির মত অনুনাসিক ধ্বনি উচ্চারিত হবে। বাংলা বা সংস্কৃত বর্ণমালায় ব্যঞ্জন বর্ণের পাঁচটি বর্গ আছে যথা ক থেকে ঙ পর্যন্ত কবর্গ, চ থেকে ঞ পর্যন্ত চবর্গ, ট থেকে ণ পর্যন্ত টবর্গ, ত থেকে ন পর্যন্ত তবর্গ এবং প থেকে ম পর্যন্ত পবর্গ। ক থেকে ম পর্যন্ত বর্ণসমূহকে বর্গীয় বর্ণ বলা হয় এবং বাকী বর্ণগুলিকে আমরা অবর্গীয় বর্ণ বলতে পারি। প্রতিটি বর্গের শেষ বর্ণকে অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ বলা হয় কারণ এগুলিকে নাকে উচ্চারণ করা হয়। কোন বর্ণ মুখে বা নাকে উচ্চারিত হয় তা কিভাবে বোঝা যাবে? যে সব বর্ণ উচ্চারণের সময় মুখ দিয়ে হাওয়া বের হয় সেগুলি মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় বলা যায় যেমন অনুনাসিক বর্ণ বাদে অন্য সব বর্ণ। আর কিছু বর্ণ আছে যেগুলি উচ্চারণের সময় মুখ ও নাক উভয় দিয়ে হাওয়া বের হয়। সেগুলিকে অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ বলা হয় যথা ঙ, ঞ, ণ, ন ও ম। তবে অনুস্বাররের উচ্চারণের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নাক দিয়ে হাওয়া বের হয়।

(২) এখন অনুস্বারের পর যদি —

(ক) ক থেকে ঙ পর্যন্ত কোন বর্ণ থাকে তাহলে অনুস্বারের উচ্চারণ হবে — ঙ যথা অং + গ = অঙ্গ বঙ্গ ইত্যাদি।

(খ) চ থেকে ঞ পর্যন্ত কোন বর্ণ থাকে তাহলে অনুস্বারের উচ্চারণ হবে — ঞ যথা চঞ্চু, অঞ্চল ইত্যাদি।

(গ) ট থেকে ণ পর্যন্ত কোন বর্ণ থাকে তাহলে অনুস্বারের উচ্চারণ হবে — ণ যথা মণ্ডন, গণ্ড ইত্যাদি

(ঘ) ত থেকে ন পর্যন্ত কোন বর্ণ থাকে তাহলে অনুস্বারের উচ্চারণ হবে — ন যথা দন্ত, অন্ত ইত্যাদি

(ঞ) প থেকে ম পর্যন্ত কোন বর্ণ থাকে তাহলে অনুস্বারের উচ্চারণ হবে — ম যথা পম্পা, বিম্ব ইত্যাদি।

অর্থাৎ কোন শব্দ যে বর্গের বর্ণ দিয়ে শুরু হবে তার পূর্বের শব্দের শেষে অনুনাসিক বর্ণ থাকলে তার উচ্চারণ সেই বর্গের অর্থাৎ পরবর্তী শব্দের আদ্য অক্ষর যে বর্গের সেই বর্গের অনুনাসিক ধ্বনির মত হবে।

অবর্গীয় বর্ণ পরে থাকলে তার পূর্বের অনুস্বারের উচ্চারণ 'ম্' হবে।

অর্থাৎ এক কথায় সংস্কৃতে অনুস্বারের উচ্চারণ কখনই বাংলা ভাষার অনুস্বারের মত হবে না অর্থাৎ লেখার সময় অনুস্বার লেখা হলেও উচ্চারণের সময় সেটি উপর্যুক্ত স্থান বিশেষে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম প্রভৃতির কোন একটির মত হবে। তবে এই অনুনাসিক বর্ণগুলির উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রভেদ এতই সূক্ষ্ম যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার সঠিক অনুধাবন করা দুষ্কর এবং সাধারণ পাঠকের পক্ষে স্থানভেদে অনুস্বারের উচ্চারণ কেমন হবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব ক'রে পাঠ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য সাধারণ পাঠকদের প্রতি আমার পরামর্শ যে পাঠ করার সময় এত হিসাব মাথায় রাখার প্রয়োজন নাই। এতে গীতার মূল রস আস্বাদনেও তাঁদের কোন অসুবিধা হবে না। এত সূক্ষ্ম বিচার করবেন তাঁরা যাঁরা সংস্কৃত চর্চা করেন, যাঁরা সংস্কৃত ভাষার ছাত্রদেরকে সংস্কৃত পাঠ শেখাবেন। তথাপি যদি কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক বিষয়টি জানতে চান সেইজন্য বিষয়টি এখানে উপস্থাপিত করেছি। সাধারণ পাঠকের উদ্দেশ্য হল সহজে গীতাপাঠ ও তাকে সাধারণভাবে বোঝা। তাঁদের পক্ষে এই সূক্ষ্ম নিয়মটুকু সামান্য এড়িয়ে গেলে এমন কোন ভাগবত অশুদ্ধ হবে না তবুও যতটা সম্ভব শুদ্ধ উচ্চারণ যাতে করা যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন।

ভূমিকা সমাপ্তির পূর্বে মনের একটি খেদ প্রকাশ করাটি সমীচীন মনে করছি। খুব স্বাভাবিক কারণেই আমাদের দেশের বেশীরভাগ মানুষই সংস্কৃতভাষার জ্ঞানরহিত। কিন্তু তথাপি বিপুল সংখ্যক মানুষ সংস্কৃত শাস্ত্র সম্পর্কে জানতে আগ্রহী কারণ সংস্কৃত শাস্ত্রের গভীরে যে পরম জ্ঞান সঞ্চিত আছে তার তুলনা বিশ্বে কোথাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু বেশীরভাগ মানুষের সংস্কৃতের জ্ঞান না থাকার জন্য তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ভাষায় অনুদিত সামান্য কিছু শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে ততোধিক সামান্য জ্ঞান অর্জন ক'রে যত ভুল মতামত পেশ করেন, প্রকৃত অর্থ কি তা জানার অবসর তাদের হয় না। ফলে সামগ্রিকভাবে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য গভীরভাবে ব্যর্থ হয়। এইটি একটি বিরাট দুঃখের বিষয়। এই সমস্ত অজ্ঞ মানুষদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান কিভাবে প্রকৃত অর্থকে

বিকৃত করে তার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। একদা একজন বিদ্যালয় শিক্ষক শ্রেণীর ছাত্রদের নিকট একটি রচনার অর্থ জানতে চাইলেন—

সরোবরে ভাসিতেছে কমল-সুন্দর।
কি আশ্চর্য ধরিয়াছে শোভা মনোহর।

একজন অতি উৎসাহী ছাত্র এক নিমেষেই উত্তর দিয়ে বলল — একটি সরোবরে কমল এবং সুন্দর নামে দুইটি যুবক ভাসছে অর্থাৎ সাঁতার কাটছে এবং কি আশ্চর্য! মনোহর নামে অপর একটি যুবক শোভা নামে একটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরেছে।

এই হল বর্তমানে পথে, ঘাটে, সভা, সমিতি, মিডিয়াতে সাধারণ মানুষের শাস্ত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা। তাই এই সমস্ত মানুষের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ আগে ভালোভাবে শাস্ত্র পাঠ ক'রে তার প্রকৃত অর্থ বুঝুন এবং তার পরই তার সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হন। দয়া ক'রে শাস্ত্রের বিকৃত, চটুল অর্থ ক'রে শাস্ত্রের মানহানি করবেন না।

আর একটি কথা। গীতা পরম বস্তু, শ্রীকৃষ্ণ পরম তত্ত্ব। তাঁকে জানতে, বুঝতে, উপলব্ধি করতে হলে একমাত্র আবশ্যিক শর্ত হল সেই চির নিষ্কলুষ, অপাপবিদ্ধ, অনাদি, অসীম, অনন্ত তত্ত্ব ও তাঁর উপদেশের প্রতি নিঃশর্ত আস্থা, অন্তরের পূর্ণ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস। এই স্বর্গীয় গুণের যাঁরা অধিকারী নন, যাঁদের অন্তর তাঁর প্রতি অবজ্ঞা, সন্দেহ, অশ্রদ্ধায় পূর্ণ, তাদের জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নয়। তাদের এই মহাগ্রন্থ তথা পরম তত্ত্ব থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। একথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে এই গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৭তম শ্লোকে বলে গিয়েছেন। 'শ্রীরামচরিতমানস'গ্রন্থে (উত্তরকাণ্ড - ২২১) গোস্বামী তুলসীদাসের মুখ থেকেও এই একই নিষেধবাক্যই শুনতে পাই —

যহ ন কহী জে সঠ হঠসীলহিঁ।
জো মন লাই ন সুন হরিলীলহিঁ।।
কহিয় ন লোভিহি ক্রোধিহি কামিহি।
জো ন ভজই সচরাচর স্বামিহি।।

অর্থাৎ এই গ্রন্থ দুষ্ট, জেদী, হরিকথা শ্রবণে অমনোযোগী, লোভী,কামী, ক্রোধী, জগতের স্বামী শ্রীকৃষ্ণের ভজনাহীন ব্যক্তিদের নিকট বলবে না।

সুতরাং যাঁরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভক্তিবিনম্রচিত্তে পরম শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করতে পারবেন একমাত্র তাঁরাই এই গ্রন্থ হস্তে ধারণ করবেন এই প্রার্থনা।

সেবন্তী সিন্‌হা

গীতাপাঠ বিধি

গীতা আমাদের নিকট কোন দূরের বস্তু নয়, গীতা আমাদের আত্মার আত্মীয়, প্রাণের ধন। সেইজন্য গীতাপাঠের জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট কোন বাঁধাধরা কঠোর নিয়ম বা বিধি নেই। তবে অবশ্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ন্যায় মহা পবিত্র জগতে অতুল মহাগ্রন্থ পাঠের ক্ষেত্রে পাঠকের কিছু বিধি পালন করা বিধেয়। গীতাপাঠককে অবশ্যই পবিত্র মনে, পবিত্র দেহে, পবিত্র বসনে, পবিত্র স্থানে ও পবিত্র আসনে উত্তর বা পূর্বদিকে মুখ ক'রে উপবেশন ক'রে গীতাপাঠ করতে হবে। গীতাপাঠের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত গুরুপ্রণাম মন্ত্র পাঠ করা বিধেয়—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুঃ উন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

তারপর পিতা-মাতাকে প্রণাম—

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা।।
মাতা জননী ধরিত্রী দয়াদ্র হৃদয়া সতী।
দেবীভ্যো রমণী শ্রেষ্ঠা নির্দোষা সর্ব দুঃখ হরা।

তারপর হাত জোড় ক'রে 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই মন্ত্রটি তিনবার উচ্চারণ ক'রে তারপর গীতাকে পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ্য অর্পণ করতে হয়।

তারপর জোড়হস্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে—

ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মালা মন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণ পরামাত্মা দেবতা।

"অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ ত্বং প্রজ্ঞাবাদান্ চ ভাষসে" (২/১১) ইতি বীজম্।

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮/৬৬) ইতি শক্তিঃ।

"অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" (১৮/৬৬) ইতি কীলকম্।

এরপর করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করতে হবে। 'ন্যাস' শব্দের অর্থ হল শুদ্ধি। সেইজন্য করন্যাস ও অঙ্গন্যাসের অর্থ হল হাত এবং অঙ্গশুদ্ধি। ন্যাসের উদ্দেশ্য হল দেব-দেবীদের আমাদের দেহের অভ্যন্তরে আবাহন করা। আমাদের শরীরে ৭২০০০ নাড়ী আছে কিন্তু শুদ্ধির জন্য আমাদের সমস্ত নাড়ীগুলিকে স্পর্শ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য কেবল অঙ্গুলির অগ্রভাগ ব্যবহার ক'রে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে দেব-দেবীদের আবাহন করা হয়।

করন্যাসের পদ্ধতি :—

(ক) উভয় হাতের তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যস্থান স্পর্শ করে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে—

'ন এনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি ন এনং দহতি পাবকঃ' (২/২৩) ইতি অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ;

(খ) উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা তর্জনীর মধ্যস্থান স্পর্শ করে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে—

'ন চ এনং ক্লেদয়ন্তি আপো ন শোষয়তি মারুতঃ' (২/২৩) ইতি তর্জনীভ্যাং স্বাহা;

(গ) উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা মধ্যমার মধ্যস্থান স্পর্শ করে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে— 'অচ্ছেদ্যঃ অয়ম্ অদাহ্য অয়ম্ অক্লেদ্যঃ অশোষ্য এব চ' (২/২৪) ইতি মধ্যামাভ্যাং বষট্।

(ঘ) উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা অনামিকার মধ্যস্থান স্পর্শ করে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে— 'নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুঃ অচলঃ অয়ং সনাতনঃ' (২/২৪) ইতি অনামিকাভ্যাং হুম্।

(ঙ) উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা কনিষ্ঠার মধ্যস্থান স্পর্শ করে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে— 'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশঃ অথ সহস্রশঃ' (১১/৫) ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বষট্।

তারপর বামহাতের তালুর নিচের দিকে ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা বাদে অপর তিনটি আঙুল স্থাপন ক'রে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে — 'নানাবিধানি দিব্যানি নানা-বর্ণ-আকৃতীনি চ' (১১/৫) ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ এবং এই মন্ত্রটি পাঠ সমাপ্ত হওয়া মাত্রই ডান হাতটি বাম হাতের নিচ থেকে সরিয়ে একবার বামহাতের চারিদিকে বৃত্যাকারে ঘুরিয়ে ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা বাদে অপর তিনটি আঙুল দিয়ে বাম হাতে তালি মারতে হবে। এখন করন্যাস সমাপ্ত হল।

তারপর বিভিন্ন অঙ্গ যেমন হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ অর্থাৎ কাঁধ ও নেত্র স্পর্শ ক'রে অঙ্গন্যাস করতে হবে—

(ক) ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা মধ্যমার মধ্য অংশ স্পর্শ করা অবস্থায়

ডান হাতের মধ্যমার দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে — 'ন এনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি ন এনং দহতি পাবকঃ' (২/২৩) ইতি হৃদয়ায় নমঃ।

(খ) একইভাবে ডান হাত দ্বারা মস্তক স্পর্শ করে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে — 'ন চ এনং ক্লেদয়ন্তি আপো ন শোষয়তি মারুতঃ' (২/২৩) ইতি শিরসে স্বাহা।

(গ) একইভাবে ডান হাত দ্বারা শিখা স্পর্শ করে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে — 'অচ্ছেদ্যঃ অয়ম্ অদাহ্য অয়ম্ অক্লেদ্যঃ অশোষ্য এব চ' (২/২৪) ইতি শিখায়ৈ বষট্।

(ঘ) একইভাবে ডান হাত বাম দিকের কবচ অর্থাৎ কাঁধের উপর এবং বাম হাত ডান দিকের কবচ অর্থাৎ কাঁধের উপর স্থাপন ক'রে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে — 'নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুঃ অচলঃ অয়ং সনাতনঃ' (২/২৪) ইতি কবচায় হুম্।

(ঙ) এবার ত্রিনেত্র ন্যাস। আমাদের দুইটি চক্ষু ব্যতীতও কপালে আর একটি চক্ষু থাকে ব'লে মনে করা হয়। তাই ত্রিনেত্র। ত্রিনেত্র ন্যাসের ক্ষেত্রে অঙ্গুলির অবস্থান ভিন্ন হবে, এই ন্যাসের ক্ষেত্রে তর্জনী ও কনিষ্ঠা ব্যবহার হবে না। এক্ষেত্রে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ডান নেত্রের উপর, অনামিকা বাম নেত্রের উপর এবং মধ্যমা কপালের উপর স্থাপন ক'রে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে — 'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশঃ অথ সহস্রশঃ' (১১/৫) ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।

এইভাবে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস শেষ হল।

এরপর জোড়হস্তে 'হরি ওঁ তৎ সৎ' ও 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র দুটি পাঠ করার পর গীতার মঙ্গলাচরণ বা গীতাধ্যান পাঠ করতে হবে —

গীতাধ্যান

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্ ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্।

অদ্বৈতাম্ অমৃত-বর্ষিণীং ভগবতীম্ অষ্টাদশ অধ্যায়িনীম্।
অম্ব ত্বাম্ অনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্।১।।
নমোঽস্তুতে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দার-আয়ত-পত্র-নেত্র।
যেন ত্বয়া ভারত-তৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।।২।।
প্রপন্ন-পারিজাতায় তোত্রবেত্রৈক-পাণয়ে।
জ্ঞান-মুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ।।৩।।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।৪।।
বসুদেবসুতং দেবং কংস-চাণূর-মর্দনম্।
দেবকী-পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্। ৫।।
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধার-নীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেন বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থাম-বিকর্ণ-ঘোর-মকরা দুর্যোধন আবর্তিনী
সা উত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ।। ৬।।
পারাশর্য-বচঃ-সরোজ অমলং গীতার্থ-গন্ধ-উৎকটং।
নানা আখ্যানক কেশরং হরিকথা-সম্বোধন অবোধিতম্।।
সজ্জন-ষটপদৈঃ অহরহঃ পেপীয়মানং মুদা।
ভূয়াৎ ভারতপঙ্কজং কলিমল প্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে।। ৭।।
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তম্ অহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্। ৮।।
যং ব্রহ্মা বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ।
বেদৈঃ সাঙ্গ-পদক্রম-উপনিষদৈঃ গায়ন্তি যং সামগাঃ।।
ধ্যান-অবস্থিত-তদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্য অন্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ।।৯।।

মঙ্গলাচরণ বা গীতাধ্যান পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পর বলতে হবে —

"ওঁ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ মঙ্গলাচরণম্ সমাপ্তত্বম্"।

তারপর গীতাপাঠ শুরুর পূর্বে জোড়হাতে উচ্চারণ করতে হবে—

ওঁ তৎ সৎ

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অমুক অধ্যায় অমুক যোগ অমুক উবাচ।

তারপর গীতাপাঠ শুরু হবে।

গীতাপাঠ শেষ হলে বলতে হবে —

"ওঁ তৎ সৎ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অমুক যোগো নাম অমুক অধ্যায়"।

লেখিকা অধ্যাপিকা সেবন্তী সিন্‌হা

বি. এ. অনার্স (ফার্স্ট ক্লাস), এম. এ. (ফার্স্ট ক্লাস), এম. ফিল. (কলকাতা)
বি. এড. (ফার্স্ট ক্লাস), পি. এইচ. ডি. স্কলার (যাদবপুর)

জন্ম-১৯৮৭ **পরলোকগমন-২০২১**

প্রথম অধ্যায়
অর্জুনবিষাদ-যোগ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে # সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব # কিম্ অকুর্বত সঞ্জয়।। ১।।

* পাণ্ডবাশ্চৈব = পাণ্ডবাঃ চ এব

যুযুৎসবঃ = যুদ্ধাভিলাষী; মামকাঃ = আমার পক্ষীয়গণ/পুত্রগণ; অকুর্বত = করল; সঞ্জয়ঃ = ধৃতরাষ্ট্রের রথের সারথি।। ১।।

অনুবাদ :- হে সঞ্জয়! আমাকে বল যুদ্ধাভিলাষী আমার পুত্রগণ ও সবান্ধব পাণ্ডুর পুত্রগণ ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়ে কি করল। ১।

ব্যাখ্যা :- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১ম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের প্রথম পদে দেখা যাচ্ছে যে এখানে কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যে ভূমিতে এত রক্তপাত, জীবনক্ষয়, হাহাকার, আর্তনাদ ঘটেছে সেই ক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করার কারণ কি?

এর পিছনে দুটি কারণ আছে। প্রথমত, ক্ষেত্রটির নাম কুরুক্ষেত্র হওয়ার বহু পূর্বকাল থেকেই সেটি পুণ্যভূমি অর্থাৎ ধর্মক্ষেত্র ব'লে পরিচিত ছিল। স্থানটির অপর নাম ছিল সমন্তপঞ্চক। জাবাল উপনিষৎ ও শতপথ ব্রাহ্মণে স্থানটিকে দেবযজন অর্থাৎ দেবতাদের যজন অর্থাৎ যজ্ঞ করার স্থান নামে অভিহিত করা হয়েছে — "ইদং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্" (জাবাল উপনিষৎ, শ্রুতি ১)

বামন পুরাণে কথিত হয়েছে একদা পুরুবংশের রাজা কুরু এই স্থানে তপস্যা ক'রে ভগবানের নিকট থেকে বর লাভ করেন যে যদি কেউ এই ক্ষেত্রে তপস্যা করেন বা যুদ্ধে বীরগতি প্রাপ্ত হন তাহলে তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে। তখন থেকেই এই পুণ্যক্ষেত্রটি কুরুক্ষেত্র নামে পরিচিত হয়। সুতরাং এক অর্থে ধর্মক্ষেত্র শব্দটি এই শ্লোকে কুরুক্ষেত্রের অপর নাম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র এই

ভূমিকে ধর্মক্ষেত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন কৌরব-পাণ্ডবদের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে। আর এই যুদ্ধে রক্তক্ষয়, জীবননাশ প্রভৃতিকে যদি পাপও বলা হয় তাহলেও বলা যায় যে সেই পাপ সংঘটিত হয়েছিল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ কথিত ধর্ম্যযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলেই তাকে ধর্মক্ষেত্র বলা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, ধৃতরাষ্ট্র স্থির জানতেন যে তাঁর পুত্রগণ অধর্মের অনুসারী। তারা কিছুতেই যুদ্ধের পথ পরিত্যাগ করবে না। কিন্তু যুদ্ধ হলে তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী কারণ পাণ্ডুপুত্রগণের সহায় হলেন জগৎ সংসারে রক্ষাকর্তা ধর্মস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ফলে যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় ও কৌরবদের ধ্বংস সুনিশ্চিত। কিন্তু পাণ্ডবরা ধর্মপ্রাণ। তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এত ভাবী রক্তপাত, জীবনহানি অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারবে না। সেই কারণে তারা যুদ্ধার্থে এই ধর্মক্ষেত্রে উপনীত হয়ে যুদ্ধের ভাবী ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা কল্পনা ক'রে যদি যুদ্ধের পরিণামকে অধর্ম হিসাব গণ্য করে তাহলে তারা যুদ্ধের পথ পরিহার ক'রে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে পারে। সেক্ষেত্রে তাঁর পুত্রগণ বিনা যুদ্ধে রাজত্ব লাভ করবে এবং সেইজন্য তারা যুদ্ধক্ষেত্রেই উল্লাসে মেতে উঠবে। সেইজন্য ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকৃতই কি ঘটল তা জানতে গভীরভাবে উৎসুক ছিলেন বলেই ধর্মক্ষেত্র শব্দটির উপর জোর দিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত যোদ্ধারা যুদ্ধই করবে। সেক্ষেত্রে তারা কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়ে কি করল একথা ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে জানতে চাওয়ার কোন যুক্তি ছিল না। সুতরাং ধর্মক্ষেত্র শব্দটি এখানে কুরুক্ষেত্রকে গৌরবান্বিত করার জন্য উল্লিখিত হয়নি, ধর্মক্ষেত্র শব্দটি এখানে এক বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে।।

আবার কোন কোন টীকাকার বলেন যে সংস্কৃতে একটা প্রথা আছে যে, কোন রচনা শুরু করতে গেলে মঙ্গলাচরণ করতে হয় যাতে রচনাটি সুসম্পন্ন হতে পারে, সেইজন্য গীতার প্রথম পদটি মঙ্গলজনক 'ধর্মক্ষেত্র' শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে।। ১।।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং # ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যম্ উপসঙ্গম্য # রাজা বচনম্ অব্রবীৎ।।২।।

* পাণ্ডবানীকং = পাণ্ডব-অনীকং; দুর্যোধনস্তদা = দুর্যোধনঃ তদা

সঞ্জয়ঃ উবাচ = সঞ্জয় বললেন; ব্যূঢ়ং = ব্যূহাকারে সজ্জিত; অনীকং = সৈন্যসমূহকে; উপসঙ্গম্য = গিয়ে; অব্রবীৎ = বলল।।২।।

অনুবাদ :- সঞ্জয় (রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে) বললেন — পাণ্ডবদের সৈন্যসমূহকে ব্যূহাকারে সজ্জিত অবস্থায় দেখে রাজা দুর্যোধন আচার্য দ্রোণের নিকট গিয়ে বললেন।।২।।

পশ্য এতাং পাণ্ডুপুত্রাণাম্ # আচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ # তব শিষ্যেণ ধীমতা।। ৩।।

পশ্য = দেখুন; ধীমতা = বুদ্ধিমান; পাণ্ডুপুত্রাণাম্ = পাণ্ডু পুত্রদের; এতাং = এই; মহতীং = বিশাল; চমূম্ = সেনানী।। ৩।।

অনুবাদ :- হে আচার্য! আপনার প্রিয় বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্ন) কর্তৃক ব্যূহাকারে সজ্জিত পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যসমূহ দেখুন।। ৩।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে দুর্যোধনের ধূর্ততা লক্ষণীয়। রাজা দ্রুপদ ও ভরদ্বাজ মুনির পুত্র গুরু দ্রোণ উভয়েই সতীর্থ ও একসময়ের পরম মিত্র হলেও পরবর্তীকালে রাজা দ্রুপদ কর্তৃক দ্রোণ অপমানিত হলে উভয়ে পরম শত্রুতে পরিণত হন। দুর্যোধন জানে যে গুরু দ্রোণ মনেপ্রাণে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চান না। তাই সে দ্রোণের অন্তরের দুর্বল স্থানে আঘাত ক'রে ধৃষ্টদ্যুম্নের নাম উচ্চারণ করার পরিবর্তে তাকে দ্রুপদপুত্র নামে আখ্যাত ক'রে দ্রোণের অন্তরের প্রতিশোধ স্পৃহাকে জাগরিত ক'রে তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার প্রয়াস করে।। ৩।।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা # ভীম-অর্জুন-সমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ # দ্রুপদশ্চ মহারথঃ।।৪।।

*বিরাটশ্চ = বিরাটঃ চ; দ্রুপদশ্চ = দ্রুপদঃ চ

মহেষ্বাসাঃ = মহাধনুর্ধারী; শূরাঃ = বীরগণ; যুযুধানঃ = সাত্যকি; মহারথঃ = মহারথী।।৪।।

অনুবাদ :- এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন ভীম ও অর্জুনের সমতুল্য অনেক বীর ধনুর্ধারী মহাযোদ্ধা সাত্যকি, বিরাট, মহারথী দ্রুপদ।।৪।।

*মহারথী (যিনি একাকী দশ সহস্র ধনুর্ধারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন এবং যিনি শস্ত্রবিদ্যায় প্রবল পারদর্শী)

ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ # কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ # শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ।। ৫।।

* কাশীরাজশ্চ = কাশীরাজঃ চ; কুন্তিভোজশ্চ = কুন্তিভোজঃ চ; শৈব্যশ্চ = শৈব্যঃ চ।

বীর্যবান্ কাশীরাজঃ = অত্যন্ত বলবান কাশীরাজ; নরপুঙ্গবঃ শৈব্যঃ = নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য।।৫।।

অনুবাদ :- (এই যুদ্ধক্ষেত্রে আরও উপস্থিত আছেন) ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, অত্যন্ত বলবান কাশীরাজ, পুরুজিৎ কুন্তিভোজ এবং নরশ্রেষ্ঠ শৈব্যের ন্যায় প্রবল শক্তিশালী বীর।।৫।।

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত # উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ # সর্ব এব মহারথাঃ।।৬।।

* যুধামন্যুশ্চ = যুধামন্যুঃ চ; উত্তমৌজাশ্চ = উত্তমৌজাঃ চ; দ্রৌপদেয়াশ্চ = দ্রৌপদেয়াঃ চ; সৌভদ্রো = সৌভদ্রঃ।

বিক্রান্তঃ = বিক্রমশালী; সৌভদ্রঃ = সুভদ্রার পুত্র অর্থাৎ অভিমন্যু; দ্রৌপদেয়াঃ = দ্রৌপদীর পুত্রগণ; মহারথাঃ = মহারথগণ।। ৬।।

অনুবাদ :- (এই যুদ্ধক্ষেত্রে আরও যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁরা হলেন) মহা বলবান যুধামন্যু, প্রবল পরাক্রমশালী উত্তমৌজা, সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ আদি মহারথগণ।।৬।।

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে # তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য # সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে।।৭।।

অস্মাকং = আমাদের; তে সংজ্ঞার্থং = আপনার অবগতির জন্য; ব্রবীমি = বর্ণনা করছি; তান্ নিবোধ = তাঁদের সকলের সম্পর্কে জানুন।।৭।।

অনুবাদ :- হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ! আমাদের পক্ষের সৈন্যের যে সমস্ত বীর সেনানায়কগণ এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁদের বিষয়ে জানুন, আপনার জ্ঞাতার্থে তাঁদের বিষয়ে আপনার নিকট বর্ণনা করছি।।৭।।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ # কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ # সৌমদত্তিঃ জয়দ্রথঃ[১]।।৮।।

ভবান্ = আপনি স্বয়ং; সমিতিঞ্জয়ঃ = যুদ্ধ বিজয়ী।। ৮।।

অনুবাদ :- স্বয়ং আপনি আছেন এবং আছেন পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, সদা যুদ্ধ বিজয়ী কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ প্রভৃতি অনেক বীর।। ৮।।

ব্যাখ্যা :- এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুর্যোধন তাঁর এগারো অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে সাতজন বিশিষ্ট বীরের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। এঁদের মধ্যে ছয় জনের নাম উচ্চারণ করলেও আচার্য দ্রোণের নাম উচ্চারণ করেননি। কেবল 'ভবান্' বলেছেন। এখানে দুর্যোধন শাস্ত্রীয় মর্যাদা রক্ষা করেই আচার্য দ্রোণের নাম উচ্চারণ করেননি। স্মৃতি শাস্ত্রে বলা আছে যে যাঁরা নিজের কল্যাণ কামনা করেন তাঁদের পক্ষে নিজের জন্মরাশির উপর যে নাম রাখা হয় সেই নাম, গুরুর নাম, অতি কৃপণের নাম, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম এবং নিজের স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ —

আত্মনাম গুরোর্নাম নামাতিকৃপণস্য চ।
শ্রেয়স্কামো ন গৃহ্ণীয়াৎ জ্যেষ্ঠাপত্যকলত্রয়োঃ।। (স্মৃতি)

এখানে উল্লেখ্য যে যদিও গীতা সমাজ জীবনে মানুষের এই শিষ্টাচার পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আধুনিক মানুষ তার বিরুদ্ধাচরণ ক'রে তার বিপরীত আচরণ করাকেই আধুনিকতা হিসাবে গ্রহণ করেছে।।৮।।

অন্যে চ বহবঃ শূরা # মদর্থে ত্যক্ত-জীবিতাঃ।
নানাশস্ত্র-প্রহরণাঃ # সর্বে যুদ্ধ-বিশারদাঃ।। ৯।।

বহবঃ = বহু; শূরাঃ = বীরগণ; মদর্থে = আমার জন্য; ত্যক্ত-জীবিতাঃ = জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত।। ৯।।

অনুবাদ :- এ ছাড়াও এখানে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী আমাদের আরও অনেক বীর যোদ্ধা আছেন যাঁরা আমার জন্য যুদ্ধে তাঁদের নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতেও সদা প্রস্তুত।। ৯।।

১। পাঠান্তর—সৌমদত্তিস্তথৈব চ

অপর্যাপ্তং তৎ অস্মাকং # বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্
পর্যাপ্তং তু ইদম্ এতেষাং # বলং ভীমাভিরক্ষিতম্।। ১০।।

অপর্যাপ্তং = অপরিমিত; বলং = সৈন্য; ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ = পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত; অস্মাকং = আমাদের; পর্যাপ্তং = পরিমিত; ভীমাভিরক্ষিতম্ = ভীমের দ্বারা রক্ষিত।। ১০।।

অনুবাদ :- পিতামহ ভীষ্ম দ্বারা রক্ষিত আমাদের সেনা অপর্যাপ্ত কিন্তু ভীমদ্বারা রক্ষিত পাণ্ডবদের সেনা পর্যাপ্ত ।।১০।।

ব্যাখ্যা :— এই শ্লোকে দুর্যোধন যে 'অপর্যাপ্ত' এবং 'পর্যাপ্ত' শব্দদুটি ব্যবহার করেছেন তাদের উভয়ের দুইটি ক'রে অর্থ আছে। 'অপর্যাপ্ত' শব্দের একটি অর্থ হল অপরিমেয় অর্থাৎ যা পরিমাপ করা যায় না অর্থাৎ প্রচুর এবং অপর অর্থ হল প্রয়োজনের তুলনায় কম। আবার 'পর্যাপ্ত' শব্দের একটি অর্থ হল সীমিত এবং অপর অর্থ হল প্রচুর। ফলে এখানে মনে প্রশ্ন জাগে যে দুর্যোধন ঠিক কোন অর্থে শব্দদুটি ব্যবহার করেছিলেন। মহাভারতে যেভাবে দুর্যোধনের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে তাতে তিনি অতীব সুযোগসন্ধানী হিসাবে প্রতিভাত হন। সেই কারণে হয়তো তিনি সীমিত অর্থে অপর্যাপ্ত এবং প্রচুর অর্থে পর্যাপ্ত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। কারণ দুর্যোধন অবশ্যই জানতেন যে তিনি অধর্ম পথের অনুসারী কিন্তু পাণ্ডবগণ ধার্মিক পথাবলম্বী এবং সীমাহীন ক্ষমতা সম্পন্ন স্বয়ং বাসুদেব তাঁদের সহায়। কাজেই যে পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান তাদের বিরুদ্ধে তাঁর যতই সৈন্য সংখ্যা থাকুক তা নিতান্তই অপ্রতুল এবং যে পক্ষে কৃষ্ণ আছেন তাদের সৈন্যসংখ্যা যতই কম হোক না কেন তারা নিশ্চিতভাবেই অজেয়। কিন্তু তিনি গুরু দ্রোণের নিকট সত্য কথাটি প্রকাশ্যে ব'লে গুরু দ্রোণের কাছে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ করতে চাননি। সেই কারণে তিনি দ্ব্যর্থক শব্দদুটি ব্যবহার ক'রেছিলেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল যে দ্রোণাচার্য যে অর্থেই শব্দদুটি গ্রহণ করুন না কেন তাতেই তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত হবে। কারণ তিনি যদি অপর্যাপ্ত শব্দটি প্রচুর অর্থে এবং পর্যাপ্ত শব্দটি সীমিত অর্থে গ্রহণ করেন তাহলে যেহেতু তাঁর অধীনে সৈন্যসংখ্যা বেশী সেইজন্য তিনি অধিকতর মনোবল ও আত্মবিশ্বাস সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন। বিপরীত পক্ষে যদি তিনি অপর্যাপ্ত শব্দটি অপ্রচুর অর্থে এবং পর্যাপ্ত শব্দটি প্রচুর অর্থে গ্রহণ করেন তাহলে যেহেতু তাঁর অধীনে সৈন্যসংখ্যা কম এবং যেহেতু তিনি কৌরবপক্ষকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেইজন্য তিনি

তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য অধিকতর দায়িত্ব সহকারে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় প্রবৃত্ত হবেন নতুবা তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ন্যায় গভীর অধর্মে লিপ্ত হবেন যা আচার্য দ্রোণ কখনই চাইবেন না। ফলে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই দুর্যোধন জ্ঞাতসারেই দ্ব্যর্থক শব্দদুটি ব্যবহার করেছিলেন।।১০।।

অয়নেষু চ সর্বেষু # যথা-ভাগম্ অবস্থিতাঃ।
ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু # ভবন্তঃ সর্ব এব হি।। ১১।।

সর্বেষু = সমস্ত; অয়নেষু = সকল ব্যূহপ্রবেশ পথে; যথাভাগম্ = নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে; অভিরক্ষন্তু = রক্ষা করুন; ভবন্তঃ = আপনারা।।১১।।

অনুবাদ :- এখন আপনারা সকলে নিজ নিজ নির্ধারিত স্থান অনুযায়ী ব্যূহের নির্দিষ্ট প্রবেশ পথে অবস্থান ক'রে পিতামহ ভীষ্মকে যথাযথভাবে রক্ষা করুন।।১১।।

ব্যাখ্যা :- এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করার জন্য বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু দুর্যোধন সম্যক জানে যে পিতামহ ভীষ্ম একাকীই অর্জুনসহ পাণ্ডবপক্ষের সকল সেনানীদেরকে সংহার করতে পারেন — "হন্যাদ্ গুপ্তো হ্যসৌ পার্থান্ সোমোকাংশ্চ সংসৃজয়ান্ (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ১৫/১৪)। কিন্তু তাহলে পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করার জন্য দুর্যোধনের এত উৎকণ্ঠা কেন? এর পিছনে রহস্য কি? রহস্য দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী। আমরা সঞ্জয়ের মুখে শুনি যে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি শিখণ্ডীকে হত্যা করবেন না কারণ তিনি শুনেছেন যে শিখণ্ডী স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং পরে সে পুরুষে রূপান্তরিত হয় এবং এইজন্য ভীষ্ম এখনও তাকে স্ত্রী বলেই মনে করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে স্ত্রীজাতি তাঁর নিকট পরিত্যাজ্যা—

অব্রবীচ্চ বিশুদ্ধাত্মা নাহং হন্যাৎ শিখণ্ডিনম্।
শ্রূয়তে স্ত্রী হ্যসৌ পূর্বং তস্মাদ্ বর্জ্যো রণে মম।।
—(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ১৫/১৫)।

সেইজন্য দুর্যোধন ভীষ্মের নিরাপত্তা নিয়ে বড়ই বিচলিত। সে জানে যে যদি শিখণ্ডী অস্ত্রহাতে পিতামহের সামনে হাজির হতে পারে তাহলে সত্যনিষ্ঠ ভীষ্ম শিখণ্ডীকে দেখা মাত্রই অস্ত্র ত্যাগ করবেন। তাহলে শিখণ্ডী অবশ্যই পিতামহের মৃত্যুর কারণ হবে। সেইজন্য দুর্যোধন বলছে যে আচার্য দ্রোণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা,

বিকর্ণ ও ভূরিশ্রবা এই ছয়জন বিশিষ্ট বীর ব্যূহের দ্বারে ভীষ্মকে রক্ষার জন্য যেন সদা পাহারায় থাকেন যাতে শিখণ্ডী পিতামহকে হত্যা করতে না পারে—

সংরক্ষমাণঃ পার্থেন ভীষ্মেণ চ বিবর্জিতঃ।
যথা ন হন্যাদ্ গাঙ্গেয়ং দুঃশাসন তথা কুরু।।
—(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ১৫/২০)।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং # কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্য উচ্চৈঃ # শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্।১২।।

সংজনয়ন্ = সৃষ্টি ক'রে; হর্ষং = আনন্দ; সিংহনাদং = সিংহের ন্যায় গর্জন; বিনদ্য = প্রকম্পিত ক'রে; দধ্মৌ = ধ্বনিত করলেন।।১২।।

অনুবাদ :- তখন কুরুবংশের সর্বজ্যেষ্ঠ প্রতাপবান পিতামহ ভীষ্ম সিংহের গর্জনের ন্যায় মহা উচ্চ শব্দে তাঁর শঙ্খ ধ্বনিত করলেন এবং এর ফলে দুর্যোধনের অন্তর আনন্দে ভ'রে উঠল।। ১২।।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ # পণব-আনক-গোমুখাঃ।
সহসা এব অভি-অহন্যন্ত # স শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ।।১৩।।

ভের্যঃ = ভেরীসমূহ; পণবঃ = মৃদঙ্গ; আনক = ঢাক; গোমুখাঃ = এক প্রকার রণশিঙা; অভি-অহন্যন্ত = বেজে উঠল; অভবৎ = হল।।১৩।।

অনুবাদ :— তারপর সহসাই রণশঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ, ঢাক ইত্যাদি বেজে উঠল এবং সেই সব মিলিত শব্দে সেখানে তুমুল আওয়াজের সৃষ্টি হল।।১৩।।

ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে # মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব # দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ।।১৪।।

শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ = সাদা অশ্বগণ দ্বারা; স্যন্দনে = রথে; দিবৌ শঙ্খৌ = দিব্য শঙ্খদুটি; প্রদধ্মতুঃ = বাজালেন।। ১৪।।

অনুবাদ :— তদনন্তর শ্বেত অশ্বযুক্ত মহারথে আরূঢ় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁদের দিব্য শঙ্খদ্বয় ধ্বনিত করলেন।। ১৪।।

ব্যাখ্যা :- এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে যুদ্ধ আরম্ভ করার জন্য তখনকার কালে প্রচলিত রণনীতির অঙ্গ হিসাবে প্রথম শঙ্খধ্বনি করার কথা সেনাপতির এবং পিতামহ ভীষ্ম কৌরব পক্ষের সেনাপতি। সেইজন্য তিনি

নিয়ম মেনেই যুদ্ধ আরম্ভ করার জন্য কৌরবদের পক্ষে শঙ্খ বাজিয়ে যুদ্ধের সূচনা করলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তো পাণ্ডবপক্ষের একজন অর্থাৎ অর্জুনের রথের সারথি। তাঁর তো যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্কেত স্বরূপ শঙ্খ বাজানোর কথা নয়! সে শঙ্খ তো বাজানোর কথা পাণ্ডবদের সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের। তাহলে তো বলা যায় শ্রীকৃষ্ণ যাকে ধর্ম্মযুদ্ধ বলেছেন সেই ধর্ম্মযুদ্ধের শুরুতেই তিনি নিজেই তখনকার সমাজের রণনীতির প্রথা ভঙ্গ করলেন। কিন্তু বিষয়টিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ যদিও যুদ্ধক্ষেত্রের প্রধান অর্থাৎ সেনাপতি নন, সাধারণ দৃষ্টিতে একজন সারথি মাত্র, তথাপি প্রতিপক্ষের ভীষ্ম, দ্রোণ থেকে আরম্ভ ক'রে পাণ্ডবপক্ষের সকলেই তাঁর স্থান সকলের উপরে ব'লে মনে করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের এহেন কাজকে কোন পক্ষেরই কেউ অধিকারভঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, আমারা দেখেছি যে ভীষ্ম যেই না তাঁর শঙ্খের ধ্বনি করেছেন সঙ্গে সঙ্গেই কৌরব পক্ষ থেকে প্রবল বাদ্যধ্বনি হতে শুরু করে। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ ভালোমতোই জানেন যে পিতামহ ভীষ্ম তাঁর শঙ্খ সত্যই যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ হিসাবে বাজাননি কারণ তিনি এই যুদ্ধ চান না। তিনি কেবলমাত্র দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট করার জন্যই শঙ্খ বাজিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর শঙ্খধ্বনির প্রত্যুত্তরে যখন কৌরবপক্ষ থেকে প্রবল বাদ্যধ্বনি শুরু হল তখন সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবপক্ষ থেকে বাদ্যধ্বনি শুরু না হলে সাধারণ পাণ্ডব সৈন্যদের মধ্যে মনোবলের অভাব সৃষ্টি হতে পারে। কৌরবপক্ষের যিনি সেনাপতি সেই পিতামহ ভীষ্ম মান-সম্মান, সামাজিক অবস্থান, অধিকার, প্রতিপত্তি প্রভৃতি সব দিক দিয়ে কৌরবপক্ষীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ফলে তাঁর উপস্থিতিতে আর কারও যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার কথা নয়। কিন্তু পাণ্ডবপক্ষের সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন হলেও পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন অর্জুনের মত মহাজ্ঞানী মহাপরাক্রমশালী ব্যক্তিত্ব, যুধিষ্ঠিরের মত স্থিতধী মহাবিচক্ষণ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব এবং সর্বোপরি কৌরবপক্ষের ভীষ্ম, দ্রোণ সহ পাণ্ডবপক্ষের সকলের নিকট মহাশ্রদ্ধার, সকলের প্রণম্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সেইজন্য যখন কৌরবপক্ষ থেকে মহাকোলাহলে বিভিন্ন বাদ্যধ্বনি বেজে উঠল তখন হয়তো মুহূর্তের জন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উঠেছিল যে শ্রীকৃষ্ণ থাকতে তিনিই যুদ্ধ শুরুর নির্দেশ দেবেন কিনা। ফলে ক্ষণকালের জন্য হলেও তাঁর শঙ্খনাদ ক'রে যুদ্ধের অনুমতি দান করতে বিলম্ব হয়েছিল। সেই বিষয়টি বুঝেই অতুলনীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষের সেনাপতি সহ সমস্ত সেনাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা দানের জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নের অপেক্ষা না করেই শঙ্খনাদের দায়িত্বটি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।।১৪।।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো # দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং # ভীমকর্মা বৃকোদরঃ।।১৫।।

হৃষীকেশঃ = হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ (হৃষীক্ অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ঈশ্ অর্থাৎ প্রভু যিনি তিনিই হৃষীকেশ); পাঞ্চজন্যং = পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ; ধনঞ্জয়ঃ = ধনঞ্জয় (অর্জুন); দেবদত্তং = দেবদত্ত নামক শঙ্খ; ভীমকর্মা = লোকের ভীতি উৎপাদক কর্মকারী; বৃকোদরঃ = বিপুল ভোজন প্রিয় দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম; পৌণ্ড্রং মহাশঙ্খং = পৌণ্ড্র নামক ভয়ঙ্কর শঙ্খ; দধ্মৌ = বাজালেন।।১৫।।

অনুবাদ :- হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ, ভীমকর্মা দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজালেন।।১৫।।

অনন্তবিজয়ং রাজা # কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ # সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ।।১৬।।

অনন্তবিজয়ং = অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ; সুঘোষমণিপুষ্পকৌ = সুঘোষ এবং মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয় (বাজালেন)।। ১৬।।

অনুবাদ :- কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ এবং নকুল ও সহদেব সুঘোষ এবং মণিপুষ্পক নামক তাদের শঙ্খদ্বয় বাজালেন।।১৬।।

কাশ্যশ্চ পরমেম্বাসঃ # শিখণ্ডী চ মহারথঃ।।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ # সাত্যকিঃ চ অপরাজিতঃ।। ১৭।।

কাশ্যশ্চ = কাশীরাজ; পরমেম্বাসঃ = মহা ধনুর্ধর; মহারথঃ = মহারথী।।১৭।।

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ # সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ # শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ।।১৮।।

দ্রৌপদেয়াঃ = দ্রৌপদীর পুত্রগণ; পৃথিবীপতে = হে মহারাজ; সৌভদ্রঃ = সুভদ্রা-পুত্র অভিমন্যু; মহাবাহুঃ = মহা বলবান; সর্বশঃ = সকলে সর্ব দিক থেকে; দধ্মুঃ = বাজালেন।।১৮।।

অনুবাদ :- হে মহারাজ ! মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট, অজেয় সাত্যকি, রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সুভদ্রাপুত্র মহা বলবান অভিমন্যু প্রভৃতি বীর যোদ্ধগণ সকলে সর্ব দিক থেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে তাদের শঙ্খসমূহ বাজাতে শুরু করলেন।। ১৭-১৮।।

ব্যাখ্যা :- এখানে দেখা যাচ্ছে অভিমন্যুকে মহাবাহু নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অভিমন্যু মহাবাহু ছিলেন না। মহাবাহু হল শ্রীকৃষ্ণের নাম। মহাভারতে বলা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দুইহাত দ্বারা পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ ক'রে থাকেন। তাই তাঁর নাম 'মহাবাহু' —

বাহুভ্যাং রোদসী বিভ্রন্মহাবাহুঃ ইতি স্মৃতঃ।।

—উদ্যোগ পর্ব (৭০/৯)

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরমপ্রিয় মিত্র অর্জুনকে তাঁর এই উপাধি দান করেছিলেন। সেইজন্য অর্জুনও মহাবাহু নামে ভূষিত ছিলেন এবং অভিমন্যুও সেই মহাবাহু পিতার সন্তান হওয়ার কারণে মহাবাহু নামে পরিচিত ছিলেন। যেমন চার প্রকার বেদ যিনি সম্যক জানেন তিনি চতুর্বেদী উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তাঁর পুত্র চতুর্বেদ না জানা সত্ত্বেও পিতার চতুর্বেদী উপাধি লাভ করেন তদ্রূপ অভিমন্যুও 'মহাবাহু' উপাধি অর্জন করেছিলেন।।১৮।।

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং # হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীং চ এব # তুমুলো-অভি-অনুনাদয়ন্।। ১৯।।

* নভশ্চ = নভঃ চ

ঘোষঃ = শব্দরাশি; ধার্তরাষ্ট্রাণাং = দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের; হৃদয়ানি = হৃদয়সমূহ; ব্যদারয়ৎ = বিদীর্ণ করল; নভঃ = আকাশ; অভি-অনুনাদয়ন্ = অনুরণিত ক'রে।।১৯।।

অনুবাদ :— সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীকে প্রকম্পিত ক'রে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করল।।১৯।।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা # ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে # ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যম্ # ইদম্ আহ মহীপতে।।২০।।

* ধনুরুদ্যম্য = ধনুঃ উদ্যম্য

ব্যবস্থিতান্ = যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত; শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে = শস্ত্র নিক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুত; উদ্যম্য = উত্তোলন ক'রে; আহ = বললেন; মহীপতে = হে রাজন।।২০।।

অনুবাদ :— হে রাজন! যখন কপিধ্বজ অর্জুন দেখলেন যে আপনার পুত্রগণ যুদ্ধ আরম্ভ করতে উদ্যত তখন তিনি শস্ত্র নিক্ষেপ করার জন্য স্বীয় ধনুক উত্তোলন ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে এই কথাগুলি বললেন।।২০।।

ব্যাখ্যা :- কপিধ্বজ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের নাম। বৈরাগ্যের প্রতিভূ মহাবীর শ্রীহনুমান অর্জুনকে সহায়তা করার জন্য যুদ্ধকালে অর্জুনের বিশাল পতাকার উপর অবস্থান করেন। সেই জন্য অর্জুনকে কপিধ্বজ অর্জুন বলা হয়। অর্জুনের পতাকা ইঙ্গিত করে যে তাঁর অন্তর বৈরাগ্যময় ছিল এবং কোন সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হননি। দ্বিতীয় পাণ্ডব এবং শ্রীহনুমান উভয়েই পবনপুত্র হওয়ার কারণে উভয়েই ভ্রাতা ছিলেন। শ্রী হনুমান ভীমসেনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে অর্জুনকে সহায়তা করার জন্য তিনি যুদ্ধকালে অর্জুনের পতাকায় বিরাজ করবেন। শ্রীহনুমানের প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে সঞ্জয় পরোক্ষে ধৃতরাষ্ট্রকে অবগত করান যে শ্রীহনুমানের ন্যায় সত্যপথাবলম্বী অজেয় মহাবীর এই যুদ্ধে পাণ্ডবদের সহায়।।২০।।

অর্জুন উবাচ

সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে # রথং স্থাপয় মে অচ্যুত।। ২১।।

উবাচ = বললেন; সেনয়োঃ = সেনাবাহিনীর; উভয়োঃ = উভয়; মধ্যে = মাঝখানে; মে = আমার; স্থাপয় = স্থাপন কর।।২১।।

অনুবাদ :— অর্জুন বললেন—হে অচ্যুত! উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর।।২১।।

যাবৎ এতান্ নিরীক্ষে অহং # যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্।
কৈঃ ময়া সহ যোদ্ধব্যম্ # অস্মিন্ রণসমুদ্যমে।। ২২।।

এতান্ = এদেরকে; নিরীক্ষে = দেখি; যোদ্ধুকামান্ = যুদ্ধাভিলাষে; অবস্থিতান্ = উপস্থিত; ময়া = আমাকে; যোদ্ধব্যম্ = যুদ্ধ করতে হবে; অস্মিন্ = এই; রণসমুদ্যমে = যুদ্ধে।। ২২।।

অনুবাদ :— (এই সময়ে) আমি দেখি এই যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করার ইচ্ছায় উপস্থিত কাদের কাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে।। ২২।।

ব্যাখ্যা :- এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বিপক্ষদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর ধনুক উত্তোলন ক'রে ফেলেছেন এবং কাদের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ

করতে হবে সেটি তিনি সম্যক জানেন। তাহলে তিনি আবার কেন যাদের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে তাঁদেরকে দেখে নিতে চাইলেন। সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণার্থে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তাঁর প্রতি পদে পদে ধারণ ক'রে আছেন ভগবানের মহান লোকশিক্ষা। এইখানে ভগবান্ মানবের উদ্দেশ্যে যে মহান শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন তা হল এই যে কোন মানুষ যেন খুব ভালো ক'রে না ভেবে-চিন্তে হঠকারীর ন্যায় কোন কাজ কদাপি না করেন। কারণ তাঁর এই হঠকারীর ন্যায় কাজ ভবিষ্যতে তাঁর এবং অপরের বিরাট ক্ষতি বয়ে আনতে পারে। সেইজন্য বিশেষ ক'রে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার পূর্বে পুনঃ পুনঃ ভেবে দেখতে হবে যেন সেই কাজের মধ্যে কোন ক্ষতিকারক দিক লুকিয়ে না থাকে, তাঁর সেই কাজের দ্বারা যেন তাঁর নিজের এবং অপরের কোন সম্মান, সম্পদ, নিরাপত্তা, জীবন প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সেইজন্যই প্রজ্ঞাবান অর্জুন যুদ্ধ শুরুর পূর্বে আর একবার বুঝে নিতে চাইলেন যে তাঁর সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন ত্রুটি আছে কিনা।।২২।।

যোৎস্যমানান্ অবেক্ষে অহং # য এতে অত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধেঃ # যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ।।২৩।।

যোৎস্যমানান্ = যুদ্ধাভিলাষী; অবেক্ষে = দেখি; প্রিয়চিকীর্ষবঃ = হিতাকাঙ্ক্ষী।।২৩।।

অনুবাদ :— ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্টবুদ্ধি পুত্র দুর্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী যারা এখানে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছে আমি সেই সমস্ত যুদ্ধাভিলাষীদের দেখি।।২৩।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে অর্জুন দুর্যোধনকে দুর্বুদ্ধি নামে অভিহিত করেছেন। গীতা খুব সুন্দর বর্ণনার মাধ্যমে কোন অবস্থায় একজন মানুষকে দুর্বুদ্ধি নামে অভিহিত করা যাবে তার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। দুর্যোধন হলেন জ্ঞানপাপী। তিনি নিজের মুখেই তাঁর পিতার নিকট বলেছেন যে তিনি স্বয়ং ভালোভাবেই জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র এই জগতেই নয়, তিন জগতের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং পরম পূজনীয় —

স হি পূজ্যতমো লোকে কৃষ্ণঃ পৃথুললোচনঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং বিদিতং মম সর্বথা।।

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৮৮।৫)

তথাপি যখন সেই শ্রীকৃষ্ণ শান্তি প্রস্তাব নিয়ে পাণ্ডবদের ব্যবহারের জন্য মাত্র পাঁচটি গ্রামের প্রস্তাব নিয়ে কৌরব সভায় এলেন তখন সেই দুর্যোধনই তাঁকে বললেন যে একটি তীক্ষ্ণ সূচের অগ্রভাগ দ্বারা বিদ্ধ করলে যতটুকু ভূমি থাকে ততটুকু ভূমিও তিনি পাণ্ডবদের বিনা যুদ্ধে দেবেন না—

ম্রিয়মানো মহাবাহৌ ময়ি সম্প্রতি কেশব।
যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ কেশব।
তাবদ্ অপি পরিত্যাজ্যং ভূমের্ণঃ পাণ্ডবান্ প্রতি।।
(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১২৭।২৫)

এই হল দুর্বুদ্ধি। দুর্যোধন সমস্ত কিছু সম্যকভাবে জেনেও ভুল পথে অগ্রসর হয়েছেন। তাই তিনি মহাজ্ঞানী অর্জুনের ভাষায় দুর্বুদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণ খুব সচেতনভাবে সাধারণ মানুষকে বার্তা দিয়েছেন যে এহেন বুদ্ধি-বিকারগ্রস্ত কর্ম যেন তাঁরা কদাপি না করেন। অন্যথায় তাদের জীবনে নেমে আসবে অনিবার্য ধ্বংস।।২৩।।

সঞ্জয় উবাচ

এবম্ উক্তো হৃষীকেশো # গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে # স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্।। ২৪।।

(এই শ্লোকটি একটি যুগ্ম শ্লোক হওয়ার জন্য পরের শ্লোক থেকে 'উবাচ' এই ক্রিয়াপদ গ্রহণ ক'রে অনুবাদে বাক্য সমাপ্ত করা হবে)

এবম্ = এই প্রকার; উক্তঃ = বলা হলে; গুড়াকেশ = গুড়াকা অর্থাৎ নিদ্রা বা আলস্য তার যে ঈশ অর্থাৎ প্রভু অর্থাৎ যিনি গুড়াকা অর্থাৎ নিদ্রা বা আলস্যকে জয় করেছেন তিনি গুড়াকেশ। এখানে গুড়াকেশ পদের দ্বারা অর্জুনকে নির্দেশ করা হয়েছে। স্থাপয়িত্বা = স্থাপন করে। রথোত্তমম্ = উত্তম রথখানি, উবাচ = বললেন।।২৪।।

অনুবাদ :- সঞ্জয় বললেন — হে রাজন্! গুড়াকেশ অর্জুন এই কথা বললে শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে তাঁর উত্তম রথখানি স্থাপন করলেন।।২৪।।

ব্যাখ্যা :- এখানে শ্রীকৃষ্ণকে হৃষীকেশ নামে অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারতে হৃষীকেশ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে বলা হয়েছে— 'হৃষিকেশো মহেশানো বরদো লোকভাবনঃ'। অর্থাৎ হৃষীকেশ সকলকে কল্যাণকর বর প্রদান করেন। সেইজন্য তাঁকে হৃষীকেশ বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ এমনই ভগবান্ যে তিনি কখনও কাউকে

অভিশাপ দেন না, তিনি সর্বদা সকলের কল্যাণে বর প্রদান ক'রে থাকেন। সেইজন্য শাস্ত্রের অভিমত অনুযায়ী ভক্তের একমাত্র কৃষ্ণেরই পূজা করাই বিধেয়। পাণ্ডবগীতায় ১৭তম শ্লোকে উদ্ধব বলেছেন যে কৃষ্ণকে ত্যাগ ক'রে যে অন্য দেবতার পূজা করে সে গঙ্গার তীরে বসে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য কুয়ো খনন করে—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যঃ অন্য দেবম্ উপাসতে।

তৃষিত-জাহ্নবীতীরে কুপং খনতি দুর্মতি।।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে ভক্ত অর্জুন ভগবান্ কৃষ্ণকে বলছেন উভয় সেনানীর মধ্যে রথখানি স্থাপন করতে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অর্জুনের সেই ইচ্ছা পূরণ করছেন। এই ঘটনাটি এই প্রমাণ করে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সদা ভক্তের বাসনা পূরণ করতে উদগ্রীব, অর্জুনের কথা পালন ক'রে তিনি স্পষ্ট বোঝাতে চেয়েছেন যে তিনি স্বতন্ত্র হলেও সর্বদা পরতন্ত্র অর্থাৎ ভক্তের অধীন।।২৪।।

ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখতঃ # সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্য এতান্ # সমবেতান্ কুরূন্ ইতি।। ২৫।।

সর্বেষাং = সমস্ত; মহীক্ষিতাং = নৃপতিদের; প্রমুখতঃ = সম্মুখে; পশ্য = নিরীক্ষণ কর; কুরূন্ = কৌরবগণকে।। ২৫।।

অনুবাদ :- (এইভাবে উভয় সেনার মধ্যে উত্তম রথখানি স্থাপন ক'রে) শ্রীকৃষ্ণ পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও সমস্ত নৃপতিদের সম্মুখে অর্জুনকে বললেন — পার্থ! এইসব সমবেত কৌরবগণকে নিরীক্ষণ কর।।২৫।।

তত্র অপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ # পিতৃন্ অথ পিতামহান্
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ # পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীং তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব # সেনয়োঃ উভয়োঃ অপি।।২৬।।

পিতৃন্ = পিতাদের (কাকা, জেঠা); পিতামহান্ = পিতামহদের; আচার্যান্ = গুরুগণকে; মাতুলান্ = মাতুলদের (মামা); ভ্রাতৃন্ = ভ্রাতাদের; পুত্রান্ = পুত্রদের; পৌত্রান্ = পৌত্রদের; সখীং = বন্ধুদের; তথা শ্বশুরান্ = শ্বশুরদের; সুহৃদঃ এব = শুভানুধ্যায়ীদেরই; অপশ্যৎ = দেখতে পেলেন।। ২৬।।

অনুবাদ :- অতঃপর অর্জুনও সেখানে উভয় সেনাদলের মধ্যে বিদ্যমান পিতাদের, পিতামহদের, গুরুগণকে, মাতুলদের (মামা), ভ্রাতাদের, পুত্রদের, পৌত্রদের, বন্ধুদের তথা শ্বশুরদের এবং শুভানুধ্যায়ীদের দেখতে পেলেন।। ২৬।।

ব্যাখ্যা :- এখানে 'পিতৃন্' ও 'আচার্যান্' পদ দুইটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। পিতা বা আচার্য তো একজনই হন। তাহলে পদ দুইটির বহুবচন করা হল কেন? শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পাঁচ প্রকার পিতা হতে পারেন— (১) জন্মদাতা পিতা, (২) সন্তান যাঁর কোলে মানুষ হয়, (৩) পুত্রের যিনি পৈতা সংস্কার করেন, (৪) যিনি অন্ন দ্বারা পালন করেন এবং, (৪) যিনি ভয় থেকে রক্ষা করেন। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে এই সব ধরণের পিতাদের দেখেছেন। তাই এখানে 'পিতৃ' শব্দের বহুবচন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আচার্য শব্দের ব্যাখ্যা দিয়ে অদ্বয়তারকোষে বলা হয়েছে—

আচার্যো বেদসম্পন্নো বিষ্ণুভক্তো বিমৎসরঃ।
যোগজ্ঞো যোগনিষ্ঠশ্চ সদা যোগাত্মকঃ শুচিঃ।
গুরুভক্তিসমাযুক্তঃ পুরুষজ্ঞো বিশেষতঃ।।

অর্থাৎ যিনি বেদ অধ্যয়ন করেছেন, যিনি বিষ্ণুর ভক্ত এবং ঈর্ষাবোধ রহিত, যিনি যোগ জানেন এবং যোগনিষ্ঠ ও যিনি সর্বদা যোগযুক্ত থাকেন, যিনি পবিত্র, যিনি নিজের গুরুকে ভক্তি করেন এবং যিনি পরমপুরুষকে সম্যক জানেন তিনি হলেন আচার্য। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ অনেক ব্যক্তিকে দেখেছেন। তাছাড়া শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, গুরুকে যে সম্মান দেওয়া হবে গুরুপুত্রকেও সেই সম্মান দিতে হবে— 'সমা গুরৌ যথা বৃত্তিঃ.......তৎপুত্রে চ তথা কুর্বন্' (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৪৪/১৩)। সেই হিসাবে আচার্য দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাও অর্জুনের নিকট গুরুসদৃশ। সেইজন্য এখানে গুরু শব্দকে বহুবচন করা হয়েছে।। ২৬।।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ # সর্বান্ বন্ধূন্ অবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো # বিষীদন্ ইদম্ অব্রবীৎ।। ২৭।।

* পরয়াবিষ্টো = পরয়া আবিষ্টঃ

অবস্থিতান্ = (সেখানে) অবস্থিত; সমীক্ষ্য = দেখে; পরয়া = পরম; কৃপয়া = করুণাদ্বারা; আবিষ্টঃ = পূর্ণ; বিষীদন্ = বিষন্নচিত্তে; অব্রবীৎ = বললেন।। ২৭।।

অনুবাদ :- সেখানে অবস্থিত সেই সকল বান্ধবগণকে দেখে কুন্তীপুত্র অর্জুনের সমগ্র হৃদয় তাদের প্রতি পরম করুণায় বিগলিত হয়ে উঠল এবং তিনি পরম বিষন্নচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে এই (নিম্নলিখিত) কথাগুলি বললেন।। ২৭।।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বা ইমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ # যুযুৎসুন্ সমুবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি # মুখং চ পরিশুষ্যতি।। ২৮।।

সমুবস্থিতম্ = (সম্মুখে) উপস্থিত; ইমান্ = এই সমস্ত, যুযুৎসুন্ = যুদ্ধাভিলাষী; স্বজনং = আত্মীয় পরিজনকে; গাত্রাণি = সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; সীদন্তি = অবসন্ন হয়ে পড়ছে; পরিশুষ্যতি = শুকিয়ে আসছে।। ২৮।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন— হে কৃষ্ণ! সম্মুখে উপস্থিত এই সমস্ত যুদ্ধাভিলাষী আত্মীয় পরিজনকে দেখে আমার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবসন্ন হয়ে পড়ছে এবং মুখ শুকিয়ে আসছে।। ২৮।।

ব্যাখ্যা :- এই স্থান থেকে কয়েকটি শ্লোকে দেখা যায় যে অর্জুন এক বিরাট ধর্মসংকটে পতিত হয়েছেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাদেরকে দেখছেন তারা প্রত্যেকেই তাঁর অতি আপন প্রিয়জন। তাঁদের প্রতি তাঁর অন্তরে কোন ঈর্ষা নেই, কোন বিদ্বেষ নেই, আক্রোশ নেই, ঘৃণা নেই, প্রতিহিংসা স্পৃহা নেই, এদেরকে হত্যা ক'রে তার অন্তরে উল্লাস সঞ্চারিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তাঁদেরকে হত্যা ক'রে কোন ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের বাসনা নেই, এঁদেরকে হত্যা করার কোন ইচ্ছা তাঁর অন্তরে নেই। তাঁর হৃদয় বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ। তথাপি তাঁর এঁদেরকে হত্যা করতে হবে বা হারাতে হবে। এ কি রকম ভাগ্যের পরিহাস তাঁর! বাস্তবে তো এরকম হয় না! যত খারাপ মানুষই হোক সে কখনও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে অপরের রক্তপাত বা প্রাণহানি ঘটায় না। ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়, স্বজনদের আকুল হাহাকারের চিত্র মানস চক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে তাঁর অন্তর এক নিবিড় বেদনায় দীর্ণ। একদিকে সখা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর অটুট বিশ্বাস ও আস্থা অপরদিকে তাঁর অতুলনীয় হৃদয়বৃত্তি, স্বজনপ্রীতি এবং ধর্মবোধ। একবার তাঁর মনে হচ্ছে যে কৌরবগণ তাঁর যতই ক্ষতি ক'রে থাকুন না কেন তাদেরকে হত্যা করা অধর্মের কাজ হবে আবার অপরদিকে তাঁর স্থির বিশ্বাস যখন যুদ্ধে তাঁর সহায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তখন এই যুদ্ধের মধ্যে কোন অধর্ম বা অসত্য থাকতে পারে না কারণ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অন্তিম সত্ত্বা, তিনিই প্রকৃত সত্য ও ধর্মের প্রতীক, তিনি পদ্মপত্রে নীর— পাপ, অসত্য, কলুষতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর বিরোধী কৌরব পক্ষের সেনাপ্রধান পরম সত্যবাদী ও পরম ধার্মিক পিতামহ ভীষ্ম শ্রদ্ধায়,

ভক্তিতে, আস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সামনে সদা নতজানু। মাতা কুন্তী, পিতৃব্য বিদুর তাঁকে স্বয়ং ভগবান্ জ্ঞানে সদা অন্তরের পূজার্ঘ্য অর্পণ করেন। সেই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার পক্ষে অভিমত পোষণ করেন! এমতাবস্থায় তিনি আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একদিকে তিনি স্বজনদের প্রতি অতুলনীয় স্নেহ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় তাদের আসন্ন বিয়োগের চিত্র কল্পনা ক'রে হৃদয়ের তীব্র বেদনা রোধ করতে পারছেন না, অপরদিকে সখা শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম্যযুদ্ধের আহ্বান তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করতে অপারগ। তাই অবশেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিষন্ন চিত্তে স্বীয় অন্তরের সমস্ত যুক্তি ও অনুভূতি উজাড় ক'রে তুলে ধরার মনস্থ করলেন।। ২৮।।

বেপথুশ্চ শরীরে মে # রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ # ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।। ২৯।।

বেপথুঃ = কাঁপুনি; চ = এবং; রোমহর্ষঃ = রোমাঞ্চ; জায়তে = উৎপন্ন হচ্ছে; স্রংসতে = খসে পড়ছে; পরিদহ্যতে = জ্বালা করছে।। ২৯।।

অনুবাদ :- আমার শরীরে শিহরণ হচ্ছে এবং রোমহর্ষ জাগছে, হাত থেকে আমার ধনুক গাণ্ডীব খ'সে পড়ছে এবং আমার চামড়া জ্বালা করছে।। ২৯।।

ন চ শক্নোমি অবস্থাতুং # ভ্রমতি ইব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি # বিপরীতানি কেশব।। ৩০।।

শক্নোমি = সক্ষম হব; অবস্থাতুং = থাকতে; ভ্রমতি = ঘুরছে; নিমিত্তানি = লক্ষণ; পশ্যামি = দেখতে পাচ্ছি।। ৩০।।

অনুবাদ :- হে কৃষ্ণ! আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। আমার মন অস্থির হয়ে উঠছে, আমি নানা কুলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।।। ৩০।।

ন চ শ্রেয়ঃ অনুপশ্যামি # হত্বা স্বজনম্ আহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ # ন চ রাজ্যং সুখানি চ।। ৩১।।

স্বজনং = আপনজনদেরকে; আহবে = যুদ্ধে; হত্বা = বধ ক'রে; ন অনুপশ্যামি = দেখতে পাচ্ছি না; কাঙ্ক্ষে = কামনা করি।।৩১।।

অনুবাদ :- হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে আপনজনদেরকে বধ করার মধ্যে কোন মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি না। আমি জয়লাভ, রাজ্য, সুখ কোন কিছুই চাই না।।৩১।।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ # কিং ভোগৈঃ জীবিতেন বা।
যেষাম্ অর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো # রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।। ৩২।।

(এইটি একটি যুগ্ম শ্লোক হওয়ার জন্য শ্লোকটির অর্থ অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে পরবর্তী ৩৩তম শ্লোকটি থেকে 'তে ইমে অবস্থিতাঃ যুদ্ধে প্রাণান্ ত্যক্তা ধনানি চ' অংশটি গ্রহণ ক'রে এই শ্লোকটির অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে)

নঃ = আমাদের; ভোগৈঃ জীবিতেন = সুখভোগ ও বেঁচে থাকার; যেষাম্ = যাদের; অর্থে = জন্য; কাঙ্ক্ষিতং = আকাঙ্ক্ষা করি।। ৩২।।

অনুবাদ :- হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যলাভেই বা কি হবে আর সুখভোগ বা বেঁচে থাকার সার্থকতাই বা কি! যাদের জন্য আমরা রাজত্ব, ভোগ, সুখ কামনা করি (তাঁরা প্রাণ এবং ধন সম্পত্তি ত্যাগ ক'রে এই যুদ্ধে উপস্থিত)।। ৩২।।

ত ইমে অবস্থিতা যুদ্ধে # প্রাণান্ ত্যক্তা ধনানি চ।
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ # তথা এব চ পিতামহাঃ।। ৩৩।।

(এইটিও যুগ্ম শ্লোক হওয়ার জন্য শ্লোকটির অর্থ অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে পূর্ববর্তী ৩২তম শ্লোকটি থেকে 'যেষাম্ অর্থে কাঙ্ক্ষিতং নঃ রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ' অংশটি গ্রহণ ক'রে এই শ্লোকটির অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে)

তথা ইব চ পিতামহাঃ = তথা পিতামহগণ; প্রাণান্ = প্রাণ; চ = এবং; ধনানি = ধন সম্পত্তি; ত্যক্ত্বা = ত্যাগ ক'রে; ইমে = এই; যুদ্ধে = রণে; অবস্থিতা = উপস্থিত।। ৩৩।।

অনুবাদ :- (যাদের জন্য আমরা রাজত্ব, ভোগ, সুখ কামনা করি) সেই আচার্য, পিতৃব্য (পিতার ভাই), পুত্র, তথা পিতামহগণ সকলেই তো তাদের প্রাণ, সম্পদ সবকিছু ত্যাগ ক'রে যুদ্ধাভিলাষে এই রণক্ষেত্রে উপস্থিত।। ৩৩।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে 'প্রাণ' পদটি এখানে প্রচলিত 'জীবন' অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে 'শরীরস্থ দশপ্রকার জীবনবায়ু হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে। এই 'প্রাণ'কে শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণের দশম স্কন্ধের সাতাশতম শ্লোকে 'দশচ্ছদী' অর্থাৎ জীবনবৃক্ষের দশটি পাতাস্বরূপ বলা হয়েছে। এই বায়ুগুলি হল— প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয়। এই জীবনবায়ুগুলি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যথা শিরা, ধমনী প্রভৃতিতে ছড়িয়ে থাকে এবং দেহকে রক্ষা করে— "এতে নাড়ীষু সর্বাসু ভ্রমন্তে জীবজন্তবঃ।" শরীরে এই দশটি বায়ুর কোনটির অভাব হলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গটি বিকল হয়ে পড়ে এবং মানুষের প্রাণ সংশয় হয়।

ধন বলতে এখানে ভূধন, গোধন, হয়ধন, গজধন, স্ত্রীধন প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে। অর্জুন বলছেন তাঁর সামনে যাঁরা যুদ্ধার্থে উপস্থিত তাঁরা এই দশ প্রকার জীবনবায়ু এবং উপর্যুক্ত বিভিন্ন প্রকার ধনের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন।। ৩৩।।

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ # শ্যালাঃ সম্বন্ধিনঃ তথা।
এতান্ ন হন্তুম্ ইচ্ছামি # ঘ্নতঃ অপি মধুসূদন।। ৩৪।।

(এইটিও যুগ্ম শ্লোক হওয়ার জন্য শ্লোকটির অর্থ অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে পূর্ববর্তী ৩২তম শ্লোকটি থেকে 'যেষাম্ অর্থে কাঙ্ক্ষিতং নঃ রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ' অংশটি গ্রহণ ক'রে এই শ্লোকটির অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে।)

ঘ্নতঃ অপি = হত হলেও; হন্তুম্ = হত্যা করতে; ন ইচ্ছামি = ইচ্ছা করি না।।৩৪।।

অনুবাদ :- (যাদের জন্য আমরা রাজত্ব, ভোগ, সুখ কামনা করি তাদের মধ্যে এখানে আরও উপস্থিত আছেন) মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ এবং কুটুম্বগণ। হে মধুসূদন! আমি যদি এঁদের দ্বারা নিহতও হই তা হলেও এঁদেরকে আমি হত্যা করতে ইচ্ছা করি না।।৩৪।।

ব্যাখ্যা :- উপর্যুক্ত পর পর দুটি শ্লোকে অর্জুন বিভিন্ন পরিজনদের উল্লেখ করেছেন। তিনি আচার্য বলতে দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামাকে, পিতৃব্য (পিতার ভাই) বলতে ভূরিশ্রবা প্রমুখকে, পুত্র বলতে অভিমন্যু, প্রতিবিন্ধ্য, সূতসোম, শ্রুতকীর্তি, শতানীক, শ্রুতসেন, ঘটোৎকচ, লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে, 'চ' পদ দ্বারা যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ভাইদেরকে, পিতামহ বলতে ভীষ্ম, সোমদত্ত, ভীষ্মের পিতৃব্য বাহ্লীক প্রভৃতিকে, মাতুল শব্দের দ্বারা পুরুজিৎ কুন্তীভোজ, শল্য প্রভৃতিকে, শ্বশুর শব্দের দ্বারা দ্রুপদ, শৈব্য প্রভৃতিকে, পৌত্র বলতে দুর্যোধন-পুত্র, লক্ষ্মণের পুত্র প্রভৃতিকে, শ্যালক বলতে ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সুরথ প্রভৃতিকে এবং সম্বন্ধী বলতে জয়দ্রথ, বিরাট প্রভৃতিকে বুঝিয়েছেন।।৩৪।।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য # হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ # কা প্রীতিঃ স্যাৎ জনার্দন।। ৩৫।।

ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য = ত্রিলোক অর্থাৎ স্বর্গ; মর্ত্য ও পাতালের রাজত্ব লাভের; হেতোঃ = কারণে; মহীকৃতে = পৃথিবীর জন্য; নিহত্য = হত্যা ক'রে; নঃ = আমাদের অন্তরে; কা = কোন; স্যাৎ = হবে।।৩৫।।

অনুবাদ :- হে জনার্দন! পৃথিবীর জন্য তো দূরের কথা, সমগ্র ত্রিলোক অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের রাজত্ব লাভের কারণেও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হত্যা ক'রে আমাদের অন্তরে কোন প্রীতিলাভ হবে?।। ৩৫।।

পাপম্ এব আশ্রয়েৎ অস্মান্ # হত্বা এতান্ আততায়িনঃ।
তস্মাৎ ন অর্হা বয়ং হন্তুং # ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্
স্বজনং হি কথং হত্বা # সুখিনঃ স্যাম মাধব।। ৩৬।।

আশ্রয়েৎ = আশ্রয় করবে; অস্মান্ = আমাদের; আততায়িনঃ = আততায়ীদের; তস্মাৎ = সেইজন্য; ন অর্হা = পারব না; বয়ং = আমরা; স্যাম = হব।।৩৬।।

অনুবাদ :- এই সকল আততায়ীদের হত্যা করলে আমরা পাপগ্রস্তই হব। সেইজন্য আমরা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সবান্ধবে হত্যা করতে পারব না। মাধব! স্বজনদেরকে হত্যা করে আমরা কিভাবে সুখী হব?।। ৩৬।।

ব্যাখ্যা :- অর্জুন এখানে কৌরবদের আততায়ী ব'লে উল্লেখ করেছেন। আততায়ী শব্দের প্রচলিত অর্থ হল যে হত্যার উদ্দেশ্যে অপরকে আক্রমণ করে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এখানে এখনও পর্যন্ত তো কেউ কাউকে আক্রমণ করেনি বা হত্যা করতে উদ্যত হয়নি। উভয়ে উভয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধ আরম্ভ হলে তো উভয় পক্ষের সৈন্যই মারা যাবে। কিন্তু সে তো হত্যার পর্যায়ভুক্ত নয়। এ তো যুদ্ধের স্বাভাবিক নিয়ম। তাহলে অর্জুন কি কৌরবদেরকে মিথ্যা অপবাদে অভিযুক্ত করলেন? তাও আবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সামনে? না, ব্যাপারটা সেরকম নয়। অর্জুন বিন্দুমাত্র মিথ্যা বলেননি। শাস্ত্রে ছয়প্রকার আততায়ীর কথা বলা হয়েছে—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণিঃ ধনাপহঃ।
ক্ষেত্র-দার-অপহর্তা চ এব ষড়েতে হি আততায়িনঃ।।

(বশিষ্টস্মৃতি ৩য় অধ্যায়)

অর্থাৎ যে ঘরে আগুন দেয়, যে বিষ দেয়, যে হত্যা করার জন্য অস্ত্র ধারণ করে, যে ধন অপহরণ করে, যে ভূমি অপহরণ করে এবং যে অপরের স্ত্রীকে অপহরণ করে এই ছয়প্রকার মানুষকে আততায়ী বলা হয়। দুর্যোধনরা পাণ্ডবদেরকে বিষ দেওয়া ও তাদের ঘরে আগুন দেওয়া, জুয়া খেলায় ছলনার আশ্রয় নিয়ে পাণ্ডবদের সর্বস্ব হরণ করা, জয়দ্রথের দ্রৌপদীকে হরণ করার মত অপরাধ তো

করেছিল! সেইজন্য শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী অর্জুন কৌরবদের যথার্থই আততায়ী নামে অভিযুক্ত করেছিলেন। এই বিচারে রাবণও একজন আততায়ী হিসাবে গণ্য। আবার ভগবান্ মনু বলেছেন যে, অপরের ক্ষতিসাধনে উদ্যত আততায়ী সে গুরুই হোক, বালকই হোক, বৃদ্ধই হোক, অতি বড় বেদবিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণই হোক, তাকে নির্বিচারে হত্যা করা উচিত এবং আততায়ীকে প্রকাশ্যে বা গোপনে যে ভাবেই হোক হত্যা করলে সেই হত্যাকারীর কোন অপরাধ বা পাপ হয় না—

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্
আততায়িনম্ আয়ান্তং হন্যাৎ এব অবিচারয়ন্।
ন আততায়িবধে দোষঃ হন্তুঃ ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বা অপ্রকাশং বা মন্যুঃ তৎ মন্যুম্ ঋচ্ছতি।।

(মনুসংহিতা ৮/ ৩৫০-৩৫১)

এই সমস্ত কারণেই ভগবান্ সম্পূর্ণ সঙ্গত ভাবেই শাস্ত্রবিধি মেনেই অর্জুনকে বারে বারে যুদ্ধে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে এহেন আততায়ী বধ যদি শাস্ত্রসম্মতই হয় তাহলে শ্রীকৃষ্ণের অনুপ্রেরণা সত্ত্বেও কেন অর্জুন কৌরববধকে পাপ ব'লে অভিহিত করেছেন? এখানে দুটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তরটি হল এই যে সত্ত্বগুণসম্পন্ন অর্জুনের কোমল হৃদয় কৌরবপক্ষীয়দের প্রতি একদিকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহ ও মমতায় পূর্ণ ছিল। সেই জন্য তিনি কৌরবদের হত্যাকে কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না এবং সেই কারণেই তিনি এই ধরণের কথা বলেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণসম্পন্ন পরম জ্ঞানী অর্জুন সম্যক জানেন যে শাস্ত্রানুযায়ী আততায়ীবধে কোন পাপ হয় না। তাহলে প্রশ্ন আসে তিনি তথাপি কেন কৌরবদের বধে কষ্ট অনুভব করছেন। মনে রাখতে হবে অর্জুন একজন সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি। তাই তিনি সর্বদা সজাগ যেন তাঁর হাত দিয়ে কোন ধরণের অপরাধ ঘটে না যায়। তিনি জানেন যে শাস্ত্র দুই প্রকার— একটি হল অর্থশাস্ত্র অর্থাৎ আইন যা সর্বদা অপরাধকে আইনের চোখে বিচার করে এবং বলা হয় যে আইন অন্ধ। সে সংঘটিত অপরাধটি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। অপরটি হল ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ ন্যায় যার মূল বক্তব্য হল ক্ষমা, অহিংসা, পাপের পরিবর্তে পাপের দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণ না করা, গুরুজনরা যে অপরাধই করুন না কেন তাঁদেরকে হত্যা না করা প্রভৃতি। উপরে আততায়ীদের সম্পর্কে যে বিধান দেওয়া হয়েছে তা অর্থশাস্ত্রনির্ভর। সুতরাং অর্থশাস্ত্রে আততায়ীকে হত্যার বিধান দিলেও ধর্মশাস্ত্রে যে তাকে ক্ষমার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে! এই দুইয়ের

সংঘাতে অর্জুনের পবিত্র হৃদয় ভীষণভাবে রক্তাক্ত কারণ অর্জুন জানেন যে স্মৃতিশাস্ত্রের বিরোধের ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র অর্থাৎ আইন অপেক্ষা ন্যায় অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র বলবান এবং যেখানেই অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের সংঘাত হবে সেখানেই ধর্মশাস্ত্র প্রাধান্য পাবে— "স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ" (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ২/২/২১)। বিশেষ ক'রে এই জ্ঞান ও চিন্তার কারণে অর্জুনের অন্তরে আততায়ী কৌরবদের প্রতি অনুকম্পার উদয় হয়েছে।। ৩৬।।

যদ্যপি এতে ন পশ্যন্তি # লোভ-উপহত-চেতসঃ।
কুলক্ষয়-কৃতং দোষং # মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্।। ৩৭।।

যদ্যপি = যদিও; ন পশ্যন্তি = দেখতে পাচ্ছে না; লোভ-উপহত = লোভের নিকট উৎসর্গীকৃত; চেতসঃ = চিত্ত; কুলক্ষয়-কৃতং = বংশ ক্ষয় অর্থাৎ নাশকারী; পাতকম্ = পাপ বা অপরাধ।।৩৭।।

অনুবাদ :- এরা লোভের নিকট তাদের চিত্তকে উৎসর্গ করেছে। সেইজন্য এরা বংশনাশ ও বান্ধবজনদের সঙ্গে শত্রুতা করার মধ্যে কোন পাপ বা অন্যায় দেখতে পাচ্ছে না।।৩৭।।

ব্যাখ্যা :- এখানে শ্রীগীতায় বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে, মানব সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে এবং সমগ্র মানব সমাজের চারিত্রিক, সামাজিক ও জগতিক উন্নয়ন ক'রে তাদেরকে সত্যের পথ প্রদর্শন করার জন্য একটি মহান ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সেটি হল যে লোভ মানুষের মহাশত্রু। তার নিকট আত্মসমর্পণ করলে মানুষের অন্তর থেকে শুভবোধ বিলুপ্ত হয় এবং তার অজ্ঞাতেই তার, তার সংসারের ও সমগ্র মানব সমাজের চূড়ান্ত ক্ষতি হয়ে যায়। সেই কারণে লোভ থেকে মানুষের দূরত্ব বজায় রেখে চলাই শ্রেয়।।৩৭।।

কথং ন জ্ঞেয়ম্ অস্মাভিঃ # পাপাৎ অস্মাৎ নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং # প্রপশ্যদ্ভিঃ জনার্দন।। ৩৮।।

ন জ্ঞেয়ম্ = জ্ঞান হবে না; অস্মাভিঃ = আমাদের দ্বারা; অস্মাৎ = এই; নিবর্তিতুম্ = নিবৃত্ত হওয়ার; কুলক্ষয়কৃতং = বংশনাশজনিত; দোষং = অপরাধ; প্রপশ্যদ্ভিঃ = দেখেও অর্থাৎ উপলব্ধি করেও।।৩৮।।

অনুবাদ :- হে জনার্দন! কিন্তু বংশনাশজনিত অপরাধ উপলব্ধি করেও আমরা কেন এই পাপ কর্ম করা থেকে বিরত হব না।। ৩৮।।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি # কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নম্ # অধর্মঃ অভিভবতি উত।। ৩৯।।

প্রণশ্যন্তি = ধ্বংস হয়ে যায়; কৃৎস্নং = সমগ্র; কুলম্ = বংশ; অধর্মঃ = অধর্ম; অভিভবতি = অভিভূত করে অর্থাৎ গ্রাস করে; উত = বলা হয়।। ৩৯।।

অনুবাদ :- বংশ নাশ হলে সমগ্র সনাতন কুলধর্ম ধ্বংস হয়ে যায়। বলা হয় ধর্ম নষ্ট হলে অধর্ম সমগ্র বংশকে গ্রাস করে।। ৩৯।।

ব্যাখ্যা :- কুলধর্ম কাকে বলে এবং বংশ নাশ হলে কুলধর্ম কিভাবে নাশ হবে সেটিও জানা প্রয়োজন। নারদপরিব্রাজকোপনিষদে বলা হয়েছে যে ধীরতা, ক্ষমা, চিত্তের সংযম, অন্যায়ের সাহায্যে পরের ধন অপহরণ না করা, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়ের সংযম, বুদ্ধি, আত্মজ্ঞান, সত্যভাষণ এবং ক্রোধের বশীভূত না হওয়া — এই দশটি হল আদর্শ সনাতন কুলধর্মের লক্ষণ—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমঃ অস্তেয়ং শোচম্ ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যম্ অক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।

—নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ, ৩।২৪

এখন অর্জুনের বক্তব্য হল যে যুদ্ধে বয়স্ক পুরুষরা মারা গেলে পরিবারের শিশু ও নারীদের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার মত কেউ থাকবে না। ফলে উপযুক্ত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পরিবারের ভাবী সদস্যরা উপর্যুক্ত কুলধর্মের শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে।। ৩৯।।

অধর্ম-অভিভবাৎ কৃষ্ণ # প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় # জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।। ৪০।।

অভিভবাৎ = প্রাদুর্ভূত হলে; প্রদুষ্যন্তি = ব্যভিচারিণী হয়; স্ত্রীষু = স্ত্রীগণ; দুষ্টাসু = দুষ্ট অর্থাৎ ব্যভিচারিণী; বার্ষ্ণেয় = বৃষ্ণির বংশজ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ; জায়তে = জন্মগ্রহণ করে; বর্ণসঙ্করঃ = বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে উৎপন্ন সন্তান।।৪০।।

অনুবাদ :- হে কৃষ্ণ! কুলে পাপের প্রাদুর্ভাব ঘটলে কুলনারীগণ ব্যভিচারিণী হয়। হে বার্ষ্ণেয়! স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হলে বর্ণসঙ্কর জন্মগ্রহণ করে।।৪০।।

সঙ্করো নরকায় এব # কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরঃ হি এষাং # লুপ্ত-পিণ্ড-উদক-ক্রিয়াঃ।। ৪১।।

কুলঘ্নানাং = বংশনাশকারিগণের; কুলস্য = বংশের; এষাং = এদের; পতন্তি

= পতিত হয়; পিতরঃ = পিতৃপুরুষগণের প্রতি; লুপ্ত-পিণ্ড-উদক-ক্রিয়াঃ = পিণ্ডদান ও তর্পণাদি ক্রিয়াকর্ম বন্ধ হয়ে যায়।। ৪১।।

অনুবাদ :- বর্ণসঙ্করের কারণে বংশনাশকারিগণ তৎসহ সমগ্র কুল নরকে পতিত হয় এবং সেই কুলের পিতৃপুরুষগণের প্রতি পিণ্ডদান ও তর্পণক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে সেই সমস্ত পিতৃপুরুষগণ নরকে নিক্ষিপ্ত হন।।৪১।।

দোষৈঃ এতৈঃ কুলঘ্নানাং # বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ # কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।। ৪২।।

দোষৈঃ = বর্ণসঙ্করকারক দোষের দ্বারা; এতৈঃ = এই সকল; উৎসাদ্যন্তে = উৎসন্নে যায়; শাশ্বতাঃ = চিরন্তন।। ৪২।।

অনুবাদ :- কুলনাশকারীদের এই সমস্ত বর্ণসঙ্করকারক দোষের কারণে চিরন্তন জাতিধর্ম ও কুলধর্ম উৎসন্নে যায়।। ৪২।।

উৎসন্ন-কুলধর্মাণাং # মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো # ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম।। ৪৩।।

নিয়তং = চিরকাল; ভবতি = হয়; ইতি অনুশুশ্রুম = এই শুনেছি।।৪৩।।

অনুবাদ :- হে জনার্দন! শুনেছি যে, যে সমস্ত মানুষদের কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যায়, তাদের চিরদিনের জন্য নরকেই ঠাঁই হয়।।৪৩।।

অহো বত মহৎ পাপং # কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যৎ রাজ্যসুখলোভেন # হন্তুং স্বজনম্ উদ্যতাঃ।। ৪৪।।

অহো = হায়; বত = কি দুঃখ; মহৎ = ভয়ঙ্কর; কর্তুং = করতে; ব্যবসিতাঃ = প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; বয়ম্ = আমরা; রাজ্যসুখলোভেন = রাজ্যসুখলোভের জন্য; উদ্যতাঃ = উদ্যত।। ৪৪।।

অনুবাদ :- হায়! কি দুঃখ! রাজ্যসুখ ভোগের লোভে আমরা স্বজনদের হত্যা করার মত ভয়ঙ্কর পাপে লিপ্ত হতে যাচ্ছি।।৪৪।।

ব্যাখ্যা :- এখানে গীতা সকল মানুষের জন্য একটি পরম শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা দেখেছি যে কৌরবগণ অর্জুনদের প্রতি অগণিত অপরাধ করা সত্ত্বেও অর্জুন তাঁদের প্রতি কোন দোষারোপ করেননি। একজন যথার্থ সাধু প্রকৃতির সজ্জন ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ হবে সেই বিষয়টি গোস্বামী তুলসীদাস তাঁর শ্রীরামচরিতমানস মহাকাব্যে খুব পেলব ও অপূর্ব সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করেছেন —

সাধুচরিত সুভ সরিস কপাসু।
নিরস বিসদ গুণময় ফল জাসু।।

জো সহি দুখ পরছিদ্র দুরাবা।
বন্দনীয় জেহি জগ জসু পাবা।।

অর্থাৎ সাধু সজ্জন ব্যক্তির জীবন কাপাস তুলার মত। কাপাসের বীজে যেমন রস নাই তেমনই সাধু সজ্জন ব্যক্তির অন্তরে বৈষয়িক কোন বিষয়ের প্রতি কোন আকর্ষণ বা লালসা নাই, কাপাসের রঙ যেমন বিশদ অর্থাৎ নির্মলতার প্রতীক শ্বেতশুভ্র তেমনই সজ্জন ব্যক্তির চিত্ত নির্মল, কাপাস গুণ অর্থাৎ তন্তুময় তেমনই সজ্জন ব্যক্তির চরিত্র সদ্গুণে পূর্ণ, কাপাস থেকে সুতা প্রস্তুতের সময় তাকে কতভাবে পীড়ন করা হয় কিন্তু কাপাস নীরবে সবকিছু সহ্য করে যায় এবং বিনিময়ে বস্ত্রে পরিণত হয়ে অপরের গোপন দিক আবৃত করে। তেমনই সাধু সজ্জন ব্যক্তি অপরের নিকট থেকে প্রাপ্ত সমস্ত দুঃখ, পীড়ন সহ্য ক'রে তার কল্যাণই করেন, তাদের সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি ঢেকে রাখেন। অর্জুন জীবনে এই বৈশিষ্ট্যই অনুসরণ ক'রে চলেছেন।

তিনি একজন যথার্থ সাধু প্রকৃতির সজ্জন ব্যাক্তি। তিনি সর্বদাই নিজের দোষের কথাই বলেছেন। ফলে গীতার শিক্ষা হল যে সজ্জন মানুষের পক্ষে অপরের দোষ দেখা উচিত নয়। অপরের দোষ দেখা দুর্জনের কর্ম।

মানুষ যদি এই শিক্ষা অনুসরণ ক'রে চলতে পারে তাহলে তার জীবন ও চরিত্র সুন্দর হয়ে উঠবে।

যদি মাম্ অপ্রতীকারম্ # অশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তারাষ্ট্রা রণে হন্যুঃ # তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।। ৪৫।।

যদি শস্ত্রপাণয়ঃ = যদি শস্ত্রধারী; অপ্রতীকারম্ = প্রতিকারে বিরত; হন্যুঃ = হত্যা করে; ক্ষেমতরং = অধিকতর মঙ্গলজনক; ভবেৎ = হবে।। ৪৫।।

অনুবাদ :- যদি ধৃতরাষ্ট্রের শস্ত্রধারী পুত্রগণ প্রতিকারে বিরত শস্ত্রহীন আমাকে যুদ্ধে হত্যা করে সেটাও আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক হবে।। ৪৫।।

সঞ্জয় উবাচ

এবম্ উক্ত্বা অর্জুনঃ সংখ্যে # রথ-উপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং # শোক-সংবিগ্ন-মানসঃ।।৪৬।।

সংখ্যে = যুদ্ধে; সশরং = শরযুক্ত; বিসৃজ্য = পরিত্যাগ ক'রে; চাপং = ধনুক; রথ-উপস্থে = রথের উপরে পিছন অংশে; উপাবিশৎ = বসলেন; শোকসংবিগ্নমানসঃ = শোকাকুলচিত্ত।। ৪৬।।

অনুবাদ :- সঞ্জয় বললেন — শোকাকুলচিত্ত অর্জুন এইরূপ ব'লে যুদ্ধক্ষেত্রে শরযুক্ত ধনুক পরিত্যাগ ক'রে রথের উপরে পিছন অংশে বসলেন।।৪৬।।

—: প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত :—

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্যযোগ

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়া আবিষ্টম্ # অশ্রু-পূর্ণ-আকুল-ঈক্ষণম্
বিষীদন্তম্ ইদং বাক্যম্ # উবাচ মধুসূদনঃ।।১।।

কৃপয়া = কৃপার দ্বারা; আবিষ্টম্ = বিহ্বল; ঈক্ষণম্ = নয়ন; বিষীদন্তম্ = বিষণ্ণ।। ১।।

অনুবাদ :- সঞ্জয় বললেন — এইভাবে করুণার দ্বারা বিহ্বল ও অশ্রুপূর্ণ আকুল-নয়ন বিষণ্ণ অর্জুনকে দেখে মধুসূদন তাঁকে এই কথা বললেন।।১।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলম্ ইদং # বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্ # অকীর্তিকরম্ অর্জুন।। ২।।

কুতঃ = কোথায় থেকে; ত্বা = তোমার; বিষমে = এই সঙ্কটকালে; অনার্যজুষ্টম্ = অনার্যসুলভ; অস্বর্গ্যম্ = স্বর্গহানিকর; অকীর্তিকরম্ = কীর্তিনাশক; কশ্মলম্ = মোহ (কাতরভাব); সমুপস্থিতম্ = উপস্থিত হল।। ২।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন, হে অর্জুন! এখন সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়েছে। এই সময়ে এই রকম অনার্যসুলভ, স্বর্গহানিকর ও কীর্তিনাশক এই মোহ (কাতরভাব) তোমার মধ্যে কোথায় থেকে উপস্থিত হল!

ব্যাখ্যা :- ঠিক এই সময়ে এক বিরাট সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়েছে। একদিকে অধার্মিক দুর্যোধনাদির উল্লাস অপরদিকে ধার্মিক মানুষদের অসহায়তা। ধর্মের সংস্থাপন ও অধর্মের বিনাশের জন্য এই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এখানে ধর্ম অর্থে ভজন, পূজন, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি বোঝানো হয়নি। এখানে ধর্ম বলতে বোঝানো

হয়েছে সমস্ত প্রকারের অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের অবসান ঘটিয়ে সমাজে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা। দুর্যোধনাদির অত্যাচারে সমাজে এই ন্যায়ধর্মের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। দুর্যোধনকে তার অন্যায়, অত্যাচাররূপ অধর্ম থেকে বিরত হওয়ার জন্য পাণ্ডবপক্ষ থেকে সর্বপ্রকার শান্তিপূর্ণ চেষ্টা করা হলেও তা সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে। এখন সমাজকে দুর্যোধনের অধর্মের হাত থেকে রক্ষা করার বৃহত্তম স্বার্থে একমাত্র এই যুদ্ধই অবশিষ্ট আছে। এই যুদ্ধ না হলে দুর্যোধনের জয়জয়কার হবে এবং পৃথিবী ভয়ানক অধর্মে পূর্ণ হয়ে যাবে। সমাজ রক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে এই যুদ্ধ আজ শিয়রে উপস্থিত। সেইজন্য এই সময়ে এই যুদ্ধ পরিত্যাগ করলে অর্জুনের পক্ষে সমাজের প্রতি এক বিরাট অবিচার করা হবে এবং সে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবশ্য করণীয় কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে যা মানুষের চোখে অপরাধ তথা পাপ ব'লে বিবেচিত হবে। সেইজন্য কৃষ্ণ অর্জুনকে সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রেরণা দান করেন। এ যুদ্ধ কোন স্বার্থ পূরণের জন্য নয়, কোন সুখভোগ বা আনন্দ লাভের জন্য বা অপরের প্রতি আক্রোশ নিবারণের জন্য নয়, এই যুদ্ধ সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনের অনুষ্ঠান। সুতরাং এই যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে ন্যায়যুদ্ধ। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে কোন পাপ হয় না, বরং তাকে পরিহার করাটাই অপরাধ ও পাপরূপে বিবেচিত হবে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের অষ্টম মন্ত্রে বলা হয়েছে —

অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ।
প্রাবো বাজেষু বাজিনম্।।

অর্থাৎ যে পুরুষ দুষ্টের সঙ্গে ধর্মপূর্বক যুদ্ধ করে একমাত্র তারই বিজয় প্রাপ্তি হয় এবং পরমেশ্বরও সেই ধর্মপূর্বক যুদ্ধকারী পুরুষের সহায় হন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের লোকশিক্ষা হল যে কোনপ্রকার লাভালাভের বিষয় চিন্তা না ক'রে মানুষের সঙ্কটকালে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত চিত্তে শুভ উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থভাবে যে কোন মূল্যে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই অবশ্য কর্তব্য।

এই শ্লোকে প্রযুক্ত ভগবান্ শব্দের অর্থটি পাঠকের নিকট পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। ভগবান্ শব্দের ব্যুৎপত্তি হল — ভজ্ (সেবা করা ইত্যাদি), গ কর্ম এবং

অর্থ হল ভগযুক্ত। 'ভগ' শব্দের অর্থ হল — পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য যথা সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য, সম্পূর্ণ বীর্য, সম্পূর্ণ শ্রী, সম্পূর্ণ যশ, সম্পূর্ণ জ্ঞান, এবং সম্পূর্ণ বৈরাগ্য —

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা।।

বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৪

বিষ্ণুপুরাণে ভগবান্ শব্দের তাৎপর্য বর্ণনা ক'রে আরও বলা হয়েছে যে হেয়গুণ বর্জিত সমস্ত জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজ সমন্বিত যিনি তাঁকে ভগবান্ বলা হয় —

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ।।

বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৯

গীতায় ভগবান্ শব্দটি কাকে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে সেটিও যুক্তি সহকারে জানা প্রয়োজন। আমরা দেখতে পাই যে বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে ভগবান্ শব্দটির দ্বারা একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দেশ করে এবং অন্যত্র এই শব্দের প্রয়োগ হলে তা নিরর্থক হবে —

এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম।
পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যতঃ।।

বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৬

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিষ্ণুপুরাণ বর্ণিত ভগবানের উপর্যুক্ত সমস্ত বৈশিষ্ট্যই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তাই তিনিই ভগবান্। সুতরাং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 'ভগবান্' শব্দটি দ্বারা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দেশ করা হয়েছে। ফলে যেখানেই 'ভগবান্ শব্দটি উচ্চারিত হবে সেখানেই বুঝতে হবে যে ঐ মহান শব্দটির দ্বারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই বোঝানো হয়েছে।

এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর উপদেশের শুরুতে অর্জুন নামেই সম্বোধন করেছেন। অর্জুন শব্দের অর্থ হল শুভ্র, শ্বেত, সাদা। এই শ্বেতবর্ণ হল সাত্ত্বিক গুণের প্রতীক এবং লাল ও কাল হল যথাক্রমে রাজস ও তামস গুণের প্রতীক। সুতরাং ভগবান্ তাঁর বক্তব্যের শুরুতে অর্জুনকে সাত্ত্বিক গুণে ভূষিত করেছেন। এর কারণটি জানা প্রয়োজন। কৌরবগণ পাণ্ডবদের উপর তাঁদের শিশুকাল থেকেই যৎপরোনাস্তি অত্যাচার, অবিচার করেছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ,

দ্রৌপদী সহ তাঁদের সকলকে যথেচ্ছ অপমান করেছে, শান্তি রক্ষার জন্য তাঁদের অগণিত প্রয়াসকে অস্বীকার ক'রে অন্যায়ভাবে তাঁদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড় করিয়েছে। তথাপি মহাপরাক্রমশালী অর্জুন কৌরবদের প্রতি বিন্দুমাত্র রোষ পোষণ করেননি। যুদ্ধে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সহায়। তিনি পাশুপত অস্ত্রের ন্যায় মহা শক্তিশালী অস্ত্রের অধিকারী। তিনি ইচ্ছা করলেই কৌরবকুলকে যুদ্ধে অনায়াসেই পরাস্ত ক'রে সিংহাসনের অধিকারী হতে পারেন। কিন্তু তথাপি তিনি কৌরবদের প্রতি বিন্দুমাত্র রুষ্ট নন। বরং কৌরবদের কোন ক্ষতি হোক তা তিনি মনেপ্রাণে চান না। তাদের প্রতি শ্রদ্ধায়, স্নেহে, মমতায় তাঁর হৃদয় আপ্লুত। কৌরবদের আশু ধ্বংসের চিত্র মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে তিনি নিতান্ত বেদনায় দীর্ণ। এই কারণে দুঃখে, মানসিক অবসাদে তাঁর হৃদয় থরথর ক'রে কাঁপছে। তিনি তাঁর এই সমস্ত স্বজনদের হত্যা করা অপেক্ষা ভিক্ষান্নে জীবন ধারণকে অনেক বেশী শ্রেয় ব'লে মনে করেছেন। তিনি আততায়ী বিপক্ষ কৌরবদেরকে হত্যা করা অপেক্ষা কৌরবদের হাতে নিরস্ত্র অবস্থাতে নিজে নিহত হওয়াকেও অনেক বেশী শ্রেয় মনে করেছেন। যিনি শত অপরাধ করলেও অপরকে দোষারোপ করেন না, যিনি অপরের দোষ বিচার করার পরিবর্তে নিজের দোষ গণনা করেন, যিনি দোষী স্বজনদের ক্ষতি, দুঃখ ও কষ্টের কল্পনায় অন্তরে নিবিড় ব্যথা অনুভব করেন, যিনি স্বজনদের প্রাণের বিনিময়ে অর্থ, সম্পদ, রাজ্যসুখলাভকে শ্রেয় মনে করেন না হোক না সেই স্বজন অত্যাচারী, তাঁদের সর্বস্ব অপহরণকারী, সেই মানুষের চরিত্র তো রাজসিক বা তামসিক হতে পারে না। এ চরিত্র তো সদা শুভ্র, অমলিন, সাত্ত্বিক গুণ সম্পন্ন। সেই কারণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সাত্ত্বিক বিশেষণে ভূষিত করেছেন।

এখানেও জগতের জন্য গীতা আদর্শ মানুষের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই মহান শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে ব্যর্থ। এইটিই দুঃখের বিষয়।। ২।।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ # ন এতৎ ত্বয়ি উপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং # ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।৩।।

ক্লৈব্যং = কাপুরুষতা; মাস্ম গমঃ = প্রাপ্ত হবে না; ন উপপদ্যতে = শোভা পায় না; পরন্তপ = শত্রু নিধনকারী; ত্যক্ত্বা = পরিত্যাগ ক'রে; উত্তিষ্ঠ = জাগ্রত হও।।৩।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! তুমি এই রকম কাপুরুষ হবে না। তোমার পক্ষে এরকম হওয়া শোভা পায় না। হে পরন্তপ! হৃদয়ের সংকীর্ণ দুর্বলতা দূর ক'রে তুমি উঠে দাঁড়াও।।৩।।

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মম্ অহং সংখ্যে # দ্রোণং চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি # পূজার্হৌ অরিসূদন।।৪।।

ইষুভিঃ = শরদ্বারা; প্রতিযোৎস্যামি = যুদ্ধ করি; পূজার্হৌ = পূজনীয়; অরিসূদন = হে শত্রু নিধনকারী।।৪।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন— হে শত্রু নিধনকারী মধুসূদন! আমি এই যুদ্ধে কিভাবে পরম পূজনীয় পিতামহ ভীষ্ম ও গুরু দ্রোণাচার্যের প্রতি শরনিক্ষেপ ক'রে যুদ্ধ করি।।৪।।

ব্যাখ্যা :- এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার মনের গ্লানি দূর করে নিজের কর্তব্যপথে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু অর্জুনের মন থেকে সংশয়ের মেঘ কিছুতেই কাটছে না। তাই তিনি পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণকে তাঁর পক্ষে কিভাবে হত্যা করা সম্ভব। কারণ পিতামহ ভীষ্ম তো পরম ভাগবত অর্থাৎ ভগবানের পরম ভক্ত। পাণ্ডবগীতায় ভীষ্মকে পরমভাগবত ব'লে প্রণাম জানানো হয়েছে —

প্রহ্লাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরীক-
ব্যাস-অম্বরীষ-শুক-শৌনক-ভীষ্ম-দালভ্যান্
রুক্মাঙ্গদ-অর্জুন[২]-বশিষ্ঠ-বিভীষণাদীন্
পুণ্যান্ ইমান্ পরমভাগবতান্ নমামি।।

(পাণ্ডবগীতা -১)

২। অর্জুন—ইনি পাণ্ডুপুত্র অর্জুন নন। ইনি ক্ষত্রিয় সমাজের হেহয় বংশের রাজা কার্তবীর্য এবং রানী কৌশিকের পুত্র মহিষ্মতীর রাজা সহস্রার্জুন। তাঁর নাম প্রথমে ছিল অর্জুন। তিনি পরশুরামকে তপস্যায় সন্তুষ্ট ক'রে একহাজারটি হাত লাভের আশীর্বাদ লাভ করেন। তখন থেকে তাঁর নাম হয় সহস্রার্জুন। তিনি একবার যুদ্ধে রাবণকে পরাজিত ক'রে বন্দী করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে যুধিষ্ঠির বলেছেন যে, ভাগবত অর্থাৎ ভগবানের পরম ভক্ত স্বয়ংই তীর্থস্বরূপ যিনি স্বীয় হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানের সাহায্যে সেই তীর্থকে মহাতীর্থে পরিণত করেন। এহেন ভগবানের পরমভাগবতকে অস্ত্রদ্বারা হত্যা করা তাঁর পক্ষে কিভাবে সম্ভব? তাছাড়া গুরু দ্রোণাচার্য একজন ব্রাহ্মণ। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণের দেহ হল ধর্মের শাশ্বত মূর্তি, ব্রাহ্মণের জন্ম হয় ধর্মের জন্য এবং ব্রাহ্মণ মোক্ষলাভের যোগ্য। ব্রাহ্মণই হলেন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধর্মের যোগ্য রক্ষক—

উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্তির্ধর্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।
ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে।।

(মনুসংহিতা ১।৯৮-৯৯)

শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণকে কদাপি হত্যা করা উচিত নয় — 'ন ব্রাহ্মণং হন্যাৎ।' মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম বলেছেন যে যারা ব্রাহ্মণকে আঘাত করে, অভিশাপ দেয়, কড়া কথা বলে, ব্রাহ্মণের সামনে মাথা নত করে না সেই পাপী ব্রহ্মদাবাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয় এবং শাস্তি পায়, সে কখনই আমাদের আপন হতে পারে না —

ঘ্নন্তং শপন্তং পরুষং বদন্তং যো ব্রাহ্মণং ন প্রণমেদ্ যথাহম্
স পাপকৃদ্ ব্রহ্মদবাগ্নিদগ্ধো বধ্যশ্চ দণ্ড্যশ্চ ন চাস্মদীয়ঃ।।

অর্জুনের মনে প্রশ্ন যে শাস্ত্রে যাঁকে এহেন পরম স্থান দিয়েছে তাঁকে হত্যা করা তাঁর পক্ষে কিভাবে সম্ভব। এছাড়া অর্জুন এই শ্লোকে ভগবানকে 'মধুসূদন' অর্থাৎ মধু নামক দৈত্যের নাশকারী ব'লে সম্বোধন করেছেন। স্পষ্টতই তাঁর মনে হয়েছে যে কৃষ্ণ যাদেরকে হত্যা করেছেন সেই মধু, কেশী, পুতনা, তৃণাবর্ত, অঘাসুর, বকাসুর, জরাসন্ধ, কংস, শিশুপাল প্রভৃতিরা ছিলেন অসুর, রাক্ষস,

অত্যাচারী। তাদেরকে হত্যার মধ্যে কোন অন্যায় থাকতে পারে না। সেইজন্য পরম ভাগবত পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণ যিনি তাঁর গুরু, যিনি শিষ্যের নিকট শাস্ত্র অনুযায়ী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সমতুল্য, যিনি কেবলমাত্র প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিমিত্ত বাধ্য হয়ে পাপী দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছেন সেই পূজ্য পিতামহ ভীষ্ম এবং গুরু দ্রোণকে হত্যা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ করাকেই শ্রেয় মনে করেন।। ৪।।

গুরূন্ অহত্বা হি মহানুভাবান্

শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষম্ অপি ইহ লোকে।

হত্বা অর্থ-কামান্ তু গুরূন্ ইহ এব

ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিগ্ধান্।। ৫।।

গুরূন্ = গুরুজনদের; অহত্বা = হত্যা না ক'রে; ভৈক্ষম্ = ভিক্ষালব্ধ অন্ন; ভোক্তুং = আহার করা; অর্থ-কামান্ = অর্থ ও কাম্যবস্তু; হত্বা = হত্যা ক'রে; রুধির-প্রদিগ্ধান্ = রক্তমাখা; ভোগান্ = কাম্যবস্তু; ভুঞ্জীয় = ভোগ করতে হবে।। ৫।।

অনুবাদ :- মহানুভব গুরুজনদের হত্যা না ক'রে এই জগতে ভিক্ষালব্ধ অন্ন আহার ক'রে জীবিকা নির্বাহ করাও নিশ্চিতভাবে অধিকতর ভালো। গুরুজনদেরকে হত্যা ক'রে যে অর্থ ও কাম্যবস্তু এই জগতে ভোগ করা যায় তা কিন্তু অবশ্যই গুরুজনদের রক্তে রঞ্জিত।। ৫।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে অর্জুন যে 'অর্থ-কামান্' পদটি ব্যবহার করেছেন সেটি একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। অর্জুন জানতেন যে আচার্য দ্রোণ কৌরবদের নিকট থেকে অর্থ ও কাম্যবস্তু পান এবং সেই কারণে তিনি যুদ্ধে কৌরবপক্ষ

অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। এ কথা স্বয়ং দ্রোণ নিজের মুখে যুধিষ্ঠিরের নিকট স্বীকার করেছেন —

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধঃ অস্মি অর্থেন কৌরবৈঃ।।

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৪৩।৫৬)

এখন অর্জুন যদি যুদ্ধে কৌরব পক্ষকে পরাজিত ক'রে অন্যান্য বীরগণ সহিত দ্রোণকে হত্যা ক'রে রাজ্যলাভ করেন তাহলে কৌরবদের নিকট থেকে দ্রোণের প্রাপ্ত অর্থও তাঁদের হস্তগত হবে এবং এভাবে লব্ধ অর্থ দ্রোণের রক্ত-রঞ্জিতই হবে। বিশেষ ক'রে সেই কারণেই অর্জুন এই কথা বলেছেন।

তাছাড়া অর্জুন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি সম্যক জানেন যে গুরু সদা অবধ্য কারণ তিনি তাঁর জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা অজ্ঞানী শিষ্যের অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, মোহ কবলিত চক্ষুতে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করেন। অদ্বয়তারকোপনিষদের যোড়শ শ্লোকে বলা হয়েছে —

গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাৎ শব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে।।১৬।।

এই সমস্ত কারণে অর্জুন মনে করেন যে গুরুহত্যা মহা পাপ এবং সেই কারণে তিনি গুরুহত্যা অপেক্ষা নিজের সমস্ত সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দেওয়াকে শ্রেয় মনে করেছেন।।৫।।

ন চ এতৎ বিদ্মঃ কতরৎ নঃ গরীয়ো
যৎ বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যান্ এব হত্বা ন জিজীবিষামঃ
তে অবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ।। ৬।।

ন বিদ্মঃ = জানি না; কতরৎ = এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি; গরীয়ঃ = অধিকতর ভালো; জয়েম = জয়লাভ করি; জয়েয়ুঃ = জয় করে; যান = যাদেরকে; ন জিজীবিষামঃ = বাঁচতে চাই না; অবস্থিতাঃ = উপস্থিত; প্রমুখে = সামনে।। ৬।।

অনুবাদ :- আমি জানি না যে যদি আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করি অথবা কৌরবরা আমাদেরকে পরাজিত করে তাহলে এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে আমাদের পক্ষে কোনটি শ্রেয়তর। নিশ্চিতভাবে যাদেরকে হত্যা ক'রে আমরা বাঁচতে চাই না ধৃতরাষ্ট্রের সেই পুত্রগণ আমাদের সামনেই উপস্থিত।। ৬।।

কার্পণ্য-দোষ-উপহত-স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম-সংমূঢ়-চেতাঃ।
যৎ শ্রেয়ঃ স্যাৎ নিশ্চিতং ব্রূহি তৎ মে
শিষ্যঃ তে অহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।। ৭।।

কার্পণ্য-দোষ-উপহত-স্বভাবঃ = কার্পণ্যদোষের কারণে বিহ্বল স্বভাব; পৃচ্ছামি = জিজ্ঞাসা করছি; ধর্ম সংমূঢ় = ধর্ম সংকটগ্রস্ত; চেতাঃ = চিত্ত; ব্রূহি = বল; শাধি = উপদেশ দাও; প্রপন্নং = শরণাপন্ন।।৭।।

অনুবাদ :- কার্পণ্যদোষের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণে বিহ্বল আমার স্বভাব ধর্মসংকটগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি — এমতাবস্থায় আমার সঠিক করণীয় কি তা আপনি আমাকে বলুন। আমি আপনার শিষ্য, আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমাকে আপনি উপদেশ দিন।।৭।।

ব্যাখ্যা :- কৃপণ শব্দটি সচরাচর যে অর্থে সাধারণত ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কঞ্জুস যার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'miser' সেই স্থূল অর্থে এই পদটি এই শ্লোকে ব্যবহৃত হয়নি। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩।৮।১০ মন্ত্রে যারা অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী পরব্রহ্ম নারায়ণকে না জেনে এই মর্তলোকে আসে, মারা যায় এবং পুনরায় মর্তলোকে ফিরে আসে তাদেরকে 'কৃপণ' নামে অভিহিত করা হয়েছে — 'যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মাল্লোকাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।' যাইহোক, এখানে করুণা, অনুকম্পা প্রভৃতি অর্থে কৃপণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আততায়ী হলেও দুর্যোধনাদির প্রতি অর্জুনের অন্তর যেভাবে অনুকম্পা ও করুণার দ্বারা পরিপ্লাবিত হয়ে আছে এইটাই তাঁর চরিত্রের কার্পণ্যদোষ হিসাবে এখানে বিবেচিত হয়েছে।

এই শ্লোকে অর্জুনের ধর্মসংকটের কথাও বলা হয়েছে। এখানে ধর্ম শব্দটি কিন্তু Religion অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। মহাভারতে ধর্ম বলতে গার্হস্থ্যধর্ম, সন্ন্যাসধর্ম,

অহিংসা ধর্ম, পাতিব্রতধর্ম, দানধর্ম, রাজধর্ম প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে। এখন যদি কারও মনে গার্হস্থ্যধর্ম পালন করব না সন্ন্যাসধর্ম পালন করব এই সংশয় জাগে তাহলে সে ধর্মসংকটে পতিত বলা যাবে। অর্জুনের অন্তরে রাজধর্ম পালন না অহিংসা ধর্ম পালন কোনটি করা শ্রেয় হবে এই বিষয়ে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। সেইজন্য তাঁর ধর্মসংকট ঘটেছে বলা হয়েছে।

এছাড়াও উপর্যুক্ত সপ্তম শ্লোকের অন্তিমে আমরা দেখতে পাই যে অর্জুন নিজেকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য হিসাবে উপস্থাপিত ক'রে শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে উপযুক্ত উপদেশ যাচ্ঞা করেছেন। এর তাৎপর্য জানা প্রয়োজন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা ভগবান্ জ্ঞানেই বিচার করতেন। কিন্তু বাস্তব ব্যবহারে আমরা দেখেছি যে অর্জুন কৃষ্ণকে সখা মনে করতেন। একজন অপরকে তখনই সখা মনে করে যখন সে অপরকে তার সমান মনে করে। আমরা দেখেছি ব্যবহারিক জীবনে অর্জুন ও ভগবানের মধ্যে তুল্যমূল্য ব্যবহার বিদ্যমান ছিল— একই সঙ্গে আহার, বিহার, নিদ্রা ছিল উভয়ের দৈনন্দিন অভ্যাস। আপদে-বিপদে বন্ধুর নিকট থেকে পরামর্শ পাওয়া যায়। সেই পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তারই, সেই বন্ধুর নয়। অর্জুন এখানে সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছেন যে এই রকম একটা অতীব জটিল ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বন্ধুর নিকট থেকে পরামর্শ নিয়ে তার ভালো-মন্দ বিচার ক'রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাঁর এখন নাই। সেইজন্য তাঁর এখন প্রয়োজন একজন প্রাজ্ঞ গুরুর উপদেশ যাকে শিরোধার্য ক'রে তিনি নিশ্চিন্তে এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবেন। তার শুভাশুভ বিচারের কোন প্রয়োজন তাঁর নেই। মাথার উপর গুরু আছেন যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্তা। তিনিই এই সুবৃহৎ কর্মযজ্ঞের শুভাশুভ বিচার করবেন। মরতে হলে তিনিই মারবেন, বাঁচাতে হলে তিনিই বাঁচাবেন। এই উদ্দেশ্য নিয়েই অর্জুন পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাবনতচিত্তে নিজেকে খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবে কৃষ্ণের শিষ্যের স্থানে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

এইখানে গীতা সমগ্র মানব সমাজের উদ্দেশ্যে এক বিরাট উপদেশ দিয়েছেন যে সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, সাফল্যে-বিফলতায়, উত্থানে-পতনে, নিদ্রায়-জাগরণে জীবনের সর্ব অবস্থায় একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পরমপুরুষ পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়াই জীবনের একমাত্র কর্তব্য।। ৭।।

ন হি প্রপশ্যামি মম অপনুদ্যাৎ
যৎ শোকম্ উচ্ছোষণম্ ইন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমৌ অসপত্নম্ ঋদ্ধং
রাজ্যং সুরাণাম্ অপি চ আধিপত্যম্।। ৮।।

প্রপশ্যামি = দেখছি; অপনুদ্যাৎ = দূর করা; উচ্ছোষণম্ = শোষণ; অবাপ্য= লাভ ক'রে; ভূমৌ = পৃথিবীতে; অসপত্নম্ = নিষ্কণ্টক; ঋদ্ধং = সমৃদ্ধ; সুরাণাম্= দেবতাগণের।। ৮।।

অনুবাদ :- যদিও আমি স্বর্গের দেবতাগণের মত আধিপত্য সহকারে এই পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজত্ব লাভ করি তথাপি (দুর্যোধনাদি স্বজনদের ভাবী নিধনের চিন্তার কারণে) যে শোক আমার ইন্দ্রিয়সমূহকে শোষণ ক'রে নিচ্ছে অর্থাৎ আমাকে সর্বপ্রকারে অবশ ক'রে দিচ্ছে তার কিভাবে অবসান হতে পারে তা আমি নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারছি না।। ৮।।

সঞ্জয় উবাচ

এবম্ উক্ত্বা হৃষীকেশং # গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দম্ # উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ।। ৯।।

উক্ত্বা = ব'লে; ন যোৎস্যে = যুদ্ধ করব না; তূষ্ণীং = নীরব; বভূব = হলেন।। ৯।।

অনুবাদ :- সঞ্জয় বললেন— এই কথা ব'লে শত্রুহন্তা গুড়াকেশ অর্থাৎ নিদ্রা বিজয়ী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "হে গোবিন্দ! আমি নিশ্চিতভাবেই আর যুদ্ধ করব না।" তারপর অর্জুন নীরব হলেন।। ৯।।

তম্ উবাচ হৃষীকেশঃ # প্রহসন্ ইব ভারত।
সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে # বিষীদন্তম্ ইদং বচঃ।। ১০।।

বিষীদন্তং = বিষণ্ণচিত্ত; প্রহসন্ ইব = হাসতে হাসতেই।। ১০।।

অনুবাদ :- হে রাজন্! উভয় পক্ষের সেনার মধ্যে বিরাজমান বিষণ্ণচিত্ত অর্জুনকে হাস্যমুখে শ্রীকৃষ্ণ এই বাক্য বললেন।।১০।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ ত্বং # প্রজ্ঞাবাদান্ চ ভাষসে।
গতাসূন্ অগতাসূন্ চ # ন অনুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।। ১১।।

গতাসূন = গত অসূন; অগতাসূন্ = অগত অসূন।

অশোচ্যান্ = যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়; অন্বশোচঃ = সেই ব্যাপারে শোক করছ; প্রজ্ঞাবাদান্ = জ্ঞানী ব্যক্তিদের ন্যায়; ভাষসে = ভাষণ দিচ্ছ অর্থাৎ বলছ; পণ্ডিতাঃ = পণ্ডিতগণ; গত = যা গত হয়েছে অর্থাৎ মৃত; অসূন্ = জীবন; অগত = যা গত হয়নি অর্থাৎ জীবিত; অনুশোচন্তি = অনুশোচনা করে।। ১১।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন — যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয়, তুমি সেই ব্যাপারে শোক করছ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের ন্যায় কথা বলছ। পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কারও জন্যই শোক করেন না।।১১।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে বলেছেন যে পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কারও জন্যই শোক করেন না। এখন জানা প্রয়োজন 'পণ্ডিত' কাকে বলে। 'পণ্ডিত' শব্দটি এসেছে 'পণ্ডা' শব্দ থেকে। 'পণ্ডা' শব্দের অর্থ হল জ্ঞান, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, শঙ্করাচার্যের মতে আত্মবিষয়ক বুদ্ধি অর্থাৎ যে বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে জানা যায় এবং সেই আত্মবিষয়ক বুদ্ধির অধিকারী যিনি তাঁকে পণ্ডিত বলা হয়— "পণ্ডা আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ যেষাং তে হি পণ্ডিতাঃ।" বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩।৫।১ মন্ত্রেও পণ্ডিত অর্থে আত্মবিষয়ক বিদ্যার অধিকারী পুরুষকে বোঝানো হয়েছে— "পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য।" সুতরাং ভগবান্ বলেছেন যে, যে সকল জ্ঞানী পুরুষ আত্মাকে সম্যক জানেন সেই পণ্ডিত পুরুষ মৃত বা জীবিত কারও জন্যই শোক করেন না। সুতরাং ভগবান্ এখানে স্পষ্ট বলেছেন যে অর্জুনের আত্মবিষয়ক কোন জ্ঞানই নাই অর্থাৎ তিনি পণ্ডিত নন। কারণ তিনি জানেন না যে আত্মার কখনও মৃত্যু নাই এবং একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কারও সত্ত্বা নাই, সমগ্র জগতই অনিত্য, নশ্বর, স্বপ্নের মত মিথ্যা। তাহলে কার জন্য শোক? আত্মার রহস্য অর্জুনের অজ্ঞাত। প্রকৃতপক্ষে দেহ একটি জড় পদার্থ, দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগ ও বিয়োগ অনিবার্য। দেহ অনিত্য কিন্তু আত্মা নিত্য। কিন্তু এসব কিছুই অর্জুন জানেন না। তথাপি অর্জুন পণ্ডিতের মত বলছেন যে যুদ্ধে কুলনাশ হয়ে গেলে কুলনারীগণ পরিচালনার অভাবে ভ্রষ্টা হয়ে যাবে, কুলে বর্ণসংকরের

জন্ম হবে, পিতৃ-পিতামহের তর্পণ ও পিণ্ডদান বন্ধ হয়ে গিয়ে নরকে পতিত হবে, যে সমস্ত স্বজনদের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে তাদেরকে ব্যতীত তাঁর রাজ্যসুখভোগ বৃথা, গুরুজনদেরকে হত্যা ক'রে সম্পদ লাভ করলে তা হবে তাঁদের রক্তরঞ্জিত সুতরাং ভোগের অযোগ্য ইত্যাদি। এসব কথা পণ্ডিতগণ ভাবেন না। তাঁরা জানেন যে শরীর অনিত্য। কাজেই এসব ভাবনা নিতান্ত অমূলক। তাছাড়া সদাচারী পিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণ পরমার্থ দৃষ্টিতে নিত্য এবং অশোচনীয়— "ভীষ্মদ্রোণাদ্বয়ঃ সদ্‌বৃত্তত্বাৎ পরমার্থরূপেণ চ নিত্যত্বাৎ তান্ অশোচ্যান্" (শাঙ্করভাষ্য ২।১১)। তথাপি অর্জুন এঁদের মৃত্যুর জন্য শোক করছে। সুতরাং অর্জুন মূঢ়।।১১।।

ন তু এব অহং জাতু ন আসং # ন ত্বং ন ইমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ # সর্বে বয়ম্ অতঃপরম্।১২।।

জাতু = কখনই; আসম্ = ছিলাম, ইমে = এই সকল; জনাধিপাঃ = রাজাগণ; অতঃপরং = এরপর; বয়ং = আমরা; ভবিষ্যামঃ = থাকব।।১২।।

অনুবাদ :- এ কথা কখনই ঠিক নয় যে ইতিপূর্বে আমি ছিলাম না বা তুমি ছিলে না বা এই সকল রাজাগণ কখনই ছিলেন না বা ভবিষ্যতেও আমরা কেউ কখনও থাকব না।।১২।।

ব্যাখ্যা :- এখানে ভগবান্ বলতে চেয়েছেন যে তিনি তো সর্বেশ্বর। সেইজন্য তিনি নিত্য অবিনাশী, সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তিনি বিদ্যমান, এই সৃষ্টির যদি কোনদিন লয়ও হয়ে যায় তাহলেও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। তেমনই অর্জুনাদির ন্যায় ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাগণও নিত্য, অবিনাশী। রামানুজাচার্যও এই শ্লোকে কৃষ্ণের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত এই অর্থই করেছেন— "যথা অহং সর্বেশ্বরঃ পরমাত্মা নিত্য ইতি ন অত্র সংশয়ঃ তথা এব ভবন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞা আত্মানঃ অপি নিত্যা।" ১২।।

দেহিনঃ অস্মিন্ যথা দেহে # কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর-প্রাপ্তিঃ # ধীরঃ তত্র ন মুহ্যতি।। ১৩।।

দেহিনঃ = দেহধারণকারীর; অস্মিন্ = এই; কৌমারং = শৈশবকাল; যৌবনং = যৌবনকাল; জরা = বার্ধক্য; দেহান্তর-প্রাপ্তিঃ = মৃত্যু; ধীরঃ = জ্ঞানিগণ; ন মুহ্যতি = শোক করেন না।। ১৩।।

অনুবাদ :- দেহধারণকারীর এই দেহে যেমন শৈশবকাল, যৌবনকাল, জরা আসে তেমনি একসময় তার অন্য দেহ লাভ হয়। জ্ঞানিগণ তার জন্য শোক করেন না।। ১৩।।

ব্যাখ্যা :- গীতার তত্ত্ব সম্যক বোঝার জন্য এই শ্লোকের একটি বিষয় খুব সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করার প্রয়োজন আছে। এখানে 'মৃত্যু' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি, ব্যবহার করা হয়েছে 'দেহান্তরপ্রাপ্তি' শব্দটি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ খুব সচেতনভাবেই 'মৃত্যু' শব্দটির পরিবর্তে 'দেহান্তরপ্রাপ্তি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এখানে দেহী বলতে জীব নয়, আত্মাকে বোঝানো হয়েছে। এই দেহের মধ্যে যিনি বাস করেন তিনি হলেন আত্মা, স্থূল আমি নই। আমি ভাড়া বাড়ীতে বাস করি। বাড়ীটি আমার নয়। আমি অপরের বাড়ীতে থাকি। তাই সেই বাড়ীর প্রতি আমার কোন মমতা নেই। সেই বাড়ী জীর্ণ হলে আমি তাকে সারানোর চেষ্টা না ক'রে অন্য বাড়ীতে উঠে যাই। অনুরূপভাবে, জড়জগতের অন্য সমস্ত বস্তুর ন্যায় দেহটির প্রতিও আত্মার কোনও মমত্ব নেই, এই দেহ জীর্ণ হলে নিতান্ত নিরাসক্তভাবে তিনি অপর দেহে স্থান পরিবর্তন করেন।। ১৩।।

মাত্রাস্পর্শাঃ তু কৌন্তেয় # শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখদাঃ।
আগম-অপায়িনঃ অনিত্যাঃ # তান্ তিতিক্ষস্ব ভারত ।। ১৪।।

মাত্রা-স্পর্শাঃ = মাত্রা শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং স্পর্শ শব্দের অর্থ হল ইহজগতের বস্তুর সঙ্গে সংযোগ; তু = বস্তুত; শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখদাঃ = শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখদায়ী; আগম = উৎপত্তি; অপায়িনঃ = বিনাশ; অনিত্যাঃ = অস্থায়ী; তিতিক্ষস্ব = সহ্য কর অর্থাৎ উপেক্ষা কর।।১৪।।

অনুবাদ :- হে কৌন্তেয়! বস্তু জগতের বিষয়সমূহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংযোগের ফলেই শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির বোধ জন্মে। এগুলি যেমন আসে তেমনই চলেও যায়। এগুলি সবই অনিত্য বা অস্থায়ী। কাজেই এগুলিকে সহ্য করার অভ্যাস কর।।১৪।।

ব্যাখ্যা :- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ লোকশিক্ষা। জীবনে যেমন আনন্দ আছে তেমনই দুঃখও আছে। একটি ঘূর্ণায়মান চক্রের ন্যায় সুখ এবং দুঃখ একবার আসে আবার চলেও যায়। কোনটি চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু

জীবনে উভয়ের আসা এবং যাওয়া সুনিশ্চিত। সেইজন্য সুখ এবং দুঃখ কোনটিরই অনুভূতিতে অতি উদ্বেলিত হওয়া বা বিমর্ষ হওয়া সমীচীন হবে না। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ তা করে না। তারা ভাবে না যে একই বস্তু একবার আনন্দের কারণ হয় আবার পরক্ষণেই তা দুঃখের কারণ হয়। কাজেই জীবনে সুখ-দুঃখ উভয়কেই সংযতভাবে গ্রহণ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে না পারলে মানুষের জীবন অন্তহীন দুঃখে পূর্ণ হয়ে যাবে। যেমন মানুষের চাকুরিজীবন তো সুখের সময়। কিন্তু কেউ যদি সেই চাকুরিটাকেই জীবনের সবকিছু ভেবে নেয়, সেই চাকুরিজীবনকে সুখের নেশায় যথেচ্ছভাবে ভোগ করতে চায় তাহলে তার যে মুহূর্তে অবসর গ্রহণ করতে হবে সেই মুহূর্ত থেকে তার জীবন কাটানোকে ভয়ানক পীড়া মনে হবে। আবার কেউ যদি কঠিন শারীরিক পীড়ার দুঃখ সহ্য করতে অপারগ হয়ে ভয়ানক কিছু ক'রে বসে তাহলে কিছুদিন পর তার সেই পীড়া ভালো হয়ে গিয়ে তার যে সুখের দিন আসার সম্ভাবনা ছিল তা দূর হয়ে গিয়ে তার পরিবারস্থ অন্যান্যদের জীবনে অন্তহীন দুঃখ নেমে আসবে। আবার কেউ যদি অর্থবান হওয়ার কারণে অতিরিক্ত মদ্যপানে আসক্ত হয়ে যায় তাহলে মদ্যপানের সময় তার তাৎক্ষণিক সুখবোধ হবে ঠিকই কিন্তু এই সুখ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী এবং কিছুদিনের মধ্যে এর কারণে তার শরীরে যখন ভয়ঙ্কর রোগ বাসা বাধবে তখন তার দুঃখের আর অবধি থাকবে না। তাই গীতায় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে জীবনে সুখ ও দুঃখকে নিতান্ত অস্থায়ী গণ্য ক'রে উভয়কেই সংযমের সাথে গ্রহণ করতে হবে।।১৪।।

যং হি ন ব্যথয়ন্তি এতে # পুরুষং পুরুষঃ ঋষভ।
সম-দুঃখ-সুখং ধীরং # সঃ অমৃতত্বায় কল্পতে।।১৫।।

ন ব্যথয়ন্তি = বিচলিত করে না; পুরুষঃ-ঋষভ = পুরুষশ্রেষ্ঠ; অমৃতত্বায় = অমৃতত্ত্ব অর্থাৎ মুক্তিলাভের; কল্পতে = উপযুক্ত হন।।১৫।।

অনুবাদ :- হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ দুঃখ ও সুখে অবিচল থাকেন এবং দুঃখ ও সুখকে সমান মনে করেন তিনি মুক্তিলাভের উপযুক্ত হন।।১৫।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে গীতা সনাতন ধর্মের একটি বৃহৎ বিষয়কে খুব সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। গীতায় যে তত্ত্বের প্রচার করা হয়েছে তার মূলকথা হল মানুষের মোক্ষলাভ। অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মে মানুষের জীবনের যে অন্তিম লক্ষ্যের কথা বলা

হয়েছে তা হল জীবনে সৎ ও পবিত্র কর্ম ক'রে স্বর্গলাভ। কিন্তু গীতোক্ত ধর্ম মানুষের জীবনের আদর্শ হিসাবে স্বর্গলাভকে নয়, তার থেকে আরও এগিয়ে মোক্ষলাভকে উপস্থাপিত করেছে। মানুষ জীবনকে পবিত্র কর্মে ব্যয় করলে তার প্রতিদানস্বরূপ স্বর্গ লাভ করেন যেখানে কোন দুঃখ নেই, কষ্ট, বেদনা নেই, আছে কেবল অসীম অন্তহীন পবিত্র আনন্দ। কিন্তু এই স্বর্গ লাভকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ব'লে গীতা বিবেচনা করেন না কারণ স্বর্গেও ভোগের একটা বিষয় থেকে যায়— অন্তহীন সুখভোগ। অন্তরে ভোগবাসনা থাকলে আত্মার কখনও মুক্তি হয় না, তাকে আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়। আর পুনর্জন্ম হলে পুনরায় সুখ-দুঃখের চক্রে আবর্তন। এই অবস্থার হাত থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন মোক্ষলাভের। মোক্ষলাভ হলে জীবাত্মাকে আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়তে হয় না। মোক্ষলাভের জন্য প্রয়োজন সৎ ও বৈরাগ্যময় কর্ম অনুষ্ঠান ও সৎ জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সুখ ও দুঃখকে সমান চোখে দেখা যাতে কোনটার প্রতি মনে বাসনা না জন্মে, কোনকিছু না পাওয়ার জন্য অন্তর ব্যথিত না হয়। আর মনে বাসনা না থাকলে সৎ কর্ম অনুষ্ঠান ও সৎ জীবন যাপনের মাধ্যমে জীবাত্মা স্বর্গের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে মোক্ষলোকে স্থায়ী আসন পেতে পারে। বস্তুত গীতার এই শিক্ষার প্রতি যদি জগতের সমস্ত মানুষ অনুপ্রাণিত হতে পারে তাহলে পৃথিবী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর স্থানে পরিণত হয়ে উঠবে। কারণ এই শিক্ষার ফলে পৃথিবীতে আর অন্যায়-অত্যাচার থাকবে না, কোন কলুষতা থাকবে না, পরস্ব অপহরণের কোন প্রয়াস থাকবে না, মানুষের মধ্যে কেবল থাকবে সততা, পবিত্রতা এবং আসক্তিবিহীন ভোগ। অন্যান্য অনেক ধর্মে বলা হয়েছে মানুষ ভাল কাজ ক'রে স্বর্গে গেলে সেখানে নানান ভোগ্য বস্তু লাভ করে। কিন্তু গীতায় এর বিরোধিতা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে স্বর্গই মানুষের প্রকৃত অন্তিম লক্ষ্য নয়, মানুষের লক্ষ্য হতে হবে স্বর্গের গণ্ডি ছাড়িয়ে আর এক জগৎ — মোক্ষ, যেখানে থাকবে না কোন সুখলাভের বাসনা, লাভ-ক্ষতির কোন বোধ। আর এটি পেতে গেলে মানুষের প্রয়োজন গীতোক্ত উপর্যুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত নৈতিক জীবন যাপন।। ১৫।।

ন অসতো বিদ্যতে ভাবো # ন অভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োঃ অপি দৃষ্টঃ অন্তঃ # তু অনয়োঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ।।১৬।।

অসতঃ = সৎ শব্দের অর্থ নিত্য। সুতরাং অসৎ শব্দের অর্থ নশ্বর বা অনিত্য; ভাবঃ = সত্ত্বা; ন বিদ্যতে = নাই; সতঃ = অস্তিত্বযুক্ত, নিত্য; অভাবঃ = নাশ; ন বিদ্যতে = হয় না; উভয়োঃ = সৎ ও অসৎ উভয়ের; অনয়োঃ = তাদের; দৃষ্টঃ = দেখেছেন; তত্ত্বদর্শিভিঃ = তত্ত্বজ্ঞানিগণ।। ১৬।।

অনুবাদ :- অসৎ বস্তুর ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব থাকে না আবার সৎ অর্থাৎ নিত্য বস্তু বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। তত্ত্বজ্ঞানিগণ কিন্তু এই সৎ এবং অসৎ উভয় বস্তুর সমস্তটাই সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন।।১৬।।

ব্যাখ্যা :- সাধারণ সমাজে সৎ ও অসৎ শব্দের যে অর্থ প্রচলিত আছে শাস্ত্রে এই শব্দদুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। শাস্ত্রে সৎ শব্দের অর্থ হল চির অবিনাশী, নিত্য, অব্যয় আত্মা অর্থাৎ শাস্ত্রানুযায়ী আত্মাই হল একমাত্র সৎ বস্তু আর অবশিষ্ট সমস্ত কিছুই হল অসৎ অর্থাৎ বিনাশশীল। একথায় যার শরীর আছে সে অসৎ অর্থাৎ নশ্বর বা বিনাশশীল এবং যার শরীর নাই সে সৎ অর্থাৎ যার কোন অবস্থাতেই কোন প্রকারেই কোন পরিবর্তন হয় না সেই বস্তুই হল সৎ। বিষ্ণুপুরাণে এই কথাই বলা হয়েছে—

যৎ তু কালান্তরেণাপি নান্যাং সংজ্ঞামুপৈতি বৈ।
পরিণামাদিসম্ভূতং তদ্বস্তু নৃপ তচ্চ কিম্।।

২।১৩।৯৫

সুতরাং দেহ হল অসৎ আর দেহী যিনি এই দেহের মধ্যে বাস করছেন তিনিই হলেন সৎ। জ্ঞান হল সৎ কারণ কোন অবস্থাতেই তার পরিবর্তন হয় না। এই জগৎ প্রপঞ্চের যা কিছু চোখে দেখা যায় সবই নশ্বর সুতরাং অসৎ কিন্তু এই দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চের অন্তরালে যে অব্যক্ত, অদৃশ্য, অক্ষর, অবিনাশী পরমেশ্বর সদা বিরাজমান তিনি সৎ।। ১৬।।

অবিনাশি তু তৎ বিদ্ধি # যেন সর্বম্ ইদং ততম্
বিনাশম্ অব্যয়স্য অস্য # ন কশ্চিৎ কর্তুম্ অর্হতি।। ১৭।।

যেন = যার দ্বারা; ততং = পরিব্যাপ্ত; অবিনাশি = বিনাশরহিত; বিদ্ধি = জানবে; অব্যয়স্য = ক্ষয়বিহীন; বিনাশং = ধ্বংস; কর্তুং = করতে; ন অর্হতি = পারে না।।১৭।।

অনুবাদ :- জেনে রেখো আত্মা এই বিশ্ব চরাচরের সর্বত্রই বিরাজ করছেন এবং তিনি নিত্য, চির অবিনাশী। কেউই কখনই কোনভাবেই সেই অব্যয় আত্মাকে ধ্বংস করতে পারে না।। ১৭।।

ব্যাখ্যা :- ব্যাকরণে অব্যয় বলা হয় সেই সকল ধ্বনিকে যাদের বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ ও কারকভেদে কোন রকম পরিবর্তন হয় না, তাদের রূপ সর্বদাই একই থাকে যেমন — যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং প্রভৃতি। ব্যয় শব্দের অর্থ খরচ, ক্ষয় প্রভৃতি। এই শব্দটির পূর্বে নঞর্থক উপসর্গ 'অ' যুক্ত হলে তার অর্থ হয় অব্যয় অর্থাৎ ব্যয় বা ক্ষয় বিহীন। আত্মাকে অব্যয় বলা হয় কারণ আত্মার কোন অবস্থাতেই ক্ষয় বা পরিবর্তন হয় না, আত্মা সকল অবস্থাতেই অপরিবর্তনশীল।।১৭।।

অন্তবন্ত ইমে দেহা # নিত্যস্য উক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য # তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।।১৮।।

অন্তবন্ত = বিনাশশীল; নিত্যস্য = চির অপরিবর্তনশীল; শরীরিণঃ = আত্মার; অনাশিনঃ = বিনাশরহিত; অপ্রমেয়স্য = সীমাহীন; যুধ্যস্ব = যুদ্ধ কর।।১৮।।

অনুবাদ :- আত্মা চির-অপরিবর্তনশীল, বিনাশরহিত, স্বপ্রকাশ। তিনি যে দেহসকল ধারণ ক'রে আছেন সেগুলি নশ্বর। সেইজন্য হে ভারত! যুদ্ধ কর।।১৮।।

ব্যাখ্যা :- এখানে বলা হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে দেহ হল একটি জড় পদার্থ। তার ভিতরে আত্মা অবস্থান করেন তাই তাকে সজীব, চলমান বোধ হয়। যে মুহূর্তে দেহের মধ্য থেকে আত্মা নির্গত হবেন ঠিক সেই মুহূর্তে এই দেহের জড়ত্ব সকলের দৃষ্টিগোচর হবে। যেমন দেখা যায় যে সমুদ্রের তলদেশে অনেক সময় মৃত শামুকের খোলার মধ্যে কাঁকড়া আশ্রয় নেয়। যখন কাঁকড়াটি চলে বেড়ায়

তখন খোলাটিকে একটি সজীব চলমান শামুক ব'লে বোধ হয়। কিন্তু যেই কাঁকড়াটি সেই খোলাটি পরিত্যাগ ক'রে অন্য খোলে আশ্রয় নেয় সেই মুহূর্তেই মানুষের ভ্রম দূর হয়ে বোধ হয় যে এতক্ষণ যাকে সে সজীব পদার্থ মনে করছিল আসলে সেটি একটি মৃত শামুকের প্রাণহীন খোলা । এখন যদি কেউ এই খোলাটি ধ্বংস করে তাহলে তাকে হত্যার দোষে দায়ী করা যায় না। সেইজন্য দেহের বিনাশ ঘটালে কোন পাপ বা অন্যায় হয় না। যে মুহূর্তেই দেহটিকে ধ্বংস করা হবে ঠিক সেই মুহূর্তেই আত্মা দেহ থেকে অক্ষত অবস্থায় নির্গত হয়ে যাবে কারণ আত্মাকে কখনও ধরা যায় না, ছিন্ন করা যায় না, দগ্ধ করা যায় না, ক্ষয় বা ক্ষতিসাধন করা যায় না এবং আত্মার সম্মতি ব্যতীত দেহেরও কোন ক্ষতিসাধন করা যায় না। কাজেই মায়ার প্রভাবে যে দেহকে সজীব ব'লে ভ্রম হয় তাকে ধর্ম অর্থাৎ শুভ উদ্দেশ্যে কর্তব্য পালনের কারণে বিনষ্ট করলে কোন অন্যায় বা পাপ হয় না। যেমন একজন খুনী যে জীবনে অনেক হত্যা করেছে সে সমাজে ছাড়া থাকলে আরও অনেককে হত্যা করবে। সেইজন্য সমাজ রক্ষার তাগিদে তাকে বিচার বিভাগীয় পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাণদণ্ড প্রদান করলে কোন অপরাধ হয় না। সেজন্য ভগবান্ অর্জুনকে বলতে চেয়েছেন যে ধর্ম প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে কোন মতেই পাপ হবে না কারণ দেহগুলি নশ্বর, কিন্তু দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মার কোনদিন লয় নাই, আত্মা চির অক্ষয়, চির অবিনাশী।।।১৮।।

য এনং বেত্তি হন্তারং # যঃ চ এনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো # ন অয়ং হন্তি ন হন্যতে।।১৯।।

এনং = এঁকে অর্থাৎ আত্মাকে; বেত্তি = মনে করে; হন্তারং = হত্যাকারী; মন্যতে = মনে করে; হতং = নিহত; ন বিজানীতঃ = জানে না; অয়ং = ইনি অর্থাৎ আত্মা; ন হন্তি = হত্যা করেন না; ন হন্যতে = নিহত হন না।।১৯।।

অনুবাদ :- যারা ভাবে যে আত্মা হত্যা করেন অথবা যারা ভাবে যে আত্মাকে হত্যা করা যায়, তারা উভয়েই জানে না যে আত্মা কাউকেই হত্যা করেন না বা কেউ আত্মাকে হত্যাও করতে পারে না।।১৯।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে হিংসাত্মক হন্ ধাতু ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এখানে এর দ্বারা আত্মাকে নাশ করা বোঝানো হয়নি। আত্মা পদার্থ বিজ্ঞানের অণুর

ন্যায় এত সূক্ষ্ম যে তাকে ছেদন করা যায় না। তাহলে আত্মাকে ছেদন করা না গেলে তাকে হত্যা বা নাশ করা যাবে কি ভাবে? উত্তর হল যে আত্মার অতিসূক্ষ্মতার কারণে তাকে ছেদন করা সম্ভব নয় যেমন পদার্থবিজ্ঞানের অণু এত ক্ষুদ্র যে তাকে আর ছেদন করা যায় না। সুতরাং আত্মাকে হত্যা বা নাশ করাও সম্ভব নয়। সুতরাং আত্মার মৃত্যু নাই। দেহকে ভোগাদিতে লিপ্ত করতে হলে দেহে আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু তাহলে সেই দেহ নষ্ট হলে আত্মার অবস্থান কি হয়? উত্তরে বলা যায় যে পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় যেমন অনেক অণুর সমন্বয়ে একটি পদার্থ গড়ে ওঠে কিন্তু সেই পদার্থটি নষ্ট হলেও অণুগুলি নষ্ট হয় না, তারা সেই পদার্থ থেকে অক্ষত অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং একসময় আবার নূতন পদার্থ গঠন করে। ঠিক তেমনই দেহ নষ্ট হয়ে গেলে আত্মা বিনষ্ট হয় না, সে সেই দেহ থেকে অক্ষত অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হয়ে নূতন দেহ ধারণ করে। পদার্থের অণু পদার্থটিকে ধ্বংস করার ভূমিকা গ্রহণ করে না। সে কেবল পদার্থটি নষ্ট হলে পদার্থটি থেকে বিযুক্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে আত্মাও কাউকে হত্যা করে না। দেহ নষ্ট হলে সেও নূতন দেহ ধারণের নিমিত্ত সেই দেহ থেকে বিযুক্ত হয়ে যায়। একটি মোতির মালা থেকে মোতিকে বিযুক্ত করলে মালার অস্তিত্ব থাকে না ঠিকই কিন্তু এই বিযুক্তিকরণের ফলে মোতিগুলি অক্ষত অবস্থায় স্বতন্ত্র অবস্থান করে এবং পুনরায় নূতন মালা গাঁথা হলে সেই মোতি আবার সেই নূতন মালাতে অবস্থিত হয়। আত্মা অর্থাৎ দেহীর সঙ্গে দেহের সম্পর্কও অনুরূপ। বেদে বলা হয়েছে— ‘‘মা হিংসাৎ সর্বাভূতানি’’ অর্থাৎ কাউকেই হিংসা করবে না। সুতরাং আত্মা কাউকেই হিংসা করে না এবং বিনাশও করে না। সুতরাং এখানে হন্ ধাতু শরীর থেকে আত্মার বিয়োগ সম্বন্ধীয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে, আত্মার দ্বারা কাউকে হত্যা করা অর্থে নয়। রামানুজাচার্যও এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই কথাই বলেছেন--- ‘‘হন্তিধাতুঃ অপি আত্মকর্মকঃ শরীরবিয়োগকরণবাচী’’। অর্থাৎ ‘হন্তি’ ধাতু ও ‘বিয়োগ’ দুটিই বাচক শব্দ অর্থাৎ উভয়েই একই ‘বিযুক্ত’ করা অর্থ প্রকাশ করছে। অনেকে বলতে পারেন যে দেহ থেকে আত্মাকে বিযুক্ত করলে তো হত্যা করাই হয়। কিন্তু সেটি ঠিক নয়। মায়ের কোলে শিশু আছে। শিশুকে মায়ের কোল থেকে বিযুক্ত ক’রে তাকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হল। সেক্ষেত্রে তো কারোরই মৃত্যু হল না। সুতরাং বিযুক্ত করা মানেই হত্যা করা নয়।। ১৯।।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
ন অয়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতঃ অয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।। ২০।।

ন জায়তে = জন্মগ্রহণ করেন না; ম্রিয়তে = মারা যান; অয়ং = ইনি অর্থাৎ আত্মা; ভূত্বা = জন্মগ্রহণ ক'রে; ভবিতা = উৎপন্ন হন; ভূয়ঃ = উৎপন্ন হয়েছেন; অজঃ = জন্মরহিত, নিত্যঃ = চিরস্থায়ী; শাশ্বতঃ = চিরন্তন; পুরাণঃ = অনাদি; ন হন্যতে = হত হন না; হন্যমানে = বিনষ্ট হলেও।। ২০।।

অনুবাদ:- ইনি অর্থাৎ আত্মা অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান। তিনি জন্মরহিত, চিরস্থায়ী, চিরন্তন। তিনি কখনও জন্মগ্রহণ করেন না বা তাঁর কখনও মৃত্যু হয় না অথবা জন্মগ্রহণের পর তিনি অস্তিত্ব লাভ করেন না। তিনি চিরদিনই আছেন। তিনি যে দেহ ধারণ ক'রে আছেন সেই দেহ বিনষ্ট হলেও তাঁর বিনাশ ঘটে না।। ২০।।

ব্যাখ্যা:- আত্মার স্বরূপ বিষয়ে পূর্ববর্তী শ্লোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আত্মা হল ঐশ্বরিক সূক্ষ্ম শক্তি যাকে কখনও সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না যেমন পদার্থ বিদ্যার ব্যাখ্যা অনুযায়ী আণবিক শক্তির ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। সৃষ্টির আদি থেকেই এই আণবিক শক্তি অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান, কেবল তার রূপান্তর ঘটে থাকে, তাকে নূতনভাবে সৃষ্টি করা যায় না বা তাকে ধ্বংসও করা যায় না, সৃষ্টির একেবারে আদি থেকে সে আছেই, তার অস্তিত্ব লাভের জন্য তাকে নূতনভাবে সৃষ্টি হতে হয় না, এই শক্তি আদি, অবিনাশী, অব্যয়। তদ্রূপ ঐশ্বরিক সূক্ষ্ম শক্তি আত্মাও অক্ষর, শাশ্বত, আদি, অবিনাশী, অব্যয়, তাঁর সৃষ্টিও নাই, লয়ও নাই, তিনি সৃষ্টির পূর্ব থেকেই বিদ্যমান, তিনি সর্বপ্রকার বিকার রহিত, সৃষ্টির প্রারম্ভে জন্ম ও প্রলয়ের অন্তে মৃত্যু আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না — "কল্পাদৌ জননং কল্পান্তে চ মরণম্ আত্মানং ন স্পৃশতি" (রামানুজভাষ্য ২।২০)। ফলে দেহের লয়প্রাপ্তির সঙ্গে আত্মা লয়প্রাপ্ত হয় না। কেবল তার দেহান্তর অর্থাৎ রূপান্তর ঘটে মাত্র।।২০।।

বেদ অবিনাশিনং নিত্যং # য এনম্ অজম্ অব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ # কং ঘাতয়তি হন্তি কম্।। ২১।।

বেদ = জানেন; অবিনাশিনং = বিনাশরহিত; নিত্যং = চিরস্থায়ী; অজম্ = জন্মরহিত; অব্যয়ম্ = ক্ষয় বিহীন; ঘাতয়তি = হত্যা করবেন; হন্তি = হত্যা করাবেন; কম্ = কাকে।। ২১।।

অনুবাদ :- হে পার্থ ! যিনি জানেন যে আত্মা বিনাশরহিত, চিরস্থায়ী, জন্মরহিত, ক্ষয়বিহীন তিনি কিভাবে কাকে হত্যা করবেন আর কাকে হত্যা করাবেন? ।। ২১।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকের সহজ কথায় ব্যাখ্যা করলে বলা যায় যে স্বয়ং কৃষ্ণ জানেন যে আত্মাকে কখনও বধ করা যায় না, তিনি তো নিত্য, অবধ্য এবং দেহ নশ্বর এবং প্রকৃতির কারণে একদিন না একদিন আপনা আপনিই দেহের নাশ হবেই। তাহলে তিনি সকল জীবের অন্তরে সেই আত্মাকে কেন হত্যা করার প্রয়াস করবেন? তাঁর সেই প্রয়াস তো ব্যর্থ বা হাস্যকর ও তাঁর সম্মানহানিকর হবে। সেইজন্য তাঁর পক্ষে কাউকে হত্যা করার কোন প্রশ্নই নেই। আবার তিনি যদি অপরকে হত্যা করার জন্য কাউকে নিয়োগ করেন তাও উপর্যুক্ত কারণে সম্ভব নয়। কারণ যে কাজ করা আদৌ সম্ভব নয় সেই কাজ করার চেষ্টা তো মূর্খতা ব্যতীত কিছুই নয় এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সকলের সামনে মূর্খ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবেন এই চিন্তাও অযৌক্তিক। সেই জন্য অর্জুনের এটা ভাবা সমীচীন নয় যে সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কাউকে হত্যা করবেন বা কৌরবদের হত্যা করার জন্য অর্জুনকে প্ররোচিত করছেন।। ২১।।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় # নবানি গৃহ্ণাতি নরঃ অপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি # অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। ২২।।

বাসাংসি = পরিধেয় বস্ত্রসকল; জীর্ণানি = জীর্ণ; বিহায় = পরিত্যাগ ক'রে; গৃহ্ণাতি = পরিধান করে; অন্যানি = অন্য; সংযাতি = আশ্রয় করে; দেহী = আত্মা।।২২।।

অনুবাদ :- যেমন মানুষ জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্রসকল পরিত্যাগ ক'রে অন্য নূতন

বস্ত্র পরিধান করে সেই রকম দেহী অর্থাৎ আত্মা সেই দেহ জীর্ণ হলে তাকে পরিত্যাগ ক'রে অন্য নূতন শরীর আশ্রয় করে।।২২।।

ব্যাখ্যা :- এখানে বলা হয়েছে যে মানুষ যেমন জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্রসকল পরিত্যাগ ক'রে অন্য নূতন বস্ত্র পরিধান করে সেই রকম দেহী অর্থাৎ আত্মা দেহ জীর্ণ হলে দেহকে পরিত্যাগ ক'রে অন্য নূতন শরীর আশ্রয় করে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন — সত্যই কি মানুষ বস্ত্র জীর্ণ হলে তবেই সেই বস্ত্র পরিত্যাগ করে? সত্যই কি তদ্রূপ আত্মা দেহ জীর্ণ হলে তবেই সেই দেহ পরিত্যাগ করে? বাস্তবে দেখা যায় যে বিত্তশালী ব্যক্তিগণ পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণ হওয়ার আগেই তাকে পরিত্যাগ ক'রে নূতন বস্ত্র পরিধান করে এবং দরিদ্র মানুষজন তাদের পরিধেয় বস্ত্র শতচ্ছিন্ন হওয়ার পর তাকে পরিত্যাগ করে। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে অনেক জীব শৈশব, কৈশোর বা যৌবনে যখন তাদের শরীর শক্ত-সমর্থ থাকে তখন তারা পরলোক গমন করে কিন্তু অনেকে অতি বৃদ্ধকালে শরীর ভয়ানকভাবে অশক্ত হলে তারপর ইহলোক ত্যাগ করে। তাহলে বস্তু বা দেহ জীর্ণ হলে তবেই নূতন বস্ত্র পরিধান বা নূতন দেহ আশ্রয়ের তত্ত্ব কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? আসলে এই শ্লোকে 'জীর্ণ' শব্দটির দ্বারাই জনমানসে ভ্রমের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে 'জীর্ণ' শব্দটি ক্ষয়প্রাপ্ত এই প্রচলিত স্থূল বস্তুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এখানে 'জীর্ণ' শব্দটি ভোগজীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। বাস্তব জগতে অনেক বস্তু আছে যেগুলিকে একবার মাত্র ব্যবহার করেই পরিত্যাগ করতে হয় আবার একই পর্যায়ভুক্ত অন্য বস্তু আছে যেগুলিকে বহুবার ব্যবহার করা যায়। প্রথম বস্তুটি একবার ব্যবহারের পরেই সেটি ভোগজীর্ণ হয়ে যায় ফলে সেটি আপাতদৃষ্টিতে অক্ষত মনে হলেও তাকে পরিত্যাগ করতে হয় কিন্তু দ্বিতীয়টি বহুবার ব্যবহারের পর ভোগজীর্ণ হয়। সুতরাং বহুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর দ্বিতীয়টিকে পরিত্যাগ করা হয়। ফলে এই শ্লোকে জীর্ণ শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে প্রত্যেকেই যে পরিমাণ ভোগ জন্মসূত্রে নিয়ে আসে সেই ভোগ শেষ হলেই তাঁর দেহ ভোগজীর্ণ হয়ে পরে এবং তাকে তখন সেই দেহ পরিত্যাগ করতে হয়। এখানে দেহটি নবীন না পুরাতন সেটি বিচার্য বিষয় নয়।।২২।।

ন এনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি # ন এনং দহতি পাবকঃ।
ন চ এনং ক্লেদয়ন্তি আপো # ন শোষয়তি মারুতঃ।। ২৩।।

ন ছিন্দন্তি = ছিন্ন করতে পারে না; শস্ত্রাণি = শস্ত্রসমূহ; ন দহতি = দহন করতে পারে না; পাবকঃ = অগ্নি; ন ক্লেদয়ন্তি = সিক্ত করতে পারে না; আপঃ = জল; ন শোষয়তি = শোষণ করত পারে না; মারুতঃ = বায়ু।। ২৩।।

অনুবাদ :- শস্ত্রসমূহ এঁকে ছিন্ন করতে পারে না, অগ্নি এঁকে দহন করতে পারে না, জল এঁকে সিক্ত করতে পারে না এবং বায়ু এঁকে শোষণ করতে পারে না।।২৩।।

অচ্ছেদ্যঃ অয়ম্ অদাহ্যঃ অয়ম্ # অক্লেদ্যঃ অশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুঃ # অচলঃ অয়ং সনাতনঃ।। ২৪।।

অছেদ্যঃ = ছেদন করা যায় না; অদাহ্যঃ = দাহ করা যায় না; অক্লেদ্যঃ = সিক্ত করা যায় না; অশোষ্যঃ = শোষণ করা যায় না; নিত্যঃ = অবিনশ্বর; সর্বগতঃ = সর্বব্যাপী; স্থাণুঃ = স্থির; অচলঃ = অনড়; সনাতন = চিরন্তন।।২৪।।

অনুবাদ :- এই আত্মাকে ছেদন করা যায় না, দাহ করা যায় না, সিক্ত করা যায় না, শোষণ করা যায় না এবং নিশ্চিতরূপেই এই আত্মা অবিনশ্বর, সর্বব্যাপী, স্থির, অনড়, চিরন্তন।। ২৪।।

ব্যাখ্যা :- আমরা দেখেছি যে ভগবান্ পূর্বেই বলেছেন যে আত্মা অবিনাশী। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে সেই আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে সেই একটি কথাই তো যথেষ্ট ছিল। তাহলে পরপর এতগুলি শ্লোকে বিভিন্নভাবে সেই একটি কথারই পুনরাবৃত্তি করার কি প্রয়োজন ছিল? এখানে গীতা তো পুনরুক্তি দোষদুষ্ট হয়ে পড়ল! কিন্তু বিষয়টি সে রকম নয়। সর্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্যক জানেন যে আত্মতত্ত্ব বড়ই দুর্বোধ্য এবং সাধারণের পক্ষে সহজে তার মর্মার্থ অনুধাবন করা বড়ই দুষ্কর। সেই জন্য তিনি একাদিক্রমে পরপর বিভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে বিষয়টিকে সাধারণের কাছে বোধগম্য করার প্রয়াস করেছেন যাতে কোন না কোন একটি প্রসঙ্গ সাধারণ মানুষের হৃদয় বা বুদ্ধিকে স্পর্শ করতে পারে এবং সেই অতি দুরূহ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধিতে মানুষ সফল হয়। যেমন একটি কঠিন প্রস্তরকে ভাঙতে গেলে একটি আঘাতই যথেষ্ট হয় না, পরপর কয়েকটি আঘাত

দিলে তবেই সেই কঠিন প্রস্তর খণ্ড খণ্ড হয়, তেমনই মানুষের অন্তরে অজ্ঞানতার যে কঠিন প্রস্তর যুগযুগান্তর ধরে জমা হয়ে থাকে তাকে ভাঙতে গেলে পরপর অনেক প্রয়াস করতে হয় যাতে একটি না একটি প্রয়াস সফল হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অন্তর থেকে মোহের গভীর অন্ধকার দূর করার জন্য এইভাবেই ক্রমান্বয়ে প্রচেষ্টা করেছেন। ফলে এখানে কোন ভাবেই পুনরুক্তি দোষ ঘটেনি।।২৪।।

অব্যক্তঃ অয়ম্ অচিন্ত্যঃ অয়ম্ # অবিকার্যঃ অয়ম্ উচ্যতে।
তস্মাৎ এবং বিদিত্বা এনং # ন অনুশোচিতুম্ অর্হসি।।২৫।।

অব্যক্তঃ = প্রকাশিত নন অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন; অচিন্ত্যঃ = চিন্তার দ্বারা তাঁর তত্ত্ব বা স্বরূপ বোঝা যায় না; অবিকার্যঃ = নির্বিকার; বিদিত্বা = জেনে; অনুশোচিতুম্ = শোক করা; ন অর্হসি = উচিত নয়।। ২৫।।

অনুবাদ :- ইনি (এই আত্মা) অব্যক্ত অর্থাৎ তিনি প্রকাশিত নন অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, চিন্তার দ্বারা তাঁর তত্ত্ব বা স্বরূপ বোঝা যায় না, ইনি নির্বিকার। সেই জন্য তাঁকে এইরূপ জেনে শোক করা উচিত নয়।।২৫।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে আত্মা অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশিত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, তিনি অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তার দ্বারা তাঁর তত্ত্ব বা স্বরূপ বোঝা যায় না এবং তিনি অবিকারী অর্থাৎ পরিবর্তনহীন। পূর্বের শ্লোকগুলিতে বলা হয়েছে যে আত্মাকে ছেদন করা যায় না। বস্তুজগতে যে সমস্ত পদার্থকে ছেদন করা যায় সেগুলিকেই কেবল দেখা যায় অর্থাৎ তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু যেহেতু আত্মাকে ছেদন করা যায় না তাই তিনি প্রকাশিত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, সুতরাং অব্যক্ত। আবার বস্তুজগতের দৃশ্যমান পদার্থগুলি দেখা যায় ব'লে সেগুলি সম্পর্কে চিন্তা করা যায়। কিন্তু আত্মা যেহেতু অব্যক্ত সেই হেতু প্রচলিত পদ্ধতির মাধ্যমে তাকে চিন্তা করা যায় না। সেইজন্য তিনি অচিন্ত্য সুতরাং নির্বিকার।

গীতায় এখানে আমাদের দেহ এবং তার ভিতরে বসবাসকারী আত্মার স্বরূপ আরও সরলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে আমাদের দেহ নিতান্তই নশ্বর এবং আত্মা চিরস্থায়ী। বস্তুত জীবদেহ মূল্যহীন এবং এই দেহে কাগজের মোড়কের ভিতর সোনার গহনার ন্যায় বাস করেন আত্মা। যতক্ষণ

তার মধ্যে আত্মা আছেন ততক্ষণ তার মূল্য, কিন্তু আত্মা দেহ থেকে নির্গত হলেই সেই দেহ মূল্যহীন আবর্জনার সমতুল্য। কাগজের মোড়কের ভিতর থেকে সোনার গহনাটি বের করে নিয়ে মোড়কটিকে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করলে মোড়কটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করা যেমন অর্থহীন, তেমনই দেহের মধ্য থেকে আত্মা নির্গত হয়ে গেলে সেই দেহের জন্য শোক করাও অর্থহীন। একজন অবোধ শিশুর নিকট মোড়কের ভিতর গহনাটি আকর্ষণীয় নয়, মোড়কটির সুদৃশ্য অবয়বটি তার নিকট আকর্ষণের বস্তু, সেটিকে সে কিছুতেই ছাড়তে চায় না, কিন্তু তার ভিতরের দামী গহনাটি কেউ নিয়ে নিলে তাতে তার কোন কিছুই বোধ হয় না। কিন্তু যখন তার বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় তখন সে বুঝতে পারে প্রকৃত সত্য কি এবং তখন সে আর ছেঁড়া প্যাকেটের জন্য দুঃখ করে না। একইভাবে যতক্ষণ ঐ অবোধ বালকটির ন্যায় মানুষের হৃদয় এবং অন্তর মায়ার প্রভাবে অবিদ্যা, অজ্ঞতার কারণে অন্ধ থাকে ততক্ষণ সে মনে করে জীবের দেহটিই একমাত্র সত্য এবং সেই দেহের মধ্যে যে আত্মা বাস করেন সে সম্পর্কে সে চিন্তা করে না কারণ সে তখন এ বিষয়ে অজ্ঞ। শিশুটি জানে না যে কাগজের মোড়ক থেকে গহনাটি বের ক'রে নিলে গহনাটি নষ্ট হয়ে যায় না, বরং তা কোন আরও ভালো স্থানে সংরক্ষিত হয়। একইভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিরা জানে না যে যখন তার দেহের মৃত্যু হয় তখন আত্মা বিনষ্ট হন না বরং তিনি তাঁর আরও ক্রিয়াকলাপের নিমিত্ত অন্য শরীর ধারণ করেন। কিন্তু যখনই এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্যের উজ্জ্বল আলোক দ্বারা সেই ব্যক্তির মন থেকে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হয়ে তার অন্তরে প্রকৃত সত্যের উদয় হয় তখনই সে বুঝতে পারে যে জীবাত্মার মোক্ষলাভ না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর এই চক্রের আবর্তন চলেছে, তার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই এবং এই জ্ঞান লাভের পর আর তার আপাতদৃষ্টিতে স্থূল দেহের মৃত্যু দেখে মিথ্যা শোক করা উচিত নয়। আত্মা দুই প্রকার— একপ্রকার আত্মা হল পরমাত্মা যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, যিনি এই বিশ্বচরাচরকে ধারণ ক'রে আছেন। তিনি শাশ্বত, অবিনশ্বর। আর এক প্রকার আত্মা হল জীবাত্মা যিনি এই জগৎ প্রপঞ্চের সকল চেতন পদার্থের মধ্যে অবস্থান করেন। তিনি কে বা তাঁর স্বরূপ কি? তিনি হলেন আমাদের চেতনা— এই যে আমরা খাই, ঘুমাই, চলা-ফেরা করি, 'আমার আমার' ব'লে অহমিকা প্রকাশ করি, হাসি, কাঁদি,

দুঃখ অনুভব করি, আনন্দ পাই, মায়ার দ্বারা অবশ হয়ে অসত্য এই জগতটাকেই সত্য ভেবে নিয়ে নিরন্তর তার প্রতি আসক্তি, মমতায় ডুবে থাকি তাদের সমস্তেরই পিছনে কাজ করে এক অব্যক্ত অন্তর্লীন চেতনা। এই অব্যক্ত অন্তর্লীন চেতনাই হল জীবাত্মা। চেতনা হল দুই প্রকার— মায়াগ্রস্ত অসংযত চেতনা ও সংযত চেতনা। এই চেতনা যতদিন অসংযত থাকবে, প্রকৃত সত্যের আলোক থেকে বঞ্চিত থাকবে ততদিন সে সাদাকে কালো দেখবে আর কালোকে সাদা। আর যেই সেই অসংযত চেতনা জ্ঞানের আলোকে সুস্নাত হবে তখনই তার উত্তরণ ঘটবে এবং তখন জীবদেহে বিদ্যমান চেতনারূপী এই জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে মোক্ষলাভ করবে। দেহের মৃত্যু হলেও এই চেতনারূপী আত্মার মৃত্যু হয় না। পরমাত্মা যেমন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, জীবাত্মাও তেমনই ছড়িয়ে আছে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা- উপশিরায়, নাড়ীতে-ধমনীতে। এই চেতনারূপী আত্মার যে মৃত্যু হয় না তার প্রমাণ হিসাবে আমরা দেখি যে দেহের মৃত্যুর পরেও দীর্ঘক্ষণ দেহের অভ্যন্তরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সক্রিয়, সজাগ থাকে এবং দেহের মৃত্যুর পরেও সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অপরের দেহে নিরাপদে ব্যবহার করা যায় এবং তার পরও তারা অনেকদিন স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়া ক'রে চলে। কিন্তু এ তো গেল স্থূল বিষয়। বৃহত্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বলা যায় যে দেহের যে সামগ্রিক চেতনা, তার মৃত্যু দেহের মৃত্যুর সঙ্গে ঘটে না, দেহের মৃত্যুর পর এই চেতনারূপী আত্মা অপর দেহে সঞ্চরিত হয়। এই পরম সত্য অবগত হলে কারও পক্ষে অপরের মৃত্যুর জন্য শোক করা উচিত নয়।।২৫।।

অথ চ এনং নিত্যজাতং # নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো # ন এনং শোচিতুম্ অর্হসি।।২৬।।

নিত্যজাতং = নিয়ত জন্মশীল; নিত্যং মৃতম্ = নিয়ত মরণশীল; শোচিতুম্ = বিলাপ করা; ন অর্হসি = উচিত হবে না।।২৬।।

অনুবাদ :- হে পরম পরাক্রমশালী অর্জুন! কিন্তু তুমি যদি এই আত্মাকে নিয়ত জন্মশীল অথবা নিয়ত মরণশীল মনে কর এবং তা সত্ত্বেও যদি তুমি এই আত্মার নিমিত্ত বিলাপ কর সেটা উচিত নয়।।২৬।।

ব্যাখ্যা :- এখানে ভগবান্ অর্জুনকে বলতে চেয়েছেন যে অর্জুন যদি মনে করেন যে প্রতিটি দেহের আত্মা ভিন্ন এবং প্রতিটি দেহের জন্মের সঙ্গে প্রতিটি আত্মার জন্ম হয় তাহলেও তো মৃত্যুর জন্য অর্জুনের শোক করা উচিত নয় কারণ পৃথিবীর যে কোন বস্তুরই জন্ম হলে তার মৃত্যুও নিশ্চিতভাবেই ঘটবে সে যুদ্ধক্ষেত্রেই হোক বা রোগজীর্ণ হয়েই হোক এবং যাকে ধরে রাখার ক্ষমতা নাই তার বিনাশের জন্য শোক করা বৃথা।।২৬।।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ # ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাৎ অপরিহার্যে অর্থে # ন ত্বং শোচিতুম্ অর্হসি।।২৭।।

জাতস্য = যে জন্মগ্রহণ করেছে তার; ধ্রুবঃ = সুনিশ্চিত; অপরিহার্যে = সুনিশ্চিত; অর্থে = বিষয়ে; ত্বং = তোমার; শোচিতুম্ = বিলাপ করা; ন অর্হসি = উচিত নয়।।২৭।।

অনুবাদ : - যেহেতু যে জন্মগ্রহণ করেছে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত এবং মৃতের জন্মও অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য এই সুনিশ্চিত বিষয়ে মৃতের জন্য তোমার বিলাপ করা অনুচিত।।২৭।।

অব্যক্ত-আদীনি ভূতানি # ব্যক্ত-মধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত-নিধনানি এব # তত্র কা পরিদেবনা।।২৮।।

ভূতানি = জীব সকল; অব্যক্ত-আদীনি = আদিতে অপ্রকাশিত; ব্যক্ত-মধ্যানি = মধ্যখানে প্রকাশিত; অব্যক্ত-নিধনানি এব = মৃত্যুর পর পুনরায় অপ্রকাশিত; পরিদেবনা = শোক।। ২৮।।

অনুবাদ :- হে ভরত বংশজ অর্জুন ! জীবসকল আদিতে অর্থাৎ জন্মের পূর্বে অপ্রকাশিত থাকে অর্থাৎ তখন তাদেরকে দেখা যায় না, মধ্যবর্তী সময়কালে অর্থাৎ জীবদ্দশায় ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশিত থাকে অর্থাৎ তাদেরকে তখন দেখা যায় এবং মৃত্যুর পর পুনরায় অপ্রকাশিত হয়ে যায় অর্থাৎ তাদেরকে আর দেখা যায় না। তাহলে মৃত্যুর কারণে কিসের শোক? ।।২৮।।

ব্যাখ্যা :- জীবনচক্র যেন এক ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের ন্যায় যার সমগ্র অংশটি একসঙ্গে দৃষ্টিগোচর হয় না। তার একটি অংশ যখন দৃষ্টিগোচর হয় তখন তার অপর

অংশগুলি অদৃশ্য অর্থাৎ দৃষ্টির বাইরে থাকে। বামদিক থেকে ডানদিকে ঘূর্ণায়মান মঞ্চটির কেবলমাত্র সামনের অংশটিই দেখা যায়। কিন্তু তখন তার অপর অংশগুলি আছে, কেবল আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। তারপর সেই বামদিকের অংশটি যখন ঘুরতে ঘুরতে সামনে এসে পরে তখন তাকে দেখা যায়। তারপর যখন সেই অংশটি ঘুরতে ঘুরতে ডানদিকে চলে যায় তখন তাকে আবার দেখা যায় না। কিন্তু সে তখনও আছে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। প্রয়োজন হলে সে ঘুরতে ঘুরতে আবার দেখা দেবে, হয়তো বা ভিন্ন রঙ ও ভিন্ন আলোর ঝলক নিয়ে। এ যেন আমাদের জন্মপূর্ব, জীবনকাল ও মৃত্যু পরবর্তী অবস্থার চিত্র। জীবের মৃত্যু হয়ে গেলেও সে কিন্তু থাকে এবং প্রয়োজনে আবার দেহধারণ করে। কাজেই মৃত্যু মানেই পরিসমাপ্তি ভেবে নিয়ে দুঃখ করা জ্ঞানীর পক্ষে শোভা পায় না।। ২৮।।

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিৎ এনম্
আশ্চর্যবৎ বদতি তথৈব চ অন্যঃ।
আশ্চর্যবৎ চ এনম্ অন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বা অপি এনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।।২৯।।

* তথৈব = তথা এব; চৈব = চ এব

এনম্ = এই আত্মাকে; আশ্চর্যবৎ = আশ্চর্যজনক; পশ্যতি = দেখে; বদতি = বলেন; শৃণোতি = শোনে; শ্রুত্বা অপি = শুনেও; ন বেদ = জানে না।।২৯।।

অনুবাদ :- কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যজনক দেখেন এবং সেই রকমই কেউ আশ্চর্যজনক বর্ণনা করেন এবং অপরে এই আত্মাকে আশ্চর্যজনক শোনেন এবং শুনেও কেউই তাকে জানতে পারেন না।।২৯।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে আত্মাকে দর্শন, বর্ণন, শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে আশ্চর্যবৎ ব'লে বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই বক্তব্যের গূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আমরা সচরাচর যে সমস্ত বস্তু দেখে থাকি তাদেরকে দেখা, বর্ণনা করা বা শোনার মধ্যে কোন আশ্চর্যের বিষয় থাকে না। কিন্তু কোন বস্তু যখন অতীব বিরল হয় তখন তাকে অকস্মাৎ দেখলে বা তার বিষয় শুনলে আশ্চর্যই

বোধ হয়। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা ক'রে শঙ্করাচার্য বলেছেন— "আশ্চর্যম্ অদৃষ্টপূর্বম্ অদ্ভুতম্ অকস্মাদ্ দৃশ্যমানং তেন তুল্যম্ আশ্চর্যবদ্ আশ্চর্যম্ ইব"। আমরা যেমন মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে লৌকিক দৃশ্যবস্তুসমূহকে বোধগম্যরূপে দেখে থাকি, সেইভাবে কিন্তু আত্মদর্শন সম্ভব নয়। প্রাকৃত বস্তুসমূহকে একই ব্যক্তি, দেখেন, বর্ণনা করেন এবং তার সম্পর্কে শোনেন। কিন্তু আত্মদর্শনের ক্ষেত্রে এই তিনের একত্র অবস্থান হয় না। আত্মদর্শনকারীর নিকট যিনি আত্মদর্শন সংক্রান্ত বিষয়টি শোনেন তিনি আত্মাকে দর্শন করতে পারেন না। সেই জন্য আত্মদর্শন সংক্রান্ত বিষয় শুনে তার বড়ই আশ্চর্য বোধ হয়। বস্তুত সর্বব্যাপী, নিত্য, জ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মাকে দর্শন করা অতীব বিরল ও অলৌকিক বিষয়। যখন অনন্ত জীবসমূহের মধ্যে অতি বিরল কারও কারও মহান তপস্যার ফলে সমস্ত পাপ দূর হয়ে হৃদয়ে পুণ্যের সঞ্চার হয় তখন তাঁদেরই মধ্যে অতি বিরল কেউ আত্মাকে দর্শন করতে সক্ষম হন। কিন্তু আত্মাকে দর্শন করতে সমর্থ হলেও তাঁদের সকলেরই অপরের নিকট আত্মদর্শন বিষয়টি বর্ণনা করার ক্ষমতা থাকে না। একমাত্র সেই মহাপুরুষ যিনি যথার্থরূপে পরমাত্মাকে জানেন এবং যিনি বেদশাস্ত্রকে সম্যকরূপে হৃদয়স্থ করেছেন একমাত্র এইরূপ মহাপুরুষই আত্মাকে দর্শন ক'রে তাঁকে বর্ণনা করার ক্ষমতা লাভ করে থাকেন। কিন্তু যাঁরা এই ধরণের মহাপুরুষের নিকট থেকে আত্মাকে দর্শনের বিষয়টি শোনেন তাঁরাও সেই বিষয়টি বুঝতে পারেন না। প্রথমত, আত্মা ভাষায় বর্ণনার অতীত। সেইজন্য তাঁকে দর্শন ক'রেও তাকে সঠিকভাবে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ফলে যিনি সেই বর্ণনা শোনেন তিনি সেটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, বিপরীত বুদ্ধির প্রভাববিহীন এবং সূক্ষ্ম, শুদ্ধ বুদ্ধি, সদাচারী, দৃঢ়বিশ্বাসী, শ্রদ্ধাবান মানুষ ব্যতীত কারও পক্ষে আত্মদর্শন বিষয়ক বর্ণনা শ্রবণ ক'রে তাকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে রাখা কদাপি সম্ভব নয়। কিন্তু প্রাকৃত জগতে বিপরীত বুদ্ধিগ্রস্ত নয় এবং সূক্ষ্ম, শুদ্ধ বুদ্ধির অধিকারী, সদাচারী, দৃঢ়বিশ্বাসী, শ্রদ্ধাবান মানুষ তো অতীব বিরল। সেইজন্য যারা এই বিষয়টি শোনে তারা সাধারণ মানুষ হওয়ার কারণে বিষয়টির কিছুই বুঝতে পারে না যেমন একজন জন্মান্ধের নিকট মহাসমুদ্রের বিশালতা বর্ণনা করলে তার পক্ষে তার কিছুই ধারণা করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত,

ঐ সমস্ত বিপরীত বুদ্ধিগ্রস্ত মানুষ যখন এই আত্মবিষয়ক বর্ণনা শোনে তখন তারা এতদিন যে মিথ্যা জগতকে সত্য, আনন্দময়, সুখের আগার এবং শরীর ও পার্থিব সম্পদকে সত্য ও সুন্দর ভেবে এসেছিল তাদের সমস্তকে নশ্বর, অনিত্য, দুঃখময় জড় পদার্থ এবং সর্বভূতে ঈশ্বর বিরাজমান এই কথা শুনে তাদের বড়ই আশ্চর্য বোধ হয় এবং এই আশ্চর্যজনক বিষয়কে তন্ময় হয়ে শ্রবণ করলেও তারা আত্মার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে না। আর বিষয়টি যেখানে এতই গূঢ়, এতই দুর্জ্ঞেয়, এতই অবর্ণনীয়, এতই মন, বুদ্ধি ও চিন্তার দ্বারা বোধগম্যতার অতীত সেটি নিশ্চয়ই কোন সাধারণ বস্তু নয়, তাকে অলৌকিক ও আশ্চর্যজনক ব্যতীত অন্য কোন বিশেষণে ভূষিত করা যায় না। কঠোপনিষদেও প্রায় একই কথা বলা হয়েছে —

শ্রবণায় অপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তঃ অপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলঃ অস্য লব্ধা
আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশল-অনুশিষ্টঃ।। (১।২।৭)

অর্থাৎ যে আত্মতত্ত্ব বহুলোক শুনতেও পায় না, আবার বহু মানুষ শুনেও তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না, সেই আত্মতত্ত্ব যিনি বর্ণনা করেন তিনি আশ্চর্যময় পুরুষ। সেই আত্মতত্ত্বকে যিনি জানতে পারেন তিনি যেমন আশ্চর্যময় ও বিরল তেমনই সেই আত্মতত্ত্ব যিনি শ্রবণ করেন তিনিও আশ্চর্যময় ও বিরল পুরুষ।।২৯।।

দেহী নিত্যম্ অবধ্যঃ অয়ং # দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি # ন ত্বং শোচিতুম্ অর্হসি।।৩০।।

দেহী = আত্মা; নিত্যম্ = অবিনশ্বর; অবধ্যঃ = যাকে বধ করা যায় না; ভূতানি = জীবসমূহ।। ৩০।।

অনুবাদ :- হে ভরত বংশজ অর্জুন! সর্ব জীবের দেহে বিদ্যমান এই আত্মা অবিনশ্বর। তাঁকে কখনই বধ করা যায় না। সেজন্য কোন জীবের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।। ৩০।।

স্বধর্ম্মম্ অপি চ অবেক্ষ্য # ন বিকম্পিতুম্ অর্হসি।
ধর্ম্ম্যাৎ হি যুদ্ধাৎ শ্রেয়ঃ অন্যৎ # ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।।৩১।।

স্বধর্ম্মম্ = নিজ ধর্ম; অবেক্ষ্য = বিবেচনা ক'রে; বিকম্পিতুম্ = কম্পিত হওয়া; ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ = ধর্ম্ম্যযুদ্ধ অপেক্ষা; ন বিদ্যতে = হয় না।।৩১।।

অনুবাদ :- আর যদি নিজের ধর্মের কথাই ধরা যায় তাহলেও তোমার কম্পিত হওয়া উচিত নয় কারণ নিজ ধর্ম পালন করা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আর অন্য কিছু অধিকতর ভালো হতে পারে না।। ৩১।।

ব্যাখ্যা :- এখানে ধর্ম বলতে কর্তব্য পালনের কথা বলা হয়েছে। অর্জুন যেহেতু ক্ষত্রিয় তাই তার ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য হল রাজ্যরক্ষা, শাসন ও পালন। এই কার্য সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য সঙ্গত প্রয়োজনে যুদ্ধ করাও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য। সেই ধর্ম বা কর্তব্য যথাযথভাবে পালন না করলে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম বা কর্তব্যে অবহেলা করা হবে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত অনুচিত ও অসমীচীন।। ৩১।।

যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নং # স্বর্গদ্বারম্ অপাবৃতম্
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ # লভন্তে যুদ্ধম্ ঈদৃশম্।। ৩২।।

উপপন্নং = উপস্থিত হয়েছে; স্বর্গদ্বারম্ = স্বর্গের দ্বার; অপাবৃতং = উন্মুক্ত ক'রে; লভন্তে = লাভ ক'রে থাকে; ঈদৃশম্ = এই প্রকার।।৩২।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! স্বর্গের দ্বার উন্মোচনকারী। এই যুদ্ধ আপনা আপনিই উপস্থিত হয়েছে। এই প্রকার যুদ্ধ একমাত্র সুখী ক্ষত্রিয়গণই লাভ ক'রে থাকেন।।৩২।।

ব্যাখ্যা :- এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে এই যুদ্ধ নিজের ইচ্ছায় উপস্থিত হয়েছে। বিষয়টি সত্যই তাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণ তথা পাণ্ডবগণ কখনই যুদ্ধ চাননি। তাঁরা সর্বপ্রকারে নতি স্বীকার করে যুদ্ধ বন্ধ করার সমস্ত চেষ্টা করেও বিফল হয়েছিলেন এবং তাঁরা না চাওয়া সত্ত্বেও কৌরবদের দ্বারা তাঁদের ঘাড়ে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই যেহেতু পাণ্ডবগণ যুদ্ধ আহ্বান করেননি এবং তা সত্ত্বেও তাঁরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন সেইজন্য বলা হয়েছে যে এই যুদ্ধ তাঁদের সামনে অযাচিতভাবে স্বেচ্ছায় আপনিই এসে উপস্থিত হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডবদেরকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছেন কারণ কেউ চায় না যে

উন্মত্ত ব্যাঘ্র কারও গৃহে প্রবেশ করুক। তাই সে অরণ্যবাসী হলে সর্বপ্রকারে চেষ্টা করে যাতে তার গৃহে উন্মত্ত ব্যাঘ্র প্রবেশ না করে। কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি সেই ব্যাঘ্র তার গৃহপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয় তাহলে তো সেই ব্যাঘ্রকে প্রতিহত করতেই হবে এবং প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে তাকে আত্মরক্ষার তাগিদে হত্যা করাও বিধেয়। দুর্যোধনেরা সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে পাণ্ডবদের উপর আক্রমণে উদ্যত। সেইজন্য তাদেরকে প্রতি-আক্রমণ ভিন্ন পাণ্ডবদের কোন গত্যন্তর ছিল না। তাই মানুষের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ— যদি শত্রুকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বলপ্রয়োগ না ক'রে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রতিহত করা না যায় এবং শত্রু স্বেচ্ছায় তার দুয়ার প্রান্তে উপস্থিত হয়ে তার গৃহে আক্রমণ করতে উদ্যত হয় তাহলে তাকে আর অপেক্ষা না ক'রে বলিষ্ঠ হাতেই প্রতিহত করা বিধেয় নতুবা তার নিজ গৃহ বা সংসারের প্রতি ধর্মপালনে অর্থাৎ গৃহকর্তার গৃহরক্ষার কর্তব্য পালনে অবহেলা করা হবে যা অভিপ্রেত নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন যেভাবে যুদ্ধের ভাবী বীভৎস পরিণাম কল্পনা ক'রে মানসিক যন্ত্রণায় যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলেন তা সত্যই ঘটলে সে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অর্থাৎ অন্যায়, অধর্মের হাত থেকে নিরীহ শান্তিকামী প্রজাদের রক্ষা করার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রজাদের অপরিসীম পীড়া ঘটানোর পাপে জড়িত হতেন যা কোন ভাবেই অভিপ্রেত ছিল না। সেই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ এই যুদ্ধকে স্বেচ্ছায় উপস্থিত হয়েছে বলেছেন এবং অর্জুনকে তাঁর ক্ষত্রধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করেছেন।।৩২।।

অথ চেৎ ত্বম্ ইমং ধর্ম্যং # সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ # হিত্বা পাপম্ অবাপ্স্যসি।। ৩৩।।

চেৎ = যদি; ধর্ম্যং সংগ্রামং = ধর্মের অনুযায়ী যুদ্ধ; করিষ্যসি = কর; হিত্বা = হারিয়ে; অবাপ্স্যসি = লাভ করবে।।৩৩।।

অনুবাদ :- অপরদিকে যদি তুমি তোমার নিজ ধর্মের অনুযায়ী যুদ্ধ না কর তাহলে তুমি নিজের ক্ষত্রিয়-ধর্ম এবং যশ হারিয়ে পাপ লাভ করবে।।৩৩।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকের ধর্ম্যসংগ্রাম অর্থাৎ ধর্ম্যযুদ্ধ শব্দটির উপর আলোকপাত

করা প্রয়োজন। যুদ্ধ মানেই তো রক্তপাত, মৃত্যু, স্বজন হারানো হাহাকার। তাহলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই যুদ্ধকে কেন ধর্ম্যযুদ্ধ বলে অভিহিত করলেন? আসলে কোন কাজ যখন অন্যায় উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় তখন তাকে অধর্ম বলা হয়। কিন্তু যখন সেই একই কর্ম শুভ উদ্দেশ্যে পালিত হয় তখন তাকে ধর্ম পদবাচ্য বলা হয়। যেমন যখন কোন ব্যক্তি কোন ছুরির সাহায্যে হত্যার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির শরীর বিদ্ধ করে তখন সেই কাজটি অধর্ম বা পাপ বলে গণ্য হবে। কিন্তু কোন চিকিৎসক যখন সেই একই প্রকার ছুরি দিয়ে কোন অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য তার কোন অঙ্গচ্ছেদ করে তখন সেটি পুণ্যকাজ বা ধর্মযুক্ত বলেই বিবেচিত হয়। যদি কোন রাষ্ট্র লুণ্ঠন ও অপহরণের উদ্দেশ্যে অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন সে যুদ্ধ হয় পাপযুদ্ধ। কিন্তু যখন কোন রাষ্ট্র বহিঃশত্রুর হাত থেকে নিজের দেশ ও জনগণকে রক্ষা করার শুভ উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন সেই যুদ্ধ ধর্ম্যযুদ্ধই থাকে। পাপাচারী দুর্যোধন অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদের ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার হরণ করার মানসে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেছিল। সেই যুদ্ধ দুর্যোধনদের পক্ষ থেকে অধর্ম যুদ্ধ ছিল। কিন্তু পাণ্ডবদের পক্ষে সেই যুদ্ধে রত হওয়া ছিল সঠিক অর্থে ধর্ম্যযুদ্ধ কারণ পাণ্ডবদের এই যুদ্ধ করার পশ্চাতে কোন অশুভ উদ্দেশ্য ছিল না, তা ছিল তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার, দেশের অগণিত শান্তিকামী ধার্মিক মানুষদের রক্ষার সংগ্রাম। সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অতি সঙ্গত কারণেই এই যুদ্ধকে ধর্ম্যযুদ্ধ নামে আখ্যায়িত করেছেন।

এই শ্লোকে বর্ণিত 'ধর্ম্য সংগ্রাম' অর্থাৎ যুদ্ধ সম্পর্কে আর একটি বিষয় এখানে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। অভিধানে এই সম্পর্কে দুটি বানান প্রচলিত আছে একটি হল 'ধর্ম' এবং অপরটি 'ধর্ম্য'। 'ধর্ম' শব্দের সংজ্ঞাস্বরূপ বলা হয়েছে - 'ধ্রিয়তে লোকঃ অনেন' অর্থাৎ যা এই জগত সংসারকে ধারণ করে থাকে সেইটিই হল ধর্ম। বস্তুত শাস্ত্রে ধর্ম শব্দের সংজ্ঞা বিশাল ও ব্যাপক। কিন্তু বর্তমানে সাধারণভাবে মানুষ 'ধর্ম' শব্দটিকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহারে অভ্যস্ত। কিন্তু শাস্ত্রে ধর্মকে এইরূপ সংকীর্ণ অর্থে কদাপি ব্যবহার করা হয়নি।

লক্ষণীয়, এই শ্লোকে ভগবান্ 'ধর্ম' শব্দটি ব্যবহার না ক'রে ব্যবহার করেছেন 'ধর্ম্য' শব্দটি অভিধানে যার অর্থ বলা হয়েছে — ধর্মের অনুযায়ী, ইংরেজিতে যাকে 'Consistent with law– duty or religion' বলা হয়েছে। তাহলে এই শ্লোকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে কোন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা বা প্রচারের মানসে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তাহলে এখানে 'ধর্ম্য' বলতে কি বোঝানো হয়েছে? উত্তর হল এখানে 'ধর্ম্য' বলতে 'ক্ষত্রধর্ম' অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের বর্ণধর্ম অনুযায়ী করণীয় কর্মকে বোঝানো হয়েছে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অনুযায়ী সেই করণীয় কর্ম কি? উত্তর হল দেশ তথা প্রজাবর্গকে অধর্ম, অত্যাচার, অনাচার, অবিচারের হাত থেকে রক্ষা করার বৃহত্তর প্রয়োজনে পাপী, অত্যাচারী, অনাচারীদের বিরুদ্ধে নিঃসঙ্কোচে অস্ত্রধারণ করা। সেই সমাজের মানুষকে কর্ম অনুযায়ী চারিটি বর্ণাশ্রমে বিন্যস্ত ক'রে তাদের নিজ নিজ কর্ম স্থির ক'রে দেওয়া হয়েছিল। সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে সমাজ রক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্যে এই চার প্রকারের বর্ণের মানুষদের তাদের উপরে ন্যস্ত কর্মসমূহকে যথাযথভাবে শাস্ত্রসম্মত উপায়ে পালন করার মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল যেগুলিকে পালন না করলে তা অপরাধ হিসাবে গণ্য হত। এই শ্লোকে ভগবান্ অর্জুনকে সমাজের বুকে তাঁর কর্তব্যস্বরূপ সেই ক্ষত্রধর্ম পালনের দায়বদ্ধতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অর্জুনের এ যুদ্ধ পালন না করার কোন সামাজিক বা নৈতিক অধিকার ছিল না কারণ তখনকার সমাজে ক্ষত্রিয়গণ Military troop বা সামরিক জনগোষ্ঠী ছিলেন। দেশে বিশাল সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে আর মিলিটারিরা হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকবে সেটা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। সেইজন্য অর্জুন এই যুদ্ধ না করলে সমাজের বুকে বিরাট কর্তব্যে অবহেলাকারী ব'লে চিহ্নিত হতেন যা কোনভাবেই তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্যের পক্ষে সমীচীন, শোভনীয় বা কাম্য হত না। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মে বর্ণিত কোন Crusade বা ধর্মযুদ্ধ নয়, এ হল সমাজের নিকট ক্ষত্রিয়ের বর্ণধর্ম পালনের নিমিত্ত সমাজের প্রতি কর্তব্যবদ্ধ ব্যক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়যুদ্ধ।। ৩৩।।

অকীর্তিং চ অপি ভূতানি # কথয়িষ্যন্তি তে অব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চ অকীর্তিঃ # মরণাৎ অতিরিচ্যতে।।৩৪।।

অপিচ = তাছাড়াও; ভূতানি = সমস্ত লোক; তে = তোমার; অব্যয়াম্ = চিরদিন; অকীর্তিং = অপযশ; কথয়িষ্যন্তি = প্রচার করবে; সম্ভাবিতস্য = মর্যাদাযুক্ত

পুরুষের; অকীর্তিঃ = অখ্যাতি; মরণাৎ = মৃত্যুর থেকে; অতিরিচ্যতে = অধিক।।৩৪।।

অনুবাদ :- তাছাড়াও সমস্ত লোক চিরদিন তোমার অপযশ প্রচার করবে আর নিশ্চিতভাবেই মর্যাদাযুক্ত পুরুষের নিকট অসম্মান মৃত্যুর অপেক্ষাও অধিক অর্থাৎ সম্মান হারিয়ে মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। (শ্রীকৃষ্ণ এই বক্তব্যের দ্বারা অর্জুনকে বলেতে চেয়েছেন — যুদ্ধে যদি তুমি বীরগতি প্রাপ্ত হও তাতেও কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু তুমি কিছুতেই এই যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে না)।।৩৪।।

ভয়াৎ রণাৎ উপরতং # মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো # ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্।। ৩৫।।

উপরতং = নিবৃত্ত; মংস্যন্তে = মনে করে; বহুমতঃ = সম্মানিত; ভূত্বা = হয়ে; লাঘবম্ = লঘুতা; যাস্যসি = লাভ করবে।।৩৫।।

অনুবাদ :- মহারথগণেরও ধারণা হবে যে তুমি ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছ এবং এতদিন পর্যন্ত যাদের হৃদয়ে তুমি শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত তারাই এরপর তোমাকে অবজ্ঞা করবে।। ৩৫।।

অবাচ্য-বাদান্ চ বহূন্ # বদিষ্যন্তি তব অহিতাঃ।
নিন্দন্তঃ তব সামর্থ্যং # ততো দুঃখতরং নু কিম্।। ৩৬।।

অবাচ্য = বলার অযোগ্য; বাদান্ = কথা; বদিষ্যন্তি = বলবে; অহিতাঃ = শত্রুরা; নিন্দন্তঃ = নিন্দা ক'রে; নু কিম্ = আর কি আছে।।৩৬।।

অনুবাদ :- তোমার শত্রুরাও তোমার ক্ষমতার নিন্দা ক'রে অনেক বলার অযোগ্য কথা বলবে। এর চাইতে অধিকতর দুঃখের আর কি হতে পারে? ৩৬

হতো বা প্রাপ্যস্সি স্বর্গং # জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় # যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।। ৩৭।।

প্রাপ্যস্সি = লাভ করবে; জিত্বা = জয় লাভ করলে; ভোক্ষ্যসে = ভোগ করবে; মহীং = পৃথিবী; উত্তিষ্ঠ = ওঠ; কৃতনিশ্চয়ঃ = সংকল্পে দৃঢ় হয়ে।।৩৭।।

অনুবাদ :- হে কুন্তীপুত্র অর্জুন! যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হলে তুমি স্বর্গ লাভ করবে আর যদি তুমি জয়লাভ কর তাহলে তুমি পৃথিবী ভোগ করবে। সেইজন্য যুদ্ধের নিমিত্ত সংকল্পে দৃঢ় হয়ে ওঠ।। ৩৭।।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা # লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব # ন এবং পাপম্ অবাপ্স্যসি।। ৩৮।।

সমে = সমান; কৃত্বা = জ্ঞান ক'রে; যুজ্যস্ব = যুদ্ধ কর; ন অবাপ্স্যসি = হবে না।।। ৩৮।।

অনুবাদ :- সেইজন্য সুখ বা দুঃখ, লাভ বা ক্ষতি, জয় বা পরাজয় উভয়কেই সমান জ্ঞান ক'রে যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ কর, তাহলে তোমার কোনও পাপ হবে না।। ৩৮।।

ব্যাখ্যা :- গীতায় আমরা দেখতে পাই যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুভাবে অর্জুনকে বুঝিয়ে তার মনের ভুল দূর ক'রে তাঁকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন। এই কারণে অনেকে প্রশ্ন করেন শ্রীকৃষ্ণ যিনি স্বয়ং ভগবান্ তিনি কেন অপরকে রক্তপাত, নরহত্যা প্রভৃতিতে প্রেরণা যোগাবেন। এই প্রশ্নের একাধিক উত্তর আছে। প্রথমত, আমরা আবহমান কাল থেকে দেখে এসেছি যে দেশে-দেশে, রাজায়-রাজায় বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। সেই সমস্ত যুদ্ধের যুদ্ধোন্মাদদের উদ্দেশ্য ও শ্রীকৃষ্ণের এই যুদ্ধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এই দুইটির তুলনা করলে শ্রীকৃষ্ণের আসল উদ্দেশ্য বোধগম্য হবে। সেই সমস্ত অধিকাংশ যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল ভোগলিপ্সা, পরস্ব অপহরণ, ইচ্ছাকৃত পরপীড়ন, রক্তপাত ও নরহত্যায় উল্লাস প্রভৃতি অসংখ্য অসৎ উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ সংঘটিত করতে চেয়েছিলেন নিরীহ মানব সমাজকে অন্যায়ের হাত থেকে মুক্ত করার মহৎ উদ্দেশ্যে। সেই কারণে তিনি অর্জুনকে এই যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রের যিনি সর্বময় কর্তা তিনি নিজ হাতে কিছু করেন না। সর্বদা নিজে উপস্থিত থেকে তাঁর লোকজনদের দ্বারা কাজটি সমাধা করান। সেই জন্য যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ এই জগতের কর্তা তাই তিনি এই কাজে অর্জুনকে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। অর্জুনকে নিয়োজিত করতে চাওয়ার পিছনে কারণ হল যে যার যা কর্ম তাকে তাই করতে হবে। অর্জুন যেহেতু ক্ষত্রিয় তাই তিনি তার

প্রজাদের রক্ষা করতে কর্তব্যবদ্ধ। মহামারীর সময় অসুস্থ রুগীকে সেবার জন্য একজন চিকিৎসককেই অগ্রসর হতে হবে, একজন অধ্যাপক বা একজন স্থপতিকে নয়। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের এই কাজে অর্জুনকে পুনঃ পুনঃ উদ্বুদ্ধ করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, উপর্যুক্ত অপরাপর যুদ্ধের ন্যায় এই যুদ্ধ সংঘটিত করতে চাওয়ার পিছনে শ্রীকৃষ্ণের ভোগলিপ্সা, পরস্ব অপহরণ, ইচ্ছাকৃত পরপীড়ন, রক্তপাত ও নরহত্যায় উল্লাস প্রভৃতি কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অধর্ম দূর ক'রে ধর্মের প্রতিষ্ঠা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলতে চেয়েছিলেন যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য যেন ব্যক্তিগত লিপ্সা বা পররাজ্যলোভের দ্বারা পরিচালিত না হয়, তা যেন থাকে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় প্রভৃতির ঊর্ধ্বে, তা যেন হয় সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে সৎ উদ্দেশ্যে আসক্তিবিহীন কর্তব্য পালন। এইভাবে সংঘটিত যুদ্ধ কখনই অপরাধের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। তাছাড়া পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী কৌরবরা আততায়ী ছিল। মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ৩৫০ তম শ্লোকে বলা আছে যে আততায়ীরা বধের যোগ্য এবং আততায়ীদেরকে কোনরকম বিবেচনা ছাড়াই তৎক্ষণাৎ বধ করতে হবে। আবার এই মনুসংহিতার একই অধ্যায়ের ৩৫১ তম শ্লোকে বলা আছে যে আততায়ীদের বধে কোন রকম পাপ বা অপরাধ হয় না। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের বিধান মেনেই নিয়েছিলেন। শাস্ত্রই তো ছিল তখনকার দিনের দেশের সংবিধান। সুতরাং এই যুদ্ধ সংঘটিত করার জন্য অর্জুনকে অনুপ্রাণিত করা কোনভাবেই শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বকে কালিমালিপ্ত করে না।

তৃতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণ এর দ্বারা একটা বৃহৎ লোকশিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন যে রাজা যেন কখনও লোভী না হন, তাঁর রাজ্যশাসন যেন ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার উপায় না হয়, রাজ্য শাসনের পশ্চাতে তাঁর যেন কোন ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতির হিসাব ক্রিয়া না করে, তা যেন হয় সম্পূর্ণভাবে আসক্তিবিহীন ও সৎ উদ্দেশ্যে নিছক কর্তব্যপালন। তিনি আরও শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন যে যতদিন পৃথিবী থাকবে, মানব সমাজ থাকবে, ততদিন সমাজে ভালো ও মন্দ উভয়ই থাকবে। কিন্তু মন্দ যখন এত বেশী প্রকট হয়ে যাবে যে তাকে প্রতিহত না করলে সমাজব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে যাবে এবং তাকে দূর করার জন্য যখন যথাসম্ভব

সমস্ত শান্তিপূর্ণ প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে কেবলমাত্র তখনই সমাজ রক্ষার মহান উদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ন্যায়সম্মত উপায়ে সমস্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতির হিসাব ভুলে সেই মন্দের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পথে অগ্রসর হতে হবে। আমরা মহাভারতে দেখতে পাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পথে পাণ্ডবরা তখনই অগ্রসর হয়েছিলেন যখন শ্রীকৃষ্ণ তথা পাণ্ডবদের পক্ষ থেকে এই যুদ্ধ বন্ধ করার সমস্ত শান্তিপূর্ণ প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। অতি দুঃখের বিষয় বর্তমান পৃথিবীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ গীতার উপরোক্ত সমস্ত শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত পথে গমন করছেন এবং সেজন্যই বর্তমান পৃথিবীতে মনুষ্য সমাজের উন্নতির স্বার্থে ব্যাপকভাবে গীতার আদর্শ ও শিক্ষা প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। নতুবা পৃথিবীর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।। ৩৮।।

এষা তে অভিহিতা সাংখ্যে # বুদ্ধিঃ যোগে তু ইমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ # কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি।।৩৯।।

সাংখ্যে = তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে; অভিহিতা = বলা হল; যোগে = নিষ্কাম কর্মযোগে; শৃণু = শ্রবণ কর; বুদ্ধ্যা = জ্ঞানের দ্বারা; প্রহাস্যসি = মুক্তি পাবে।।৩৯।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! তোমাকে এতক্ষণ সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে বললাম। এবার তুমি কর্ম যোগের বিষয়ে শোন। এই জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে।।৩৯।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোক থেকেই প্রকৃতপক্ষে কর্মযোগের পূর্বপাঠ শুরু হল। এই শ্লোকটির অর্থ খুবই সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এখানে বলা হয়েছে যে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির একটি উপায় হল যোগ। এখন প্রশ্ন আসে যোগ মানে কি? যোগ শব্দের প্রচলিত অর্থ হল মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত অষ্টাঙ্গিক যোগ যেমন আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি। কিন্তু গীতায় তো আসন, প্রাণায়ামাদি যোগের কথা বলা হয়নি। তাহলে যোগ বলতে কি বোঝায়? গীতায় যোগ বলতে কর্মযোগ বোঝানো হয়েছে। এবার এখানে আরও একটি সংশয়ের উদয় হয়। এই শ্লোকে বলা হয়েছে এই যোগ আয়ত্ত করতে পারলে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণভাবে ধারণা হয় যে কর্ম করলে তো তাতে আসক্তি জন্মাবে আর গীতার বাণী অনুযায়ী সেক্ষেত্রে তো মোক্ষলাভ হবে না কারণ কোন কিছুর প্রতি

আসক্তি হল মোক্ষলাভের পথে বাধা। সাধারণ মানুষ ভাবে গীতায় তো কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে আর আমরা কর্মই করছি। তাহলে আমাদের অবশ্যই মোক্ষ লাভ হবে! এইখানেই ভুল। গীতায় যোগ বলতে কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এটি সাধারণ ভাষার কর্ম নয়, গীতায় কর্মযোগ বলতে নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে আর এই অর্থটি জানলেই সাধারণ মানুষের ভ্রান্তি দূর হবে। কর্ম করা সহজ, কিন্তু নিষ্কাম বা আসক্তিহীনভাবে কর্ম করা খুবই কঠিন যা সচরাচর প্রায় কোন মানুষই করে না বা করতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আসক্তিহীনভাবে যুদ্ধ করতে বলেছেন যা একমাত্র অর্জুনের মত উচ্চগুণসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই সম্ভব।।৩৯।।

ন ইহ অভিক্রম-নাশঃ অস্তি # প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পম্ অপি অস্য ধর্মস্য # ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।। ৪০।।

ইহ = এই নিষ্কাম যোগে; অভিক্রমঃ = অভিক্রম শব্দের অর্থ শুরু বা আরম্ভ, যে কাজ আরম্ভ হয়েছে অর্থাৎ আরব্ধ কর্ম; প্রত্যবায়ঃ = হানি বা ক্ষতি; ত্রায়তে ত্রাণ করে অর্থাৎ উদ্ধার করে।। ৪০।।

অনুবাদ :- এই নিষ্কাম কর্ম যোগে আরব্ধ কর্ম অর্থাৎ এই ধর্ম যতটুকুই পালন করা যায় তা নিষ্ফল হয় না। আবার ঠিকভাবে এই ধর্ম পালন করতে না পারলেও কোন ক্ষতি হয় না। যদি এই নিষ্কাম কর্মযোগের অল্প হলেও কিছুটা করা যায় তাহলে সেইটুকুই মানুষকে বিরাট ভয় থেকে উদ্ধার করে।।৪০।।

ব্যাখ্যা :- এখানে নিষ্কাম কর্মযোগের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে সনাতন ধর্মের প্রচলিত যোগ দুই প্রকার— জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ। যাঁরা জ্ঞানযোগ অবলম্বন করেন তাঁরা কোন কর্ম করেন না, তাঁরা প্রায় সকলেই গৃহত্যাগী বা সন্ন্যাসী। তাঁরা নিয়ত ব্রহ্মকে লাভ করার জ্ঞানের আলোচনায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন। অপরদিকে যাঁরা নিষ্কাম কর্মযোগের অনুশীলন করেন তাঁরা একাধারে নিষ্কাম কর্ম করেন আবার ব্রহ্মকে লাভ করার জ্ঞানও আহরণ করেন। জ্ঞানযোগের পথ বড়ই কঠিন। যোগী দীর্ঘদিন এই যোগ অভ্যাস করার পর যদি এই পথ থেকে বিচ্যুত হন তাহলে এতদিন তিনি যা কিছু অর্জন করেছেন তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যায়। আবার এই যোগ ঠিকমত নিয়ম মেনে

অনুষ্ঠান করতে না পারলে তার অনেক ক্ষতিও হতে পারে। কিন্তু কর্মযোগের পথ অনেক সহজ। এই যোগ অবলম্বন করতে হলে কাউকে গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নিতে হয় না। সংসারের আর পাঁচজনের সঙ্গে গৃহে বাস করেই সংসারের স্বাভাবিক কাজের মধ্যে দিয়েই এই যোগ অবলম্বন করা যায়। এখানে কোন নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় নিয়ম নেই। শর্ত কেবল একটাই যে এই যোগে অনুষ্ঠিত কর্মে কর্তার কোন আসক্তি থাকবে না, তা যেন পরিপূর্ণভাবে নিষ্কাম কর্ম হয়। আর এই যোগের একটি বিশেষ সুবিধা হল যে এই যোগ যতটুকুই পালন যায় ততটুকুরই সুফল পাওয়া যায়, কৃত নিষ্কাম কর্মযোগের কোন অংশই নিষ্ফল হয় না, সে যত ক্ষুদ্র কর্মই হোক না কেন। সামান্যতম নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠানও মানুষকে অনেক বড় বড় ভয়ের হাত থেকে উদ্ধার করে।

এখানে গীতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণী হল এই জীবনের যে মুখ্য উদ্দেশ্য ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ, তা পেতে গেলে সর্বত্যাগ ক'রে বনে-জঙ্গলে গিয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের কোন প্রয়োজন হয় না, মানুষ গৃহে ব'সেই সংসারের স্বাভাবিক সমস্ত কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই মোক্ষলাভ করতে পারে। কেবল যেটুকু প্রয়োজন তা হল তার সেই সংসারের স্বাভাবিক সমস্ত কর্তব্য পালনের মধ্যে তার কোন আসক্তি, লালসা প্রভৃতি থাকবে না, তা হবে পরিপূর্ণ নিষ্কাম কর্তব্য পালন। রাজা জনক এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।। ৪০।।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ # একা ইহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হি অনন্তাশ্চ # বুদ্ধয়ঃ অব্যবসায়িনাম্।। ৪১।।

একা = একনিষ্ঠ অর্থাৎ একমুখী।

ব্যবসায়াত্মিকা = নিশ্চয়াত্মক; অব্যবসায়িনাং = অব্যবসায়ী অর্থাৎ অস্থিরচিত্ত ব্যক্তিদের; বুদ্ধয়ঃ = বুদ্ধিসমূহ; বহুশাখাঃ = বহুদিকে প্রবাহিত; অনন্তাঃ = অনন্ত।।৪১।।

অনুবাদ :- হে কুরুনন্দন অর্জুন! নিশ্চয়াত্মক ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগীদের বুদ্ধি সর্বদা একমুখী হয় এবং চঞ্চলচিত্ত সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি অব্যবসায়াত্মিকা যা বহুদিকে প্রবাহিত হয়।।৪১।।

ব্যাখ্যা :- সংস্কৃতে ব্যবসায় মানে নিশ্চয়। যে একমুখী বিবেচনাশক্তি মুক্তিকামী মানুষের অন্তরে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস উৎপাদন করে যে ভগবানের প্রকৃত ভজনার মাধ্যমে সে অবশ্যই কর্মের সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে ভগবানের ধামে উপস্থিত হতে পারবে সেই নিশ্চয়াত্মক বিবেচনা শক্তিকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলা হয় — "ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকৈবৈকনিষ্টৈব বুদ্ধির্ভবতি" (গীতাভাষ্য, শ্রীধরাচার্য ২।৪১)। এই বুদ্ধি সর্বদাই একমুখী। কোনভাবেই সে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয় না। এই একমুখী বুদ্ধি ব্যতীত কেউ কোনদিনই ঈশ্বরের ধামে পৌঁছাতে পারে না। একজন প্রচলিত অর্থে ব্যবসায়ীকে সর্বদা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে চলতে হয় যে সে কোন ব্যবসায় করবে। একজন ব্যক্তি যদি ভিন্ন ভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় করার কথা ভাবে তাহলে সে কখনও সফল হতে পারবে না। এটা তার বিক্ষিপ্ত অব্যবসায়সুলভ মনোভাব হয়ে যাবে। ফলে যারা প্রকৃত ব্যবসায়ী তাদের বুদ্ধি সর্বদা নিশ্চিতভাবে একমুখে প্রবাহিত হয় এবং তারা সফল হয় কিন্তু যারা অব্যবসায়ী তাদের চঞ্চল মন বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হবে এবং তারা কখনও সফল হতে পারবে না। অনুরূপভাবে তাই গীতা বলেছেন যে ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে ভক্তকে একজন প্রকৃত ব্যবসায়ীর মত নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে এবং সর্বকর্ম একমাত্র ভগবানের চরণে তার চিত্তকে সদা সর্বদা সমাহিত রাখতে হবে। সকাম মানুষের চিত্ত সকল কর্মে ঈশ্বরে একনিষ্ঠভাবে সমর্পিত হতে পারে না। সেই কারণে তার অনুষ্ঠিত কর্মে বিভিন্ন প্রকার দোষ-ত্রুটি দেখা যায় যার ফলে তার কর্ম বিফল হয়ে যায় এবং সে কর্মবন্ধনে লিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু ঈশ্বরে একনিষ্ঠ ব্যক্তির সকল কর্মই ঈশ্বরের আরাধনায় নিয়োজিত হয় বলেই তাঁর কর্মে কিঞ্চিৎ দোষ-ত্রুটি দেখা দিলেও তা কখনও বিফলে যায় না এবং সেই কর্ম তাঁর কর্মবন্ধনের কারণ হয়ে ওঠে না— "ঈশ্বরারাধনার্থং হি নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেনাপি ন নশ্যতি" (শ্রীধরাচার্য)। সেইজন্য এখানে অর্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হল এই যে অর্জুন যেন যুদ্ধের প্রয়োজনে তাঁর সকল কর্ম তাঁকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেন। তাহলে এই যুদ্ধের কারণে অর্জুনকে আর কোন দোষ, ত্রুটি, কর্মবন্ধন স্পর্শ করতে পারবে না এবং তাঁর এই যুদ্ধ হবে সুফলদায়ক। আমরা আধুনিক যুগে দেখতে পাই যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গিরীশ ঘোষের নিকট থেকে তার সকল কৃত কর্মের বকলম গ্রহণ করেছিলেন তাকে পাপমুক্ত করার জন্য ।।৪১।।

যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং # প্রবদন্তি অবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ # ন অন্যৎ অস্তি ইতি বাদিনঃ।।৪২।।

(এটি একটি যুগ্ম শ্লোক হওয়ার কারণে এই শ্লোকটির অর্থ প্রকাশের জন্য পরবর্তী শ্লোক থেকে 'স্বর্গপরা' এই পদটি গ্রহণ করা হয়েছে)

(স্বর্গপরা = স্বর্গ লাভই যাদের একমাত্র লক্ষ্য) বেদবাদরতাঃ = যারা স্বর্গ লাভের উপায় হিসাবে বেদের যাগযজ্ঞ-যোগ ক্রিয়াদি আচার অনুষ্ঠানের উপদেশে আসক্ত; অন্যৎ = অন্য কেউ; অস্তি = আছে; ইতি বাদিনঃ = এই মতবাদের প্রচারকগণ; ইমাং যাম্ = এই সমস্ত; পুষ্পিতাং = মধুর; বাচং = বাক্য, প্রবদন্তি = বলে, (তে = তারা) অবিপশ্চিতঃ = অল্পবুদ্ধি অজ্ঞানী।। ৪২।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! যে সমস্ত মানুষ একমাত্র স্বর্গ লাভকেই জীবনের পরমার্থ ভাবেন তাঁরা ব'লে থাকেন যে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য যে স্বর্গলাভ তা পূরণ করার উপায় হিসাবে বেদের যাগ-যোগ-যজ্ঞ ক্রিয়াদি আচার অনুষ্ঠান ব্যতীত আর অন্য কিছুই নাই। বেদের যাগ-যজ্ঞ-যোগ ক্রিয়াদি আচার অনুষ্ঠানের মধুর বাক্যে যারা আসক্ত তারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ও অজ্ঞানী।।৪২।।

ব্যাখ্যা :- এখানে মনে হতে পারে কৃষ্ণ কেন এই ধরণের বেদবিরোধী বাক্য বলছেন। এইখানেই গীতার রহস্য লুকিয়ে আছে। গীতায় পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে যে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য স্বর্গলাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের মূল লক্ষ্য হল স্বর্গেরও উর্ধ্বে মোক্ষলাভ। বেদোক্ত ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানও মোক্ষলাভের পথ প্রশস্ত করতে পারে। কিন্তু বেদোক্ত ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যেহেতু স্বর্গলাভের কথা প্রচার করা হয়েছে সেই জন্য সাধারণ মানুষ স্বর্গলাভের দিকে লক্ষ্য রেখেই বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠান ক'রে থাকেন এবং তাঁরা এর ফলে স্বর্গ লাভ ক'রে থাকেন ঠিকই তবে যেহেতু তাঁরা কেবলমাত্র স্বর্গলাভের প্রতি আসক্তিযুক্ত হয়েই এই অনুষ্ঠানসমূহ ক'রে থাকেন সেইজন্য স্বর্গে তাঁদের পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলেই তাঁদেরকে পুনরায় জন্মলাভ করতে হয় কারণ আসক্তিযুক্ত কর্ম কখনই জীবকে মোক্ষলাভের উপযোগী ক'রে তুলতে পারে না। সেইজন্য বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্ত জীবকে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ও অজ্ঞানী বলা হয়েছে কারণ

তারা স্বর্গসুখলাভের আকর্ষণে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য মোক্ষলাভের চিন্তাকে গৌণ ক'রে ফেলে।। ৪২।।

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা # জন্ম-কর্ম-ফল-প্রদাম্।

ক্রিয়া-বিশেষ-বহুলাং # ভোগ-ঐশ্বর্য-গতিং প্রতি।।৪৩।।

(এটি একটি যুগ্ম শ্লোক হওয়ার কারণে এই শ্লোকটির অর্থ প্রকাশের জন্য পূর্ববর্তী শ্লোক থেকে 'যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি' এই অংশটি গ্রহণ করা হয়েছে)

কামাত্মনঃ = কামনাযুক্ত; স্বর্গপরাঃ = যাঁরা একমাত্র স্বর্গ লাভকেই জীবনের পরমার্থ ভাবেন; জন্ম-কর্ম-ফল-প্রদাং = জন্মরূপ কর্মফল প্রদান কারী; ক্রিয়া-বিশেষ-বহুলাম্ = আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়া কলাপ; ভোগ-ঐশ্বর্য-গতিং = ভোগ, ঐশ্বর্য ও প্রগতি বা উন্নতির; (যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি = এই সমস্ত মধুর বাক্য বলে)।।৪৩।।

অনুবাদ :- এই সমস্ত অল্পবুদ্ধি অজ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্তঃকরণ একমাত্র স্বর্গ লাভই জীবনের পরমার্থ এইরূপ কামনার দ্বারা মোহিত। তাঁরা জন্মরূপ কর্মফল প্রদানকারী ভোগ, ঐশ্বর্য ও প্রগতি বা উন্নতির জন্য যাগ, যোগ প্রভৃতি বেদের বিবিধ আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠানের আপাত মধুর বাক্য বলে থাকেন।।৪৩।।

ভোগ-ঐশ্বর্য-প্রসক্তানাং # তয়া অপহৃত-চেতসাম্।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ # সমাধৌ ন বিধীয়তে।।৪৪।।

ভোগ-ঐশ্বর্য-প্রসক্তানাং = ভোগ ও ঐশ্বর্যের দ্বারা গভীরভাবে আসক্ত; চেতসাম্ = অন্তর; ব্যবসায়াত্মিকা = করণীয় ও অকরণীয় বিষয়ে একমুখী দৃঢ়চিত্ত; বুদ্ধিঃ = জ্ঞান; সমাধৌ = ঈশ্বরে স্থির; ন বিধীয়তে = হয় না।।৪৪।।

অনুবাদ :- সেই সমস্ত বাক্য দ্বারা যাদের অন্তর আচ্ছন্ন এবং যারা ভোগ ও ঐশ্বর্যের প্রতি গভীরভাবে আসক্ত সেই সব ব্যক্তিদের বুদ্ধি করণীয় ও অকরণীয় বিষয়ে একমুখী ও দৃঢ় না হওয়ার কারণে ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় না।।৪৪।।

ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা # নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব অর্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্য-সত্ত্বস্থো # নির্যোগ-ক্ষেম আত্মবান্।।৪৫।।

ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ = সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ বিষয়ক; বেদাঃ = বেদসমূহ; নিস্ত্রৈগুণ্যঃ = ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ নিষ্কাম; নির্দ্বন্দ্বঃ = সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ প্রভৃতির বোধরহিত; নিত্যসত্ত্বস্থঃ = সদা সত্ত্বগুণে অবস্থিত; নির্যোগক্ষেম = যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুকে রক্ষা করা এই উভয়বিধ ভাবনামুক্ত; আত্মবান্ = অধ্যাত্ম চেতনায় অবস্থিত।। ৪৫।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! বেদসমূহ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ বিষয়ক। তুমি ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ নিষ্কাম হও, নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ প্রভৃতির বোধ রহিত, নিত্যসত্ত্বস্থ অর্থাৎ সদা সত্ত্বগুণে অবস্থিত, নির্যোগক্ষেম অর্থাৎ যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুকে রক্ষা করা এই উভয়বিধ ভাবনামুক্ত ও আত্মবান অর্থাৎ অধ্যাত্ম চেতনায় অবস্থিত হও।। ৪৫।।

ব্যাখ্যা :- এই অধ্যায়ের ৪২-৪৫তম শ্লোকসমূহে আমরা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে এমন কিছু কথা শুনতে পাই যাতে কারও কারও মনে হতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ কি বেদবিরোধী ছিলেন? কারণ সনাতন ধর্মে বেদের উপর অটুট আস্থা। সাত্ত্বিক মনুষ্যগণ বেদোক্ত কর্মকাণ্ড যথা যাগ-যজ্ঞ, যোগ প্রভৃতি অটুট শ্রদ্ধার সঙ্গে পালনের মাধ্যমে পুণ্যার্জন ক'রে স্বর্গলাভের পথে ব্রতী হন। কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে কেবলমাত্র বেদোক্ত আচার-অনুষ্ঠান পালন শ্রেয় পথ নয়। তাহলে এখানে আপাতরূপে প্রতীয়মান হয় যে শ্রীকৃষ্ণ বেদের বিরোধিতা করেছেন। তিনি স্বর্গ লাভার্থে বেদোক্ত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ আচরণের বিধানকে আপাত মধুর বাক্য বলে অভিহিত করেছেন যার অনুসরণকারীরা অজ্ঞানী এবং যার উপরে আসক্ত হলে মানুষ ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হতে পারে না। তিনি আরও বলেছেন যে বেদ হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক যেগুলি মানুষের অন্তরে আসক্তি উৎপন্ন করে। তাই তিনি এই ত্রিগুণাত্মক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকার জন্য অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং আপাতভাবে দেখলে শ্রীকৃষ্ণকে বেদবিরোধী বলেই মনে দৃঢ় ধারণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু গভীরভাবে অনুধাবন করলে শ্রীকৃষ্ণকে কখনই বেদবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে না। সমস্ত শাস্ত্রেই বলা

হয়েছে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলের ঊর্ধ্বে--- তিনি বেদেরও ঊর্ধ্বে। শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৮-২৯তম সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে—

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।।
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ।।

অর্থাৎ সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় হলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বেদোক্ত সকল যজ্ঞ ও যোগের অনুষ্ঠান করা হয়, বেদোক্ত সকল কর্মের পরিসমাপ্তি তাঁর মধ্যেই হয়ে থাকে, জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই লাভ করা যায়, সকল তপস্যাই কৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভের জন্যই করা হয়, সমস্ত ধর্মানুষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তই করা হয় এবং সমস্ত গতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই সমাহিত হয়।

তাহলে যে বেদের সমস্তটাই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত তাকে যদি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অস্বীকার করেন তাহলে তো তাঁর নিজেকে নিজেই অস্বীকার করা হয়। বস্তুত বিষয়টি তা নয়। কোন সুউচ্চ অট্টালিকার যেমন প্রথমতল, দ্বিতল, ত্রিতল প্রভৃতি থাকে তেমনই তার বিশ/পঞ্চাশ তলও থাকতে পারে। এখন, যদি তার প্রথমতল/দ্বিতল/ ত্রিতলকে অস্বীকার করা হয় তাহলে তো তার বিশ/পঞ্চশ তলের কোন অস্তিত্ব থাকে না কারণ এই প্রথমতল/দ্বিতল/ত্রিতলই তো বিশ/পঞ্চাশতম তলকে ধারণ ক'রে আছে। অনুরূপভাবে বেদও শ্রীকৃষ্ণকথিত তত্ত্বকে ধারণ ক'রে আছে। বেদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকথিত তত্ত্বের পার্থক্য অন্যত্র। বেদে বলা হয়েছে যে বেদোক্ত আচার-অনুষ্ঠান পালন করলে মানুষের ঈপ্সিত স্বর্গ লাভ করা যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আর একটি পর্যায় ঊর্ধ্বে উঠেছেন। তিনি বলেছেন যে মানুষের ঈপ্সিত লক্ষ্য স্বর্গীয় সুখভোগের নিমিত্ত স্বর্গে সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের ঈপ্সিত লক্ষ্য হল স্বর্গেরও ঊর্ধ্বে — মোক্ষলাভ অর্থাৎ নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্তব্যকর্ম পালনের মাধ্যমে পরমাত্মায় লীন হয়ে যাওয়া। শ্রীকৃষ্ণের অভিমত হল যে স্বর্গ লাভের নিমিত্ত বেদোক্ত কর্ম অনুষ্ঠান আসক্তিহীনভাবে করা হয় না

— সেখানে যে আসক্তি বা বাসনা কাজ করে সেটি হল স্বর্গসুখভোগ। তাঁর মতে বেদোক্ত কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে অধঃপতিত মানুষকে একটা উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে তাকে স্বর্গে প্রবেশলাভের উপযোগী ক'রে তোলে, কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সকামভাবে পালিত এই সমস্ত বৈদিক ক্রিয়াকলাপ তাকে মোক্ষলাভের উপযোগী ক'রে তোলে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের অভিমত হল এই যে যদি মানুষ স্বর্গসুখ লাভার্থে কেবলমাত্র বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যেই তার সমস্ত বুদ্ধি সীমাবদ্ধ ক'রে রাখে তাহলে তার পক্ষে তার প্রকৃত ঈপ্সিত লক্ষ্য মোক্ষলাভ সম্ভব হবে না। তাই তিনি অর্জুনকে বেদোক্ত ক্রিয়া-কাণ্ডের মধ্যে সীমিত না থেকে নিষ্কামভাবে তাঁর কর্তব্য পালন অর্থাৎ যুদ্ধ করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন যা তাকে নিশ্চিতভাবে মোক্ষলাভের উপযুক্ত ক'রে তুলবে। কাজেই তিনি বেদের বিরুদ্ধে বলেননি, বরং তিনি বলতে চেয়েছেন যে বেদোক্ত কর্ম-কাণ্ড আচরণ কিভাবে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তাঁর বক্তব্যের অর্থ হল মানুষ নিশ্চয়ই বেদোক্ত যজ্ঞ, যোগ ইত্যাদি পালন করতে পারে কিন্তু অন্তরে স্বর্গসুখলাভের আসক্তি নিয়ে নয়, তা যেন পরিপূর্ণ নিষ্কামভাবে পালন করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান— সে বেদোক্ত ক্রিয়া-কলাপই হোক বা গৃহকর্মই হোক বা নিজের কর্তব্য পালনই হোক। কর্মের ফলের প্রতি অনাসক্তিই হল মোক্ষলাভের একমাত্র সোপান। তাই তিনি অর্জুনকে যুদ্ধের ফলাফলের প্রতি কোন প্রকার আসক্তি না রেখে নিষ্কামভাবে যুদ্ধ করার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সুচিন্তিত অভিমতের ইঙ্গিত হল এই যে মানুষের নিকট বেদোক্ত স্বর্গসুখলাভের বার্তা এমন সুমিষ্ট ও শ্রবণসুখকর বোধ হয় যে মানুষ সমস্ত মন-প্রাণ সহকারে কেবলমাত্র বেদোক্ত আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে তার সমস্ত বুদ্ধি নিয়োজিত ক'রে রাখে, অপেক্ষাকৃত কঠিন নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের প্রতি অগ্রসর হয় না। তাই মানুষের প্রকৃত ঈপ্সিত লক্ষ্য মোক্ষলাভের দিকে সে আর অগ্রসর হতে পারে না। তাই আসক্তিযুক্ত চিত্তে বেদোক্ত আচার-অনুষ্ঠান পালন অপেক্ষা নিষ্কামভাবে গৃহকর্ম সম্পাদন শ্রেয়।।৪৫।।

যাবান্ অর্থ উদপানে # সর্বতঃ সংপ্লুত-উদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু # ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।। ৪৬।।

যাবান্ = যে পরিমাণ; অর্থঃ = প্রয়োজন; উদপানে = ক্ষুদ্র জলাশয়ে; সর্বতঃ সংপ্লুত-উদকে = বিরাট জলাশয়ে; তাবান্ = সেই পরিমাণ; বিজানতঃ = ব্রহ্মজ্ঞানী; ব্রাহ্মণস্য = ব্রাহ্মণের।।৪৬।।

অনুবাদ :- আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে পরিমাণ জল প্রয়োজন তা যেমন ছোট কুপের মধ্যে আছে তেমনি সেই পরিমাণ জল বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যেও সঞ্চিত আছে। অনুরূপভাবে বেদের মধ্যে যে জ্ঞান সঞ্চিত আছে তার সমস্তই ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান।। ৪৬।।

কর্মণ্যেব্যধিকারস্তে # মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফল-হেতুঃ ভূঃ # মা তে সঙ্গঃ অস্তু অকর্মণি।।৪৭।।

কর্মণি = স্বধর্মবিহিত কর্মে; ফলেষু = কর্মফলে; কর্মফলহেতুঃ = কর্মফলের কারণে; ভূঃ = হবে; অকর্মণি = কর্মত্যাগে; সঙ্গঃ = আসক্তি; মা = না; অস্তু = হয়।।৪৭।।

অনুবাদ :- তোমার অধিকার স্বধর্মবিহিত কর্মেই, কর্মফলে কখনই নয়। সেই জন্য কর্মফল বা কর্মত্যাগের প্রতি কখনই যেন তোমার আসক্তি না হয় অর্থাৎ কর্ম ক'রে কখনই তার ফল কি হবে তা ভাববে না আবার কর্ম করার পর যেহেতু তার ফলে তোমার অধিকার নাই বা কর্ম করলে তার প্রতিবন্ধক ফলগুলি ভোগ করতে হবে এই ভয়ে কর্মটিকেই পরিত্যাগ করার কথাও ভাববে না, তোমার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব তোমাকে পালন করতেই হবে।। ৪৭।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে শাস্ত্রানুসারে স্বধর্মবিহিত কর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন। কর্ম তিন প্রকার—নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম এবং কাম্যকর্ম। প্রত্যহ সন্ধ্যা-আহ্নিক করাকে নিত্য কর্ম বলা হয়। পূর্ণিমা-অমাবস্যাদির নিমিত্ত আচরিত কর্মকে নৈমিত্তিক কর্ম এবং স্বর্গসুখাদি লাভের কামনায় পালিত কর্মকে কাম্য কর্ম বলা হয়। মুমুক্ষু জীবের পক্ষে কাম্যকর্ম মঙ্গলজনক নয় কারণ এই কামনা-পরিচালিত কর্মের দ্বারা সে স্বর্গলোক লাভ করলেও সেই কাম্যকর্মসমূহের পুণ্য সমাপ্ত হয়ে গেলে তাকে আবার পুনর্জন্মরূপ দুঃখের কবলে

পড়তে হয়। যাঁরা যোগ অবলম্বন করেন তাঁদের জন্য নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম করার বিধান শাস্ত্রে স্বীকৃত আছে।। ৪৭।।

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি # সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা # সমত্বং যোগ উচ্যতে।।৪৮।।

যোগস্থঃ = যোগে অবিচল থেকে; সঙ্গং = আসক্তি; ত্যক্ত্বা = পরিত্যাগ ক'রে; সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ = সাফল্য ও ব্যর্থতা; সমঃ = সমান; ভূত্বা = জ্ঞান ক'রে; কর্মাণি = কর্মসমূহ; কুরু = কর; সমত্বং = সমতার বোধকেই; যোগ উচ্যতে = যোগ বলা হয়ে থাকে।।৪৮।।

অনুবাদ :- হে ধনঞ্জয়! সর্বদা যোগে অবিচল থেকে আসক্তি পরিত্যাগ ক'রে সাফল্য ও ব্যর্থতাকে সমান জ্ঞান ক'রে কর্ম কর। এইরূপ সমতার বোধকেই যোগ বলা হয়ে থাকে।। ৪৮।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ খুব অল্পকথায় সরলভাবে একটি বৃহৎ তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 'যোগ' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা সাধারণের নিকট স্পষ্ট নয়। সচরাচর মানুষ 'যোগ' বলতে পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গিক যোগকেই বোঝে। আবার অনেকেই যোগ বলতে মনুষ্য সমাজ থেকে দূরে নির্জন স্থানে ব'সে সাধুদের চোখ বন্ধ ক'রে একমনে ধ্যান করাকেই বুঝে থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এখানে এই শব্দটির খুব সুন্দর ও সকলের সহজবোধ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে যোগ হল সেই মানসিক অবস্থা যখন মানুষ সাফল্য ও ব্যর্থতাকে সমান জ্ঞান করে অর্থাৎ সে কোন কাজে সফল হল কিনা বা বিফল হল কিনা এই রকম চিন্তা করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে এবং তখন তার আনন্দ-দুঃখ, সফলতা-বিফলতা, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় কোন বিষয়েই কোন প্রকার আসক্তি থাকে না। অন্তরের এই সমত্ব বোধকেই যোগ বলা হয়। তাঁর মতে এইটিই সর্বাপেক্ষা বড় তপস্যা। কাজেই তাঁর অভিমতে তপস্যা করার জন্য নির্জন স্থানে গিয়ে চোখ বুজে এক মনে ঈশ্বরের ধ্যান করার কোন প্রয়োজন নাই। সংসারে থেকেই এই প্রকার যোগযুক্ত হয়ে তার সমস্ত কর্ম করাই হল মুক্তির উপায়।। ৪৮।।

দূরেণ হি অবরং কর্ম # বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ # কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।। ৪৯।।

হি = নিশ্চিতভাবে; কর্ম = সকাম কর্ম; বুদ্ধিযোগাৎ = সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম অপেক্ষা; দূরেণ = বহু পরিমাণে বা নিতান্ত; অবরং = নিকৃষ্ট; বুদ্ধৌ = সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম; = শরণম্ = আশ্রয়; অন্বিচ্ছ = কামনা কর; ফলহেতবঃ = ফলের কারণে অর্থাৎ সকাম কর্ম যারা করে; কৃপণাঃ = অধম।। ৪৯।।

অনুবাদ :- হে ধনঞ্জয়! সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম অপেক্ষা সকাম কর্ম নিশ্চিতভাবে নিতান্তই নিকৃষ্ট। তাই তুমি সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম অনুষ্ঠানের প্রয়াসে ব্রতী হও। যারা ফলের আকাঙ্ক্ষায় সকাম কর্ম করে তারা কৃপণ অর্থাৎ অধম।।৪৯।।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতি ইহ # উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব # যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।। ৫০।।

বুদ্ধিযুক্তঃ = সমত্ববুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগী; ইহ = এই মরজগতে; সুকৃত-দুষ্কৃতে = পুণ্য ও পাপ; উভে = উভয়কেই; জহাতি = ত্যাগ করেন; তস্মাৎ = সেইজন্য; যোগায় = নিষ্কাম কর্মযোগের নিমিত্ত; যুজ্যস্ব = যুক্ত হও; যোগঃ = নিষ্কাম কর্মযোগ; কর্মসু = সকল কর্মের; কৌশলম্ = দক্ষতা।। ৫০।।

অনুবাদ :- সমত্ববুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগিগণ এই মরজগতেই পুণ্য ও পাপ উভয়কেই ত্যাগ করেন। সেইজন্য তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের নিমিত্তই কর্মে যুক্ত হও। সকল কর্মের দক্ষতার মূল হল নিষ্কাম কর্মযোগ।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন। কর্মে যদি দক্ষতা না থাকে তাহলে সেই কর্মে কোন সফলতা আসে না। সাধারণ কর্মে সেই দক্ষতা নির্ভর করে সততা, কর্মের প্রতি নিষ্ঠা প্রভৃতির উপর। সাধারণ অর্থে একজন ব্যবসায়ীর যদি সততা ও নিষ্ঠা না থাকে তাহলে তার ব্যবসায় অচিরেই পতনের পথে এগিয়ে যাবে। তেমনই যারা মোক্ষলাভে অভিলাষী তাদেরকে তাদের কর্মে দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং তা নির্ভর করবে তার আসক্তিবিহীন কর্ম সম্পাদনের উপর। কর্ম-বিমুখতা নয়, কর্মই মানুষকে মোক্ষলাভের পথে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং সেই কর্ম যতই বেশী আসক্তিহীন হবে ততই তার মোক্ষলাভের পথ সুগম হবে।। ৫০।।

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি # ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ-বিনির্মুক্তাঃ # পদং গচ্ছন্তি অনাময়ম্।। ৫১।।

বুদ্ধিযুক্তাঃ = সমত্ববুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ যাঁরা সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতির মধ্যে প্রভেদ দেখেন না; মনীষিণঃ = জ্ঞানিগণ; কর্মজং = কর্ম থেকে উদ্ভূত; ফলং = ফল; ত্যক্ত্বা = বর্জন ক'রে; জন্মবন্ধ = জন্ম-মৃত্যুর কালচক্রের বন্ধন; বিনির্মুক্তাঃ = ছিন্ন ক'রে; অনাময়ং = অপাপবিদ্ধ; পদং = বিষ্ণুপদ; হি = নিশ্চিতভাবে; গচ্ছন্তি = লাভ করেন।। ৫১।।

অনুবাদ :- সমত্ববুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্ম থেকে উদ্ভূত ফল বর্জন ক'রে জন্ম-মৃত্যুর কালচক্রের বন্ধন ছিন্ন ক'রে নিশ্চিতভাবে অপাপবিদ্ধ বিষ্ণুপদ লাভ করেন অর্থাৎ তাঁদের মোক্ষলাভ হয়।। ৫১।।

যদা তে মোহ-কলিলং # বুদ্ধিঃ ব্যতি-তরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং # শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।। ৫২।।

যদা = যখন; তে = তোমার; বুদ্ধিঃ = বুদ্ধি; মোহ = অজ্ঞানতা, অবিদ্যা; কলিলং = সুগভীর অন্ধকার; ব্যতিতরিষ্যতি = অতিক্রম করবে; তদা = তখন; শ্রোতব্যস্য = যা কিছু শুনবে; চ = এবং; শ্রুতস্য = যা কিছু শুনেছ সব কিছুর বিষয়ে; নির্বেদং = বৈরাগ্য; গন্তাসি = জন্মাবে।।৫২।।

অনুবাদ :- যখন তোমার বুদ্ধি অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার সুগভীর অন্ধকার অতিক্রম করবে তখন তোমার অন্তর জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত হবে এবং তখন তুমি ভবিষ্যতে যা কিছু শুনবে এবং ইতিপূর্বে যা কিছু শুনেছ সব কিছুর বিষয়ে তোমার অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হবে অর্থাৎ তুমি পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি সব কিছু বোধের ঊর্ধ্বে উঠে যাবে এবং তখন এসব কোন কিছুর বোধই তোমার অন্তরকে স্পর্শ করতে বা আন্দোলিত করতে পারবে না।।৫২।।

শ্রুতি-বিপ্রতিপন্না তে # যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধৌ অচলা বুদ্ধিঃ # তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি।। ৫৩।।

তে = তোমার; শ্রুতি = বেদ; বিপ্রতিপন্না = বিভ্রান্ত; বুদ্ধিঃ = বুদ্ধি; যদা = যখন; সমাধৌ = জীবাত্মা ও পরমাত্মার ধ্যানে; নিশ্চলা = নিশ্চল হয়ে; অচলা

= স্থির অবস্থায়; স্থাস্যতি = অবস্থান করবে; তদা = তখন; যোগম্ = যোগাবস্থা; অবাপ্স্যসি = প্রাপ্ত হবে।।৫৩।।

অনুবাদ :- বেদোক্ত ও লৌকিক বিভিন্ন বিধানসমূহের ফললাভের বিষয় শোনার ফলস্বরূপ তোমার বিভ্রান্ত বুদ্ধি যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার ধ্যানে সমাধিপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ নানা বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নানা দিকে ছোটাছুটি না ক'রে নিজের মনের মধ্যে স্থির অবস্থায় বিরাজ করবে তখনই তুমি আত্মদর্শনরূপ যোগাবস্থা লাভ করবে।।৫৩।।

ব্যাখ্যা :- এখানে সমাধি অর্থে মনকে বোঝানো হয়েছে। ভোগৈশ্বর্যে অতিরিক্ত আসক্ত জীবের আত্মবিষয়ক জ্ঞান নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তার মনে ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় হতে পারে না। শাস্ত্রজ্ঞান থেকে নিষ্কাম কর্মযোগের মাধ্যমে স্থিতপ্রজ্ঞতা নামক জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয় এবং এই স্থিতপ্রজ্ঞতা থেকে আত্মদর্শনরূপ যোগাবস্থা লাভ হয় আর এই আত্মজ্ঞানকে মনের মধ্যে যথার্থভাবে সমাহিত করা যায়। সেইজন্য রামানুজ তাঁর গীতাভাষ্যে (২/৪৪) মনকে সমাধি নামে অভিহিত করেছেন—"সমাধীয়তে অস্মিন্ আত্মজ্ঞানম্ ইতি সমাধিঃ মনঃ।" প্রকৃতপক্ষে আত্মজ্ঞান ব্যতীত যোগাবস্থা লাভ করা যায় না। সেইজন্য উপনিষদে আত্মদর্শনের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ ক'রে বলা হয়েছে 'আত্মানং বিদ্ধি'— 'নিজেকে অর্থাৎ আত্মাকে জান'। নিজেকে অর্থাৎ আত্মাকে জানা যায় একমাত্র নিজের মনের সাহায্যে। সেইজন্য এখানে মনের মধ্যে নিজের বুদ্ধিকে সমাহিত করার কথা বলা হয়েছে।।৫৩।।

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা # সমাধিস্থস্য কেশব।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত # কিম্ আসীত ব্রজেত কিম্।।৫৪।।

অর্জুনঃ উবাচ = অর্জুন বললেন; কেশব = হে কেশব; সমাধিস্থস্য = সমাধিস্থ ব্যক্তির; স্থিতপ্রজ্ঞস্য = স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির; কা ভাষা = কি লক্ষণ; স্থিতধীঃ = স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি; কিং = কিরূপ; প্রভাষেত = কথা বলেন; কিম্ = কিরূপে; আসীত = অবস্থান করেন; কিং = কিরূপে; ব্রজেত = বিচরণ করেন।।৫৪।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন— হে কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপ কথা বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন আর কিরূপেই বা বিচরণ করেন?।।৫৪।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ # সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।

আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ # স্থিতপ্রজ্ঞঃ তদা উচ্যতে।। ৫৫।।

আত্মনি এব = নিজের মধ্যেই; আত্মনা = নিজে; তুষ্টঃ = সন্তুষ্ট থাকে; যদা = যখন; মনোগতান্ = মনের; সর্বান্ = সমস্ত; কামান্ = কামনা; প্রজহাতি = ত্যাগ করেন; তদা = তখন; স্থিতপ্রজ্ঞঃ = স্থিতপ্রজ্ঞ; উচ্যতে = বলা হয়।।৫৫।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন— হে পার্থ! যখন কেউ তার মনের সমস্ত কামনা বর্জন ক'রে নিজের মধ্যেই নিজে সন্তুষ্ট থাকেন তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।।৫৫।।

দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ # সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ # স্থিতধীঃ মুনিঃ উচ্যতে।। ৫৬।।

দুঃখেষু = দুঃখ সমূহে; অনুদ্বিগ্নমনাঃ = উদ্বেগবিহীন মন; সুখেষু = সুখে; বিগতস্পৃহঃ = আসক্তিশূন্য; বীত = দূর হয়েছে এমন; রাগ = অনুরাগ; স্থিতধীঃ = স্থিতপ্রজ্ঞ; মুনিঃ = মুনি; উচ্যতে = বলা হয়।।৫৬।।

অনুবাদ :- দুঃখে যে ব্যক্তির মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখের প্রতি যাঁর মনে কোন আসক্তি হয় না, যাঁর অন্তর থেকে অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ সব দূর হয়েছে তাঁকেই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি অর্থাৎ আত্মমননশীল পুরুষ বলা হয়।।৫৬।।

ব্যাখ্যা :- দুঃখ হল প্রতিকূলতা, ক্ষতি, নিরাশা, শোক, অসহায়তা, হতাশা প্রভৃতি বিভিন্ন অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানসিক যন্ত্রণার এক বিমূর্ত প্রকাশ— "প্রতিকূলতয়া বেদনীয়ং দুঃখম্"। দুঃখ তিন প্রকার— আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। নিজের দেহ ও মনের বেদনার কারণে যে দুঃখ তাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলা হয়। যেমন শারীরিক অসুস্থতা, আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদ, মৃত্যু প্রভৃতির

কারণে প্রাপ্ত দুঃখ, প্রিয় বস্তু হারানো ও অপ্রিয় বস্তুর সঙ্গে সংযোগ প্রভৃতি। অন্যের যথা বিষাক্ত সাপ, পোকা-মাকড়, চোর-ডাকাত, প্রতারক প্রভৃতির নিকট থেকে প্রাপ্ত দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ বলা হয়। ঝড়- ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, বন্যা প্রভৃতি দৈব দুর্বিপাক জনিত দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা হয়। সাংসারিক সুখ ছয় প্রকার — ধনবৃদ্ধি, সুস্থ শরীর, সুন্দরী ভার্যা, প্রিয় মধুরভাষিণী পত্নী, আজ্ঞা বহনকারী পুত্র ও অর্থকরী বিদ্যা। অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষাকে রাগ বলা হয়। প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদ ও অপ্রিয় বস্তুর লাভের কারণকে দেখে মনে যে যন্ত্রণা হয় তাকে ভয় বলা হয়। প্রিয় বস্তুর সঙ্গে বিয়োগ এবং অপ্রিয় বস্তুর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে অন্যের উপর এই ঘটনা ঘটতে দেখে মনে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাকে ক্রোধ বলা হয়। যিনি এই তিন প্রকার দুঃখে বিচলিত হন না এবং এই ছয় প্রকার সুখের প্রতি আসক্ত নন তিনি হলেন স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি অর্থাৎ আত্মমননশীল পুরুষ।।৫৬।।

যঃ সর্বত্র অনভিস্নেহঃ # তৎ তৎ প্রাপ্য শুভ-অশুভম্।

ন অভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি # তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৫৭।।

যঃ = যিনি; সর্বত্র অনভিস্নেহঃ = সবক্ষেত্রেই মমতাশূন্য; তৎ তৎ = সেই সেই; শুভ-অশুভম্ = শুভ বা অশুভ বিষয়; প্রাপ্য = লাভ করেও; ন অভিনন্দতি = আনন্দ করেন না; ন দ্বেষ্টি = অসন্তুষ্ট হন না; তস্য = তার; প্রজ্ঞা = পূর্ণ জ্ঞান; প্রতিষ্ঠিতা = প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।।৫৭।।

অনুবাদ :- যিনি সর্বক্ষেত্রেই মমতাশূন্য অর্থাৎ আসক্তিবিহীন, কোন বিষয়ে ভালো বা মন্দ লাভ হলেও যিনি আনন্দ করেন না বা অসন্তুষ্ট হন না তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছেন অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।।৫৭।।

যদা সংহরতে চ অয়ং # কূর্মঃ অঙ্গানি ইব সর্বশঃ।

ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ # তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৫৮।।

কূর্মঃ = কচ্ছপ; অঙ্গানি = অঙ্গসমূহ; ইব = যে রকম; যদা = যখন; চ = এবং; অয়ং = তিনি; ইন্দ্রিয়াণি = ইন্দ্রিয়সমূহ; ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ = ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে; সংহরতে = গুটিয়ে নেন বা সরিয়ে রাখেন; সর্বশঃ = সর্বপ্রকারে; (তদা = তখন) তস্য = তাঁর; প্রজ্ঞা = জ্ঞান; প্রতিষ্ঠিতা = প্রতিষ্ঠিত।। ৫৮।।

অনুবাদ :- যেভাবে কচ্ছপ তার পা, মাথা ইত্যাদি তার কঠিন খোলার মধ্যে গুটিয়ে রাখে সেই রকমভাবে যখন কোন ব্যক্তি সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহকে সর্বপ্রকারে সরিয়ে রাখতে পারেন তখন তিনি প্রকৃত স্থির বুদ্ধি লাভ করেছেন বলা যায়।।৫৮।।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে # নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসঃ অপি অস্য # পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ।।৫৯।।

নিরাহারস্য = ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগে বিরত; দেহিনঃ = ব্যক্তিগণ; বিষয়াঃ = বিষয়সমূহ; বিনিবর্তন্তে = বিরত হয়; রসবর্জং = বিষয়রস ভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ; পরং = পরমেশ্বরকে; দৃষ্ট্বা = দেখে; অস্য = তাঁর; রসঃ = ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের বাসনা; অপি = ও; নিবর্ততে = দূর হয়।। ৫৯।।

অনুবাদ :- কোন মানুষ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগে বিরত হলেও তাঁর অন্তর থেকে বিষয়রস ভোগের আকাঙ্ক্ষা দূর হয় না। একমাত্র সেই পরমেশ্বরকে দেখলে অর্থাৎ তাঁর প্রতি সমর্পিতপ্রাণ হলে তবেই সেই ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের বাসনা দূর হয়।।৫৯।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে আত্মজ্ঞান কত দুর্লভ এবং তাকে কিভাবে লাভ করা যায় সে বিষয়ে অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন। নিরাহার মানে আহার গ্রহণ না করা। কিন্তু আহার গ্রহণ না করলেই চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি হতে গেলে বাসনার নিবৃত্তি হতে হবে। কিন্তু কেবলমাত্র আহার গ্রহণ না করলেই বাসনার নিবৃত্তি হয় না। অনেক মানুষ আছে যারা শারীরিক অসুস্থতার কারণে আহার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাদের মনে খাদ্যের প্রতি নিয়ত অতৃপ্ত বাসনা থেকে যায়। ফলে এই ধরণের মানুষের জীবনে কেবলমাত্র আহার ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার কারণেই জীবনের পরম লক্ষ্য মোক্ষলাভের পথ মসৃণ হয়ে ওঠে না কারণ তাদের ইন্দ্রিয় সংযত হয়ে ওঠে না আর ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত মোক্ষলাভের পথ সুগম হয় না। সেইজন্য এখানে মানুষকে অন্নাদি আহার গ্রহণ থেকে বিরত হওয়ার কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়সমূহের আহার গ্রহণ সংযত করার বিষয়। ইন্দ্রিয়সমূহের আহার্য বস্তু হল রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ ও স্পর্শ প্রভৃতি। বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু থেকে রস বর্জন করলে ধীরে ধীরে আসক্তি

দূর হয়ে দুর্লভ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভের পথ সুগম হয়। এখানে রস পদের অর্থ আসক্তি। মন থেকে শব্দাদি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আসক্তি দূর হলে মানুষ ক্রমশ মানবজীবনের লক্ষ্য পরমার্থ অর্থাৎ মোক্ষ লাভের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। অন্তর থেকে বিষয়ভোগের বাসনা দূর না হওয়া পর্যন্ত সেই পরমার্থকে লাভ করা যায় না আর অন্তর থেকে বিষয়ভোগের বাসনা দূর করা সংসারী মানুষের পক্ষে অতীব কঠিন। এখানে গীতায় বলা হয়েছে যে কেউ যদি পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে নিজের দেহ-মন-প্রাণ-সুখ-দুঃখ সকল কিছু নিঃস্বার্থভাবে সমর্পণ করতে পারে তাহলে পরমেশ্বর তখন নিজে এগিয়ে এসে ভক্তকে বিষয়ভোগের বাসনা দূর করার জন্য শক্তি দান করেন।। ৫৯।।

যততো হি অপি কৌন্তেয় # পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি # হরন্তি প্রসভং মনঃ।।৬০।।

কৌন্তেয় = হে কুন্তীপুত্র অর্জুন; প্রমাথীনি = চিত্ত বিক্ষেপকারী; ইন্দ্রিয়াণি হি= ইন্দ্রিয়সমূহই; যততঃ = যত্নশীল; বিপশ্চিতঃ = বিবেকবান; পুরুষস্য = পুরুষের; অপি = ও; মনঃ = চিত্ত; প্রসভং = বলপূর্বক; হরন্তি = হরণ করে।। ৬০।।

অনুবাদ :- হে কুন্তীপুত্র অর্জুন! চিত্ত বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়সমূহই যত্নশীল বিবেকবান পুরুষেরও চিত্তকে বলপূর্বক হরণ করে অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি আসক্ত করে।। ৬০।।

ব্যাখ্যা :- শ্রীকৃষ্ণ এখানে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে কত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত সে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। ইন্দ্রিয়সমূহের ক্ষমতা অপরিসীম। সহস্র চেষ্টা করলেও তাদের কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া দুষ্কর। বহু সিদ্ধপুরুষও অনেক সময় তাদের হাতে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এ বিষয়ে পুরাণে একটি উপাখ্যান আছে। একদা স্বয়ং বেদব্যাস তাঁর প্রিয় শিষ্য জৈমিনির কাছে এই শ্লোকটিরই ব্যাখ্যা করছিলেন। কিন্তু জৈমিনি তাঁর গুরুর সঙ্গে ইন্দ্রিয় যে বিবেকবান পুরুষকেও পরাজিত করতে পারে ভগবানের এই বক্তব্যের বিষয়ে একমত হতে পারেননি। সেইজন্য তিনি গুরু ব্যাসদেবকে শ্লোকটি থেকে ভগবান্ কথিত ‘বিপশ্চিত’ (বিবেকবান) পদটির পরিবর্তে অন্য পদ ব্যবহার করার

অনুরোধ করেন। ব্যাসদেব একদিন শিষ্যকে ইন্দ্রিয়সমূহের ক্ষমতা যে কত প্রবল সে বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য যোগবলে অতীব সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ ক'রে অন্যান্য রমণীদের সঙ্গে জৈমিনির সম্মুখে ক্রীড়া করতে শুরু করেন। এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত শুরু হলে অন্যান্য রমণীদের সঙ্গে রমণীরূপধারী ব্যাসদেবও ভিজে ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকেন। ইত্যবসরে অন্যান্য রমণীগণ অদৃশ্য হয়ে যায় এবং একেলা রমণীরূপী ব্যাসদেব ঠাণ্ডায় অতীব কাঁপতে থাকেন। তখন অতীব সাত্ত্বিক বিবেকবান জৈমিনি কন্যাটির প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে তাঁর পর্ণকুটিরে আশ্রয় দেন এবং কন্যাটিকে বলেন যে কোন কোন রাক্ষস মানুষের রূপ ধারণ ক'রে দরজা খোলার জন্য তাকে (কন্যাটিকে) ডাকতে পারে। সে যেন ভুলেও দরজা না খোলে। এদিকে গভীর রাত্রে জৈমিনির ঘুম ভেঙে যায় এবং দিনের বেলায় স্বচ্ছ শুভ্র বসন পরিহিত সিক্ত রমণীর দেহকান্তি স্মরণ ক'রে জৈমিনির মতিভ্রম হয় এবং তিনি দরজায় পুনঃ পুনঃ আঘাত ক'রে সেই কন্যাকে দ্বার খুলতে আহ্বান করেন। সেই কন্যা জৈমিনিরই পরামর্শমত দ্বার না খুললে জৈমিনি গৃহের ছাদ ভেঙে কুটিরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন। তখন তাঁর গুরু প্রকট হয়ে জৈমিনিকে পিছন থেকে তাঁর শিখা ধরে উপরদিকে টান দিতে থাকেন এবং সেই কন্যাটিও জৈমিনির পা ধরে নিচের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। এর ফলে জৈমিনি একসময় নিচে পড়ে গিয়ে দেহে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে দেখেন যে সেই কন্যাটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে এবং তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর গুরুদেব বেদব্যাস মৃদু মৃদু হাসছেন। তখন এই শ্লোকে ভগবান্ যে ভুল বলেননি এই বিষয়টি সম্বন্ধে জৈমিনি গুরুর সঙ্গে একমত হলেন।

মনুসংহিতাতেও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই শ্লোকের কথাই বলা হয়েছে — "বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামঃ বিদ্বাংসম্ অপি কর্ষতি" (মনুসংহিতা ২/২১৫)। সেইজন্য এখানে গীতার শিক্ষা হল যে ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন ও আকর্ষণ এতই প্রবল যে তা মানুষকে মুহূর্তে বিপথে পরিচালিত করতে পারে এবং এর ফলে তার মান-সম্মান-জীবন-সম্পদের সমূহ ক্ষতি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। সেইজন্য বুদ্ধিমান মানুষকে এদের সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকতে হবে।। ৬০।।

তানি সর্বাণি সংযম্য # যুক্ত আসীত মৎপরঃ।

বশে হি যস্য ইন্দ্রিয়াণি # তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৬১।।

মৎপরঃ = আমাতে সমর্পিত; তানি = সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়; সর্বাণি = সকলকে; সংযম্য = সংযত ক'রে; যুক্ত = যুক্ত হয়ে; আসীত = থাকে; বশে = বশীভূত; হি = নিশ্চিতভাবে; যস্য = যার; ইন্দ্রিয়াণি = ইন্দ্রিয়সমূহ; তস্য = তার, প্রজ্ঞা = পূর্ণজ্ঞান; প্রতিষ্ঠিতা = প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ লাভ হয়েছে।।৬১।।

অনুবাদ :- আমাতে সমর্পিতপ্রাণ যে ভক্ত তার ইন্দ্রিয়সকল সংযত ক'রে নিজেকে আমার সঙ্গে যুক্ত করে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে আমার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, আমার সেই ভক্তের ইন্দ্রিয়সমূহ তার বশে থাকে এবং সে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হয়।। ৬১।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে তাঁর ভক্তদের প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে যদি তাঁর কোন ভক্ত তার ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় তাহলে সেই প্রচেষ্টা তার একা একা নিজে নিজে করলে হবে না। এভাবে তার সাফল্য এলেও তা চিরস্থায়ী হবে না কারণ কিছুদিনের মধ্যেই তার প্রচণ্ড শক্তিশালী ইন্দ্রিয়সমূহের তাড়না তাকে পরাজিত ক'রে তার প্রচেষ্টাকে বিফল ক'রে দেবে। যেমন একজন ছাত্র কারও সাহায্য ছাড়াই নিজে নিজে অঙ্ক শিখতে শুরু করলে সে হয়তো কিছুদিন সফল হবে কিন্তু অচিরেই সে অপারগ হবে। সেইজন্য তাকে একজন শিক্ষকের সাহায্য নিতে হবে। সেইজন্য ভগবান্ বলেছেন যে তাঁর ভক্তের উচিত হবে তাঁর শ্রীচরণকমলে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করা। তাহলে সে ভগবানের নিকট থেকে শক্তি অর্জন ক'রে ইন্দ্রিয়সমূহের আক্রমণ চিরস্থায়ী ভাবে প্রতিহত করতে পারবে এবং তখন সে জীবনে পরম জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে।

আমরা বিষ্ণুপুরাণে এই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই —

তদ্রূপং বিশ্বরূপস্য তস্য যোগযুজা নৃপ।
চিন্তম্ আত্ম-বিশুদ্ধ্যর্থং সর্বকিল্বিষনাশনম্।

যথা অগ্নিঃ উদ্ধতশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ।
তথা চিত্তস্থিতঃ বিষ্ণুঃ যোগিনাং সর্বকিল্বিষম্।
তস্মাৎ সমস্তশক্তীনামাধারে তত্র চেতসঃ।
কুর্বীত সংস্থিতং সা তু বিজ্ঞেয়া শুদ্ধধারণা।।

—বিষ্ণুপুরাণ ৬/৭/৭২-৭৪

অর্থাৎ যোগযুক্ত ব্যক্তি চিত্তের বিশুদ্ধির জন্য সমস্ত পাপবিনাশন বিশ্বরূপের মোহন রূপ সদা চিন্তা করবেন। তাহলে ঊর্ধ্ব শিখাযুক্ত অগ্নি যেমন বায়ুর সাহচর্য লাভ ক'রে শুষ্ক তৃণরাশিকে ভস্ম করে তেমনই হৃদয়ে অবস্থিত ভগবান্ বিষ্ণু যোগিগণের সমস্ত পাপ নাশ করে থাকেন। সেই কারণে সমস্ত শক্তির আধার সেই ভগবানে চিত্ত স্থাপন করতে হবে। এরই নাম বিশুদ্ধ ধারণা।

সুতরাং ভক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অর্পণ করে জীবনের পরম আশ্রয় লাভে প্রয়াসী হলে তার মন থেকে সকল পাপরাশি, গ্লানি, ক্লেদ, আসক্তি, মদ, মাৎসর্য, অসূয়া সব দূর হয়ে তার অন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হবে। সমস্ত দেহ-মন পবিত্র হয়ে সে পরমার্থ লাভের যোগ্য হয়ে উঠবে।।।৬১।।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ # সঙ্গঃ তেষু উপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ # কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে।। ৬২।।

বিষয়ান্ = বিষয়সমূহের; ধ্যায়তঃ = চিন্তা করতে করতে; পুংসঃ = মানুষের; তেষু = তার উপরে; সঙ্গঃ = আসক্তি; উপজায়তে = জন্মলাভ করে; সঙ্গাৎ = আসক্তি থেকে; কামঃ = কামনা; সংজায়তে = সৃষ্টি হয়; কামাৎ = কামনা থেকে; ক্রোধঃ = ক্রোধ; অভিজায়তে = জন্মলাভ করে।।।৬২।।

অনুবাদ :- বিষয়সমূহের চিন্তা করতে করতে তার উপরে মানুষের আসক্তি জন্মলাভ করে, আসক্তি থেকে কাম সৃষ্টি হয় এবং কাম থেকে ক্রোধ জন্মলাভ করে।।।৬২।।

ব্যাখ্যা :- কাম কাকে বলে? এ বিষয়ে রামানুজাচার্য বলেছেন— " কামো নাম সঙ্গস্য বিপাকদশা। পুরুষো যাং দশাম্ আপন্নো বিষয়ান্ অভুক্ত্বা স্থাতুং ন শক্নোতি স

কামঃ।” অর্থাৎ আসক্তির পরিপক্ক অবস্থার নাম হল ‘কাম’। যে দশাকে লাভ করলে মানুষ বিষয় ভোগ বিনা থাকতে পারে না সেই দশাকে কাম’ বলা হয়।।৬২।।

ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ # সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃত্তিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো # বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।। ৬৩।।

ক্রোধাৎ = ক্রোধ থেকে; সম্মোহঃ = মোহ; ভবতি = হয়; সম্মোহাৎ = মোহ থেকে; স্মৃতিবিভ্রমঃ = স্মৃতিভ্রংশ; স্মৃত্তিভ্রংশাৎ = স্মৃতিভ্রংশ থেকে; বুদ্ধিনাশঃ = বুদ্ধিনাশ; বুদ্ধিনাশাৎ = বুদ্ধিনাশ থেকে; প্রণশ্যতি = বিনাশপ্রাপ্ত হয়।।৬৩।।

অনুবাদ :- ক্রোধ থেকে মোহ হয়, মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ থেকে বিনাশ ঘটে।।৬৩।।

রাগ-দ্বেষ-বিমুক্তৈঃ তু # বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈঃ চরন্

আত্মবশ্যৈঃ বিধেয়াত্মা # প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি।।৬৪।

রাগ = স্নেহ; দ্বেষ = বৈরিতা; বিমুক্তৈঃ = মুক্ত; তু = কিন্তু; আত্মবশ্যৈঃ = আত্মবশীভূত; ইন্দ্রিয়ৈঃ = ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা; বিষয়ান্ = বিষয়সমূহ; চরন্ = ভোগ ক’রে; বিধেয়াত্মা = সংযতচিত্ত মানুষ; প্রসাদম্ = আত্মপ্রসাদ; অধিগচ্ছতি = লাভ করেন।।৬৪।।

অনুবাদ :- কিন্তু স্নেহ এবং দ্বেষ মুক্ত হয়ে সংযতচিত্ত মানুষ আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয়সমূহ ভোগ ক’রে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।। ৬৪।।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং # হানিঃ অস্য উপজায়তে।

প্রসন্নচেতসো হি আশু # বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে।। ৬৫।।

প্রসাদে = আত্মপ্রসাদে; অস্য = তাঁহার; সর্বদুঃখানাং = সমস্ত দুঃখের; হানিঃ = পরিসমাপ্তি; উপজায়তে = ঘটে; হি = নিশ্চয়ই; প্রসন্নচেতসঃ = প্রসন্নচিত্ত; বুদ্ধিঃ = প্রজ্ঞা; আশু = দ্রুত; পর্যবতিষ্ঠতে = সর্বপ্রকারে প্রতিষ্ঠিত হয়।।৬৫।।

অনুবাদ :- এইরূপ আত্মপ্রসাদ ঘটলে তাঁর সমস্ত দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে কারণ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির প্রজ্ঞা দ্রুত ঈশ্বরে সর্বপ্রকারে প্রতিষ্ঠিত হয়।।৬৫।।

নাস্তি বুদ্ধিঃ অযুক্তস্য # ন চ অযুক্তস্য ভাবনা।

ন চ অভাবয়তঃ শান্তিঃ # অশান্তস্য কুতঃ সুখম্। ৬৬।।

অযুক্তস্য = যে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না; বুদ্ধিঃ = আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা; নাস্তি = নাই; চ = এবং; অযুক্তস্য = আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির; ভাবনা = ঈশ্বর সম্পর্কিত চিন্তা; ন অভাবয়তঃ = যার ঈশ্বর সম্পর্কিত চিন্তা নাই; শান্তিঃ = শান্তি; ন = নাই; চ = এবং; অশান্তস্য = যার শান্তি নাই তার; সুখং = সুখ; কুতঃ = কোথায়।। ৬৬।।

অনুবাদ :- যে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না তার আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা নাই এবং আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির ঈশ্বর সম্পর্কিত চিন্তা নাই, যার ঈশ্বর সম্পর্কিত চিন্তা নাই তার শান্তি নাই এবং যার শান্তি নাই তার সুখও নাই।। ৬৬।।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং # যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে।

তৎ অস্য হরতি প্রজ্ঞাং # বায়ুঃ নাবম্ ইব অম্ভসি।।৬৭।।

হি = নিশ্চিতভাবে; চরতাং = বিষয়ে আসক্ত; ইন্দ্রিয়াণাং = ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে; যৎ = যেটির; মনঃ অনুবিধীয়তে = মন অনুসরণ করে; তৎ = সেটি; বায়ুঃ = বায়ু; অম্ভসি = জলে; নাবম্ ইব = নৌকার মতই; অস্য = তার; প্রজ্ঞাং = বুদ্ধিকে; হরতি = হরণ করে।। ৬৭।।

অনুবাদ :- বিষয়ে আসক্ত মন ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যেটিকেই অনুসরণ করে সেটিই নিশ্চিতভাবে জলের উপর ভাসমান নৌকাকে যেমন বাতাস উড়িয়ে নিয়ে চলে যায় ঠিক তেমনই মানুষের বুদ্ধিকে হরণ করে।।৬৭।।

ব্যাখ্যা :- এখানে মনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করা হয়েছে। মানুষের ভাল-মন্দের কর্তা হল মন। মনই পারে মানুষকে পবিত্রতার শীর্ষে নিয়ে যেতে, আবার মনই পারে মানুষকে পাপের গহন অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে মনই মানুষের মুক্তি বা বন্ধের কারণ। এই মন যদি বিষয়ে আসক্ত হয় তাহলে তা মানুষের বন্ধের কারণ হয়ে ওঠে কিন্তু সেই মনই যদি বিষয়চিন্তামুক্ত হয় তাহলে তা মানুষের মুক্তির কারণ হয়ে ওঠে। সেইজন্য

জ্ঞানী মুনিগণ মনকে বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পরমেশ্বরের চরণে স্থাপন করেন —

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধস্য বিষয়াসঙ্গি মুক্তোর্নির্ব্বিষয়ং তথা।।
বিষয়েভ্যঃ সমাহৃত্য বিজ্ঞানাত্মা মনো মুনিঃ।
চিন্তয়েন্মুক্তয়ে তেন ব্রহ্মভূতং পরমেশ্বরম্।

—বিষ্ণুপুরাণ ৬/৭/২৮-২৯

সেইজন্য গীতার শিক্ষা হল যে মনকে সর্বদা সংযত রাখতে হবে। মনকে সর্বদা ভক্তিরূপ রজ্জুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভয় চরণযুগলরূপ যমলার্জুন বৃক্ষমূলে বন্ধন করে রাখলে সেই মনের আর পাগল ইন্দ্রিয়রূপ ঝড়ের আঘাতে উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না এবং ধীরে ধীরে মনে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে।।৬৭।।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো # নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ # তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। ৬৮।।

মহাবাহো = হে মহাবীর; তস্মাৎ = সেইজন্য; যস্য = যার; ইন্দ্রিয়াণি = ইন্দ্রিয়সমূহ; ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ = ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহ থেকে; সর্বশঃ = সকলপ্রকারে; নিগৃহীতানি = বিরত হয়েছে; তস্য = তার; প্রজ্ঞা = পূর্ণ জ্ঞান; প্রতিষ্ঠিতা = প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।।৬৮।।

অনুবাদ :- সেইজন্য হে মহাবীর! যাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহ থেকে সকল প্রকারে বিরত হয়েছে তিনি পূর্ণ স্থির জ্ঞান লাভ করেছেন।। ৬৮।।

যা নিশা সর্বভূতানাং # তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি # সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।৬৯।।

সর্ব-ভূতানাং = সকল জীবের; যা = যা; নিশা = রাত্রি; তস্যাং = তা; সংযমী = আত্মসংযমী; জাগর্তি = জেগে থাকেন; যস্যাং = যাতে; ভূতানি = জীবসকল; জাগ্রতি = জেগে থাকে; মুনেঃ = তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ; পশ্যতঃ = দেখেন; সা = তা; নিশা = রাত্রি।। ৬৯।।

অনুবাদ :- যে বিষয় জ্ঞানচক্ষুহীন সকল জীবের নিকট রাত্রির মত ঘোর অন্ধকারময়, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণের নিকট তা দিবালোকের মত স্পষ্ট। আবার জ্ঞানচক্ষুহীন সকল জীব যে বিষয়ে জেগে থাকে, সে বিষয়ে আত্মসংযমী জ্ঞানিগণ নিদ্রামগ্ন থাকেন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞানী জীব কোন রকম আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে না কিন্তু তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণের একমাত্র সেই বিষয়েই আগ্রহ থাকে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ভোগ সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞানী জীব আগ্রহ প্রকাশ করে, সেই বর্জনীয় বিষয়ে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন না।।৬৯।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে আত্মজ্ঞান লাভের সহায়ক হিসাবে 'সংযমী' পদটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই শ্লোকে উপর্যুক্ত যে বিষয়টি বিবৃত করা হয়েছে সেটি একজন সংযমী পুরুষ ব্যতীত কখনই সম্ভব নয়। একমাত্র সংযমী পুরুষের হৃদয়ই জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয় এবং সেইজন্যই তিনি সত্য দর্শন করতে পারেন। তাহলে আমাদের ভালভাবে বোঝা প্রয়োজন এই সংযম কি এবং তার স্বরূপ কি।

সম্যকরূপে যিনি যম পালন করেন তিনিই সংযমী। এখন যম শব্দটির প্রকৃত অর্থ বোঝা প্রয়োজন। যম হল শরীরসাধনসাপেক্ষ নিত্য কর্ম। শাণ্ডিল্য উপনিষদের প্রথম মন্ত্রে দশ প্রকার যমের উল্লেখ করা হয়েছে —

"তত্রাহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যদয়ার্জবক্ষমাধৃতিমিতাহারশৌচানি চেতি যমাদশ" অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য, দয়া, আর্জব (অকপটতা), ক্ষমা, ধৃতি(সহিষ্ণুতা), মিতাহার ও শৌচ অর্থাৎ শুদ্ধি। এই দশপ্রকার যম অর্থাৎ নিত্য কর্ম যাঁরা পালন করেন তাঁরা অন্তরে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হন এবং তাঁরা ইন্দ্রিয়ের উপর যথার্থ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন।

শাণ্ডিল্য উপনিষদে অহিংসা নামক যমের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হিংসা কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে— "হিংসা নাম মনোবাক্কায়-কর্মভিঃ সর্বভূতেষু সর্বদা ক্লেশজননম্" অর্থাৎ শরীর, মন ও কথার দ্বারা কৃত যে কর্ম সর্ব জীবের অন্তরে ক্লেশ বা দুঃখ উৎপন্ন করে তাই হল হিংসা। তাহলে সহজেই অনুমেয় যে, যে কাজ অপরের নিকট ক্লেশ বা কষ্টের কারণ হয় না সেটিই হল অহিংসা।

এরপর এই একই মন্ত্রে পরপর উপর্যুক্ত অবশিষ্ট নয়টি যমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সত্যের স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা জীবের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত যে যথার্থ বাক্য বলা যায় তাকেই সত্য বলা হয় —"সত্যং নাম মনোবাক্কায়-কর্মভির্ভূত-হিত-যথার্থ-অভিভাষণম্"। অস্তেয় হল শরীর, মন ও কথার দ্বারা অপরের দ্রব্যের প্রতি লোভ বা আকাঙ্ক্ষা না করা— "অস্তেয়ং নাম মনোবাক্কায়-কর্মভিঃ পরদ্রব্যেষু নিঃস্পৃহা।" এরপর ব্রহ্মচর্যের স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা সদা মৈথুন পরিত্যাগ করার নাম হল ব্রহ্মচর্য— "ব্রহ্মচর্য নাম সর্বাবস্থাসু মনোবাক্কায়-কর্মভিঃ সর্বত্র মৈথুনত্যাগঃ।" দয়া হল সর্বজীবে সর্বত্র অনুগ্রহ করা— "দয়া নাম সর্বভূতেষু সর্বত্রানুগ্রহঃ।" আর্জব বা সরলতা সম্পর্কে বলা হয়েছে— "আর্জবং নাম মনোবাক্কায়-কর্মণাং বিহিত-অবিহিতেষু জনেষু প্রবৃত্তৌ নিবৃত্তৌ বা একরূপত্বম্"। অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক বা বাচনিকভাবে বেদবিহিত বা অবিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া বা বিরত থাকা উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তির অন্তরে যে সমরূপ অবস্থান বিরাজ করে তাকে আর্জব বলা হয়। এরপর ক্ষমা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে কেউ প্রিয় আচরণ করুক বা অপ্রিয় আচরণ করুক, তাকে ভর্ৎসনা করুক বা পূজা করুক এই সমস্ত কিছুর প্রতি সহনশীলতার নাম হল ক্ষমা— "ক্ষমা নাম প্রিয়াপ্রিয়েষু সর্বেষু তাড়নপূজনেষু সহনম্"। অর্থের হানি বা লাভ, নিজের প্রিয় বন্ধুর বিয়োগ বা লাভ এই সব বিষয়ে চিত্তের দৃঢ়তা বজায় রাখার নাম ধৃতি— "ধৃতির্নামার্থহানৌ স্বেষ্টবন্ধুবিয়োগে তৎপ্রাপ্তৌ সর্বত্র চেতঃ স্থাপনম্"। মিতাহার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে উদরের চার ভাগের এক ভাগ খালি রেখে সুস্নিগ্ধ ও সুমিষ্ট বস্তু আহার করাকে মিতাহার বলা হয়— "মিতাহারো নাম চতুর্থাংশাবশেষকসুস্নিগ্ধমধুরাহারঃ।" উল্লেখ্য যে শ্রীকৃষ্ণ মিতাহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে বলেছেন যে অতিভোজনকারী বা একেবারে উপবাসীর পক্ষে যোগসমাধি লাভ করা সম্ভব নয়। শাণ্ডিল্য উপনিষদের প্রথম শ্লোকে শৌচ সম্পর্কে সর্বশেষ আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে শৌচ দুই প্রকারের— বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক। বাহ্যিক শৌচ মাটি ও জলের দ্বারা সম্পন্ন করা যায়। মনের শৌচ

হল আভ্যন্তরিক শৌচ — “শোচং নাম দ্বিবিধং বাহ্যমান্তরং চেতি। তত্র মৃজ্জলাভ্যাং বাহ্যম্। মনঃশুদ্ধিরান্তরম্” অর্থাৎ মাটি, জল প্রভৃতির দ্বারা বাহ্যিক শৌচ করা যায়। আভ্যন্তরিক শৌচ চিত্তের শুদ্ধি ও ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে পাওয়া যায়— “তদধ্যাত্মবিদ্যয়া লভ্যম্।”

এই দশ প্রকার যম পালন সম্পর্কে অন্তরে সম্যক উপলব্ধি না হলে গীতার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।।৬৯।।

আপূর্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠং # সমুদ্রম্ আপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে # স শান্তিম্ আপ্নোতি ন কামকামী।। ৭০।।

আপূর্যমাণম্ = পরিপূর্ণ; অচলপ্রতিষ্ঠং = স্থির; অচঞ্চল; সমুদ্রম্ = সমুদ্রে; যদ্বৎ = যে রকম; আপঃ = জল; প্রবিশন্তি = প্রবেশ করে; তদ্বৎ = তেমনই; যং = যার মধ্যে; সর্বে = সকল; কামা = কামনা; প্রবিশন্তি = প্রবেশ করে; স = তিনি; শান্তিম্ = চিত্তের প্রশান্তি; আপ্নোতি = লাভ করেন; ন = নয়; কামকামী = বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি।।৭০।।

অনুবাদ :- অতুল জলরাশিবিশিষ্ট শান্ত সমুদ্রের মধ্যে যেমন চারিদিক থেকে নদ-নদী বাহিত জলরাশি প্রবেশ করলেও সেই স্থির সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে কোনরকম আন্দোলন দেখা যায় না বা সমুদ্রের কোন রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না, তেমনই তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের মধ্যে সকল বিষয় প্রবেশ করলেও তা তাঁর মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়। ফলে তিনি চিত্তের প্রশান্তি লাভ ক'রে থাকেন। কিন্তু বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের সেরূপ শান্তিলাভ হয় না।।৭০।।

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ # পুমান্ চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ # স শান্তিম্ অধিগচ্ছতি।। ৭১।।

যঃ = যে; পুমান্ = পুরুষ; সর্বান্ = সমস্ত; কামান্ = বাসনা; বিহায় = পরিত্যাগ ক'রে; নিঃস্পৃহঃ = স্পৃহাহীন; নির্মমঃ = ‘আমার-আমার’ বোধহীন; নিরহঙ্কারঃ = অহঙ্কারশূন্য; চরতি = বিচরণ করেন; স = তিনি; শান্তিম্ = শান্তি; অধিগচ্ছতি = লাভ করেন।। ৭১।।

অনুবাদ :-যে ব্যক্তি জীবনে সকল প্রকার কামনা-বাসনা ত্যাগ করেছেন, যাঁর কোন বিষয়ে কোন রকম আকাঙ্ক্ষা নাই, কোন বিষয়ে মমতা অর্থাৎ 'আমার-আমার' বোধ নাই, যিনি সর্বদা অহঙ্কারশূন্য জীবন যাপন করেন তিনিই জীবনে শান্তি লাভ করে থাকেন।।৭১।।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ # ন এনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বা অস্যাম্ অন্তকালে অপি # ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋচ্ছতি।। ৭২।।

এষা = এই হল; ব্রাহ্মী = ব্রহ্মজ্ঞান; স্থিতিঃ = অবস্থান; এনাং = তাঁকে; প্রাপ্য = লাভ করলে; বিমুহ্যতি = বিষয়ের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়; অন্তকালে = মৃত্যুর সময়; অপি = ও; অস্যাং = এই অবস্থায়; স্থিত্বা = থেকে; ব্রহ্মনির্বাণম্ = ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে মোক্ষলাভ; ঋচ্ছতি = করেন।। ৭২।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! একে বলা হয় ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান। কেউ এই অবস্থা লাভ করলে তিনি আর পার্থিব ভোগ্যবিষয়ের দ্বারা কখনও মোহিত হন না। মৃত্যুর সময়েও এই অবস্থায় থেকে তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে মোক্ষলাভ করেন।। ৭২।।

—: দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত :—

তৃতীয় অধ্যায়
কর্মযোগ

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণঃ তে # মতা বুদ্ধিঃ জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং # নিয়োজয়সি কেশব।।১।।

চেৎ = যদি; তে = আপনার; মতা = মতে; কর্মণঃ = কর্ম অপেক্ষা; বুদ্ধিঃ = জ্ঞান; জ্যায়সী = শ্রেষ্ঠ; তৎ = তাহলে; কিং = কেন; ঘোরে = ভয়ানক; কর্মণি = কাজে; মাং = আমাকে; নিয়োজয়সি = লিপ্ত করছেন।। ১।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন - হে জনার্দন! যদি আপনার মতে কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে হে কেশব! কেন আপনি আমাকে এরকম ভয়ানক কাজে লিপ্ত করছেন?।।১।।

ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন # বুদ্ধিং মোহয়সি ইব মে।
তৎ একং বদ নিশ্চিত্য # যেন শ্রেয়ঃ অহম্ আপ্নুয়াম্।। ২।।

ব্যামিশ্রেণ = নানার্থক; ইব = নিশ্চিতভাবে; বাক্যেন = বাক্যের দ্বারা; মে = আমার; বুদ্ধিং মোহয়সি ইব = আমার মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত; তৎ = সেইজন্য; নিশ্চিত্য = ঠিক করে; একং = একটি পথ; বদ = বলুন; যেন = যার দ্বারা; অহম্ = আমি; শ্রেয়ঃ = সঠিক পথটি; আপ্নুয়াম্ = লাভ করতে পারি।। ২।।

অনুবাদ :- নানার্থক কথা ব'লে আপনি আমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। আপনি আমাকে ঠিক ক'রে একটিই পথ বলুন যাতে আমি শ্রেয় পথটি পেতে পারি।।২।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

লোকে অস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা # পুরা প্রোক্তা ময়া অনঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং # কর্মযোগেন যোগিনাম্।। ৩।।

উবাচ = বললেন; হে অনঘ = হে নির্মলচিত্ত অর্জুন; অস্মিন্ = এই;

লোকে = সংসারে; দ্বিবিধা = দুই প্রকার; নিষ্ঠা = স্থিতি; ময়া = আমার দ্বারা; পুরা = পূর্বে; প্রোক্তা = বলা হয়েছে; সাংখ্যানাং = যারা জ্ঞান অর্জন করতে চায়; জ্ঞানযোগেন = জ্ঞানযোগ; যোগিনাম্ = নিষ্কাম কর্মীদের; কর্মযোগেন = নিষ্কাম কর্মযোগ।। ৩।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন - হে নির্মলচিত্ত অর্জুন! আমি পূর্বে (সৃষ্টির আদিকালে এবং তারপর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবতারদের নিকট) বলেছি (এবং আজ তোমাকে বলছি) যে এই সংসারে দুই প্রকার নিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি বা অবস্থান আছে - সাংখ্যদের জন্য জ্ঞাননিষ্ঠা এবং কর্মীদের জন্য নিষ্কাম কর্মনিষ্ঠা।।৩।।

ব্যাখ্যা :- সংখ্যা শব্দের একটি অর্থ হল — বুদ্ধি। সেইজন্য যাঁরা বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত তাঁদেরকে সাংখ্য বলা হয়। আর যে বুদ্ধির যোগ্য নয় কিন্তু কর্মের অধিকারী তাঁকে কর্মযোগী বলা হয়। রামানুজাচার্য বলেছেন — "আত্মৈকবিষয়য়া বুদ্ধ্যা যুক্তাঃ সাংখ্যাঃ" অর্থাৎ যাঁরা একমাত্র আত্মবিষয়ক বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত তাঁরাই হলেন সাংখ্য। যিনি প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সমস্ত গুণের সঙ্গে সম্পর্কহীন, যিনি শরীর ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কাজ নিজে করেন এরকম মনে করেন না, কোন কাজের ফলের উপর যাঁর কোন অহঙ্কার আসক্তি, কামনা, বাসনা থাকে না, যিনি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যান তখন যোগীর সেই স্থিতিকে জ্ঞাননিষ্ঠা বলা হয়। আর যিনি সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম নিরাসক্তচিত্তে পালন করেন তাঁকে কর্মনিষ্ঠ বা কর্মযোগী বলা হয়। যিনি বিষয়-ব্যাকুলবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত তাঁর অধিকার কর্মযোগে এবং যাঁর বুদ্ধি স্থির অর্থাৎ যাঁর চিত্ত বিষয়-ব্যাকুল নয় তাঁর অধিকার জ্ঞানযোগে।। ৩।।

ন কর্মণাম্ অনারম্ভাৎ # নৈষ্কর্ম্যং পুরুষঃ অশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাৎ এব # সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।৪।।

পুরুষঃ = পুরুষ; কর্মণাম্ = কর্মসমূহ; অনারম্ভাৎ = আরম্ভ না ক'রে; নৈষ্কর্ম্যং = কর্মফলের হাত থেকে মুক্তি; ন অশ্নুতে = লাভ করতে পারে না; সন্ন্যাসনাৎ = সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বারা; এব = কেবল; চ = ও; সিদ্ধিং = সিদ্ধিলাভ; ন সমধিগচ্ছতি = লাভ হয় না।।৪।।

অনুবাদ :- কেউ কোন কর্ম না করলেও কর্মফলের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে না। আবার সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই কারও সিদ্ধিলাভ লাভ হয় না।।৪।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ভগবান্ একটি পদ ব্যবহার করেছেন—'নৈষ্কর্ম্য'। প্রচলিত ভাষায় আমরা অনেক ক্ষেত্রে 'নিষ্কর্মা' শব্দটি প্রায়শই ব্যবহার করতে শুনি। 'নিষ্কর্মা' শব্দটি বিশেষণ। নিষ্কর্মার ভাব = নৈষ্কর্ম্য। সাধারণভাবে নিষ্কর্মা শব্দের অর্থ হল অকর্মণ্য, কর্মহীন, বেকার প্রভৃতি। তাহলে নিষ্কর্মার বিশেষ্য নৈষ্কর্ম্য শব্দের অর্থ হল অকর্মণ্যের ভাব। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠের ক্ষেত্রে নৈষ্কর্ম্য শব্দটির এরকম প্রচলিত অর্থ গ্রহণ ক'রে নিলে ভুল হবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নৈষ্কর্ম্য শব্দটিকে প্রচলিত অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বৃহৎ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নৈষ্কর্ম্য শব্দটির অর্থ হল যোগীর এক বিশেষ অবস্থা যখন তিনি অন্তরের সমস্ত প্রকার কামনা, বাসনা, আসক্তি, রাগ, দ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ ও শুদ্ধ চিত্তে তাঁর কর্তব্য কর্ম করে যান। তখন তাঁর কর্ম করার জন্য কোন প্রকার কর্মবন্ধন জন্মায় না। যোগীর এই অবস্থাকে নৈষ্কর্ম্য বলা হয়। কর্মের মাধ্যমেই নৈষ্কর্ম্য লাভ করা যায়, আদৌ কোন কর্ম না ক'রে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বসে থাকলে কারোরই পক্ষে নৈষ্কর্ম্য অবস্থা লাভ করা যাবে না। দেহে যতদিন প্রাণ থাকবে ততদিন মানুষকে কোন না কোন কর্ম করতেই হবে যা তাদের কর্মবন্ধনের কারণ হবে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহচিত্তে কর্ম করলে কর্মযোগীর কর্মবন্ধন না হয়ে নৈষ্কর্ম্য অবস্থা প্রাপ্ত হবে যার ফলে যোগীর মোক্ষপ্রাপ্তি হবে। নৈষ্কর্ম্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে কিভাবে কর্ম করতে হয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। তিনি সবই করেছেন— বিবাহ করেছেন, বিবাহে আনন্দ করেছেন, নিজের আপনজনদের খোঁজ-খবর রেখেছেন, স্ত্রীর সঙ্গে বসে বসে গাল-গল্প করেছেন, থিয়েটার দেখেছেন, গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে ফুলকো লুচি খাওয়া হবে না জেনে বালকসুলভ আচরণ করেছেন ইত্যাদি। কিন্তু কোন কিছুরই প্রতি তাঁর অন্তরে কোন আসক্তি, কামনা, বাসনা, রাগ, দ্বেষ ছিল না। তিনি সমস্ত কিছুরই মধ্যেই আছেন কিন্তু ঠিক যেন পাঁকাল মাছটির মত— কাদায় আছে কিন্তু তার গায়ে কখনও কাদা লাগে না। সেইজন্য তাঁর কর্মবন্ধন হয়নি। এই হল পরিপূর্ণ নৈষ্কর্ম্য অবস্থায় স্থিতি। সুতরাং জীবনের লক্ষ্য মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য নৈষ্কর্ম্য অবস্থা লাভ করতে হবে আর নৈষ্কর্ম্য অবস্থা লাভ করার একমাত্র শর্ত হল নিরাসক্ত চিত্তে কর্ম করা। সুতরাং কেউ যদি কর্মই না করে তাহলে তার পক্ষে নৈষ্কর্ম্য অবস্থা লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। সেইজন্য তার কর্মবন্ধনও কাটবে না। সেইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে কর্ম ত্যাগ করলে নৈষ্কর্ম্য অবস্থা লাভ

হবে না ফলে মোক্ষলাভের দ্বারও উন্মুক্ত হবে না। সেইজন্যই তিনি পুনঃ পুনঃ অর্জুনকে আসক্তিবিহীন হয়ে যুদ্ধ করতে বলেছেন।।৪।।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণম্ অপি # জাতু তিষ্ঠতি অকর্মকৃৎ।
কার্যতে হি অবশঃ কর্ম # সর্বঃ প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ।।৫।।

হি = নিশ্চিতভাবে; কশ্চিৎ = কোন ব্যক্তি; ক্ষণম্ = মুহূর্তকাল; অপি = ও; জাতু = কখনও; অকর্মকৃৎ = কর্মহীন হয়ে; ন তিষ্ঠতি = থাকতে পারে না; হি = অবশ্যই; সর্বঃ = সকলে; প্রকৃতিজৈঃ = প্রকৃতিজাত; গুণৈঃ = গুণের দ্বারা; অবশঃ = বশবর্তী হয়ে; কর্ম = কাজ; কার্যতে = করতে বাধ্য হয়।। ৫।।

অনুবাদ :- নিশ্চিতভাবেই কোন ব্যক্তি কখনই কাজ না ক'রে মুহূর্তকালও থাকতে পারে না। সকলে অবশ্যই প্রকৃতিজাত গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) তাড়নায় বিবশ হয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়।।৫।।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য # য আস্তে মনসা স্মরন্
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়-আত্মা # মিথ্যাচারঃ সঃ উচ্যতে।। ৬।।

যঃ = যে; বিমূঢ় = মূঢ়; আত্মা = চিত্ত; মনসা = মনে মনে; ইন্দ্রিয়ার্থান্ = ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকল; স্মরন্ = মনে রেখে; কর্মেন্দ্রিয়াণি = হাত, পা প্রভৃতি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়; সংযম্য = সংযত রেখে; আস্তে = অবস্থান করে; সঃ = তাকে; মিথ্যাচারঃ = কপটাচারী; উচ্যতে = বলা হয়।।৬।।

অনুবাদ :- যে মূঢ় ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকলকে মনে রাখে কিন্তু হাত, পা প্রভৃতি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় সংযত রেখে কোন কর্ম না ক'রে অবস্থান করে (অর্থাৎ যার মন থেকে ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি দূর হয়নি) তাকে মিথ্যাচারী বলা হয়।। ৬।।

যঃ তু ইন্দ্রিয়াণি মনসা # নিয়ম্য আরভতে অর্জুন।
কর্ম-ইন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগম্ # অসক্তঃ স বিশিষ্যতে।।৭।।

অর্জুন = হে অর্জুন; যঃ = যিনি; তু = কিন্তু; ইন্দ্রিয়াণি = জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ; মনসা = অন্তরে; নিয়ম্য = সংযত রেখে; অসক্তঃ = নিরাসক্ত হয়ে; কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ = কর্মেন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা; কর্মযোগম্ = নিষ্কাম কর্মযোগ; আরভতে = আচরণ করেন; সঃ = তিনি; বিশিষ্যতে = শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।।৭।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! কিন্তু যিনি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে অন্তরে সংযত রেখে নিরাসক্ত হয়ে কর্মেন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নিষ্কাম কর্মযোগ আচরণ করেন তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।।৭।।

ব্যাখ্যা :- চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক এইগুলি হল জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হাত, পা, বাক অর্থাৎ মুখ, পায়ু অর্থাৎ মলদ্বার ও উপস্থ অর্থাৎ জননাঙ্গ এইগুলি হল কর্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যদি সংযত রাখা যায় তাহলে কর্মেন্দ্রিয়গুলি ইচ্ছামত চলে মানুষের জীবন কলুষিত করতে পারবে না এবং মানুষের জীবন সুন্দর ও শুচিতাপূর্ণ হয়ে উঠবে।।৭।।

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং # কর্ম জ্যায়ো হি অকর্মণঃ।
শরীর-যাত্রা অপি চ তে # ন প্রসিধ্যেৎ অকর্মণঃ।। ৮।।

ত্বং = তুমি; নিয়তং = সর্বদা; কর্ম = নির্ধারিত কর্তব্য; কুরু = করে যাও; হি = নিশ্চিতভাবে; অকর্মণঃ = কর্ম-বিমুখতা অপেক্ষা; কর্ম = কর্ম করা; জ্যায়ঃ = ভাল; চ = এবং; অকর্মণঃ = কর্ম-বিমুখতা; শরীর-যাত্রা = দেহ ঠিক রাখা; অপি = ও; ন প্রসিধ্যেৎ = যায় না।।৮।।

অনুবাদ :- তুমি সর্বদা নিয়ত কর্ম অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য ক'রে যাও। নিশ্চিতভাবে কর্ম-বিমুখতা অপেক্ষা কর্ম করা ভাল এবং কর্ম না করলে শরীরযাত্রা নির্বাহও সিদ্ধ হবে না (কারণ শরীর ঠিক রাখতে গেলে কিছু না কিছু কর্ম করাও প্রয়োজন)।।৮।।

ব্যাখ্যা :- শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে অর্জুনকে 'নিয়তকর্ম' করার উপদেশ দিয়েছেন। এখন, তিনি নিয়ত কর্ম বলতে ঠিক কি বুঝিয়েছেন সেটি জানা প্রয়োজন। অনেক প্রাচীন ব্যাখ্যাকার 'নিয়ত' শব্দের অর্থ করেছেন সন্ধ্যোপাসনা, শ্রাদ্ধাদি প্রভৃতি কর্ম। কিন্তু এখানে অর্থটি সে রকম নয় কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এতক্ষণ যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার নিরলস প্রয়াস করার পর হঠাৎ তাঁকে সন্ধ্যোপাসনাদি করার জন্য প্রেরণা দেবেন সেটি যুক্তিগ্রাহ্য নয়। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি গুণিগণ নিয়তকর্ম অর্থে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম, স্বধর্মকে বুঝিয়েছেন। রামানুজ তাঁর গীতাভাষ্যে বলেছেন যে এখানে নিয়ত মানে 'ব্যাপ্ত' কারণ কর্ম প্রকৃতির সঙ্গে সংসর্গযুক্ত জীবাত্মার সঙ্গে পরিব্যাপ্ত থাকে। চিরন্তন বাসনার কারণে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার সংসর্গ থাকে। সেইজন্য প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

হওয়ার কারণে কর্মটি একদিকে যেমন সুখসাধ্য হয় অপরদিকে সেটি করতে প্রমাদ বা ভ্রান্তির ভয় থাকে না। প্রকৃতিসংসৃষ্টত্বম্ অনাদি বাসনয়া। নিয়তত্বেন সুশকত্বাদ্ অসংভাবিতপ্রমাদত্বাচ্চ কর্মণঃ।” সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ম করতে বলছেন। রামানুজের ব্যাখ্যাটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

এই শ্লোকে ‘অকর্ম’ বলতে শ্রীকৃষ্ণ কি বুঝিয়েছেন সেটিও সম্যক বোঝা প্রয়োজন। সাধারণভাবে অকর্ম বলতে অপকর্ম, কর্মত্যাগ প্রভৃতি বোঝায়। তাহলে কি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অপকর্ম করা বা অলসভাবে বসে থেকে কালাতিপাত করা অপেক্ষা কর্ম করা ভালো বলেছিলেন? না, বিষয়টি সেরকম নয়। এখানে আমরা যা কিছু ভাবব তার সমস্তটাই গীতার আলোকে ভাবাই সমীচীন। আমরা আগেই দেখেছি যে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট জানতে চেয়েছিলেন যে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ। আমরা পূর্বেই দেখেছি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পূর্বেই বলেছেন যে, জ্ঞান অর্জনের দুটি নিষ্ঠা বা পথ আছে— একটি হল জ্ঞাননিষ্ঠা এবং অপরটি হল নিষ্কাম কর্মনিষ্ঠা। যাঁরা জ্ঞাননিষ্ঠা অনুসরণ করেন তাঁরা কোন কর্ম করেন না, কেবল জ্ঞানান্বেষণে রত থাকেন। কিন্তু যাঁরা কর্মনিষ্ঠায় বিশ্বাসী তাঁরা নিষ্কাম কর্মও করেন আবার জ্ঞান আহরণেও যুক্ত থাকেন। এখানে অকর্ম বলতে দুষ্কর্ম বা অলসভাবে বসে কালক্ষয়কে বোঝানো হয়নি, বোঝানো হয়েছে জ্ঞাননিষ্ঠা অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্যকে বা সর্বকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক জ্ঞানান্বেষণে ব্রতী হওয়াকে। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে জ্ঞানযোগের ক্ষেত্রে মধ্যপথে প্রয়াস পরিত্যাগ করলে যতটুকু অগ্রসর হওয়া গিয়েছে তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় এবং সঠিকভাবে না করতে পারলে তা ক্ষতির কারণও হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কর্মযোগের অনুষ্ঠান যতটুকু যেভাবেই করা হোক না কেন তার সুফল কর্মযোগী লাভ ক’রে থাকেন। আবার কর্মযোগীদের কর্ম করার কারণে তাদের শরীর যাত্রাও সিদ্ধ হয় কিন্তু জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণের শরীরযাত্রাও সিদ্ধ হয় না। আর যদি শরীরই না থাকে তাহলে জ্ঞাননিষ্ঠা পূর্ণ হওয়ার উপায় থাকে না। অন্তত যতদিন জ্ঞাননিষ্ঠা পরিপূর্ণতা লাভ না করে ততদিন শরীর রাখতেই হবে। আবার, জ্ঞাননিষ্ঠা আচরণকারী ব্যক্তিগণ পূর্ব থেকেই এই বিষয়ে অভ্যস্ত থাকেন না। সেই কারণে এই নিষ্ঠা তাদের মধ্যে নিয়ত অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত থাকে না। ফলে অনেক কষ্টের সাহায্যে এই পথে সিদ্ধি লাভ করতে হয় এবং এই জন্য এখানে অনেক ভুল-ভ্রান্তি

হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অপরদিকে কর্মনিষ্ঠা অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষাকৃত সহজ এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনাবিহীন। সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণ অকর্ম অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা অপেক্ষা কর্মনিষ্ঠাকে অধিকতর ভালো আখ্যা দিয়েছেন।। ৮।।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ অন্যত্র # লোকঃ অয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তৎ অর্থং কর্ম কৌন্তেয় # মুক্ত-সঙ্গঃ সমাচর।। ৯।।

যজ্ঞার্থাৎ = যজ্ঞের উদ্দেশ্যে; কর্মণঃ = কর্ম; অন্যত্র = অন্য প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত কর্ম; অয়ং = এই; লোকঃ = ইহ লোকে; কর্মবন্ধনঃ = কর্মবন্ধনের কারণ; মুক্ত = মুক্ত হয়ে; সঙ্গঃ = আসক্তি; তৎ = সেই; অর্থম্ = উদ্দেশ্যে অর্থাৎ যজ্ঞের নিমিত্তই; কর্ম সমাচর = কর্মের অনুষ্ঠান কর।। ৯।।

অনুবাদ :- যজ্ঞের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্মই হল প্রকৃত কর্ম আর অন্য উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম এই ইহলোকে কর্মবন্ধনের কারণ। সেইজন্য হে কৌন্তেয়! তুমি আসক্তিমুক্ত হয়ে সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই কর্মের অনুষ্ঠান কর।।৯।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ব্যবহৃত 'যজ্ঞ' শব্দটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে। যজ্ঞ বলতে সাধারণত বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপকেই বোঝানো হয়। গীতারও বহুস্থলে যজ্ঞ শব্দের দ্বারা বৈদিক ক্রিয়াকলাপকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এখানে 'যজ্ঞ' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে — বৈদিক ক্রিয়াকলাপ না বিষ্ণুকে সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণের ১/২/১৩ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে যজ্ঞই বিষ্ণু। ভাষ্যকার সায়নও যজ্ঞকে বিষ্ণু বলেই স্বীকার করেছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও বলা হয়েছে — "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ (১/৭/৪) এবং শঙ্করাচার্যও তাঁর ভাষ্যে তৈত্তিরীয় সংহিতার এই মত গ্রহণ ক'রে যজ্ঞকেই বিষ্ণু বলেছেন — "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ ইতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ।"

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মহাশয় মনে করেন যে এই শ্লোকে বিষ্ণু অর্থে 'যজ্ঞ' পদটি ব্যবহৃত হয়নি। তিনি বলেছেন — "যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম নয়। বিষ্ণু সর্বব্যাপক বলিয়া যজ্ঞ বিষ্ণু, অতএব 'যজ্ঞার্থে' বলিলে 'বিষ্ণু-অর্থে' বুঝিতে হইবে এই কথা খাটে না।" শ্রদ্ধেয় বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয়ও এখানে 'যজ্ঞ' অর্থে 'বিষ্ণু' এইকথা স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন — "Yajña means all the Action (duties) prescribed for the four castes" (Śrīmad Bhagavadgīta

Rahasya 3/9– Tilak). তিনি আরও বলেছেন— "The meaning– which some commentators arrive at– by taking 'Yajña' to mean 'Viṣṇu' (which is a secondary interpretation) so as to explain 'Yajñārtha' as meaning 'for the sake of Viṣṇu– or 'in order to dedicate it to the Parameśvara is–according to me, a stretched and uncouth meaning." শ্রীমদসচ্চিদানন্দভক্তিবিনোদ ঠক্কুর 'যজ্ঞ' শব্দের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন— "হরিতোষণার্থ নিষ্কাম-কর্মকে 'যজ্ঞ' বলে"।

এই সমস্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে কর্ম হল একপ্রকার যজ্ঞ এবং আমার মতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু নিষ্কাম কর্মযোগের প্রবক্তা সেইজন্য তিনি এই শ্লোকে 'যজ্ঞ' পদটিকে মানুষের কর্তব্যরূপী নিষ্কাম কর্মযজ্ঞ অর্থেই ব্যবহার করেছেন কেননা অর্জুন যেহেতু যুদ্ধ করলে পাপগ্রস্ত হবেন কিনা এই দ্বিধায় দোদুল্যমান এবং বেদবিহিত যজ্ঞ যেমন তার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হবি (আজ্য, ঘৃত) সমূহকে দগ্ধ ক'রে অঙ্গারে পরিণত করে এবং অর্পিত সেই সমস্ত বস্তুর কোন লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না তদ্রূপ নিষ্কাম কর্মসমূহও তার মধ্যে নিহিত সমস্ত পাপকে দগ্ধ ক'রে সেই কাজকে পাপশূন্য, নির্মল, পবিত্র ক'রে তোলে এবং যেহেতু সমস্ত কর্মই পরিণামে শ্রীকৃষ্ণে আশ্রয় লাভ করে সেইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে সেই নিষ্কাম কর্মযজ্ঞ পালন করারই উপদেশ দিয়েছেন যা প্রকারান্তরে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই করা হবে এবং যেহেতু কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার নন, তিনিই স্বয়ং বিষ্ণু, সেই হেতু কৃষ্ণ ও বিষ্ণু অভিন্ন এবং সেইজন্য বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই করার নামান্তর। সুতরাং ভগবান্ কৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের নয়, নিষ্কামচিত্তে কর্তব্যরূপ যুদ্ধ করার উপদেশই দিয়েছেন।। ৯।।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা # পুরা উবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ # এষ বঃ অস্তু ইষ্ট-কামধুক্।।১০।।

পুরা = পুরাকালের অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে; সহ = সঙ্গে; যজ্ঞাঃ = প্রজাদের রক্ষা ও পরিচালনা করার কর্মনীতি; প্রজাঃ = জড়জগৎ; সৃষ্ট্বা = সৃষ্টি ক'রে; প্রজাপতিঃ = নারায়ণ; উবাচ = বলেছিলেন; অনেন = এই কর্মনীতি অনুসরণ ক'রে;

প্রসবিষ্যধ্বম্ = তোমরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও; এষ = এই যজ্ঞ অর্থাৎ কর্মনীতি; বঃ = তোমাদের; ইষ্ট = মনোবাঞ্ছা; কামধুক্ = পূরণকারী; অস্তু = হোক।। ১০।।

অনুবাদ :- পুরাকালে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে একইসঙ্গে এই জড়জগৎ এবং তাকে রক্ষা ও পরিচালনা করার কর্মনীতি সৃষ্টি ক'রে প্রজাপতি নারায়ণ বলেছিলেন - এই কর্মনীতি অনুসরণ ক'রে তোমরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। এই কর্মনীতি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করুক।।১০।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে উল্লিখিত প্রজাপতি শব্দের অর্থ সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, প্রজাপতি শব্দদ্বারা সাধারণভাবে ব্রহ্মাকে বোঝানো হয়। কিন্তু এখানে প্রজাপতি বলতে ব্রহ্মা নয়, নারায়ণকে নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে প্রজা মানে 'সৃষ্টি' আর 'পতি' মানে রক্ষক। সুতরাং 'প্রজাপতি' শব্দের অর্থ হল— এই সৃষ্টির অর্থাৎ সকলের রক্ষাকর্তা। কিন্তু ব্রহ্মা সকলের রক্ষাকর্তা নন; তিনি স্বয়ং নিজেকেই রক্ষা করার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু অর্থাৎ নারায়ণের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় এই যে এখানে প্রজাপতি যে ব্রহ্মা একথা ব'লে দেওয়া হয়নি। সুতরাং মেনে নিতে বাধা নেই যে এখানে প্রজাপতি অর্থে ব্রহ্মাকে নয়, বিষ্ণুকেই নির্দেশ করা হয়েছে। অনেক ব্যাখ্যাকার এখানে প্রজাপতি অর্থে ব্রহ্মাকেই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সেটি সঠিক নয়। অমরকোষ অনুযায়ী 'প্রজা' শব্দের অর্থ হল অধীনস্থ জন এবং সন্ততি। ব্রহ্মা এই জড়জগতের স্রষ্টা নন; এই জড়জগতের স্রষ্টা হলেন নারায়ণ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলা হয়েছে — " স বিশ্বকৃৎ" ইতি (৬/১৬) অর্থাৎ নারায়ণই এই বিশ্বের কর্তা এবং নারায়ণই ব্রহ্মাকেও সৃষ্টি করেছিলেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আরও বলা হয়েছে— "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং" (৬/১৮) অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং এই জড়জগৎ ব্রহ্মার প্রজা হতে পারে না, এই জড়জগৎ তার স্রষ্টা ভগবান্ বিষ্ণু নারায়ণের প্রজা এবং সেইজন্য এখানে 'প্রজা' শব্দের দ্বারা নারায়ণের সৃষ্ট জীবকেই নির্দেশ করা হয়েছে। শ্রুতি, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে 'প্রজাপতি' শব্দের দ্বারা নারায়ণকেই নির্দেশ করা হয়েছে। মহাভারতেও কৃষ্ণকে প্রজাপতি নামে অভিহিত করা হয়েছে —"জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রজাপতিঃ" (অনুশাসন পর্ব)।

শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণে শ্রী শুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণকে প্রজাপতি সহ বিভিন্ন প্রকারে পতি নামে অভিহিত করেছেন—

শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি-
র্ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ।
পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং
প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ।। (২/৪/২০)

অর্থাৎ তিনি সর্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর পতি, তিনি যজ্ঞপতি, তিনি প্রজাপতি, তিনি জীবসমূহের অধিপতি প্রভৃতি।

রামানুজ তাঁর গীতাভাষ্যে বলেছেন— "শ্রুতেঃ নিরুপাধিকঃ প্রজাপতিশব্দঃ সর্বেশ্বরং বিশ্বস্রষ্টারং বিশ্বাত্মানং পরায়ণং নারায়ণম্" ইতি (গীতাভাষ্য ৩/১০)।

অর্থাৎ শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা এইটি প্রমাণিত হয় যে এই শ্লোকে উপাধিরহিত প্রজাপতি শব্দ বিশ্বের স্রষ্টা বিশ্বাত্মা পরম আশ্রয়স্বরূপ সর্বেশ্বর নারায়ণকে নির্দেশ করে।

সুতরাং প্রজাপতি শব্দের প্রকৃত অর্থ হল ব্রহ্মা নন, নারায়ণ।

দ্বিতীয়তঃ, এখানে 'যজ্ঞ' শব্দ অন্য একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যজ্ঞ মানে সর্বদা কাষ্ঠাদি দহন ক'রে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান নয়, আরও বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞ আছে যেমন দানযজ্ঞ অর্থাৎ দান করার অনুষ্ঠান, নামযজ্ঞ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম-গানের অনুষ্ঠান প্রভৃতি। এই শ্লোকে যজ্ঞ বলতে কর্ম পরিচালনার নিয়মকে নির্দেশ করা হয়েছে, বেদোক্ত অনুশাসনকে নয়। বস্তুত, কোন প্রতিষ্ঠান কিভাবে পরিচালিত হবে সেই নিয়ম না থাকলে প্রতিষ্ঠানটির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য জগত সৃষ্টির পূর্বে তার সুষ্ঠু পরিচালনার নিয়মও ভগবান্ নারায়ণ সৃষ্টি করেছিলেন।। ১০।।

দেবান্ ভাবয়ত অনেন # তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ # শ্রেয়ঃ পরম্ অবাপ্স্যথ।।১১।।

অনেন = এই যজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম পরিচালনার নিয়মসমূহের দ্বারা; দেবান্ = দেবগণের; ভাবয়ত = প্রীতিসাধন কর; তে দেবা = সেই দেবগণ; বঃ = তোমাদেরকেও; ভাবয়ন্তু = প্রীত করবে; পরস্পরং = পরস্পরকে; ভাবয়ন্তঃ = প্রীত করার মাধ্যমে; পরং শ্রেয়ঃ = পরম মঙ্গল; অবাপ্স্যথ = লাভ করবে।। ১১।।

অনুবাদ :- এই যজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম পরিচালনার নিয়মসমূহের দ্বারা তোমরা দেবগণের প্রীতিসাধন কর। সেই দেবগণও তোমাদেরকেও প্রীত করুক। এইভাবে পরস্পরকে প্রীত করার মধ্য দিয়ে পরস্পর পরম মঙ্গল লাভ করবে।। ১১।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ভগবান্ অর্জুনকে বলেছেন যে দেবতা ও মনুষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রীত অর্থাৎ সহায়তা করার মাধ্যমে এই সৃষ্টির সৌন্দর্য ও মহিমা বজায় রাখবে। কিন্তু দেবতা ও মনুষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে কিভাবে প্রীত করতে পারেন সে ব্যাপারে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি আখ্যান প্রচলিত আছে। একদা এক অঞ্চলে একজন যোগী পুরুষ প্রত্যহ তাঁর শিষ্যদের গীতা পাঠ ক'রে শোনাতেন। একদিন যখন তিনি এই শ্লোকটি পাঠ ও তার ব্যাখ্যা করছিলেন তখন একজন শিষ্য জানতে চাইলেন যে কিভাবে দেবতা ও মনুষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রীত করতে পারেন কারণ মানুষদেরই তো কর্তব্য হল দেবতাদের প্রীতি উৎপাদন করা। সেই শিষ্যের কথা শুনে অন্যান্য অনেক শিষ্য সেই শিষ্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন। গুরুদেব তাদেরকে অনেক ভাবে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করলেও শিষ্যরা কিছুতেই গুরুদেবের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে পারলেন না। এর কয়েকদিন পর গুরুদেব তাঁর আশ্রমে এক পূজার আয়োজন ক'রে সকল শিষ্যদের দুপুরে প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। সকল শিষ্য যথাসময়ে আশ্রমে এসে দেখলেন যে সেখানে দুই সারিতে আসন বিছিয়ে শিষ্যদের মুখোমুখি বসে প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য গুরুদেব আয়োজন ক'রে রেখেছেন এবং প্রতিটি পাতার পাশে একটি ক'রে দেড়হাত লম্বা চামচ রাখা আছে। গুরুদেব তাঁদের সকলকে বলেন যে প্রত্যেককে এই চামচ দ্বারাই প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে। সকলে প্রসাদ গ্রহণের নিমিত্ত আসনে বসে দেখল যে অত বৃহৎ চামচ দ্বারা প্রসাদ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তখন তাঁরা গুরুদেবকে তাঁদের অসুবিধার কথা জানালে গুরুদেব তাঁদের প্রত্যেককে সেই চামচ দিয়ে নিজের পাতা থেকে প্রসাদ তুলে সামনের সারির শিষ্যদেরকে খাওয়াতে বললেন। গুরুদেবের সেই বাক্য পালন ক'রে সকলে দেখল যে এইভাবে খুবই সুন্দররূপে তাঁদের সকলের প্রসাদ গ্রহণ সুসম্পন্ন হল। তখন সকলে গুরুদেবের মুখপানে চেয়ে তাঁর মুখে মধুর মৃদু হাসি দেখে কিভাবে দেবতা ও মনুষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রীত করতে পারেন সে ব্যাপারটি শিষ্যরা সকলেই বুঝতে পারলেন। তাঁরা সকলে

বুঝতে পারলেন যে তাঁরা যদি দেবতার মুখে হাসি ফোটানোর মত শুভকর্ম করেন তাহলে দেবতাগণও তাঁদের মুখে হাসি ফোটাবেন, মনুষ্যগণ যদি দেবতাদের উদ্দেশ্যে অন্ন অর্পণ করেন তাহলে দেবতাগণও তাদের জন্য উপযুক্তরূপে অন্নের ব্যবস্থা করবেন ।। ১১।।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা # দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈঃ দত্তান্ অপ্রদায় এভ্যঃ # যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।। ১২।।

হি = নিশ্চয়ই; দেবাঃ = দেবগণ; যজ্ঞভাবিতাঃ = এই যজ্ঞের দ্বারা তুষ্ট হয়ে; ইষ্টান্ = বাঞ্ছিত; ভোগান্ = ভোগ্যবস্তু; বঃ = তোমাদের; দাস্যন্তে = প্রদান করবেন; তৈঃ = সেই সমস্ত; দত্তান্ = প্রদত্ত বস্তুসকল; এভ্যঃ = এই দেবতাদেরকে; অপ্রদায় = অর্পণ না ক'রে; যঃ = যে; ভুঙ্‌ক্তে = ভোগ করে; সঃ = সে; স্তেনঃ = চোর; এব = নিশ্চয়ই।।১২।।

অনুবাদ :- নিশ্চয়ই দেবতাগণ এই যজ্ঞের দ্বারা তুষ্ট হয়ে তোমাদেরকে বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু প্রদান করবেন। সেই সমস্ত প্রদত্ত বস্তুসকল এই দেবতাদেরকে অর্পণ না ক'রে যে ভোগ করে সে নিশ্চয়ই চোর।।১২।।

যজ্ঞ-শিষ্ট-অশিনঃ সন্তো # মুচ্যন্তে সর্ব-কিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে তু অঘং পাপা # যে পচন্তি আত্মকারণাৎ।।১৩।।

যজ্ঞ-শিষ্ট = যজ্ঞের শিষ্ট অর্থাৎ অবশিষ্ট; অশিনঃ = ভক্ষণকারী; সন্তঃ = সজ্জন ব্যক্তিগণ; সর্ব-কিল্বিষৈঃ = সমস্ত পাপ থেকে; মুচ্যন্তে = মুক্ত হন; যে = যারা; তু = কিন্তু; আত্মকারণাৎ = নিজের জন্য; পচন্তি = রন্ধন করে; তে = তারা; পাপাঃ = পাপিষ্ঠগণ; অঘং = পাপ; ভুঞ্জতে = ভোগ করে।।১৩।।

অনুবাদ :- সজ্জনগণ যজ্ঞের অবশিষ্ট ভক্ষণ ক'রে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন কিন্তু যারা নিজের জন্য রন্ধন করে সেই পাপিষ্ঠগণ পাপ ভোগ করে।।১৩।।

ব্যাখ্যা :- এখানে বলা হয়েছে যে যাঁরা যজ্ঞের অবশিষ্ট গ্রহণ ক'রে জীবন যাপন করেন তাঁরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হন। এখানে মনে প্রশ্ন আসতে পারে এর দ্বারা ঠিক কি বোঝানো হয়েছে। ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে শাস্ত্রের খুব সূক্ষ্ম ও মহান একটি চরিত্র নজরে আসে। স্রষ্টা যখন জগৎ সৃষ্টি করেন তখন তিনি মানুষের কর্মও সৃষ্টি করেন এবং সেই সমস্ত কর্ম করার মাধ্যমে তিনি মানুষদেরকে শুভ কর্মপথে অগ্রসর হতে পরামর্শ দেন। কিন্তু প্রতিনিয়ত কর্ম

করার পথে গৃহস্থ মানুষ তার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেক প্রকার পাপ যথা প্রাণিহত্যা ক'রে বসে। শাস্ত্রের এমনই সূক্ষ্ম ও সজাগ নজর যে মানুষকে এই সমস্ত পাপের পথ থেকে কিভাবে দূরে রাখা যায় সে বিষয়ে শাস্ত্র উপযুক্ত চিন্তা করতে ত্রুটি করেনি। শাস্ত্র উপলব্ধি করেছে যে মানুষ পাঁচ প্রকারে পাপে পতিত হতে পারে। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে—

পঞ্চ সূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষন্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্।। —মনুসংহিতা ৩/৬৮

অর্থাৎ উনুন, জাঁতা, শিল-নোড়া, রান্নার হাঁড়ি-কড়া, উদুখল, মুষল ঢেঁকি, হামানদিস্তা, জলের কলসী এইগুলি হল প্রাণীহত্যার স্থান অথচ এগুলি গৃহস্থ জীবনের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। এইগুলি ব্যবহারের কারণে গৃহস্থদের পাপ অর্জনের হাত থেকে দূরে রাখার জন্য মনুসংহিতায় মহাযজ্ঞ নামে পাঁচ প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যেগুলি নিত্য পালন করলে গৃহে বাস করেও গৃহস্থ এই ধরণের পাপে লিপ্ত হন না—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞঃ অথিথিপূজনম্।
পঞ্চ এতান্ যো মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ।
স গৃহে অপি বসন্ নিত্যং সূনাদোষৈর্ন লিপ্যতে।।
—মনুসংহিতা ৩/৭০-৭১

অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ — বেদাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, পিতৃযজ্ঞ - পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে জল ও খাদ্যবস্তুদ্বারা তর্পণ, দেবযজ্ঞ — অগ্নিতে ঘি, চরু প্রভৃতি আহুতি প্রদানের মাধ্যমে হোম, ভূতযজ্ঞ— দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশুবলি, নৃযজ্ঞ— অতিথিসেবা। যে গৃহস্থ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তিনি সূনাদোষ অর্থাৎ প্রাণীহত্যাজনিত দোষে লিপ্ত হন না।

কিন্তু যাঁরা গৃহী নয়, তাঁদের তো জীবন ধারণের কারণে খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য তাঁরা যাতে যতটা সম্ভব এই ধরণের পাপের হাত থেকে দূরে থাকতে পারেন সেই জন্য গীতায় বলা হয়েছে যে তাঁরা যেন যজ্ঞের অবশিষ্ট আহার গ্রহণ করে জীবনধারণ করেন। তাহলে তাঁদের আর গৃহস্থদের মত ঐসব বস্তুর প্রয়োজন হবে না। ফলে তাদের দ্বারা প্রাণিহত্যার সম্ভাবনাও হ্রাস পাবে। যজ্ঞের জন্য যে খাদ্যবস্তু রন্ধন হয় তা ঈশ্বরে অর্পিত হয়। সাধু ব্যক্তি সেই

যজ্ঞের অবশিষ্ট প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করেন ব'লে নিত্য উনুন জ্বালানো ইত্যাদি কর্ম থেকে বিরত থাকার কারণে তাঁদেরকে পাপ স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু যারা কেবল নিজের জন্য রন্ধন করে তাদেরকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রাণ হত্যায় জড়িয়ে পড়তে হয়। ফলে তাদেরকে অনন্ত পাপের ভাগী হতে হয়। মনুসংহিতাতেও আমরা এই কথা শুনতে পাই —

অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে পচত্যাত্মকারণাৎ।
যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে।।

—মনুসংহিতা ৩/১১৮

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের ভোজনের জন্য অন্নাদি রন্ধন করে, সে কেবল পাপই ভোজন করে। এই কারণে পঞ্চ যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নই সাধুব্যক্তিদের ভোজনের নিমিত্ত বিহিত হয়েছে।

অবশ্য বর্তমান যুগের মানুষদের নিকট এই বিষয়টি হাস্যকর। কিন্তু মহান শাস্ত্র তার নিজের কাজ করেছে, মানুষ সেটি গ্রহণ করুক বা না করুক তাতে শাস্ত্রের কিছু যায় আসে না। সুবাসিত পুষ্প উৎপাদনকারী বৃক্ষ-লতা সুবাসিত পুষ্প উৎপাদন করবেই। কোন মানুষ তার সুঘ্রাণ গ্রহণ করলে সে সৌভাগ্যবান কিন্তু কেউ তা না গ্রহণ করতে চাইলে সেটা তার দুর্ভাগ্য, তাতে সেই বৃক্ষের কোন ক্ষতি হয় না।। ১৩।।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি # পর্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো # যজ্ঞঃ কর্ম-সমুদ্ভবঃ।।১৪।।

অন্নাৎ = অন্ন থেকে; ভূতানি = জীবসমূহ; ভবন্তি = সৃষ্টি হয়; পর্জন্যাৎ = মেঘ থেকে; অন্নসম্ভবঃ = অন্নের সৃষ্টি হয়; যজ্ঞাৎ = যজ্ঞ থেকে; পর্জন্যঃ = মেঘ; ভবতি = হয়; কর্ম-সমুদ্ভবঃ = কর্ম থেকে উদ্ভব হয়।।১৪।।

অনুবাদ :- অন্ন থেকে জীবসমূহ সৃষ্টি হয়, মেঘ থেকে অন্নের সৃষ্টি হয়, যজ্ঞ থেকে মেঘ হয় এবং যজ্ঞ কর্ম থেকে উদ্ভূত হয়।।১৪।।

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি # ব্রহ্ম-অক্ষর-সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম # নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।।১৫।।

ব্রহ্ম = প্রকৃতির পরিণামরূপ শরীর; উদ্ভবং = উৎপত্তি; অক্ষর-সমুদ্ভবম্ = অক্ষর অর্থাৎ জীবাত্মা থেকে সৃষ্টি হয়; বিদ্ধি = জেনে রেখো; তস্মাৎ = সেইজন্য;

সর্বগতং = সমস্ত; ব্রহ্ম = শরীর; নিত্যং = সদা; যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ = যজ্ঞে অধিষ্ঠিত।।১৫।।

অনুবাদ :- জেনে রেখো কর্ম ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামরূপ শরীর থেকে উৎপন্ন হয়। এই ব্রহ্ম অক্ষর অর্থাৎ জীবাত্মা থেকে সৃষ্টি হয়। সেইজন্য সমস্ত ব্রহ্ম অর্থাৎ শরীর সদা যজ্ঞে অধিষ্ঠিত থাকে।।১৫।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ব্যবহৃত 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ কি সে সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে বিস্তর মতভেদ আছে। অনেক ব্যাখ্যাকার এই শ্লোকে ব্যবহৃত 'ব্রহ্ম' শব্দটির অর্থ হিসাবে বেদ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতিকে গ্রহণ করেছেন। শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকে ব্যবহৃত 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ হিসাবে বেদকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ভাষ্যকারগণ তাঁর সঙ্গে একমত নন। তাঁদের মতে এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ হল প্রকৃতির পরিণামরূপ শরীর। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে — "তস্মাৎ এতৎ ব্রহ্ম নামরূপম্ অন্নং চ জায়তে (১/১/৯)।" অর্থাৎ সেই সর্বজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্ম, নাম, রূপ এবং অন্ন উৎপন্ন হয়। এখন 'ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্ম উৎপন্ন হন' এই বক্তব্যটি সহজবোধ্য নয়।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বিষয়টি পরিষ্কার ক'রে দিয়ে বলেছেন— "সর্বজ্ঞাৎ এতৎ উক্তং কার্যলক্ষণং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যং জায়তে। কিং চ নাম অসৌ-দেবদত্তো যজ্ঞদত্ত ইত্যাদি লক্ষণং রূপমিদং শুক্লং নীলমিত্যাদি, অন্নং চ ব্রীহিযবাদিলক্ষণং জায়তে।" অর্থাৎ মুণ্ডোকোপনিষদের উপর্যুক্ত ১/১/৯ মন্ত্রে কথিত সর্বজ্ঞ থেকে হিরণ্যগর্ভ নামক কার্যব্রহ্ম উৎপন্ন হন এবং সেখান থেকেই দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নাম, শুক্ল, নীল ইত্যাদি রূপ, ব্রীহি, যব ইত্যদি অন্ন উৎপন্ন হয়। তাহলে শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যা অনুসারে এই ব্রহ্মের প্রকৃত অর্থ হল কার্যব্রহ্ম। আবার, এখানে হিরণ্যগর্ভ শব্দের অর্থ হল প্রাণ আর প্রাণের অধিষ্ঠানস্থল তো শরীর। সুতরাং শ্রুতি অনুসারে এই শ্লোকে ব্রহ্ম শব্দটি বেদ অর্থে ব্যবহার করা হয়নি, তা ব্যবহার করা হয়েছে প্রাণসমৃদ্ধ শরীর অর্থে। ঋষি অরবিন্দের মতে এই শ্লোকে ব্যবহৃত "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ হল— "সগুণ ব্রহ্ম - ক্ষরজগতে সকল কর্মের স্রষ্টা ও উদ্ভবকর্তা — প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল পুরুষ"। শ্রুতি অনুসারে এই ব্রহ্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ হল প্রকৃতির পরিণামরূপ শরীর। রামানুজ তাঁর গীতার ভাষ্যে এই শ্লোকে ব্যবহৃত 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ 'প্রকৃতির পরিণামরূপ শরীর' হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন ---"অত্র ব্রহ্মশব্দনির্দিষ্টং

প্রকৃতিপরিণামরূপশরীরম্ (শ্রীরামানুজভাষ্য ৩/১৫)। অনুরূপভাবে তিলকও রামানুজের এই অভিমতকে গ্রহণ করেছেন — “Therefore–the meaning of the word ‘Brahman’, given in the Rāmānujabhāsya, consistently with its meaning in the stanza ‘‘mama yonir mahat brahma’’ (Gī. 14.3), (where it means Prakti) namely, ‘Prakti’, which is the Fundamental Subsistance of the world ‘appeals to me as better’’ (Gītā-Rahasya or Karma-Yoga 3/15, B. G. Tilak)

এবং প্রবর্তিতং চক্রং # ন অনুবর্তয়তি ইহ যঃ।
অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারামো # মোঘং পার্থ স জীবতি ।। ১৬ ।।

এবং = এই রকম; প্রবর্তিতং = প্রচলিত; চক্রং = চক্রকে; যঃ = যে; ইহ = ইহলোকে; ন অনুবর্তয়তি = অনুসরণ করে না; সঃ = সেই ব্যক্তি; ইন্দ্রিয়ারামঃ = ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত; অঘায়ুঃ = পাপী; মোঘং = বৃথা; জীবতি = জীবন ধারণ করে।।১৬।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! এই রকম প্রচলিত জগচ্চক্রকে যে ইহলোকে অনুসরণ ক’রে জীবন যাপন করে না সেই ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত এবং পাপী। তার জীবন বৃথা।।।১৬।।

যঃ তু আত্মরতিঃ এব স্যাৎ # আত্মতৃপ্তঃ চ মানবঃ।
আত্মনি এব চ সন্তুষ্টঃ # তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।।১৭।।

যঃ = যে; তু ; কিন্তু; মানবঃ = ব্যক্তি; আত্মরতিঃ = আত্মাতেই প্রীত; এব = কেবল; আত্মতৃপ্তঃ = আত্মাতেই তৃপ্ত; চ = এবং; আত্মনি = আত্মাতেই; সন্তুষ্টঃ = সন্তুষ্ট; স্যাৎ = থাকেন; তস্য = তাঁর; কার্যং = কোন কর্তব্য; ন বিদ্যতে = থাকে না।।১৭।।

অনুবাদ :- কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল আত্মাতেই অনুরক্ত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং কেবল আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন তাঁর কোন নিজস্ব কর্তব্য থাকে না।।১৭।।

ব্যাখ্যা :- যে ব্যক্তি মনে করে —‘আমিই সব কর্ম করি’, তার কর্মের মধ্যে আত্ম-অভিমান থেকে যায় এবং আত্মাভিমানযুক্ত কর্ম সকাম পর্যায়ভুক্ত। আত্মাভিমান দূর না হওয়ায় সে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার জন্য ঈশ্বরের

সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয় না। ফলে তার ব্রহ্মপদ লাভের অর্থাৎ মোক্ষলাভের কোন উপায় থাকে না। কিন্তু যিনি সমস্ত কর্মই পরমাত্মাতে সমর্পণ করেছেন তিনি সদা মনে করেন যে তিনি কিছুই করেন না, তিনি আপাতদৃষ্টিতে যা কিছু করেন তাঁর সব কিছুই পরমাত্মা করেন, তিনি নিমিত্তমাত্র। ফলে সকাম কর্মীদের মত তাঁর করার মত নিজস্ব কোন কর্মই থাকে না। তাঁর নিকট সকল কর্মই পরমেশ্বরের কর্ম। ফলে কোন কাজ করার পশ্চাতে তাঁর কোন আত্মাভিমান থাকে না এবং তাঁর সর্ব কর্ম নিষ্কাম কর্ম হিসাবে গণ্য হয় এবং এর ফলে তিনি অক্ষয় ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

মানুষ কিভাবে নিষ্কাম কর্মজগতের সঙ্গে যুক্ত থেকে অক্ষয় ব্রহ্মপদ লাভের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত মহাভারত থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণরূপে নিরাসক্ত পুরুষ ছিলেন, জীবনের সকলপ্রকার ব্যক্তিগত ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ, লাভালাভ সকল বিষয়ে চূড়ান্তরূপে নিরাসক্ত, উদাসীন ছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ তো পূর্ণরূপে সকাম কর্ম। তথাপি তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন এবং তিনি তা করেছিলেন কোন আত্মতৃপ্তি বা আনন্দলাভের জন্য নয়। তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন নিষ্কাম চিত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে একান্তভাবে রাজকর্তব্যের আহ্বানে। এবিষয়ে মহাভারতে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর আক্ষেপের উত্তরে বলেছেন—

নাহং কর্মফলান্বেষী রাজপুত্রি চরাম্যুত।
দদামি দেয়মিত্যেব যজ্ঞে যষ্টব্যমিত্যুত।।

—বনপর্ব ৩১/২

অর্থাৎ তিনি কর্মফলের ইচ্ছা রেখে কোন কর্ম করেন না, তিনি দান করেন কারণ দান করা কর্তব্য এবং যজ্ঞ করা কর্তব্য। সেইজন্য তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন।।১৭।।

নৈব তস্য কৃতেন অর্থো # ন অকৃতেন ইহ কশ্চন।
ন চ অস্য সর্বভূতেষু # কশ্চিৎ অর্থ-ব্যপাশ্রয়ঃ।।১৮।।

ইহ = এই ইহজগতে; তস্য = তাঁর; কৃতেন = কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানের; কশ্চন = কোন প্রকার; ন = নাই; অর্থঃ = প্রয়োজন; অকৃতেন = কর্তব্য কর্ম না করারও; এব = অবশ্যই; চ = এবং; সর্বভূতেষু = সকল জীবের মধ্যে;

অস্য = তাঁর; কশ্চিৎ = কোনপ্রকার; অর্থ = প্রয়োজন; ব্যপাশ্রয়ঃ = আশ্রয় গ্রহণ।। ১৮।।

অনুবাদ :- এইরকম আত্মানন্দে মগ্ন ব্যক্তির এই ইহজগতে কোনরূপ কর্তব্য পালনের কোন প্রয়োজন নাই। আবার তাঁর কর্তব্য থেকে বিরত থাকারও কোন প্রয়োজন নাই এবং সর্বভূতের মধ্যে কারও কাছে তাঁর আশ্রয় নেবার প্রয়োজন নাই।। ১৮।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে যাঁরা আত্মানন্দে মগ্ন তাঁদের কাজ করার কোন প্রয়োজন নাই। তাহলে অর্জুনের মনে হতে পারে যে তাঁর যুদ্ধ না করলেও চলবে। কিন্তু পরক্ষণেই যখন কৃষ্ণ তাঁকে বলেন যে কর্তব্য পরিত্যাগ করারও কোন অর্থ হয় না তখন বিষয়টি অর্জুনের কাছে পরস্পরবিরোধী ও সংশয়াত্মক বলে বোধ হয়। কিন্তু এই শ্লোকের বাহ্যিক অর্থের আড়ালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে একটি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে অর্জুন যদি যুদ্ধ না করেন তাহলেও ফল একই হবে কারণ কালচক্রের অমোঘ প্রভাবে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান প্রত্যেকেরই একদিন দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটবে। কাজেই তাদের নিছক মৃত্যু ঘটানোর জন্য অর্জুনের যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু অর্জুন যদি যুদ্ধ না করে তাহলে এই সমস্ত আততায়ী অন্তত আরও কিছুদিন তাদের পাপাচার চালিয়ে যেতে পারবে যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। সেইজন্য কৃষ্ণ অর্জুনকে নিরাসক্তচিত্তে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এখানে সর্ব মানব সমাজের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হল এই যে যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে আপাত কিছু ক্ষতির সম্ভাবনায় একেবারে কিছু না করা অপেক্ষা মানব কল্যাণে কিছু ভালো কাজ করা শ্রেয়।। ১৮।।

তস্মাৎ অসক্তঃ সততং # কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হি আচরন্ কর্ম # পরম্ আপ্নোতি পূরুষঃ।। ১৯।।

তস্মাৎ = সেইজন্য; সততং = সর্বদা; অসক্তঃ = আসক্তি ত্যাগ ক'রে; কার্যং = কর্তব্য; কর্ম = কর্ম; সমাচর = কর; হি = নিশ্চিতভাবে; অসক্তঃ = অনাসক্ত হয়ে; পুরুষঃ = ব্যক্তি; কর্ম = কাজ; আচরন্ = অনুষ্ঠান ক'রে; পরম্ = মোক্ষ; আপ্নোতি = লাভ করেন ।। ১৯।।

অনুবাদ :- সেইজন্য সর্বদা আসক্তি ত্যাগ ক'রে কর্তব্যকর্ম কর। নিশ্চিতভাবেই অনাসক্তভাবে কাজ করেই মানুষ মোক্ষ লাভ করেন।। ১৯।।

কর্মণা এব হি সংসিদ্ধিম্ # আস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোক-সংগ্রহম্ এব অপি # সংপশ্যন্ কর্তুম্ অর্হসি।। ২০।।

জনকাদয়ঃ = জনক ইত্যাদি রাজাগণ; কর্মণা = কর্মের দ্বারা; এব = কেবলমাত্র; হি = অবশ্যই; সংসিদ্ধিম্ = সিদ্ধি; আস্থিতাঃ = লাভ করেছিলেন; লোক-সংগ্রহম্ = লোকহিতের প্রতি; এব অপি = ও; সংপশ্যন্ = দৃষ্টি রেখে; কর্তুম্ = কর্তব্য পালন করা; অর্হসি = উচিত।। ২০।।

অনুবাদ :- জনক ইত্যাদি রাজাগণ কেবলমাত্র কর্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেইজন্য লোকহিতের প্রতি দৃষ্টি রেখেও তোমার কর্তব্য পালন করা উচিত।।২০।।

ব্যাখ্যা :- শ্রীকৃষ্ণ এখানে একজন আদর্শ কর্মযোগী হিসাবে রাজা জনকের নাম করেছেন। এখন, রাজা জনক কিরূপ কর্মযোগী ছিলেন সেটি বোঝানোর জন্য এখানে রাজা জনক সম্পর্কে একখানি উপাখ্যান উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। একবার ব্যাসদেব তাঁর পুত্র শুকদেবকে উপদেশ লাভের জন্য রাজা জনকের নিকট প্রেরণ করেন। শুকদেব জনক রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে আসনে বসলেন। রাজা জনক তখন সামনে উপবিষ্ট ছাত্রদেরকে উপদেশ দিয়ে চলেছেন। শুকদেব যে এসেছেন সে বিষয়ে জনকের কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। শুকদেব বসে বসে ভাবছেন যে ইনি তো সংসারী মানুষ কিন্তু তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাহলে তাঁর পিতা কেন তাঁকে সংসারী জনকের নিকট উপদেশ নিতে পাঠালেন। এমন সময় শুকদেব লক্ষ্য করেন যে হঠাৎ সেখানে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে এবং আগুনের লেলিহান শিখা তাঁদের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। এই দৃশ্য দেখে শুকদেব চঞ্চল হয়ে উঠলেন পাছে তাঁর পরিধান করার কৌপীন আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। তখন শুকদেবের চঞ্চলতা দেখে ধীর প্রশান্তমুখে রাজা জনক শুকদেবকে বললেন - বৎস! তুমি এই সামান্য কৌপীনের জন্য উপদেশ শোনা থেকে বিরত হয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলে কেন? আমি তো রাজা। দেখো আমার কত অজস্র সম্পদ অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছে। আমার তো কৈ এইরূপ চিত্ত চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি! এই কথা বলার পর রাজা জনক আবার প্রশান্তচিত্তে তাঁর অবশিষ্ট উপদেশ প্রদানে মন দিলেন।

এই উপাখ্যানটি প্রমাণ করে রাজা জনক কত বড় নিরাসক্ত কর্মযোগী ছিলেন এবং এই কারণেই তিনি সংসারী হয়েও মোক্ষলাভ করেছিলেন।। ২০।।

যৎ যৎ আচরতি শ্রেষ্ঠঃ # তৎ তৎ এব ইতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে # লোকঃ তৎ অনুবর্ততে।। ২১।।

শ্রেষ্ঠঃ = শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; যৎ যৎ = যে রকম; আচরতি = আচরণ করেন ; তৎ তৎ = সেই রকমই; এব = অবশ্যই; ইতরঃ = সাধারণ; জনঃ = মানুষ; সঃ = সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; যৎ = যা; প্রমাণং কুরুতে = প্রমাণ ব'লে গ্রহণ করেন; লোকঃ = সমগ্র পৃথিবী; তৎ = তাকে; অনুবর্ততে = অনুসরণ করে।। ২১।।

অনুবাদ :- শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে রকম আচরণ করেন সাধারণ মানুষ ঠিক সেই রকমই আচরণ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন সমগ্র পৃথিবী তাকেই অনুসরণ করে।।২১।।

ন মে পার্থ অস্তি কর্তব্যং # ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

ন অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যং # বর্ত এব চ কর্মণি।। ২২।।

ত্রিষু = তিন; লোকেষু = জগতে; মে = আমার; কিঞ্চন = কোন; কর্তব্যং = কর্তব্য; ন = না; অস্তি = আছে; চ = এবং; অনাবাপ্তম্ = পাইনি এমন কিছু; অবাপ্তব্যম্ = পেতে হবে এমন কিছু; কর্মণি = কর্মসমূহের মধ্যে; এব = অবশ্যই; বর্তে = যুক্ত আছি।।২২।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এই ত্রিলোকে আমার কোনপ্রকার কর্তব্যকর্ম নাই। আবার এমন কিছু নাই যা আমি পাইনি বা আমাকে পেতে হবে। তথাপি আমি সমস্ত কর্মসমূহের সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত আছি।।২২।।

যদি হি অহং ন বর্তেয়ং # জাতু কর্মণি অতন্দ্রিতঃ।

মম বর্ত্ম অনুবর্তন্তে # মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।২৩।।

অহং = আমি; অতন্দ্রিতঃ = অতন্দ্রভাবে অর্থাৎ নিরলসভাবে; জাতু = কখনও; কর্মণি = কর্মসমূহে; ন বর্তেয়ং = কর্ম না করি; মনুষ্যাঃ = মানুষেরা; মম = আমার; বর্ত্ম = পথ; হি = নিশ্চিতভাবে; অনুবর্তন্তে = অনুসরণ করবে; সর্বশঃ = সর্বপ্রকারে।। ২৩।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! আমি যদি অতন্দ্রভাবে অর্থাৎ নিরলসভাবে কর্ম না করি

তাহলে মানুষেরা সর্বপ্রকারে আমার পথই অনুসরণ করবে অর্থাৎ তারাও কোন কাজ করবে না।। ২৩।।

উৎসীদেয়ুঃ ইমে লোকা # ন কুর্যাং কর্ম চেৎ অহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যাম্ # উপহন্যাম্ ইমাঃ প্রজাঃ।।২৪।।

চেৎ = যদি; অহং = আমি; কর্ম = কর্তব্য; ন = না; কুর্যাম্ = করি; ইমে = এই সব; লোকাঃ = মানুষগণ; উৎসীদেয়ুঃ = উৎসন্নে যাবে; চ = এবং; সঙ্করস্য = বর্ণসঙ্করের; কর্তা = কারণ; স্যাম্ = হব; ইমাঃ = এই সমস্ত; প্রজাঃ = প্রজাগণ; উপহন্যাম্ = ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।।২৪।।

অনুবাদ :- আমি যদি আমার কর্তব্য না করি তাহলে এই সব মানুষগণ উৎসন্নে যাবে এবং আমি বর্ণসঙ্কর ঘটার কারণ হব এবং এই সমস্ত প্রজাগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।।২৪।।

সক্তাঃ কর্মণি অবিদ্বাংসো # যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাৎ বিদ্বান্ তথা অসক্তঃ # চিকীর্ষুঃ লোকসংগ্রহম্।। ২৫।।

ভারত = হে ভরতবংশীয় অর্জুন! কর্মণি = কর্মসমূহে; সক্তাঃ = আসক্তিযুক্ত; অবিদ্বাংসঃ = অজ্ঞানী; যথা = যেমন; কুর্বন্তি = কর্ম করে; বিদ্বান্ = জ্ঞানিগণ; অসক্তঃ = আসক্তি পরিত্যাগ ক'রে; লোকসংগ্রহম্ = মানুষের কল্যাণ; চিকীর্ষুঃ = সাধন করতে ইচ্ছুক; তথা = সেইভাবেই; কুর্যাৎ = কর্ম করে।। ২৫।।

অনুবাদ :- হে ভরতবংশীয় অর্জুন! কর্মসমূহে আসক্তিযুক্ত অজ্ঞানীরা যেভাবে কর্ম করে, মানুষের কল্যাণ সাধন করতে ইচ্ছুক জ্ঞানিগণ আসক্তি পরিত্যাগ ক'রে সেইভাবেই কর্ম করে।। ২৫।।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ # অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি # বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।২৬।।

অজ্ঞানাং = অজ্ঞ; কর্মসঙ্গিনাম্ = কর্মফলে আসক্ত ব্যক্তিদের; বুদ্ধিভেদং = বুদ্ধিভেদ; ন জনয়েৎ = জন্মান উচিত নয়; বিদ্বান্ = জ্ঞানিগণ; যুক্তঃ = ভালোভাবে জেনে; সর্বকর্মাণি = সকল কর্ম; সমাচরন্ = অনুষ্ঠান ক'রে; যোজয়েৎ = তাদেরকে কর্মে যুক্ত করবেন ।। ২৬।।

অনুবাদ :- জ্ঞানিগণ যেন কখনই কর্মফলে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিদের মধ্যে

বুদ্ধিভেদ সৃষ্টি না করেন অর্থাৎ তাদেরকে বিভ্রান্ত না করেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যেন ভালোভাবে সমস্ত কিছু জেনে আসক্তি পরিত্যাগ ক'রে কর্ম ক'রে অজ্ঞ ব্যক্তিদের কর্মের সঙ্গে যুক্ত করেন।।২৬।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকের অর্থটি একটু পরিষ্কারভাবে বোঝা প্রয়োজন। এখানে বলা হয়েছে যে জ্ঞানিগণ যেন কখনই কর্মফলে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিদের মধ্যে বুদ্ধিভেদ সৃষ্টি না করেন অর্থাৎ তাদেরকে বিভ্রান্ত না করেন। শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞান ব্যক্তিদের মধ্যে বুদ্ধিভেদ সৃষ্টি করা মানে ঠিক কি বলতে চেয়েছেন তা সকলের নিকট ঠিকমত বোধগম্য নাও হতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণকে বলতে শুনেছি যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যা করেন, সাধারণ মানুষ তাকেই অনুসরণ করে। এখন, অর্জুন ভাবী যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুমান ক'রে যুদ্ধ পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করার বাসনা প্রকাশ করেছেন। অর্জুন নিঃসন্দেহে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি বহু মানুষের নিকট আদর্শস্বরূপ। সেক্ষেত্রে অর্জুন যদি সন্ন্যাস গ্রহণকে শ্রেয় মনে করেন তাহলে অন্যান্য সাধারণ মানুষ গৃহকর্ম পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণে প্রবৃত্ত হবে। এইটিকেই তাদের বুদ্ধিভেদ বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ কখনই বলেননি যে সন্ন্যাসই হল একমাত্র শ্রেয় পথ। তাহলে তো সাধারণ সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তাঁর উপদেশ হল যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে কর্ম পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই। সংসারে থেকেই আসক্তিবিহীনভাবে সমস্ত কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েও সন্ন্যাস জীবনের আদর্শ পালন করা যায়। সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কামভাবে সমাজের প্রতি তাঁর নির্দিষ্ট কর্তব্য হিসাবে যুদ্ধ করার উপদেশ দিয়েছেন।। ২৬।।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি # গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়-আত্মা # কর্তা অহম্ ইতি মন্যতে।।২৭।।

কর্মাণি = কর্মসমূহ; সর্বশঃ = সর্বপ্রকারে; প্রকৃতেঃ = প্রকৃতির; গুণৈঃ = গুণসমূহের দ্বারা; ক্রিয়মাণানি = সম্পন্ন হয়; অহঙ্কার-বিমূঢ়-আত্মা = যার বুদ্ধি অহঙ্কারে মত্ত; অহং = আমি; ইতি = এই কথা; মন্যতে = মনে করে।।২৭।।

অনুবাদ :- সমস্ত কর্ম প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের প্রভাবে আপনা আপনিই সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি অহঙ্কারে মত্ত সে ভাবে যে সেই কাজগুলি সে নিজেই সম্পন্ন করেছে।।২৭।।

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো # গুণকর্ম-বিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্তে # ইতি মত্বা ন সজ্জতে।।২৮।।

তু = কিন্তু; গুণকর্ম-বিভাগয়োঃ = গুণ ও কর্ম এই দুই বিভাগের; তত্ত্ববিৎ = জ্ঞানী; গুণাঃ = ইন্দ্রিয়সমূহ; গুণেষু = ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে; বর্তন্তে = প্রবৃত্ত হয়; ইতি = এইরূপ; মত্বা = জেনে; ন সজ্জতে = জ্ঞানিগণ কোন কিছুতে আসক্ত হন না।। ২৮।।

অনুবাদ :- কিন্তু হে মহাবাহু! যে সমস্ত জ্ঞানিগণ গুণ ও কর্ম এই দুই বিভাগের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য সম্যক জানেন তাঁরা জানেন যে গুণসমূহ নিজেদের মধ্যেই নিত্য খেলায় মত্ত অর্থাৎ কাজগুলি তাদের প্রভাবেই হয়ে থাকে এবং কাজগুলি করার ব্যাপারে অন্য কারও কিছু ভূমিকা নেই। এই সত্য জানার পর জ্ঞানিগণ কোন কিছুতে আসক্ত হন না।। ২৮।।

প্রকৃতেঃ গুণ-সংমূঢ়াঃ # সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তান্ অকৃৎস্নবিদো মন্দান্ # কৃৎস্নবিৎ ন বিচালয়েৎ।। ২৯।।

প্রকৃতেঃ = প্রকৃতির; গুণ-সংমূঢ়াঃ = গুণের প্রভাবে বিমূঢ়; সজ্জন্তে = আসক্ত হয়; গুণকর্মসু = শরীরস্থ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপে; কৃৎস্নবিৎ = কৃৎস্ন অর্থাৎ সমস্ত এবং বিদ্ অর্থাৎ জ্ঞানী। সুতরাং কৃৎস্নবিৎ = সর্বজ্ঞ; অকৃৎস্নবিদঃ = অল্পজ্ঞ; তান্ = সেই সকল; মন্দান্ = মন্দবুদ্ধি; ন বিচালয়েৎ = বিচলিত করা উচিত নয়।।২৯।।

অনুবাদ :- অল্পজ্ঞ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহিত হয়ে ইন্দ্রিয়াদির প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে। সর্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে সেই সমস্ত অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে বিচলিত করা উচিত নয়।। ২৯।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে বলতে চেয়েছেন যে অল্পজ্ঞ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহিত হয়ে ইন্দ্রিয়াদির প্রতি আসক্ত হওয়ার কারণে ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ্যবস্তু ভোগের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হয় এবং তাদের ভগবৎ ভক্তির প্রতি কোন মন বা প্রচেষ্টা থাকে না। কিন্তু যাঁরা সর্বজ্ঞ ব্যক্তি তাঁরা প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহিত হন না। তাঁদের দায়িত্ব হল ঐ সকল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদেরকে ভগবৎ ভক্তির পথে আকর্ষণ করা। কিন্তু ভগবান্ বলছেন যে তাদেরকে হঠাৎ এই পথে বলপূর্বক আনতে গেলে তারা বিচলিত হয়ে পড়বে এবং তাতে বিপরীত ফল ফলবে। সেইজন্য সেই সকল সর্বজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে

কৌশলপূর্ণ উপায়ে এই কাজ করতে হবে। যেমন অতিরিক্ত মদিরা পানে আসক্ত কোন ব্যক্তিকে মদিরাপানে বিরত করতে হলে হঠাৎ একদিনে সেই চেষ্টা করতে গেলে হবে না, তাতে সেই মদিরাসক্ত ব্যক্তি ভয়ঙ্করভাবে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে কোন ভয়ানক কর্ম করে ফেলতে পারে। এর ফলে তাকে মদ্যপানে বিরত করার প্রয়াসটাই ব্যর্থ হবে। সেইজন্য ধীরে ধীরে তাকে মদ্য পানের কুফল এবং মদ্য পানে বিরত থাকার সুফল সম্বন্ধে ভালোভাবে বুঝাতে হবে। তাহলে ক্রমশ সেই ব্যক্তি একদিন মদ্যপানে বিরত হবে। তেমনই ইন্দ্রিয়ভোগের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত ভগবৎ ভক্তিবর্জিত তামসী ব্যক্তির অন্তরে নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত হওয়া ও শাস্ত্রবিহিত কর্ম ক'রে ভগবৎ ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা যোগাতে হবে। তাহলে ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তি একদিন পাপের পথ পরিহার ক'রে ভক্তির শ্রেয় পথে অগ্রসর হবে। কিন্তু হঠকারীর মত অতি দ্রুততার দ্বারা এই কাজ করতে গেলে সেই ব্যক্তি অতি বিচলিত হয়ে পড়বে এবং তাকে আর কোনদিনই শুভপথে আনা যাবে না। সেইজন্য ভগবান্ বলছেন যে প্রয়োজনের চাইতেও অতি উৎসাহের সঙ্গে কোন শুভকাজ করতে যাওয়া উচিত নয়।।২৯।।

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি # সংন্যস্য অধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীঃ নির্মমো ভূত্বা # যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।। ৩০।।

অধ্যাত্মচেতসা = অধ্যাত্মচেতনার দ্বারা; সর্বাণি = সমস্ত; কর্মাণি = কর্মসমূহ; ময়ি = আমাতে; সংন্যস্য = সমর্পণ ক'রে; নিরাশীঃ = নিষ্কাম; নির্মমঃ = মমতাশূন্য; বিগতজ্বরঃ = শোক-সন্তাপ মুক্ত; ভূত্বা = হয়ে; যুধ্যস্ব = যুদ্ধ কর।।৩০।।

অনুবাদ :- অধ্যাত্মচেতনার দ্বারা অর্থাৎ সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের এবং আমি তাঁর দাস এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ ক'রে আশা, মমতাশূন্য হয়ে অর্থাৎ 'আমার আমার' বোধ ত্যাগ ক'রে এবং শোক ও সন্তাপ মুক্ত হয়ে যুদ্ধ কর।। ৩০।।

যে মে মতম্ ইদং নিত্যম্ # অনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তো # মুচ্যন্তে তে অপি কর্মভিঃ।। ৩১।।

যে = যে সকল; মানবাঃ = মানবগণ; শ্রদ্ধাবন্তঃ = ভক্তিমান; অনসূয়ন্তঃ = ঈর্ষাবিহীন; মে = আমার; ইদং = এই; মতং = নির্দেশাবলী; নিত্যম্ = অহরহ; অনুতিষ্ঠন্তি = পালন করে; তে = তারা; অপি = ও; কর্মভিঃ = কর্মবন্ধন থেকে;

মুচ্যন্তে = মুক্তিলাভ করে।। ৩১।।

অনুবাদ :- যে সকল মানবগণ ভক্তিমান ও ঈর্ষাবিহীন চিত্তে আমার এই নির্দেশাবলী অহরহ পালন করে তারাও সকল কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে।। ৩১।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে এই শ্লোকে ব্যবহৃত 'অনসূয়া' শব্দটির অর্থের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। 'অনসূয়া' শব্দটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ক'রে অত্রি স্মৃতিতে বলা হয়েছে—

ন গুণান্ গুণিনো হন্তি স্তৌতি চ অন্যান্ গুণান্ অপি।
ন হসেচ্চান্যদোষাংশ্চ সাহনুসূয়া প্রকীর্তিতা।।

অত্রিস্মৃতি — ৩৭

অর্থাৎ গুণবান মানুষের গুণকে নষ্ট না করা, অপরের গুণের প্রশংসা করা এবং অপরের দোষ দেখে তাকে উপহাস না করা— এইগুলিকে অনসূয়া বলা হয়।

এই শব্দটির উপর্যুক্ত অর্থের উপর গুরুত্ব প্রদান ক'রে ভাবতে হবে শ্রীকৃষ্ণ কেন এবং কি উদ্দেশ্যে এই শব্দটি এই শ্লোকে ব্যবহার করেছিলেন এবং এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত অর্থ কি। জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলেই জানেন যে মানুষের সুন্দর ও আদর্শ জীবন লাভের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি কি উপদেশ দিয়েছেন। তথাপি উভয় প্রকারের মানুষ জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার ও অভ্যাস বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অমূল্য উপদেশগুলির গুরুত্ব জেনেও তাঁর প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুযায়ী তাঁর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর না হয়ে উলটো পথে গমন করে। এখন এখানে একটি প্রশ্ন যে তাহলে কি সেই সমস্ত লোক জ্ঞানী-অজ্ঞানী নির্বিশেষে শাস্ত্র বিহিত দণ্ডের ভাগী হবেন? এই প্রশ্নটির উত্তর দেবার জন্যই পরম করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে এই শ্লোকটিতে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অনসূয়া পদটির অবতারণা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে তাঁর পথে গমন না করলেই যে কেউ দণ্ডের ভাগী হবেন তা নয়। যদি আত্মনিষ্ঠ শাস্ত্রের অধিকারী কেউ আমার প্রদর্শিত পথে গমন না করে বা না করতে পারে কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে আমার মতই হল সকল শাস্ত্রের সার এবং সেই মত কার্য-অনুষ্ঠান করে অথবা আমার মতানুসারে কার্য না করলেও নিশ্চিতভাবে মনে করে যে আমার

মতই সকল শাস্ত্রের সার এবং আমার উপরে শ্রদ্ধা রাখে অথবা যে আমার উপর শ্রদ্ধাবান না হলেও 'আমার মত সকল মতের সার হতে পারে না' এইরূপে আমার নিন্দা করে না অর্থাৎ আমার মহান শাস্ত্রের মধ্যে কোন দোষ দেখে না, তারা আমার এই মতানুসারে কর্ম না করলেও আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনসূয়ার দ্বারা তারা অনাদি কাল থেকে আগত সমস্ত কর্মের বন্ধন ও পাপ থেকে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করে।

গীতার তত্ত্ব অনুযায়ী একজন মানুষ যিনি মোক্ষলাভে ইচ্ছুক তাঁর চরিত্রে এই সকল গুণের উপস্থিতির একান্ত আবশ্যক।। ৩১।।

যে তু এতৎ অভ্যসূয়ন্তো # ন অনুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞান-বিমুঢ়ান্ তান্ # বিদ্ধি নষ্টান্ অচেতসঃ।। ৩২।।

তু = কিন্তু; যে = যারা; অভ্যসূয়ন্তঃ = ঈর্ষাবশতঃ; মে = আমার; এতৎ = এই; মতং = নির্দেশ; ন অনুতিষ্ঠন্তি = পালন করে না; তান্ = তাদেরকে; সর্বজ্ঞান-বিমুঢ়ান্ = সর্বজ্ঞানহীন; অচেতসঃ = চেতনাহীন; নষ্টান্ = বিনষ্ট; বিদ্ধিঃ = জেনে রেখো।। ৩২।।

অনুবাদ :- কিন্তু যারা ঈর্ষাবশতঃ আমার এই নির্দেশ পালন করে না, জেনে রাখ তারা সর্বজ্ঞানহীন, চেতনাহীন, ঘোর মূর্খ এবং বিনষ্ট।। ৩২।।

ব্যাখ্যা :- সমস্ত বিশ্ব প্রপঞ্চ কৃষ্ণকেই কেন্দ্র ক'রে চলছে। সমস্ত আত্মপদার্থ তাঁরই শরীর। আমরা তাঁর দাসানুদাস হয়ে তাঁরই নির্দেশে যন্ত্রবৎ তাঁরই নির্ধারিত কর্ম ক'রে চলেছি। কিন্তু একশ্রেণীর মানুষ আছে যারা এরকম ভাবে না বা ভাবতে পারে না। বরং তারা কৃষ্ণকে বিদ্রূপ করে। তারা কৃষ্ণের নিন্দায় সরব। তারা ভাবে কৃষ্ণের জন্ম গোয়ালের ঘরে, সে ছোটবেলায় গরুর লেজ ধরে ঘুরে বেড়াতো, পুকুরে স্নানরতা গোপিনীদের কাপড় চুরি ক'রে পালাত, অগণিত নারীর সঙ্গে প্রেম করত এই সমস্ত বলে তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন শ্রদ্ধা রাখে না। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এই ধরণের মানুষদের জন্য এই কথাগুলি বলেছেন। তিনি বলেছেন যে একমাত্র সেই সমস্ত মানুষই বস্তুর যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে যাদের অন্তরে চেতনা আছে। কিন্তু এই সমস্ত মানুষ বস্তুর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারে না। তাই তারা সর্বপ্রকারে চেতনাহীন, মূঢ়, নষ্ট এবং বিপরীত জ্ঞানবিশিষ্ট।। ৩২।।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ # প্রকৃতেঃ জ্ঞানবান্ অপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি # নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।। ৩৩।।

জ্ঞানবান্ = জ্ঞানী ব্যক্তি; অপি = ও; স্বস্যাঃ = নিজ; প্রকৃতেঃ = স্বভাবের; সদৃশং = অনুরূপ; চেষ্টতে = চেষ্টা করে; ভূতানি = জীবসকল; প্রকৃতিং = নিজের স্বভাবকে; যান্তি = অনুসরণ করে; নিগ্রহঃ = দমন; কিং = কি; করিষ্যতি করবে।। ৩৩।।

অনুবাদ :- জ্ঞানী ব্যক্তিগণও যার যা স্বভাব সে সেই অনুসারে কাজ করতে চেষ্টা করে। জীবসকল স্বভাবকে অনুসরণ করে। সুতরাং ইন্দ্রিয়কে বলপূর্বক দমন ক'রে কোন সুফল হয় না।। ৩৩।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ কৃষ্ণ এই শ্লোকে জ্ঞানযোগের আচরণ দুঃসাধ্য হওয়ার কারণে প্রমাদ ঘটার সম্ভাবনাযুক্ত এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে সমস্ত শাস্ত্রেই বলা হয়েছে যে আত্মা নিত্য, শাশ্বত, শুদ্ধ, নির্মল, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাতীত — সেইজন্য সদা-সর্বদা আত্মারই অনুসন্ধান করা উচিত। এই বিষয়টি যাঁরা জানেন অর্থাৎ পরমার্থের যথার্থ তত্ত্বকে যে সমস্ত ভগবতপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ সম্যক জানেন সেই জ্ঞানবান ব্যক্তিগণও নিজ নিজ পূর্বজীবনে অর্জিত বাসনা অনুযায়ী প্রকৃতি বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবন করে চলেন। পূর্ব জন্মে অর্জিত পাপ-পুণ্যের যে সংস্কার বর্তমান জীবনে প্রকট হয় তাকে প্রকৃতি বলা হয়। সহসা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করলেই যে ঐ সমস্ত মানুষদের অন্তর থেকে বাসনা দূর হয়ে প্রাকৃত বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষা দূর হয়ে যাবে একথা সত্য নয়। জন্ম-জন্মান্তর লালিত বাসনা সহজে অন্তর থেকে দূর হওয়া কঠিন। কেউ জানে না অন্তরের সেই সুপ্ত কাম, ক্রোধ, লোভ আদি ষড়রিপু সহসা কখন আপাতভাবে মৃত আগ্নেয়গিরির ন্যায় জেগে উঠবে। এ বিষয়ে একটি পৌরাণিক উপাখ্যান উদ্ধৃত করছি। সাংখ্যশাস্ত্র প্রণেতা কপিলমুনি একজন প্রকৃত আত্মদর্শী মহান জ্ঞানযোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর জ্ঞান যোগের দ্বারা পূর্বাপর জীবন সমূহের সংস্কার ও বাসনাকে অর্গলবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু সহসা একদিন একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে অগ্র-পশ্চাৎ কোন প্রকার বিবেচনা না ক'রে নিতান্ত ক্রোধ বশতঃ তিনি সগর রাজার নির্দোষ ষাট হাজার পুত্রদের ভস্ম ক'রে দিয়েছিলেন। সেইজন্য বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করলেই চিত্ত সংযত হয় এ কথা বলা যায় না।

ক্রোধকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নরকের দরজা বলা হয়েছে —

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।।
—১৬/২১

এই সমস্ত কারণে পূর্বে বলা হয়েছে যে জ্ঞানযোগের আচরণ খুবই কঠিন এবং এখানে প্রমাদ ঘটার ভয় আছে যা আমরা দেখতে পাই কপিলমুনির ন্যায় মহা জ্ঞানযোগীর ক্ষেত্রে। তুলনায় কর্মযোগের সাধন অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এখানে প্রমাদ ঘটার ভয় নাই এবং নিষ্কাম কর্মযোগের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ হয় বলে অন্য কোন সাধনের প্রয়োজন হয় না।। ৩৩।।

ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে # রাগ-দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োঃ ন বশম্ আগচ্ছেৎ # তৌ হি অস্য পরিপন্থিনৌ।।৩৪।।

ইন্দ্রিয়স্য = ইন্দ্রিয়ের; ইন্দ্রিয়স্য অর্থে = নিজের বিষয়ে; রাগ-দ্বেষৌ = অনুরাগ ও বিরাগ; ব্যবস্থিতৌ = থাকে; তয়োঃ = তাদের; বশং = অধীনে; ন আগচ্ছেৎ = না যাওয়া উচিত; হি = অবশ্যই; তৌ = তারা; অস্য = মানুষের পক্ষে; পরিপন্থিনৌ = ক্ষতিকর।।৩৪।।

অনুবাদ :- প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়েরই নিজের নিজের বিষয়ে রাগদ্বেষ থাকে অর্থাৎ কোনটি তার ভালো লাগে আবার কোনটি তার ভালো লাগে না। সেইজন্য ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষের অর্থাৎ পছন্দ-অপছন্দের বশীভূত হওয়া অনুচিত কারণ সেগুলি মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক।।৩৪।।

ব্যাখ্যা :- মানুষের অন্তরে যে যে বিষয় ভোগের পথ সাবলীল বা মসৃণ বলে বোধ হয় সেই সেই বিষয়ে তার অন্তরে আকর্ষণ থাকে। একে রাগ বলা হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রের ২।৭ সূত্রে বলেছেন— 'সুখানুশয়ী রাগঃ' অর্থাৎ কোন বিষয়ে সুখ অনুভব করার পর কোন ব্যক্তি, ভোক্তা, অনুভবকর্তার অন্তরে তাকে লাভ করার জন্য যে বাসনা, অভিলাষ, অনুরক্তি, আসক্তি উৎপন্ন হয় তাকেই বিষয়টির প্রতি রাগ বলা হয়। আবার যে যে বিষয় ভোগের পথ তাদের কাছে প্রতিকূল বলে মনে হয় সেই সেই বিষয়ের প্রতি তাদের অন্তরে অনীহা বা বিরক্তি থাকে। একে দ্বেষ বলা হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রের ২।৮ সূত্রে

দ্বেষ সম্পর্কে বলেছেন — "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ" অর্থাৎ কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার পরে সেখান থেকে অন্তরে ব্যথা, দুঃখ অনুভব হওয়ার কারণে চিত্তে সেই বিষয়ের প্রতি যে নিন্দাত্মক ক্রোধরূপ ভাবনা জন্ম নেয় তাকে দ্বেষ বলা হয়। মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়ের প্রতি রাগ অর্থাৎ আকর্ষণ থাকে। কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়ভোগের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হলে তার প্রতি তার মনে দ্বেষ জন্মগ্রহণ করে। আত্মদর্শী ব্যক্তিগণ প্রবল প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অবস্থিত বাসনাসমূহের রাগদ্বেষ দমন করে জ্ঞান যোগের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু কখনও কখনও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি সেই রাগদ্বেষ এমন প্রবল আকার ধারণ করে যে তারা সেই আত্মদর্শী ব্যক্তির নিষ্ঠাকে পরাভূত করে। যার ফলে সেই আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির পতন ঘটে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে আত্মদর্শনে নিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রথম থেকেই সজাগ থাকতে হবে যেন তাঁরা কোন বিষয়ের প্রতি রাগদ্বেষের শিকার না হন। রাগদ্বেষ মানুষের উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।।৩৪।।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ # পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ # পরধর্মো ভয়াবহঃ।।৩৫।।

স্বনুষ্ঠিতাৎ = খুব ভালোভাবে পালিত হলেও; পরধর্মাৎ = অপরের জন্য নির্ধারিত কর্তব্যের চাইতে; বিগুণঃ = অল্প ত্রুটিযুক্ত; স্বধর্মঃ = নিজের জন্য নির্ধারিত কর্তব্য; শ্রেয়ান্ = শ্রেষ্ঠ; স্বধর্মে = নিজের কর্তব্য পালনের জন্য; নিধনং = মৃত্যু হলেও; শ্রেয়ঃ = ভালো; পরধর্মঃ = অপরের জন্য নির্ধারিত কর্তব্য; ভয়াবহঃ = বিপজ্জনক।। ৩৫।।

অনুবাদ :- অপরের জন্য নির্ধারিত কর্তব্য যদি খুব ভালোভাবেও পালিত হয় এবং নিজের জন্য নির্ধারিত কর্তব্যের মধ্যে যদি কিছু ত্রুটি থাকে তাহলেও পরের জন্য নির্ধারিত কর্তব্য অপেক্ষা নিজের কর্তব্য পালন করা শ্রেয়। নিজের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মৃত্যু হলেও তা শ্রেয়ঃ কিন্তু অপরের পথ অনুসরণ করা বিপজ্জনক।। ৩৫।।

ব্যাখ্যা :- এখানে ধর্ম বলতে Religion বলা হয়নি। এখানে ধর্ম বলতে চতুর্বর্ণের জন্য শাস্ত্রবিহিত নিজ নিজ কর্তব্য বা বৃত্তিকে বোঝানো হয়েছে। তখনকার সমাজে এক এক বর্ণের মানুষদের জন্য এক এক প্রকার বৃত্তি নির্ধারিত ছিল। ক্ষত্রিয়দের বৃত্তি ছিল প্রজাপালন, দেশরক্ষা তৎসহ প্রজাকল্যাণে শত্রুর

সঙ্গে যুদ্ধ করা। সুতরাং ক্ষত্রিয় হিসাবে অর্জুনের বৃত্তি ছিল যুদ্ধ করা। এটিই ছিল তার বর্ণ-ধর্ম। কিন্তু অর্জুন তাঁর এই স্বাভাবিক ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের কথা ভাবছেন। কিন্তু তিনি যদি তাঁর স্বাভাবিক ক্ষত্রিয় ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য বা শূদ্রের স্বাভাবিক বৃত্তি অবলম্বন করতে যান তাহলে তা তাঁর নিজের বা সমাজের কারোর পক্ষেই শুভ হবে না। পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিগণ যা করেন অপরেরা তাকেই অনুসরণ করেন। সেক্ষেত্রে অর্জুন যদি সত্যই তাঁর নির্ধারিত কর্তব্য পরিত্যাগ ক'রে ভিক্ষুকের ধর্ম অবলম্বন করেন তাহলে সমাজের উপর তার একটা বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেছেন অর্জুনকে তাঁর কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ ক'রে সমস্ত দিক রক্ষা করতে। সুতরাং এখানে ধর্ম শব্দের অর্থ যেন কেউ Religion ধরে নিয়ে ভুল না ক'রে বসেন সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন কারণ তার ফলে গীতার অন্যতম মূল নির্যাস বিঘ্নিত হবে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে স্বধর্ম অর্থাৎ নিজের বর্ণধর্ম পালন করতে গিয়ে যদি তাঁর মৃত্যুও হয় তাহলে তাও শ্রেয়। তিনি পূর্বে বলেছেন যে যতটুকুই কর্মযোগ করা যায় ততটুকুরই ফল কর্মযোগী অবশ্যই লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্যক জানেন যে অর্জুনের তো মৃত্যু ঘটবে না, তার দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটবে মাত্র। ফলে পরজন্মে অর্জুন এই জন্মে অর্জিত কর্মযোগের সমস্ত সুফলই লাভ করবেন এবং সেক্ষেত্রে পরজন্মে অর্জুন কর্মযোগ এই স্থান থেকে আরম্ভ করবেন যার ফলে তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যপুরণ সহজতর হয়ে যাবে।

শাস্ত্রে দেখা যায় যে অনেক মহাত্মা স্বধর্ম রক্ষার জন্য হাসিমুখে মৃত্যু স্বীকার করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা অভীষ্ট লাভ করেছিলেন। রাজা দিলীপ ক্ষত্রিয়দের ধর্ম পালন করার লক্ষ্যে একটি গাভীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিজেকে খাদ্যের জন্য একটি সিংহের নিকট সমর্পণ করেছিলেন যার ফলে তাঁর অভীষ্ট পূরণ হয়েছিল। রাজা শিবি শরণাগতরূপ স্বধর্মকে রক্ষা করার জন্য একটি পায়রার পরিবর্তে নিজের শরীরের সমস্ত মাংস একটি বাজকে প্রদান করে নিজের মৃত্যুকে স্বীকার করেছিলেন এবং এর ফলে তাঁর অভীষ্ট পূরণ হয়েছিল। ভক্ত প্রহ্লাদ ভগবদ্ভক্তিরূপ স্বধর্ম পালন করার জন্য আনন্দিতচিত্তে অনেক প্রকারে নিজের মৃত্যুকে স্বীকার করেছিলেন এবং এর ফলে তাঁর পরম কল্যাণ হয়েছিল।

মহাভারতে বলা হয়েছে যে মানুষের কোন সময়ই কামনার বশবর্তী হয়ে, ভয়, লোভ প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে অথবা জীবন রক্ষার জন্য স্বধর্মকে পরিত্যাগ করা উচিত নয় কারণ ধর্ম হল শাশ্বত, নিত্য আর সুখদুঃখ অনিত্য। জীব অর্থাৎ আত্মা নিত্য কিন্তু শরীর অনিত্য—

ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতৌঃ।
নিত্যো ধর্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ।।

—স্বর্গারোহণপর্ব ৫/৬৩

মনুসংহিতাতেও বলা হয়েছে যে স্বধর্ম হীন হলেও তা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অপরের ধর্ম ভালো হলেও তা বর্জনীয়। পরধর্মের সাহায্যে জীবন অতিবাহিতকারী তৎক্ষণাৎ জাতিভ্রষ্ট (শ্রেণীভ্রষ্ট) হয়ে যায় —

বরং স্বধর্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ।।

—মনুসংহিতা ১০/৯৭

গীতা এমনই একটি মহাগ্রন্থ যাঁর প্রতিটি শব্দই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এই জগৎসংসারের পরম জ্ঞাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে 'বিগুণঃ' অর্থাৎ গুণহীন পদটি ব্যবহার করেছেন একটি বিশেষ তত্ত্বকে উপস্থাপিত করার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ বলতে চেয়েছেন যে ভালো ও মন্দের বোধ আপেক্ষিক। বেশীরভাগ সময়ে অজ্ঞানতার কারণে অন্তরে প্রকৃত সত্যের আলোক উদ্ভাসিত না হওয়ার জন্য মানুষ ভ্রান্তভাবে কোন বস্তুকে শ্রেয় বা মন্দ বোধ করে থাকে। যেমন মদ্যাসক্ত ব্যক্তির নিকট নবনীত অপেক্ষা মদ্যই শ্রেয় বোধ হয়। কিন্তু যখনই তার অন্তরে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত হয় তখনই সে তার ভ্রম উপলব্ধি করে সঠিক পথে অগ্রসর হয়। বিল্বমঙ্গল প্রথম জীবনে বাসনার দ্বারা তীব্রভাবে ধাবিত হয়ে এক বারবনিতার প্রতি আসক্ত হন। কিন্তু যখন পরে তার জীবনে সত্যের আলোকের উন্মেষ ঘটল তখন তিনি তাঁর ভ্রম সম্যক উপলব্ধি করে শ্রীভগবানের চরণকমলে নিজেকে সমর্পণ করেন। অতীত-ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্যক জানেন যে বর্তমানে অর্জুন তাঁর শোকবিহ্বল চিত্তের কারণে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ক্ষত্রধর্মের প্রতিকূল কথা বলছেন। কিন্তু অচিরেই তাঁর অন্তর হতে বিষাদের মেঘ কেটে যাবে এবং তখন অর্জুন নিজ ক্ষত্রধর্ম পালনের পথে অগ্রসর হবেন।।৩৫।।

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তঃ অয়ং # পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্ অপি বার্ষ্ণেয় # বলাৎ ইব নিয়োজিতঃ।। ৩৬।।

উবাচ = বললেন; বার্ষ্ণেয় = হে কৃষ্ণ; অথ = তাহলে; অয়ং = এই সমস্ত; পুরুষঃ = মানুষ; অনিচ্ছন্ = অনিচ্ছা; অপি = সত্ত্বেও; কেন = কার দ্বারা; প্রযুক্তঃ = প্রেরিত; বলাৎ = বলপূর্বক; নিয়োজিতঃ = নিয়োজিত; ইব = যেন; পাপং = পাপকর্ম; চরতি = আচরণ করে।। ৩৬।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন — হে কৃষ্ণ! তাহলে এই সমস্ত মানুষেরা ইচ্ছা না থাকলেও কার দ্বারা বলপূর্বক নিয়োজিত হয়ে পাপকর্ম আচরণ করে? ।। ৩৬।।

ব্যাখ্যা :- পূর্বেই বলা হয়েছে গীতার প্রায় প্রতিটি শব্দ গভীর তাৎপর্য বহন করে। সেই জন্য গীতার যথাসম্ভব প্রতিটি শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ জানার প্রয়াস করা কর্তব্য। এই শ্লোকে অর্জুন 'অথ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সাধারণভাবে 'অথ' শব্দটি অতঃপর, সুতরাং ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। বামন শিবরাম আপ্তে তাঁর The Practical Sanskrit-English Dictionary গ্রন্থে লিখেছেন যে সাধারণভাবে 'অথ' শব্দটির ইংরেজি অনুবাদ হল 'here' 'now' ইত্যাদি। কিন্তু এখানে 'অথ' শব্দটি এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। শাস্ত্রের বক্তব্য অনুযায়ী 'অথ' শব্দের অর্থ যাই হোক না কেন এই শব্দটির উচ্চারণ একটি মঙ্গলজনক ইঙ্গিত বহন করে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার কণ্ঠ থেকে প্রথম দুটি শব্দ নির্গত হয়— একটি হল 'ওঁ এবং অপরটি হল 'অথ' —

ওঁকারশ্চাথ শব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং নির্ভিদ্য নির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ।।

অমরকোষে বলা হয়েছে — "মঙ্গলান্তরারম্ভপ্রশ্নকার্ৎস্ন্যেষ্বথো অথ" অর্থাৎ মঙ্গল, অনন্তর, আরম্ভ, প্রশ্ন, সমগ্র প্রভৃতি অর্থে 'অথ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

এইজন্য এই শব্দদুটিকে মধ্যস্থলে উচ্চারিত হলে মঙ্গলজনক ব'লে মনে করা হয়—

এই মঙ্গলজনক শব্দটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দশবার উচ্চারিত হয়েছে যথা শ্লোক

সংখ্যা ১/২০, ১/২৬, ২/২৬, ২/৩৩, ৩/৩৬, ১১/৫, ১১/৪০, ১২/৯, ১২/১১ এবং ১৮/৫৮। অন্যান্য বিভিন্নস্থলে যথা বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ সাহিত্য প্রভৃতিতে মঙ্গলজনক অর্থে এই শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে যথা 'তব বৃক্ষঃ অথ বিল্ব" (ঋগ্বেদ ৪/৪/৩৫/৬), 'অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা' (কঠোপনিষৎ ৩/৭), 'অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্তে দত্তমিত্যুপাসতে' (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৫/১০/৩), 'বৈয়াসকিঃ স ভগবান্ অথ বিষ্ণুরাতম্' (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১/১৪), 'অথ সুদর্শনতাং প্রয়াতি শস্ত্রোঃ' (ভবিষ্য পুরাণ), 'অথ পথি গময়িত্বা ক্লৃপ্তরম্যোপকার্যে ..' (রঘুবংশ) প্রভৃতি।। ৩৬।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ # রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা # বিদ্ধি এনং ইহ বৈরিণম্।।৩৭।।

শ্রীভগবান্ উবাচ = শ্রীভগবান্ বললেন; এষ = এই; রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ = রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়; মহাশনঃ = সর্বগ্রাসী; মহাপাপ্মা = মহাপাপী; ইহ = এই জগতে; এনং = একে; বৈরিণং = শত্রু; বিদ্ধি = মনে করবে।। ৩৭।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন — এই যে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি এগুলি আসে রজোগুণ থেকে। এগুলি হল সর্বগ্রাসী ও পাপময়। এগুলিকে মানবের শত্রু ব'লে জানবে।। ৩৭।।

ধূমেন আব্রিয়তে বহ্নিঃ # যথা আদর্শো মলেন চ।
যথা উল্বেন আবৃতো গর্ভঃ # তথা তেন ইদম্ আবৃতম্।। ৩৮।।

যথা = যেমন; বহ্নিঃ = আগুন; ধূমেন = ধোঁয়ার দ্বারা; আব্রিয়তে = আবৃত থাকে; আদর্শঃ = আয়না; মলেন = ময়লার দ্বারা; চ = এবং; গর্ভঃ = গর্ভ; উল্বেন = জরায়ু দ্বারা; আবৃতঃ = আবৃত থাকে; তথা = সেইরূপ; তেন = তার (বাসনা) দ্বারা; ইদম্ = এই জ্ঞান; আবৃতম্ = আবৃত থাকে।। ৩৮।।

অনুবাদ :- যেমন ধোঁয়া আগুনকে ঢেকে দেয়, যেমন ময়লা আয়নাকে এবং জরায়ু গর্ভকে ঢেকে রাখে ঠিক তেমনই বাসনা জ্ঞানকে আবৃত ক'রে রাখে।। ৩৮।।

আবৃতং জ্ঞানম্ এতেন # জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় # দুষ্পূরেণ অনলেন চ।। ৩৯।।

জ্ঞানিনঃ = জ্ঞানী ব্যক্তির; নিত্যবৈরিণা = চিরশত্রু; এতেন = এর দ্বারা; কামরূপেণ = বাসনারূপ; দুষ্পূরেণ = দুর্বার; অনলেন = আগুনের দ্বারা; চ = এবং; জ্ঞানম্ = জ্ঞান; আবৃতং = আবৃত থাকে।। ৩৯।।

অনুবাদ :- কৌন্তেয়! জ্ঞানী ব্যক্তির চিরশত্রু কামরূপ দুর্বার আগুনের দ্বারা তার জ্ঞান আবৃত থাকে অর্থাৎ দুর্বার আগুনকে যেমন কখনই থামানো যায় না, তেমনই বাসনারও কোনদিনই পরিসমাপ্তি হয় না।। ৩৯।।

ব্যাখ্যা :- সাধারণ ভাষায় 'কাম' শব্দের অর্থ কর্ম ব'লে গণ্য করা হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 'কাম' শব্দ সাংসারিক বাসনাযুক্ত ভোগসমূহের সংযোগ-বিয়োগের কামনা বা ভোগ্যপদার্থ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এছাড়াও এই গ্রন্থের অন্যত্র যে 'রাগ', 'আসঙ্গ' প্রভৃতি পদ ব্যবহার করা হয়েছে সেইগুলিও কামের প্রতিশব্দ হিসাবে গণ্য, এগুলি ভগবৎ বিষয়ক অনুরাগের বোধক নয়।

এখানে জ্ঞান বলতে পরমার্থের যথার্থ জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। জ্ঞাননিষ্ঠাতে যেহেতু ইন্দ্রিয়সমূহকে সর্বদা দমন ক'রে রাখতে হয় সেইজন্য কাম জ্ঞাননিষ্ঠার চিরশত্রু। সে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির বিন্দুমাত্র দুর্বলতা পেলেই সর্বগ্রাসী আগুনের ন্যায় তার সেই জ্ঞাননিষ্ঠাকে গ্রাস ক'রে ফেলে এবং নিরন্তর তাকে বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষার দিকে আকর্ষণ ক'রে চলে এবং সেই জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি যতই বিষয়ভোগে লিপ্ত হয় ততই এই দুর্বার কাম তাকে আরও বিষয়ভোগের দিকে চালিত করে এবং সেই বিষয়ভোগের বাসনা কখনও তৃপ্ত হয় না। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।।

—শ্রীমদ্ভাগবত ৯/১৯/১৪

অর্থাৎ যেমন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি বেড়ে যায় তেমনই কাম উপভোগের দ্বারা কামেরও কোন সমাপ্তি হয় না বরং তা বেড়ে যায়।। ৩৯।।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ # অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে।
এতৈঃ বিমোহয়তি এষ # জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনম্।। ৪০।।

ইন্দ্রিয়াণি = ইন্দ্রিয়সমূহ; মনঃ বুদ্ধিঃ = মন ও বুদ্ধি; অস্য অধিষ্ঠানম্ = এদের বাসস্থান; উচ্যতে = বলা হয়; এষঃ = এই (বাসনা); এতৈঃ = এর দ্বারা; জ্ঞানম্ = জ্ঞানকে; আবৃত্য = ঢাকা দিয়ে; দেহিনং = জীবকে; বিমোহয়তি = মোহগ্রস্ত করে।। ৪০।।

অনুবাদ :- বলা হয় যে ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধির মধ্যে কাম বাস করে। এই কাম জ্ঞানকে আড়াল ক'রে জীবকে মোহগ্রস্ত ক'রে রাখে।। ৪০।।

ব্যাখ্যা :- ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধিকে কামের বাসস্থান বা গৃহ বলা হয়েছে। আমাদের স্বাস্থ্য, মন, নিরাপত্তা প্রভৃতি ততক্ষণই সুরক্ষিত থাকবে যতক্ষণ না আমাদের গৃহে রোগ, চোর-ডাকাত, ক্ষতিকারক বস্তু ও বন্য জন্তু, কীটপতঙ্গ প্রভৃতির অনুপ্রবেশ ঘটবে। কিন্তু আমাদের অনবধানতা বশতঃ যেই আমাদের গৃহে ঐ সব শত্রু অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হবে তৎক্ষণাৎ আমাদের সমস্ত সুখ, সমস্ত নিরাপত্তা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কল্যাণবিরোধী দুর্জয় শত্রু হল কাম। এই কাম বিষয়ভোগরূপ মিথ্যা অনিত্য সুখের লোভ দেখিয়ে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে গ্রাস করে এবং তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং সেই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্ত বিষয়সুখভোগরূপ লালসার দ্বারা জীবাত্মার পারমার্থিক জ্ঞানকে আবৃত ক'রে তাকে মোহময় সংসাররূপ কারাগারের গহন অন্ধকারে নিক্ষেপ করে এবং পরমার্থ প্রাপ্তিরূপ জীবনের প্রকৃত সম্পদ থেকে বঞ্চিত ক'রে তার অমূল্য মনুষ্যজীবনকে ধ্বংস ক'রে দেয়। সেইজন্য নিজের ঘর-সংসারের সুখ-শান্তি-সুস্বাস্থ্য-নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য যেমন গৃহস্থকে সদা জাগ্রত থাকতে হয় এবং তাকে যথাসম্ভব প্রয়াসের মাধ্যমে সেইসব শত্রুদের প্রতিহত করতে হয় তেমনই পারমার্থিক জ্ঞানলাভে অভিলাষী ব্যক্তিগণেরও ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কল্যাণবিরোধী দুর্জয় শত্রু কামকে প্রতিহত বা নিষ্কাসিত করতে হবে। নচেৎ কাম তার বাসনারূপ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির গভীরে প্রবেশ ক'রে মানুষের বিবেকশক্তিকে নষ্ট ক'রে তার জীবনকে বিষময় ক'রে তুলবে।। ৪০।।

তস্মাৎ ত্বম্ ইন্দ্রিয়াণি আদৌ # নিয়ম্য ভরত-ঋষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হি এনং # জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্।। ৪১।।

ভরত-ঋষভ = হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তস্মাৎ = সেইজন্য; ত্বম্ = তুমি; আদৌ = প্রথমে; ইন্দ্রিয়াণি = ইন্দ্রিয়সমূহকে; নিয়ম্য = সংযত ক'রে; জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্ = জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশকারী; এনং = এই; পাপ্মানং = পাপরূপ বাসনাকে; প্রজহি = জয় কর; হি = নিশ্চিতভাবে।।৪১।।

অনুবাদ :- হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! সেইজন্য তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত ক'রে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশকারী এই পাপরূপ বাসনাকে নিশ্চিতভাবে জয় কর।। ৪১।।

ব্যাখ্যা :- প্রচলিত অর্থে 'ঋষভ' শব্দের দ্বারা ষণ্ড অর্থাৎ ষাঁড়কে বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু উন্নত অর্থে 'ঋষভ' শব্দের অর্থ হল শ্রেষ্ঠ পুরুষ। শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে রাজা নাভি ও মেরুদেবীর পুত্র ঋষভদেবকে ভগবান্ বিষ্ণুর অষ্টম অবতার হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জৈনগণ ঋষভদেবকে তাঁদের আদি তীর্থংকর হিসাবে স্বীকার করেন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান কাকে বলে— শঙ্করাচার্য বলেছেন— "জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্যতঃ চ আত্মাদীনাম্ অববোধঃ, বিজ্ঞানং বিশেষতঃ তদনুভবঃ তয়োঃ জ্ঞানবিজ্ঞানঃ"। (শাঙ্করভাষ্য ৩।৪১)। অর্থাৎ যে মানুষের অন্তরে বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ ক'রে তথা গুরুর নিকট থেকে উপদেশের মাধ্যমে দেহাদিভিন্ন আত্মা-অনাত্মা, বিদ্যা-অবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের আত্মবিষয়ক যে বোধের উদয় হয় তাকে বলা হয় জ্ঞান এবং ধ্যান প্রভৃতির দ্বারা অন্তরে আত্মবিষয়ক যে অনুভব হয় তাকে বিজ্ঞান বলা হয়।। ৪১।।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ # ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসঃ তু পরা বুদ্ধিঃ # যো বুদ্ধেঃ পরতঃ তু সঃ।। ৪২।।

ইন্দ্রিয়াণি = ইন্দ্রিয়সমূহ; পরাণি = শ্রেষ্ঠ; আহুঃ = বলা হয়; ইন্দ্রিয়েভ্যঃ = ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা; মনঃ = মন; পরং = শ্রেষ্ঠ; মনসঃ = মন অপেক্ষা; তু = কিন্তু; বুদ্ধিঃ = বুদ্ধি; পরা = শ্রেষ্ঠ; যঃ = যিনি; তু = কিন্তু; বুদ্ধেঃ = বুদ্ধি অপেক্ষা; পরতঃ = উপরে; সঃ = তিনি।। ৪২।।

অনুবাদ :- স্থূল শরীর অপেক্ষা ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যিনি বুদ্ধিরও উপরে তিনি আত্মা।।৪২।।

ব্যাখ্যা :- শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন যে স্থূল শরীর অপেক্ষা ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা বুদ্ধি এবং বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়টি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে বিষয়টি সম্যকভাবে পরিস্ফুট করার জন্য আমাদেরকে কঠোপনিষদের সাহায্য নিতে হবে। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে —

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।।

—কঠোপনিষদ১/৩/৩-৪

অর্থাৎ স্থূল দেহ হল একটি রথস্বরূপ। সেই রথের একেবারে উপরে যিনি বসে আছেন তিনি হলেন রথী অর্থাৎ রথের মালিক অর্থাৎ আত্মা। সেই রথকে যিনি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি হলেন সারথি অর্থাৎ বুদ্ধি। রথটিকে যারা টানছে সেই ঘোড়াগুলি হল ইন্দ্রিয়, ঘোড়াগুলিকে যে নিয়ন্ত্রণ করছে সেই লাগাম হল মন এবং রথটি যে পথ দিয়ে চলেছে সেই পথটি হল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বিষয়ভোগরূপ পথ দিয়ে দেহরূপ যে রথখানি চলেছে সেটি জড়পদার্থ। সে নিজে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতাহীন। তাকে কেউ টানলে তবে সে চলবে। এই টানা কাজটি করছে ঘোড়ারূপ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলির কাজ করা স্তব্ধ হয়ে গেলে রথ থেমে যাবে অর্থাৎ দেহ অসার হয়ে যাবে। সুতরাং দেহের চাইতে ইন্দ্রিয় বড়। আবার ঘোড়াগুলি যাতে ইচ্ছামত চলে বিপথে গিয়ে বিপদ ঘটাতে না পারে সেই জন্য তার লাগামের প্রয়োজন আর এই লাগাম হল মন। তাহলে ইন্দ্রিয়ের চাইতে মনের স্থান উঁচুতে। সেই লাগামকে যে নিয়ন্ত্রণ করবে সে হল সারথি এবং দেহের ক্ষেত্রে সেই সারথি হল বুদ্ধি। তাহলে বুদ্ধির অবস্থান হল মনেরও উপরে আর বুদ্ধিকে যিনি ধারণ করে আছেন তিনি হলেন দেহী অর্থাৎ রথের মালিক অর্থাৎ আত্মা। সুতরাং সারথিরূপ বুদ্ধিরও উপরে স্থান হল আত্মার। কঠোপনিষদে আরও বলা হয়েছে —"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হি অর্থা"

(১/৩/১০) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ হল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহই ইন্দ্রিয়গুলিকে পারমার্থিক জ্ঞানলাভের প্রতিকূল পথে চালিত করার জন্য আকৃষ্ট করে এবং এভাবে ইন্দ্রিয় অসংযতভাবে বিষয়ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হলেই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণের সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যের মূল কথা হল এই যে জীবাত্মা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হওয়ার কারণে যতক্ষণ সে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে নিজের অধীনে রাখতে পারবে ততক্ষণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয়ের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না অর্থাৎ জীবন তার ঈপ্সিত পথের দিকে অগ্রসর হয়ে চলবে। কিন্তু যখনই জীবাত্মা তার শক্তি বিস্মৃত হয়ে সকলের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাবে তখনই লোভনীয় বিষয়সমূহের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে শক্তিশালী ইন্দ্রিয়সমূহ প্রবল বেগে জীবনকে নরক পথগামী ক'রে তুলবে। সেইজন্য অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ যে অর্জুন যেন চিত্তের দুর্বলতাবশতঃ ইন্দ্রিয়জ সুখ, দুঃখ, মমতা, অনুকম্পা, বিষাদ, দয়া প্রভৃতির দ্বারা অবশ হয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ না করেন। তাহলে তাঁর এই চিত্তের দুর্বলতা তাঁর পতনকে আহ্বান করবে।। ৪২।।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা # সংস্তভ্য আত্মানম্ আত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো # কামরূপং দুরাসদম্।। ৪৩।।

এবং = এইভাবে; বুদ্ধেঃ = বুদ্ধির; পরং = শ্রেষ্ঠকে; বুদ্ধ্বা = জেনে; আত্মনা = বুদ্ধিদ্বারা; আত্মানং = মনকে; সংস্তভ্য = নিশ্চল ক'রে; কামরূপং = কামরূপ; দুরাসদং = দুর্নিবার; শত্রুং = শত্রুকে; জহি = পরাজিত কর।। ৪৩।।

অনুবাদ :- হে মহাবাহো! এইভাবে বুদ্ধির অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জেনে বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিশ্চল ক'রে কামরূপ দুর্নিবার শত্রুকে পরাজিত কর।। ৪৩।।

ব্যাখ্যা :- শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন আত্মাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জেনে বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিশ্চল ক'রে প্রবল শক্তিশালী কামকে পরাস্ত করতে। অর্জুন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণের এই পরামর্শের গূঢ় অর্থ নিশ্চয়ই

উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের নিকট এই বিষয়টি ততখানি সহজবোধ্য নয়। সেইজন্য এখানে বিষয়টি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা প্রয়োজন।

সেই আদিকাল থেকেই আমাদের দেশের বেদ পুরাণাদি বিভিন্ন শাস্ত্র মানুষের কল্যাণে আত্মার সার্বভৌমত্বের বার্তা মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। সেই বার্তা অন্তরে গ্রহণ ক'রে সীমিত সংখ্যক জ্ঞানী মানুষ জীবনের পরম সত্যকে উপলব্ধি ক'রে নিজেকে অনেক উঁচু স্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু সেই অনাদিকাল থেকেই শাস্ত্রসমূহের এই বার্তা বেশীরভাগ মানুষের কানে পৌঁছায়নি। কারণ সেই অনাদিকাল থেকেই মানুষের অন্তর অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেইজন্য মানুষ বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে বা জ্ঞানীদের নিকট থেকে আত্মবিষয়ক কথা শুনলেও জীব আত্মস্বরূপকে বিস্মৃত হয়ে নিজে সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও নিজের শক্তিকে উপলব্ধি করতে না পেরে আত্মার চিরশত্রু কামের অধীনস্থ হয়ে থাকে। কিন্তু সে যদি নিজের আত্মস্বরূপকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারে তাহলে রাগদ্বেষরূপী কামকে সে অনায়াসেই মন থেকে দূর করতে পারবে। সুতরাং কামকে নাশ করতে হলে আত্মতত্ত্ব কি সেটি জানা অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু আত্মতত্ত্ব বড়ই গূঢ় বিষয়। একমাত্র সূক্ষ্মদর্শী পুরুষগণই এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে যে প্রতিটি জীবের মধ্যে আত্মা অবস্থিত কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না। একমাত্র সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ তাঁদের সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন—

> এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়ো আত্মা ন প্রকাশতে।
> দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।। —১/৩/১২

বুদ্ধিদ্বারা মনকে কিভাবে বশ করা যাবে সেই বিষয়টিও জানা প্রয়োজন। গীতায় বুদ্ধির দ্বারা মনকে জয় করার দুটি উপায় বলা হয়েছে— অভ্যাস এবং বৈরাগ্য — "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে" (৬/৩৫)। কিন্তু এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য কিভাবে অর্জন করা যায়? বুদ্ধির সাহায্যে মনকে অহরহ পরমেশ্বরের চিন্তায় মগ্ন রাখা ও অন্তর থেকে ভোগবাসনাকে দূরে সরিয়ে রেখে পরমেশ্বরের চিন্তায় সদা যুক্ত থাকার প্রচেষ্টাকে অভ্যাস বলা হয়। ক্রমাগত এইরূপ অভ্যাস করতে করতে একসময় পরমেশ্বরের চিন্তা করাটাই

মনের স্বভাবে পরিণত হয়ে যাবে এবং অন্তরে আর ভোগবাসনার ইচ্ছা থাকবে না। আর ইন্দ্রিয়লব্ধ ভোগের মধ্যে যে সব দোষ আছে এবং সেই ভোগ যে কত দুঃখ বয়ে আনে সেটি ক্রমাগত মনকে বোঝানোর চেষ্টা করলে একসময় মনের মধ্যে সেই ভোগবাসনার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জন্মাবে। এই অবস্থায় বিষয়কে তার মনে হবে বিষময় অর্থাৎ তখন বিষয় তার কাছে লোভনীয় সম্পদ মনে হবে না। একে বলা হয় বৈরাগ্য। পতঞ্জলির যোগসূত্রে বৈরাগ্যের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে —“দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ (১/১৫) অর্থাৎ চেতন-অচেতন দৃষ্ট বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণাকে বৈরাগ্য বলা হয়। এইভাবে ক্রমাগত প্রচেষ্টার দ্বারা মনে ভোগবাসনার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মালে মনের মধ্যে প্রকৃত সত্যের আলোক জ্বলে উঠবে এবং মন আর বিষয়বাসনার প্রতি আকৃষ্ট হবে না। এই উভয় ক্ষেত্রেই বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে মন পরমেশ্বরের মধ্যে নিশ্চলভাবে অবস্থান করবে, কামাদির মত অন্য কোন ক্ষতিকর বস্তু মনে প্রবেশ করতে পারবে না। ফলে মনে বাসনার পরাজয় ঘটবে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমেশ্বরে নিশ্চল ক’রে কামকে জয় করার কথা বলেছেন কারণ বুদ্ধিই কেবলমাত্র মনকে পরিচালনা করতে পারে কেন না বুদ্ধি মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।। ৪৩।।

—: তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত :—

চতুর্থ অধ্যায়
জ্ঞানযোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং # প্রোক্তবান্ অহম্ অব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ # মনুঃ ইক্ষাকবে অব্রবীৎ।।১।।

শ্রীভগবান্ উবাচ = শ্রীভগবান্ বললেন; অহম্ = আমি; ইমম্ = এই; অব্যয়ম্ = চির অক্ষয়; যোগং = যোগ (কর্মযোগ); বিবস্বতে = সূর্যকে; প্রোক্তবান্ = বলেছিলাম; বিবস্বান = সূর্য; মনবে = তাঁর পুত্র মনুকে; প্রাহ = বলেছিলেন; ইক্ষাকবে = তাঁর পুত্র ইক্ষাকুকে; অব্রবীৎ = বলেছিলেন।। ১।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন — এতক্ষণ যে যোগের কথা আমি তোমাকে বললাম সেই চির অক্ষয় কর্মযোগের বিষয় আমি প্রথমে সূর্যকে বলেছিলাম। সূর্য আবার সেই যোগের বিষয় তাঁর পুত্র মনুকে বলেছিলেন এবং তারপর মনু এই কর্মযোগের বিষয় তাঁর পুত্র ইক্ষাকুকে বলেছিলেন।। ১।।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ # ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেন ইহ মহতা # যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।। ২।।

পরন্তপ = হে পরন্তপ অর্জুন; এবং = এইভাবে; পরম্পরাপ্রাপ্তম্ = একজনের নিকট থেকে অপরজনের পাওয়া; ইমং = এই কর্মযোগ; রাজর্ষয়ঃ = রাজর্ষিগণ; বিদুঃ = জানতেন; সঃ = সেই; যোগঃ = কর্ম যোগ; ইহ = এই জগতে; মহতা = সুদীর্ঘ; কালেন = সময়ে; নষ্টঃ = ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।।২।।

অনুবাদ :- হে পরন্তপ অর্জুন! এইভাবে একজনের নিকট থেকে অপরজনের পাওয়া এই কর্মযোগ রাজর্ষিগণ জানতেন। সেই কর্মযোগ এই জগতে সুদীর্ঘ সময়কালে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।।২।।

ব্যাখ্যা :- উপরের দুটি শ্লোকে ভগবান্ গীতা সম্পর্কে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে তিনি প্রথমে এই জ্ঞান-ভক্তিমিশ্র কর্মযোগ (যা পূর্ব অধ্যায়ে

বলা হয়েছে) সূর্যকে বলেছিলেন। তারপর এই যোগ সূর্যের পুত্র-পৌত্র পরম্পরাক্রমে অপরের নিকট বলা হয়েছিল। তারপর কালক্রমে এই যোগ এই জগতে সুদীর্ঘ সময়কালে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই কথার অর্থ হল এই যে অনেকে ভ্রান্তভাবে ধারণা করেন যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্যই এই কর্মযোগের বিষয়টি উদ্ভাবন করেছিলেন। কিন্তু ভগবানের এই কথা প্রমাণ করে যে তিনি এই বিষয় অর্জুনকেই প্রথম বলেননি অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম এই বিষয় বর্ণনা করেননি। এই যোগের বিষয়টি নতুন কিছু নয়, বহুপূর্ব থেকেই এই যোগ প্রচলিত ছিল এবং রাজর্ষিগণ (যিনি রাজা হয়েও বেদমন্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব জানেন তাঁকে রাজর্ষি বলা হয়) এই যোগ জানতেন। সুতরাং কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এই যোগ বলার পশ্চাতে কৃষ্ণের কেবলমাত্র অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল এরূপ অসৎ চিন্তা অন্তরে স্থান দেওয়া নিতান্ত অসমীচীন। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে দেখেছি যে অর্জুন কৃষ্ণের নিকট নিজেকে তাঁর শিষ্য হিসাবে উপস্থাপিত ক'রে একান্ত শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তাঁর নিকট থেকে তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে উপযুক্ত উপদেশ প্রার্থনা করেছিলেন এবং শিষ্যের এই প্রার্থনা পূরণ করার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে এই যোগের তত্ত্ব বলেছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে গীতার প্রায় প্রতিটি পদই বিশেষ ইঙ্গিত বহন করে। যেমন এই শ্লোকে তিনি বলেছেন যে সুদীর্ঘ সময়কালে ধীরে ধীরে ইহলোকে এই যোগ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ তিনি বলেননি যে এই যোগ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কারণ ইহলোক ব্যতীতও আরও অনেক লোক আছে। পতঞ্জলির যোগসূত্রে সাত প্রকার লোকের কথা বলা হয়েছে— "তৎপ্রস্তারঃ সপ্ত লোকাঃ। তত্রাবীচেঃ প্রভৃতি মেরুপৃষ্ঠং যাবদিত্যেবং ভূর্লোকঃ। মেরুপৃষ্টাদারভ্য— আধ্রুবান্‌গ্রহনক্ষত্র-তারাবিচিত্রোঽন্তরিক্ষলোকঃ। ততঃ পরঃ স্বর্লোকঃ পঞ্চবিধো মাহেন্দ্রস্তৃতীয়ো লোকঃ। চতুর্থঃ প্রাজাপত্যো মহর্লোকঃ। ত্রিবিধো ব্রাহ্মঃ। তদ্যথা--- জনলোকস্তপোলোকঃ সত্যলোক ইতি" (৩/২৬)। অর্থাৎ একেবারে নীচে আমাদের এই মরলোক, তার উপরে গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা খচিত অন্তরিক্ষ লোক, পাঁচ প্রকার স্বর্গলোক, তার উপরে ইন্দ্রলোক, তার উপরে প্রজাপতির মহঃ লোক এবং সবার উপরে তিনপ্রকার ব্রহ্মলোক যথা— জনলোক, তপলোক এবং সত্যলোক। আর ভগবান্ তো সর্বকালের এই সমস্ত লোকেরই অধীশ্বর। তাই

শ্রীকৃষ্ণ বলতে চেয়েছেন যে তাঁর এই যোগ ইহলোক থেকে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হলেও এইসব লোকে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অবিনশ্বর ভগবানের এই অবিনশ্বর যোগ আমাদের মরলোকে কিভাবে অবলুপ্ত হল? প্রকৃতপক্ষে ইহজগতের মানুষের অন্তর তো মরুভূমির বুকে অনন্ত বালিরাশির ন্যায়। মরুভূমিতে যেমন বালির উপর জল ফেললে তার ধারা অতি সামান্য দূর পর্যন্তমাত্র গড়িয়ে গিয়ে হঠাৎ অনন্ত বালিরাশির অভ্যন্তরে হারিয়ে যায়, মানুষের মনও সেই রকম। এখানে স্নেহ, প্রেম,ভালবাসা, মায়া, দয়া, মমতা, করুণা, শ্রদ্ধা, ভক্তি কোনকিছুই বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। অল্প পরেই মরুভূমির বুকে বালিরাশির উপর পতিত বারিধারার ন্যায় খুব দ্রুত লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। সেইজন্য তাকে মাঝে মাঝে জাগিয়ে তুলতে হয়। সেইজন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শিষ্টের পালন ও অশিষ্টের দলনের উদ্দেশ্যে পুনরায় ধরায় অবতীর্ণ হয়ে পরম সৌভাগ্যবান অর্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে এই যোগ আবার বর্ণনা ক'রে আমাদের ধরার অগণিত পাপী-তাপীদেরকেও তাঁর আখরাবতার স্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার রূপ ধারণ ক'রে সেই একই সৌভাগ্যের অংশীদার ক'রে আমাদের মত অকিঞ্চনদেরকেও পরম করুণা ক'রে গেলেন।। ২।।

স এব অয়ং ময়া তে অদ্য # যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তঃ অসি মে সখা চ ইতি # রহস্যং হি এতৎ উত্তমম্।। ৩।।

মে = আমার; ভক্তঃ = ভক্ত; চ = এবং; সখা = সখা; অসি ইতি = হও; অয়ং = এইটিই; সঃ এব = সেই; পুরাতনঃ = প্রাচীন; যোগঃ = যোগ; অদ্য = আজ; প্রোক্তঃ = বলা হল; ময়া = আমার দ্বারা; তে = তোমাকে; হি = বাস্তবিকই; এতৎ = এটি; উত্তমং = গভীর; রহস্যম্ = রহস্য।।৩।।

অনুবাদ :- তুমি তো আমার ভক্ত এবং সখা। সেইজন্যই সেই প্রাচীন কর্মযোগ আজ তোমাকে বললাম। বাস্তবিকই এটি হল খুবই উত্তম রহস্য।।৩।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ভগবান্ বলেছেন যে, অর্জুন তাঁর ভক্ত ও সখা হওয়ার জন্য তিনি তাঁর নিকট গভীর রহস্যময় এই কর্মযোগ বর্ণনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বক্তব্যের মর্মার্থ বোঝা প্রয়োজন। সর্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এমনই এক মহাগ্রন্থ যে তাঁকে শ্রবণের জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিকে তাঁকে শ্রবণের অধিকারী হতে হবে। সুতরাং প্রকৃত অধিকারী ব্যতীত কারোর নিকট এই মহাগ্রন্থ বর্ণনা করা বা প্রচার করা বিধেয় নয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৭তম শ্লোকে

স্পষ্ট ভাষায় ব'লে দিয়েছেন কোন ধরনের ব্যক্তি এই সর্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মহা উপদেশ শ্রবণের অধিকারী। অর্জুন নিঃসন্দেহে চারিত্রিক ও মানসিক গুণে এই উপদেশ শ্রবণের একজন যোগ্য অধিকারী। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই যোগের উপদেশ প্রদান করেছিলেন।

অর্জুনের পূর্বে যেসব মহাত্মা এই ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে —

'ব্রহ্মা...স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্
অথর্বায় জ্যেষ্ঠ্যপুত্রায় প্রাহ।।
অথর্বণে যাং প্রবেদত ব্রহ্মা-অথর্বা তাং
পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্
স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ
ভারদ্বাজঃ অঙ্গিরসে পরাবরাম্।।

—মুণ্ডকোপনিষদ১/১/১-২

অর্থাৎ ব্রহ্মা এই ব্রহ্মবিদ্যা তাঁর পুত্র অথর্বকে বলেন, অথর্ব সেটি অঙ্গিরা ঋষিকে, অঙ্গিরা তাঁর শিষ্য ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবহকে এবং সত্যবহ সেই ব্রহ্মবিদ্যা নিজ শিষ্য অঙ্গিরসকে বলেন।

আবার বাসুদেব সংহিতায় উল্লেখ আছে যে ভগবান্ নারায়ণ একদা এই যোগ বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীদেবীকে, লক্ষ্মীদেবী আবার সেই মন্ত্র ভগবানের সেনাপতি বিষ্বক্সেনকে বলেন, বিষ্বক্সেন সেই মন্ত্র কুরুকা নগরীতে তেঁতুলবৃক্ষমূলবাসী শঠকোপ মুনিকে বলেন —

শ্রীবিষ্ণুলোকে ভগবান্ স্বয়ম্
প্রোক্তবান্ মন্ত্ররাজাদীন শ্রিয়ৈ তাপাদিপূর্বকম্।
সা চ প্রোক্তবতী প্রীত্বা তাপপুণ্ড্রাদিপূর্বকম্
সেনেশায় প্রিয়া বিষ্ণোর্মূলমন্ত্র দ্বয়াদিকম্
সেনেস্সয়মাগত্য প্রীত্বা শ্রীনগরীং শুভাম্
শঠকোপায় মুনয়ে তিতিণ্ডিমূলবাসিনে।
তাপাদিপূর্বকং শ্লোকং মন্ত্ররত্নদ্বয়াদিকম্।
বিষ্ণুপত্যা বিশালাক্ষ্যা নিয়োগাদুপদিষ্টবান্।।

এইখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ভগবান্ কেন অর্জুনকে এই পরম রহস্য বলার উপযুক্ত মনে করেছিলেন। এছাড়া এই সব তথ্য এইটিও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে ভগবান্ কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে হঠাৎ অর্জুনকে যুদ্ধপথে পরিচালিত করার জন্যই কেবল এই যোগ উদ্ভাবন করেননি। তিনি কল্পকালের পূর্বে জীবের কল্যাণে এই যোগ সৃষ্টি করেছিলেন।। ৩।।

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম # পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথম্ এতৎ বিজানীয়াং # ত্বম্ আদৌ প্রোক্তবান্ ইতি।।৪।।

অর্জুনঃ উবাচ = অর্জুন বললেন; ভবতঃ জন্ম = আপনার জন্ম; অপরং = পরে; বিবস্বতঃ জন্ম = বিবস্বানের জন্ম; পরং = আগে; ত্বম্ = আপনি; এতৎ = এই বিষয়টি; আদৌ = প্রথমে; প্রোক্তবান্ = বলেছিলেন; ইতি = একথা; কথম্ = কিভাবে; বিজানীয়াম্ = বুঝব।। ৪।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন — আপনি তো পরে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু বিবস্বান অর্থাৎ সূর্য তো নিশ্চিতভাবেই আপনার আগে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাহলে আপনি প্রথমে সূর্যকে আদিকালে এই বিষয়টি বলেছিলেন সেটি কিভাবে বুঝব? ।। ৪।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি # জন্মানি তব চ অর্জুন।
তানি অহং বেদ সর্বাণি # ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।। ৫।।

শ্রীভগবান্ উবাচ = শ্রীভগবান্ বললেন; পরন্তপ = শত্রু নিধনকারী; মে = আমার; তব = তোমার; চ = এবং; বহূনি = অনেক; জন্মানি = জন্ম; ব্যতীতানি = পার হয়ে গিয়েছে; অহং = আমি; তানি = তাদের; সর্বাণি = সমস্ত; বেদ = জানি; ত্বং = তুমি; ন বেত্থ = জান না।। ৫।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন— হে পরন্তপ অর্জুন! এর আগে আমি আর তুমি অনেকবার জন্মগ্রহণ করেছি। সে সব জন্মের কথা আমার মনে আছে, কিন্তু সেগুলি তোমার মনে নাই।। ৫।।

ব্যাখ্যা :- পূর্ববর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে অর্জুন শুনলেন যে তিনি সূর্যদেবকে এই বিদ্যা শুনিয়েছিলেন তখন অর্জুনের আর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। তিনি জানেন যে কৃষ্ণ তাঁদেরই সমকালে বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

কিন্তু সূর্যদেবের আবির্ভাব তো অনাদিকাল পূর্বে। তাহলে কৃষ্ণের পক্ষে সূর্যকে কিভাবে এই পরম সত্য বর্ণনা করা সম্ভব হল! তারই উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে ইতিপূর্বে তাঁর এবং অর্জুনের উভয়ের অসংখ্যবার জন্ম হয়েছে। সেইসমস্ত জন্মের ব্যাপার সবই তাঁর স্মরণে আছে কিন্তু অর্জুন সে সব স্মরণ করতে পারেন না। খুবই সঙ্গত স্বাভাবিক কথা। অর্জুন মহাবীর হলেও একজন রক্ত-মাংসের মানুষ। তাঁর মৌলিক জীবগত বৈশিষ্ট্য আর পাঁচটা মানুষের মতই। ফলে পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অবিনাশী সর্বজ্ঞ ভগবান্ হওয়ার কারণে শ্রীকৃষ্ণ সবই জানেন কোথায় কোথায় কি কি রূপে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি স্পষ্ট জানেন যে তিনি বর্তমান জন্মের পূর্বে যুগে যুগে পৃথিবীর কল্যাণে আরও উনিশবার অবতার রূপ পরিগ্রহ ক'রে অবতীর্ণ হয়েছেন এই ধরাধামে — প্রথমবার তিনি কৌমারসর্গে সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারজন ব্রাহ্মণরূপে অবতার গ্রহণ করেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় অবতারে বরাহরূপে, তৃতীয় অবতারে দেবর্ষি নারদরূপে, চতুর্থ অবতারে ধর্মের পত্নী মূর্তির গর্ভে নরনারায়ণরূপে, পঞ্চম অবতারে কপিল রূপে, ষষ্ঠ অবতারে অত্রিমুনির পুত্র দত্তাত্রেয়রূপে, সপ্তম অবতারে রুচিনামক প্রজাপতির পত্নী আকূতির গর্ভে যজ্ঞ নামে, অষ্টম অবতারে রাজা নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেবরূপে, নবম অবতারে রাজা পৃথুরূপে, দশম অবতারে মৎস্যরূপে, একাদশ অবতারে কূর্মরূপে, দ্বাদশ অবতারে ধন্বন্তরিরূপে, ত্রয়োদশ অবতারে মোহিনীরূপে, চতুর্দশ অবতারে নৃসিংহরূপে, পঞ্চদশ অবতারে বামনরূপে, ষোড়শ অবতারে পরশুরামরূপে, সপ্তদশ অবতারে ব্যাসদেবরূপে, অষ্টাদশ অবতারে রামরূপে এবং ঊনবিংশ অবতারে বলরামরূপে ধরায় অবতীর্ণ হন। বিংশ অবতারে তিনি স্বয়ং পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণরূপে নরদেহে অর্জুনের সম্মুখে বিরাজমান। তাছাড়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবই তো তাঁরই মূর্ত প্রকাশ! তাই প্রতিটি জীবের জন্ম তো তাঁরই এক একটি জন্ম, জগতের প্রতিটি জীবের দেহ তো তাঁরই এক একটি দেহ বা বিভূতি। তাই ধরার বুকে তাঁর জন্মের শেষ নাই আর সকল জন্মের কথাই তিনি স্পষ্ট মনে করতে পারেন। তাই তিনি সোজাসুজি বলতে পারেন তাঁর অসংখ্যবার জন্ম হয়েছে এবং প্রতিটি জন্মের কথা তিনি স্পষ্ট স্মরণ করতে পারেন।। ৫।।

অজঃ অপি সন্ অব্যয় আত্মা # ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ অপি সন্।
প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় # সম্ভবামি আত্ম-মায়য়া।। ৬।।

অজঃ = জন্মরহিত; অব্যয় = অবিনাশী; সন্ = হয়ে; অপি = ও; ভূতানাম্ = সকল জীবের; ঈশ্বরঃ = ঈশ্বর; স্বাম্ = আমার; প্রকৃতিম্ = প্রকৃতিকে; অধিষ্ঠায় = আশ্রয় ক'রে; আত্ম = নিজের; মায়য়া = মায়ার দ্বারা; সম্ভবামি = আবির্ভূত হই।।৬।।

অনুবাদ :- আমার জন্ম নাই, আমার মৃত্যু নাই; আমি সকল জীবের ঈশ্বর। তথাপি আমি আমার প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে আমার নিজের মায়ার সাহায্যে আবির্ভূত হয়ে থাকি।। ৬।।

ব্যাখ্যা :- এইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক যার প্রতিটি পদ খুব সূক্ষ্মভাবে না বিচার করলে শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে না। তিনি এখানে বলেছেন যে তিনি "অজঃ" অর্থাৎ অজন্মা অর্থাৎ তাঁর জন্ম হয় না, আবার তিনি বলছেন "সম্ভবামি" অর্থাৎ তিনি আবির্ভূত হন। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে তাঁর যখন জন্মই হয় না তখন তিনি আবির্ভূত হন কিভাবে? সাধারণ বিচারে জন্ম ছাড়া তো কারও পক্ষে পৃথিবীতে আসা সম্ভব নয়। তাহলে এখানে বিষয়টি কি? শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে তিনি সত্যই অজ। তিনি ধরাধামে পুনঃ পুনঃ আসেন কিন্তু প্রাকৃত জীবের মত বারে বারে যোনিসম্ভূত হয়ে নয়। তিনি যে যোনিসম্ভূত নন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল তাঁর নরসিংহ অবতার রূপ গ্রহণ। তিনি আছেন জগৎসৃষ্টির পূর্ব থেকেই। তিনি অব্যয়, অক্ষর, সনাতন, শাশ্বত, পৃথিবীর বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তাঁকে সর্বদা চর্মচক্ষে দেখা যায় না। তবু তিনি আছেন। তিনি এই সৃষ্টির সর্বত্র সমসত্ত্বভাবে বিদ্যমান। তিনি আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়েই সদা আমাদের কল্যাণ ক'রে চলেছেন। তাঁকে ধরাধামে প্রকট হওয়ার জন্য প্রাকৃত জীবের মত জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তিনি স্বপ্রকাশ। শ্রীমদ্ভাগবত—মহাপুরাণের প্রথম শ্লোকে তাঁকে বলা হয়েছে— 'স্বরাট্' অর্থাৎ তিনি স্বয়ং প্রকাশ। তাঁকে প্রকাশ করার জন্য অপরের প্রয়োজন হয় না। তিনি সৃষ্টির সর্বত্র বিদ্যমান। যেমন বায়ু। পৃথিবীর সর্বত্র বায়ু বিদ্যমান। যখন বায়ুর প্রবাহিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না, তখন সে থাকে শান্ত, স্থির, অচঞ্চল। আমরা উপলব্ধি করতে পারি না যে বায়ু নামক এক পদার্থ সর্বত্র আছে। সে আমাদেরকে এক নিবিড় রক্ষাবন্ধনে আবদ্ধ রেখে আমাদের

অজান্তেই আমাদেরকে রক্ষা ক'রে চলেছে। কিন্তু যখন প্রকৃতির বুকে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন বায়ু প্রবাহিত হয় এবং আমাদের অনুভূতির চেতনায় ধরা দেয়, আমরা বুঝতে পারি বায়ু আছে। এই যে বায়ু প্রবাহিত হল এর জন্য বলা যাবে না যে বায়ুর জন্ম হল। সে সদাই বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণও তেমনই সেই সৃষ্টির পূর্ব থেকেই এই সৃষ্টির মধ্যে সদা বিরাজমান। সেই সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে তাঁর কোন পরিবর্তন হয়নি। তাঁকে যুগে যুগে যতই নব নবরূপে দেখি না কেন তার দ্বারা বলা যাবে না যে তাঁর বারে বারে নব নব জন্ম হয়েছে। তিনি পৃথিবীরই প্রয়োজনে প্রতিবারই নব নবরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

কৃষ্ণ লীলা — নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে।
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য যেন ফিরে রাত্রি-দিনে।।

অর্থাৎ অনাদিকাল থেকে সূর্য প্রতিদিন পূর্বদিকে উদিত হয় এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। কৃষ্ণের লীলাও ঠিক সেই রকম। পৃথিবীর প্রয়োজনে প্রতিবার পৃথিবীকে দেখা দেওয়া এবং পৃথিবীর প্রয়োজন মিটে গেলে অন্তরালে চলে যাওয়া।

শুষ্ক নদীর বুকে কেবল ধু ধু বালির প্রান্তর। সেখানে একফোঁটা জলের দেখা নেই। মনে হয় কোথাও জল বোধ হয় নেই। কিন্তু বালি একটু খনন করলেই দেখা দেয় স্বচ্ছ জলের ভাণ্ডার। অর্থাৎ শুকনো নদীর বুকে জল আছে, কিন্তু সেই জল নিজেকে বালির আবরণে আবৃত ক'রে রেখেছে। ঠিক যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সর্বত্রই আছেন, কিন্তু নদীবক্ষে বালির জলকে আবৃত ক'রে রাখার ন্যায় তাঁর মায়ার দ্বারা তিনি নিজেকে আবৃত রাখেন। মনের বালি খুঁড়লেই নদী গর্ভে শীতল জলরাশি সদৃশ কৃষ্ণের মোহন রূপের দর্শন পাওয়া যায়।

তিনি এই শ্লোকে বলেছেন যে তিনি তাঁর প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে নিজের মায়ার সাহায্যে আবির্ভূত হয়ে থাকেন।

এখন 'প্রকৃতি' ও 'নিজের মায়া' বিষয় দুটিকে বিশ্লেষণ করা যাক। অমরকোষে বলা হয়েছে 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ 'স্বভাব', 'স্বরূপ'(নাট্যবর্গ, ১ম কাণ্ড)। রামানুজাচার্যও তাঁর গীতার ভাষ্যে এই 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ হিসাবে 'স্বভাব'কে গ্রহণ করেছেন — "প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ" (রামানুজ-ভাষ্য ৪/৬)। শ্রীকৃষ্ণের মায়া

হল তাঁরই দিব্য স্বরূপ। তাহলে এখানে অর্থ হল যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁরই দিব্য স্বভাব বশে সম্পূর্ণ স্বজ্ঞানে এবং সংকল্পসহ তাঁর নিজের দিব্যস্বরূপের দ্বারাই প্রকাশিত হয়ে থাকেন ঠিক সূর্য যেমন তার নিজরূপ নিয়েই প্রকাশিত হয়। এখানে তাঁর স্বভাব বলতে বোঝানো হয়েছে যে তিনি অবিনাশী, নিত্যশুদ্ধ, সর্বদোষশূন্য, ঈশ্বরীয় গুণসম্পন্ন, অক্ষীণজ্ঞানশক্তি, পৃথিবীর কোন বন্ধনে আবদ্ধ হন না, যতবারই তিনি আসেন ততবারই তিনি তাঁর জ্ঞান, বল, বীর্য, সমস্ত ঐশ্বর্যসহ আসেন। প্রাকৃত জীবের মত ভিন্ন ভিন্ন জন্মে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব হয় না। বলা হয়েছে তিনি তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন। এখন তাঁর স্বরূপটি কেমন সেটি আলোচনা করা প্রয়োজন। যজুর্বেদের ৩১/১৮ মন্ত্রে বলা হয়েছে — "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" অর্থাৎ তাঁর বর্ণ আদিত্যের সমান এবং উজ্জ্বল। সামবেদে বলা হয়েছে — "ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে" অর্থাৎ তিনি রজোময় জগৎ থেকে দূরে অবস্থান করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে — "ভারূপঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ" (৩/১৪/২) অর্থাৎ তিনি প্রকাশরূপ, সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বস্বরূপ প্রভৃতি। তিনি যে সর্বদা স্বেচ্ছায়, নিজসংকল্পসহ ও স্বরূপে আবির্ভূত হন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাই শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণে তাঁর জন্মমূহূর্তের বর্ণনা থেকে —

> তমদ্ভুতং বালকম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্যুদায়ুধম্।
> শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিতকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্।।
> মহার্হবৈদূর্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
> উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভির্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত।।

(১০/৩/৯-১০)

অর্থাৎ জন্মের সময় তাঁর নেত্র ছিল পদ্মপলাশের মত রক্তাভ ও বিশাল, চারহাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলায় উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণি, ঘনমেঘসদৃশ শ্যামলসুন্দর দেহে পীতাম্বরের শোভা, বহুমূল্য বৈদূর্যমণিখচিত কিরীট এবং কুণ্ডলের দীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত কুটিল কুন্তলরাজি, কটিদেশে কাঞ্চী, বাহুসমূহে অঙ্গদ এবং কঙ্কণাদি অলঙ্কারের শোভা। সেই বালকের সর্বাঙ্গ থেকে এক অপূর্ব জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

উপরের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা স্বরূপে এবং স্বস্বভাবেই আবির্ভূত হন। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের জন্মমুহূর্তে তাঁর অবয়বের এই একই বর্ণনা পাওয়া যায়।। ৬।।

যদা যদা হি ধর্মস্য # গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য # তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।। ৭।।

ভারত = হে অর্জুন! যদা যদা হি = যখন যখনই; ধর্মস্য = ধর্মের অর্থাৎ ন্যায়বিচারের; গ্লানিঃ = হানি অর্থাৎ অবক্ষয়; অধর্মস্য = অধর্মের অর্থাৎ পাপাচারের; অভ্যুত্থানম্ = উত্থান অর্থাৎ বৃদ্ধি ; ভবতি = ঘটে; তদা = তখনই; অহম্ = আমি; আত্মানং = নিজেকে; সৃজামি = প্রকাশ করি।। ৭।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! যখন যখনই ধর্মের অর্থাৎ ন্যায়বিচারের হানি অর্থাৎ অবক্ষয় ও অধর্মের অর্থাৎ পাপাচারের উত্থান অর্থাৎ বৃদ্ধি ঘটে তখনই আমি নিজেকে প্রকাশ করে থাকি।। ৭।।

পরিত্রাণায় সাধূনাং # বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় # সম্ভবামি যুগে যুগে।। ৮।।

পরিত্রাণায় = রক্ষা করার জন্য; সাধূনাং = সজ্জনব্যক্তিদের; বিনাশায় = বিনাশ করার জন্য; দুষ্কৃতাং = দুষ্টদের; ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় = ধর্মের অর্থাৎ ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠার জন্য; চ = এবং; সম্ভবামি = অবতীর্ণ হয়ে থাকি; যুগে যুগে = বিভিন্ন যুগে।। ৮।।

অনুবাদ :- সজ্জনব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্য, দুষ্টদের বিনাশ করার জন্য ও ধর্মের অর্থাৎ ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকি।। ৮।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকের 'সাধূনাম্' এবং 'ধর্মসংস্থাপনায়' পদ দুইটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সচরাচর 'সাধূনাম্' পদটির অনুবাদ করা হয় সাধুগণের এবং 'ধর্মসংস্থাপনায়' পদটির অর্থ করা হয় বৈদিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা। তাহলে এই শ্লোকের অর্থ দাঁড়ায় — তিনি সাধুদের উদ্ধার ও বৈদিক ধর্ম স্থাপনের নিমিত্তই অবতীর্ণ হন। কিন্তু এই অর্থ ধরলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সার্বিকভাবে সমগ্র মানবকুলের উদ্দেশ্যে তাঁর যে মহান অভয় বাণী বিতরণ করেছেন তা সাধারণের নিকট অস্পষ্ট ও সম্যকভাবে বোঝার পক্ষে বাধার সৃষ্টি হবে। এই পদ দুইটির এরকম অর্থ ধরলে

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল নির্যাস ও উদ্দেশ্য মানুষের নিকট অধরা থেকে যাবে। এখানে ভগবান্ 'সাধূনাম্' পদটির দ্বারা বনে-জঙ্গলে বিচরণকারী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের কথা বলেননি। তিনি এই পদের দ্বারা নির্দেশ করেছেন সেই সমস্ত সজ্জন ব্যক্তিদের যাঁরা সৎ, সদাচারী ও পবিত্র জীবন যাপন করেন, যাঁরা বৃহত্তর সমাজ ও মানবকুলের শুভচিন্তক, ন্যায় ও সত্যের পূজারী। সেইজন্য 'সাধূনাম্' পদটির অর্থ সঙ্কীর্ণ অর্থে 'সাধুগণের' মনে করলে সাধারণ পাঠক বিভ্রান্ত হবেন এবং তাঁদের মনে হতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র সর্বত্যাগী সাধুদের কথাই চিন্তা করেন, সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন না। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে সাধারণের অন্তরে এক ভুল বার্তা যেতে পারে।

আবার 'ধর্মসংস্থাপনায়' পদটির অর্থ যদি করা হয় ধর্ম অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম স্থাপন তাহলে গীতার মাহাত্ম্য উপলব্ধিটিই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ভগবান্ এই সুমহান গ্রন্থে কখনই কোন বিশেষ ধর্মের প্রচার করেননি। তিনি এখানে 'ধর্মসংস্থাপনায়' পদটি ন্যায়ধর্ম, সত্য, সুবিচার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার অর্থে ব্যবহার করেছেন। সেইজন্য এই শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ হবে — তিনি সৎ, পবিত্র, সজ্জন ব্যক্তিদের উদ্ধার করার জন্য এবং জগতে ন্যায়ধর্ম, সত্য, সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন।। ৮।।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্ # এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম # নৈতি মামেতি সঃ অর্জুন।। ৯।।

মে = আমার; এবং = এইরূপ; দিব্যং = দিব্য; জন্ম কর্ম চ = জন্ম ও কর্ম; যঃ = যিনি; = তত্ত্বতঃ = যথার্থভাবে; বেত্তি = জানেন; সঃ = তিনি; দেহং = শরীর; ত্যক্ত্বা = ত্যাগ ক'রে; পুনর্জন্ম = পুনরায় জন্ম; ন এতি = লাভ করেন না; মাম্ এতি = আমাকেই।। ৯।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! যিনি আমার এইরূপ দিব্য জন্ম ও কর্মের বিষয় সঠিকভাবে জানতে পারেন তাঁকে মৃত্যুর পর আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তিনি তখন আমাকেই লাভ করেন অর্থাৎ তখন তাঁর মোক্ষলাভ হয়।। ৯।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্মের কথা বলা হয়েছে। এখন, ভগবানের দিব্য জন্ম বলতে কি বোঝানো হয়েছে সেটি জানা প্রয়োজন। অক্ষর, অব্যয়, অবিনাশী, সর্বশক্তিমান, পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত

মানুষের মত জন্ম-মরণশীল নন। প্রাকৃত মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে তখন তার সঙ্গে থাকে ক্রন্দন। কিন্তু ভগবান্ যখন আসেন তখন তাঁর মুখে থাকে শুচিস্মিত মোহন হাসি। সাধারণ মানুষের জীবন ব্যক্তিস্বার্থের জীবন। কিন্তু ভগবানের জীবনে কোন ব্যক্তিস্বার্থ থাকে না। তিনি আসেন লোককল্যাণের নিমিত্ত, তাঁর দর্শন, সান্নিধ্য, স্পর্শ প্রভৃতির দ্বারা মানুষের জীবনকে আনন্দিত, ধন্য করার জন্য। শুধু মানুষই নয় - তাঁর আগমনে সমগ্র জীবকুল, সমগ্র চেতন অচেতন পদার্থ আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে, তাঁর অপার্থিব প্রেম সকল প্রাণীর জীবনে স্বর্গীয় পরম পবিত্র মাদকতা এনে দেয়। তাঁর বাঁশীর রব শুনে গাভী উৎকীর্ণ হয়ে তাকিয়ে থাকে, নীল যমুনা উজান বয়, তাঁর স্বর্গীয় রূপ দেখে ময়ূর পেখম মেলেও আবেশে নৃত্য করতে ভুলে যায়। তিনি ধরায় আসেন পার্থিব জগতের আস্বাদ গ্রহণ করার জন্য নয়, তিনি আসেন পৃথিবী থেকে পাপীদের ধ্বংস করে পুণ্যাত্মাদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাঁর জীবন তো কেবল লীলামাত্র। তাঁর জন্ম মায়াময় কাজেই তাঁর জন্ম জন্মহীনের জন্ম, তাঁর কর্ম হল সাধুদের রক্ষা। কাজেই তা হল দিব্যকর্ম যা ঈশ্বরশক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়, তাঁর দেহ প্রাকৃত বস্তুর উপাদান দিয়ে গঠিত নয়, তাঁর জীবন শুদ্ধ, প্রকাশমান, অলৌকিক। সাধারণ মানুষের জন্ম হয় মায়ার বশীভূত হয়ে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পিছনে মায়ার হাত থাকে না, বরং মায়াই তাঁর বশীভূত। তাঁর তথাকথিত জন্মের সময় যোগমায়া বাধ্যের মত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে যান। তিনি মানুষের উপর করুণা করার জন্য আবির্ভূত হন। আবার তিনি যে কর্ম করেন তা সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ, আকাঙ্ক্ষাবিহীন। কোন কর্মে তাঁর অন্তরে কর্তৃত্বাভিমান জন্মে না। ফলে কর্মের বন্ধনে তিনি আবদ্ধ হন না। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সকলের সঙ্গে সমান দয়া, করুণা, প্রেম প্রদান ক'রে সাধারণভাবে আচরণ করেন। যে ভক্ত যেভাবে তাঁকে ভজনা করেন, তিনিও তাঁকে সেইভাবে ভজনা করেন। এই সমস্ত কারণে তাঁর জন্ম ও কর্মকে দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম বলা হয় ।। ৯।।

বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধা # মন্ময়া মাম্ উপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞান-তপসা # পূতা মদ্ভাবম্ আগতাঃ।। ১০।।

বীত = মুক্ত; রাগ = আসক্তি; ক্রোধাঃ = ক্রোধ; মন্ময়াঃ = আমার প্রতি; মাম্ = আমাকে; উপাশ্রিতাঃ = অবলম্বন ক'রে; জ্ঞান-তপসা = জ্ঞানরূপ

তপস্যাদ্বারা; পূতাঃ = পবিত্র হয়ে; বহবঃ = অনেকেই; মৎ = আমার প্রতি; ভাবম্ = প্রেম; আগতাঃ = লাভ করেছেন।। ১০।।

অনুবাদ :- অন্তর থেকে সকল প্রকার আসক্তি, ভয়, ক্রোধ ত্যাগ ক'রে আমাকে অবলম্বন ক'রে জ্ঞানরূপ তপস্যাদ্বারা পবিত্র হয়ে অনেকেই আমার ভাব অর্থাৎ আমার মধ্যে চিরনির্ভর স্থান লাভ করেছেন।। ১০।।

ব্যাখ্যা :- এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের প্রতি স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেছেন যে তাঁর ভালোবাসা পেতে গেলে ভক্তকে মন থেকে অবশ্যই সকল প্রকার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য ত্যাগ ক'রে তাঁর মধ্যেই সমস্ত মন-প্রাণ সমর্পণ ক'রে একাগ্রচিত্তে তাঁরই ভজনা করতে হবে। তবেই তাঁর প্রেম লাভ করা যাবে। যতক্ষণ ভক্তের অন্তরে পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকবে ততক্ষণ সেই ভক্তের পক্ষে কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব নয়।। ১০।।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে # তান্ তথা এব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্ম অনুবর্তন্তে # মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। ১১।।

* ভজাম্যহম্ = ভজামি অহম্

পার্থ = হে পার্থ; যে = যারা; যথা = যেভাবে; মাং = আমাকে; প্রপদ্যন্তে = ভজনা করে; অহং = আমি; তান্ = তাদেরকে; তথা এব = সেই রকম ভাবেই ভজনা করি অর্থাৎ তুষ্ট করি; মনুষ্যাঃ = মানুষেরা; সর্বশঃ = সর্বপ্রকারে; মম = আমার; বর্ত্ম = পথ; অনুবর্তন্তে = অনুসরণ করে।। ১১।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! যারা যেভাবে আমার ভজনা করে আমিও তাদেরকে সেই রকম ভাবেই ভজনা করি অর্থাৎ তুষ্ট করি। মানুষেরা সর্বপ্রকারে আমার পথই অনুসরণ করে।।১১।।

ব্যাখ্যা :- এটি একটি খুবই মূল্যবান শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ এখানে তাঁর চিন্তাধারার একটি অতুলনীয় দিক তুলে ধরেছেন। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাধারা বড়ই পেলব, বড়ই মসৃণ, সংকীর্ণতাবিহীন, সর্বপ্রকার গ্লানি, কালিমা মুক্ত। একমাত্র কৃষ্ণই পারেন এই মনোভাব পোষণ করতে। যেহেতু তাঁর মধ্যে কোন অহমিকা, কর্তৃত্বাভিমান নাই তাই তিনি সহজেই বলতে পারেন যে তাঁর কৃপা লাভ করতে হলে যে একটি নির্দিষ্ট পথে বা নির্দিষ্ট রূপে তাঁর ভজনা করতে হবে এ রকম নয়। তিনি তাঁর ভক্তদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন যে কোন রূপে, যে কোন মতে, যে কোন

পথে, যে কোন পদ্ধতিতে তাঁর ভজনা করার এবং ভক্তদের তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে ভক্ত যেভাবেই তাঁর ভজনা করবে তিনি সেভাবেই তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন। যেমন ভক্ত তাঁকে কৃষ্ণরূপে, বিষ্ণুরূপে, শ্রীরামরূপে, মহাদেবরূপে, সাকার বা সর্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্মরূপে, ভজন, পূজন, চিন্তন প্রভৃতির মাধ্যমে, বা দেবকী ও যশোদার ন্যায় সন্তানরূপে, সুদামার মত বন্ধু হিসাবে, মীরাবাঈ এর মত স্বর্গীয় প্রেমাস্পদ হিসাবে প্রভৃতি যে কোন বিভিন্ন স্বর্গীয় ভাবে ভাবিত হয়েই তাঁর আরাধনা করুন না কেন শ্রীকৃষ্ণ তাতেই তুষ্ট হয়ে সেইভাবেই তাকে কৃপা ক'রে থাকেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষ হয়ত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা করছে কিন্তু বাস্তবে সেই সমস্ত পূজাই কৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকে কারণ সেই সব দেবতার মধ্যেই তো বিরাজ করছেন সেই এক এবং অদ্বিতীয় পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেই সমস্ত পথই কৃষ্ণের পথ ।।১১।।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং # যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে # সিদ্ধিঃ ভবতি কর্মজা।।১২।।

ইহ = ইহলোকে; কর্মণাং = কর্মের; সিদ্ধিং = সফলতা লাভের জন্য; কাঙ্ক্ষন্তঃ = কামনাকারী; দেবতাঃ = দেবগণের; যজন্তে = অর্চনা করে; হি = নিশ্চিতভাবে; মানুষে লোকে = মনুষ্যলোকে; কর্মজা = কর্মসমূহের; সিদ্ধিঃ = সফলতা; ক্ষিপ্রং = দ্রুত; ভবতি = ঘটে।।১২।।

অনুবাদ :- ইহলোকে যে সমস্ত লোক কর্মে সফলতা কামনা করেন তাঁরা বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করেন। এইভাবেই মনুষ্যলোকে নিশ্চিতভাবে তাঁদের দ্রুত কর্মে সফলতা লাভ হয়।। ১২।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে ইন্দ্রাদি বিভিন্ন দেবতাদের বিষয়ে বলেছেন। কৃষ্ণভক্তি বড়ই দুর্লভ বস্তু। যদিও সেই ভক্তি করার পথটি অতীব সহজ ও সরল, তবুও সেই পথটি অনুসরণ করা সাধারণ মানুষের নিকট তেমন রুচিকর নয়। এই পথের একটিই নিয়ম যে মানুষ যেখানেই থাকুক, তাকে পবিত্র ও কালিমাহীনচিত্তে মনের সমস্ত কামনা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে পবিত্র কর্তব্যকর্ম পালন ক'রে যেতে হবে। কৃষ্ণকে ভক্তি করতে হলে তাঁর নিকট থেকে কোন পার্থিব ফলের কামনা করলে চলবে না। পার্থিব জগতের বস্তুর

প্রতি চিত্তের বাসনা এই পথের প্রধান অন্তরায়। তাই মানুষ প্রকৃত কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হতে চায় না। কৃষ্ণের প্রতি যথার্থ ভক্তি করলে তাঁর থেকে একটিই ফল পাওয়া যেতে পারে — মোক্ষলাভ। অবশ্য প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত তার কৃষ্ণভক্তির অপর একটি ফলও পেয়ে থাকে — তা হল অন্তরের মধ্যে এক অপরিসীম অপার্থিব আনন্দ ও সুখানুভূতি এবং এগুলি পাওয়া অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু সাধারণ মানুষের এত ধৈর্য থাকে না। তাদের কামনা দ্রুত ফললাভ। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ আদি দেবতাগণের পূজা করলে সত্ত্বর ফলপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। তাই সাংসারিক ভোগবাসনায় আসক্ত মন্দবুদ্ধি মানুষগণ স্ত্রী, পুত্র, ধন, দৌলত, ফসল, পশু প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুগুলি দ্রুত পাওয়ার জন্য ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের পূজা করে যদিও সেই সব ফলের স্থায়িত্ব খুবই কম। সেই সমস্ত ব্যক্তির বিবেক নানা প্রকার ভোগ-বাসনার আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আবৃত থাকার জন্য তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে কৃষ্ণই পরমপুরুষ পরমেশ্বর, কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান্। সেইজন্য তারা কৃষ্ণের ভজনা না ক'রে দ্রুত ফললাভের আশায় ঐ সব দেবতাদের পূজা করে এবং পূজার বিধি সম্পূর্ণ হলেই সেই সেই দেবতাগণ তাদের অধিকারে যে যে ফল প্রদানের ক্ষমতা আছে এবং যে যে ফল ঐ উপাসনার দ্বারা পাওয়া যেতে পারে সেই সব ফল তাঁরা উপাসককে সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করে থাকেন। সেই ফল উপাসনাকারীর পক্ষে মঙ্গলজনক নাও হতে পারে। আমরা পুরাণে দেখেছি যে অনেক, অসুর, দৈত্য, দানব বিভিন্ন দেবতার তপস্যা ক'রে এমন এমন ভয়ানক বর লাভ করেছিল যেগুলি পরিণামে তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য এই রকমভাবে এত দ্রুত ব্যবস্থা করেন না। তাঁর করুণা লাভ করতে গেলে সময় লাগে এবং কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এমনই বর প্রদান করেন যা ভক্তের পক্ষে হিতকর হয়, যা ভক্তকে কেবল স্বর্গসুখলাভের নয়, মোক্ষলাভের যোগ্য ক'রে তোলে।। ১২।।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং # গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ।
তস্য কর্তারম্ অপি মাং # বিদ্ধি অকর্তারম্ অব্যয়ম্।।১৩।।

ময়া = আমার দ্বারা; গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ = গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে; চাতুর্বর্ণ্যং = চার প্রকার বর্ণ; সৃষ্টং = সৃষ্টি হয়েছে; তস্য = তার; কর্তারম্ = সৃষ্টিকর্তা; অপি = হলেও; মাম্ = আমাকে; অকর্তারম্ = অকর্তা; অব্যয়ম্ = চির অবিনশ্বর; বিদ্ধি = জানবে।।১৩।।

অনুবাদ :- আমি গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চার প্রকার বর্ণ সৃষ্টি করেছি। তথাপি জেনে রাখবে যে তার সৃষ্টিকর্তা হলেও আমি তার কর্তা নই এবং আমার কোন ক্ষয় বা লয় নাই।। ১৩।।

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি # ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যঃ অভিজানাতি # কর্মভিঃ ন স বধ্যতে।।১৪।।

কর্মাণি = কর্মসমূহ; মাং = আমাকে; ন লিম্পন্তি = প্রভাবিত করতে পারে না; ন = নাই; মে = আমার; স্পৃহা = আকাঙ্ক্ষা; ইতি = এইভাবে; যঃ = যিনি; মাম্ = আমাকে; অভিজানাতি = বুঝতে পারেন; সঃ = তিনি; কর্মভিঃ = কর্মের দ্বারা; ন = না; বধ্যতে = আবদ্ধ হন।।১৪।।

অনুবাদ :- আমার উপরে কর্মবন্ধনের কোন প্রভাব পড়ে না, কর্মফলের প্রতি আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। যিনি আমার সম্পর্কে এইরূপ জ্ঞান অর্জন করতে পারেন তাঁকে কর্ম বন্ধন করতে পারে না।। ১৪।।

ব্যাখ্যা : - এই শ্লোকে ভগবান্ বলছেন যে কোন কর্ম তাঁকে লিপ্ত করতে পারে না এবং কর্মফলেও তাঁর কোন স্পৃহা নাই। কিন্তু এ কথা তিনি কেন বলেছেন সে কথা জানা প্রয়োজন। গীতায় বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে আসক্তিযুক্ত কর্ম বন্ধনের কারণ এবং যেহেতু তাঁর কোন কর্মে আসক্তি নাই সেইজন্য কোন কাজ করার জন্য তাঁর কর্মবন্ধন হয় না। মানুষের মন সেই কর্মে আসক্ত হয় যে কর্মটি সে করে। কিন্তু যে কর্ম সে করেনি সেই কর্মে কিভাবে তার আসক্তি হবে? এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে। আমরা সকলেই ভাবি যে পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই জগৎ সৃষ্টির কারণ এবং তিনিই এই সৃষ্টির কর্তা। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা ভাবেন না। তিনি কদাপি ভাবেন না যে তিনিই এই সৃষ্টির কারণ বা কর্তা। তাঁর মধ্যে কোন প্রকার আমিত্ব অর্থাৎ 'আমি আমি' ভাব নেই। তিনি জানেন যে তিনি সৃষ্টির নিমিত্তমাত্র। যে বস্তু সৃষ্টি হয় সেই বস্তুর ভিতর যে শক্তি লুক্কায়িত থাকে সেই শক্তিই হল তার সৃষ্টির কারণ। বস্তু নিজের শক্তিতেই বস্তুতা লাভ করে। যেমন আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়লে বীজের অঙ্কুরোদ্গাম হয় আবার কোন কোন বীজ জলে অঙ্কুরোদ্গাম না হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। বীজের অঙ্কুরোদ্গামের পিছনে বৃষ্টি কর্তা বা কারণ নয়, নিমিত্ত মাত্র, বীজের মধ্যে

অঙ্কুরোদ্গাম হওয়ার যে শক্তি লুকিয়ে আছে সেই শক্তিই হল অঙ্কুরোদ্গামের কারণ বা কর্তা। বিষ্ণুপুরাণে পরাশর শ্রীহরি সম্পর্কে এই কথাই বলেছেন—

নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি।
প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ।।
নিমিত্তমাত্রং মুক্তৈকং নান্যৎ কিঞ্চিদবেক্ষতে।
নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ স্বশক্ত্যা বস্তুতাম্।।

—বিষ্ণুপুরাণ ১/৪/৫১-৫২

শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু নিজেকে সৃষ্টির কর্তা মনের করেন না, নিমিত্তমাত্র মনে করেন সেইজন্য এই সৃষ্টির উপর তাঁর কোন কর্তৃত্বাভিমান বা মমতা (আকাঙ্ক্ষা) বা আসক্তি নাই এবং কোন বস্তুর উপর যেহেতু তাঁর কোন কর্তৃত্বাভিমান বা মমতা (আকাঙ্ক্ষা) বা আসক্তি নাই সেই কারণেই তাঁর কোন কর্মবন্ধন হয় না। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে কর্ম তাঁকে লিপ্ত করতে পারে না।

আবার পৃথিবীর জীব যে কেউ সুখে থাকে বা দুঃখে থাকে সেখানেও কৃষ্ণের কোন হাত বা কর্তৃত্ব নাই। মানুষ নিজেরই কর্মফলে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে মানুষ পুণ্যকাজ করলে তার পুণ্যলাভ হয় এবং পাপ কর্ম করলে তার পাপ অর্জিত হয়। "পূণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি" (৩/২/১৩)। জীবের উভয়প্রকার ভোগের জন্য সেই জীবই দায়ী, পরমেশ্বর নন — কাজেই জীবের সুখ-দুঃখ ভোগের পিছনে পরমেশ্বরকে কর্তা ভাবার কোন কারণ নাই। পরমেশ্বর কেন কর্তা নন তার একটি কারণ হিসাবে ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে যে ঈশ্বরের চরিত্রে পক্ষপাতিত্ব বা নির্দয়তা দোষ নাই - "বৈষম্যনৈঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ২/১/৩৪)। কোন প্রতিষ্ঠানের যিনি কর্তা তিনি ভালো কর্মীকে পুরস্কৃত করেন এবং অসৎ কর্মীকে শাস্তি প্রদান করেন। ঈশ্বর কিন্তু এরকম কিছুই করেন না। ঈশ্বর এটি জেনেই সৃষ্টি করেছেন যে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয়ই থাকবে। তাই আমরা দেবতাদের কথা জানি যাঁরা পরম সুখী এবং মানুষদের জানি যাদের একাংশ খুবই সুখী এবং অপর অংশ দুঃখ ভোগ করে এবং জীবজন্তুরা অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করে এবং এর জন্য তাদের নিজ নিজ কর্মই দায়ী। এখন যদি ঈশ্বর এই সৃষ্টির কর্তা হন তাহলে তিনি দেবতা, মানুষ, জীব-জন্তু সকলেরই কর্তা হবেন। তাহলে বলা

হবে ঈশ্বর পক্ষপাতমূলক আচরণ ক'রে একটি শ্রেণীকে সুখে রেখেছেন এবং অপর শ্রেণীর প্রতি নির্দয় হয়ে তাদেরকে যন্ত্রণার মধ্যে রেখেছেন। সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের চরিত্রের পবিত্রতা, উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি বড় প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়াত। সেইজন্য তিনি কারও কর্তা নন, সৃষ্টির নিমিত্ত মাত্র। এই সমস্ত কারণে তাঁর কোন কর্তৃত্বাভিমান নাই সুতরাং তাঁর কর্মবন্ধনের কোন প্রশ্নই আসে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মানুষ একটি ক্ষুদ্র কর্ম করেই সে নিজেকে তার কর্তা ভাবে, তাই সে কর্মের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে, তাই তাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এত বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেও নিজেকে তার কর্তা ভাবেন না, নিমিত্তমাত্রই ভাবেন। তাই তাঁর কর্মবন্ধনও হয় না। এখানে ভগবান্ সমগ্র মানুষ জাতির জন্য একটি মহান শিক্ষা দিয়েছেন যে কোন কাজ ক'রে তার জন্য মনে কখনই আত্মশ্লাঘা অনুভব করা উচিত নয়। এর ফলে সেই কাজটির মূল নির্যাস কলুষিত হয়।। ১৪।।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম # পূর্বৈঃ অপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম এব তস্মাৎ ত্বং # পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্।।১৫।।

এবং = এইভাবে; জ্ঞাত্বা = জেনে; পূর্বৈঃ = পূর্বকালের; মুমুক্ষুভিঃ = মোক্ষকামিগণ; অপি = ও; কর্ম = কাজ; কৃতং = করেছিলেন; তস্মাৎ = সেইজন্য; ত্বং = তুমি; পূর্বৈঃ = পূর্বকালের জ্ঞানিগণ কর্তৃক; পূর্বতরং = পূর্বকালে; কৃতম্ = আচরিত; কর্ম এব = কর্মই; কুরু = কর।।১৫।।

অনুবাদ :- প্রাচীনকালের মুক্তিকামী মহাত্মাগণ বুঝেছিলেন যে আমি কর্ম করলেও আমি তার কর্তা নই এবং আমার কোন কর্মফলে আকাঙ্ক্ষাও নাই। এই সত্য জ্ঞানটিই স্মরণে রেখে তাঁরা তাঁদের কর্ম করেছিলেন। সেইজন্য প্রাচীনকালের মহাত্মাগণ যে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যেভাবে কর্ম করেছিলেন তুমিও সেই চিন্তা নিয়েই কাজ কর।।১৫।।

ব্যাখ্যা :- যে ব্যক্তি সংসারের সুখভোগকে দুঃখময় এবং অতি ক্ষণস্থায়ী বিবেচনা ক'রে জন্ম-মরণরূপ সংসারবন্ধনের প্রতি বিরক্ত হয়ে সেই বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে লাভ করতে চান, যাঁর পরলোকের সুখভোগের প্রতিও কোন লালসা থাকে না এবং যিনি মমতা, আসক্তি, ফলাকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ নিষ্কাম নিরাসক্তচিত্তে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম ক'রে যান তাঁকে

মুমুক্ষু বলা হয়। বৃহন্নারদীয়পুরাণের ১।৩৩।৫১ মন্ত্রে মুমুক্ষু ব্যক্তির লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে —

রাগদ্বেষবিহীনো যঃ শমাদিগুণসংযুক্তঃ।
হরিধ্যানপরো নিত্যং মুমুক্ষুরভিধীয়তে।।

অর্থাৎ যিনি অন্তর থেকে রাগ অর্থাৎ কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতি অনুরাগ, দ্বেষ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা বস্তু প্রভৃতির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মানসিকতা সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন, যিনি শম অর্থাৎ মন ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম, দম অর্থাৎ বাহ্যশুচি ইত্যাদি চরিত্রের দৈবী সম্পদের অধিকারী এবং যিনি সদা পরব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেবের চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন তাঁকে মুমুক্ষু অর্থাৎ মুক্তিলাভ করতে ইচ্ছুক বলা হয়।।১৫।।

কিং কর্ম কিম্ অকর্ম ইতি # কবয়ঃ অপি অত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি # যৎ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে অশুভাৎ।।১৬।।

কিং কর্ম = কর্মই বা কাকে বলে; কিম্ অকর্ম = অকর্মই বা কাকে বলে; ইতি = এই; অত্র = বিষয়ে; কবয়ঃ = জ্ঞানিগণ; অপি = ও; মোহিতাঃ = বিচলিত হয়ে যান; তৎ = সেইজন্য; তে = সেই সকল; কর্ম = কর্ম ও অকর্ম বিষয়ে; প্রবক্ষ্যামি = বলছি; যৎ = যা; জ্ঞাত্বা = জেনে; অশুভাৎ = অশুভের হাত থেকে; মোক্ষ্যসে = মুক্তি পাবে।।১৬।।

অনুবাদ :- প্রকৃত অর্থে কর্মই বা কাকে বলে এবং অকর্মই বা কাকে বলে এই বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে গিয়ে জ্ঞানিগণও বিচলিত হয়ে যান। সেইজন্য সেই সকল কর্ম ও অকর্ম বিষয়ে আমি তোমাকে বলছি যা জেনে তুমি অশুভ অর্থাৎ সংসার বন্ধন হাত থেকে মুক্তি পাবে।।১৬।।

কর্মণো হি অপি বোদ্ধব্যং # বোদ্ধবং চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণঃ চ বোদ্ধব্যং # গহনা কর্মণো গতিঃ।।১৭।।

কর্মণঃ = কর্ম বলতে কি বোঝায়; অপি = ও; বোদ্ধব্যং = সে সম্পর্কে জানবার আছে; বিকর্মণঃ = অশুভ কর্ম; চ = ও; অকর্মণঃ = কর্মহীনতা বলতে কি বোঝায়; চ = ও; হি = নিশ্চিতভাবে; গহনা = দুর্জ্ঞেয়; কর্মণঃ = কর্মের; গতিঃ = গতি।।১৭।।

অনুবাদ :- কর্ম অর্থাৎ প্রকৃত কর্ম, বিকর্ম অর্থাৎ অশুভ কর্ম এবং অকর্ম অর্থাৎ কর্মহীনতা বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে জানবার আছে কারণ কর্মের গতি-প্রকৃতি সত্যই বড়ই দুর্জ্ঞেয়।।।১৭।।

কর্মণি অকর্ম যঃ পশ্যেৎ # অকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু # স যুক্তঃ কৃৎস্ন-কর্মকৃৎ।।১৮।।

যঃ = যিনি; কর্মণি = কর্মসমূহের মধ্যে; অকর্মণি = অকর্মসমূহের মধ্যে; চ = এবং; পশ্যেৎ = দেখতে পান; সঃ = তিনি; মনুষ্যেষু = মনুষ্যসমূহের মধ্যে; বুদ্ধিমান = জ্ঞানী; সঃ যুক্তঃ = তিনি প্রকৃত যোগী; কৃৎস্ন = সকল; কর্মকৃৎ = কর্ম সম্পাদনকারী।।১৮।।

অনুবাদ :- যিনি কর্মসমূহের মধ্যে অকর্ম এবং অকর্মসমূহের মধ্যে কর্ম দেখতে পান তিনি মনুষ্যসমূহের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি প্রকৃত যোগী এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে সকল কর্ম সম্পাদন করে থাকেন।।।১৮।।

ব্যাখ্যা :- কর্মসমূহের মধ্যে অকর্ম দর্শন এবং অকর্মসমূহের মধ্যে কর্ম দর্শন গীতার এই বক্তব্যটি সাধারণ পাঠকের নিকট বড়ই দুর্বোধ্য মনে হয়। এ বিষয়ে বলা যায় যে গীতায় পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে যে ঈশ্বর সেই সকল কর্মকেই অনুমোদন করেন যেগুলি নিষ্কামভাবে করা হয়ে থাকে এবং যেগুলির পিছনে কর্তার কোন কর্তৃত্বাভিমান থাকে না। অকর্ম শব্দের দুইটি অর্থ আছে — একটি অশুভ কর্ম বা অনুচিত কর্ম ও অপরটি হল কর্মবিমুখতা বা কর্মহীনতা। মানুষ অনেক প্রকার কর্ম করে থাকে — নরহত্যা, পরের দ্রব্য অপহরণ, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি। এগুলি কর্ম নয় — এগুলিই হল অকর্ম অর্থাৎ অশুভ কর্ম। অনেক মানুষ ভাবে যে যদি সংসারের সব কিছুই ঈশ্বরের নির্দেশে হয়ে থাকে তাহলে এই ধরণের কর্ম করায় অপরাধ কি? অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন অন্তরের পক্ষে এই ধরণের চিন্তাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাদের অন্তর জ্ঞানের আলোকে পূর্ণ তাঁরা জানেন যে এগুলি অশুভ কর্ম এবং সর্বথা পরিত্যজ্য। তাই গীতার ভাষায় এগুলি কর্ম নয়, এগুলি অকর্ম অর্থাৎ অশুভ কর্ম। কিন্তু যদি কখনও এই ধরণের কর্ম করার পিছনে বাসনা বা কর্তৃত্বাভিমান ক্রিয়া না করে তাহলে সেই কর্ম করার জন্য কর্তার কোন প্রকার দোষ জন্মায় না। যেমন দেশকে রক্ষা করার জন্য যখন সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে যায় তখন তাদের হাতে অপর পক্ষের অনেক নিরীহ সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু তাতে বিজয়ী সৈন্যের কোন রকম কামনা বা কর্তৃত্বাভিমান

ক্রিয়া করে না। ফলে গীতার ভাষায় এটি কর্মের মধ্যে পরে। আবার অনেকে ভাবেন যে কর্ম করলেই তো কর্মবন্ধন দেখা দেবে। কাজেই কোন রকম কর্ম না ক'রে শুয়ে শুয়ে জীবন কাটানো শ্রেয়। এইটিই হল অকর্ম অর্থাৎ কর্মহীনতা। কিন্তু এইভাবেও কর্মবন্ধন বা কর্মফল অতিক্রম করা যায় না। গীতাতেই বলা হয়েছে কেউ কখনও কর্ম না ক'রে তিলার্ধ সময়মাত্র থাকতে পারে না। এইভাবে অলস শয়নে জীবন যাপন করলে তার অবশ্যই কর্মবন্ধন দেখা দেবে এবং এর ফলে সে যে কর্মফল লাভ করবে তা হল শারীরিক অসুস্থতা, পরিবারের আর্থিক অনটন প্রভৃতি। সেইজন্য যাঁরা জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁরা এই ধরণের অকর্মের মধ্যেও কর্ম দর্শন করেন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করলেও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন না কারণ তাঁর এই অকর্মের ফলস্বরূপ সমাজে অধর্মের আবির্ভাব হবে যার অংশীদার তিনিও হবেন অর্থাৎ এই কর্মের বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হয়ে থাকতে পারবেন না। কিন্তু কোন কর্মই কর্তার কর্মবন্ধনের কারণ হবে না যদি সেটি নিষ্কাম চিত্তে করা হয়ে থাকে এবং তার মধ্যে কর্তার কোন কর্তৃত্বাভিমান না থাকে।

এখন মানুষ কিভাবে কর্মের মধ্যে অকর্ম এবং অকর্মের মধ্যে কর্ম দেখে অর্থাৎ উলটো বোঝে তার একটি স্থূল বাস্তব উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। দিনের বেলায় মানুষের মনে হয় যে পৃথিবী স্থির আছে এবং সূর্য পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে গমন করছে। সূর্যের স্থির থাকা এবং পৃথিবীর ঘোরা কর্ম। সূর্যের ঘোরা এবং পৃথিবীর স্থির থাকা অকর্ম। সুতরাং মানুষ এখানে কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করে। এই ধারণাগুলি সবই মায়া বা অবিদ্যার কারণে হয়ে থাকে। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত সত্য জানেন তাঁরা বোঝেন যে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী গতিশীল এবং সূর্য স্থির। সুতরাং অজ্ঞ ব্যক্তি যাকে কর্ম মনে করেন তত্ত্বজ্ঞ তাকে কর্ম মনে করেন না আবার অজ্ঞান ব্যক্তিগণ যাকে অকর্ম মনে করেন জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তার মধ্যেই কর্মের সন্ধান পান।। ১৮।।

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ # কাম-সংকল্প-বর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্মাণং # তম্ আহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।।১৯।।

যস্য = যার; সর্বে = সকল; সমারম্ভাঃ = উদ্যোগ; কাম = বাসনা; সংকল্প = আমিই কাজটি করছি এই রকম অহং বোধ; বর্জিতাঃ = বর্জিত; বুধাঃ = জ্ঞানিগণ; জ্ঞানাগ্নি = জ্ঞানরূপ অগ্নি; দগ্ধ = দগ্ধ; কর্মাণং = কর্মসমূহ; তং = তাঁকে; পণ্ডিতম্ = পণ্ডিত; আহুঃ = বলেন।।১৯।।

অনুবাদ :- যিনি সকল প্রকার বাসনা ও 'আমিই কাজটি করছি' এইরূপ মনোভাব পরিত্যাগ ক'রে কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন, সেই রকম জ্ঞানরূপ অগ্নির দহন দ্বারা পরিশুদ্ধ কর্মকারীকে জ্ঞানিগণ পণ্ডিত নামে অভিহিত করেন।।১৯।।

ব্যাখ্যা :- ইহলোক বা পরলোকে লভ্য স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ, গৃহ, মান, সম্মান, যশ, প্রতিষ্ঠা, স্বর্গসুখ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের প্রতি ভোগের ইচ্ছাকে কাম বলা হয় এবং এই সমস্ত বস্তুর প্রতি রাগ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা, দ্বেষ, মমতা অর্থাৎ আসক্তি, অহঙ্কার, লোভ প্রভৃতিকে বলা হয় সঙ্কল্প।। ১৯।।

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং # নিত্য-তৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি # নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।।২০।।

কর্মফলাসঙ্গং = কর্মফলে আসক্তি; ত্যক্ত্বা = ত্যাগ ক'রে; নিত্য = সর্বদা; তৃপ্তঃ = সন্তুষ্ট; নিরাশ্রয়ঃ = যিনি প্রয়োজনে কারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না; সঃ = তিনি; কর্মণি = কর্মে; অভিপ্রবৃত্তঃ অপি = কাজ করলেও; ন = না; এব = নিশ্চিতভাবে; কিঞ্চিৎ = কোন কিছু; করোতি = করেন।।২০।।

অনুবাদ :- যিনি কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ ক'রে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং যিনি প্রয়োজনে কারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না তিনি প্রকৃতপক্ষে কোনপ্রকার কর্ম করলেও নিশ্চিতভাবেই কোন কিছুই করেন না।।২০।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ব্যবহৃত 'নিরাশ্রয়' পদটি সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু মানুষ আছে যারা মনে করে যে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গ ব্যতীত তাদের জীবন অচল। এই সমস্ত ব্যক্তি ঐ সমস্ত ব্যক্তি বা বস্তুতে এত বেশী পরিমাণে আসক্ত যে তারা বিন্দুমাত্র সময় তাদেরকে ছাড়া থাকতে পারে না। তাদের জীবনে ঐ ব্যক্তি বা বস্তু বিরাট বন্ধনের সৃষ্টি করে। ফলে ঐ সমস্ত লোক ঐ সমস্ত ব্যক্তি বা বস্তুর গণ্ডী ত্যাগ ক'রে মুক্ত হতে পারে না। ফলে তাদের জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। গীতা বলেছেন যে কারও মনে অপরের প্রতি এই ধরণের আসক্তি থাকা উচিত নয় এবং এইসব আসক্তিসৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা বস্তুর আশ্রয় থেকে মানুষকে বের হয়ে মুক্তি পেতে হবে। এই রকম আসক্তিপূর্ণ ব্যক্তি বা বস্তুর আশ্রয় সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে সক্ষম হলে তখন অন্তরে বোধ জন্মাবে যে এতদিন আমার ব'লে যা ভেবে এসেছি সে সব ভুল, কোন কাজই আমার নয়, কোন কাজই আমি করি না, সকল কর্মই সেই পরমেশ্বরের,

আমি নিমিত্ত মাত্র। আমি যে উড়োজাহাজে চেপে বহু উঁচুতে উঠি সেই ওঠা কাজটি প্রকৃতপক্ষে আমি করি না। উড়োজাহাজটিই আমাকে নিয়ে অত উপরে উঠে যায়। আমি তার মধ্যে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকি মাত্র। উড়োজাহাজটি আমাকে নিয়ে উপরে যায় বলে আমি সেখানে যাই, সে আবার আমাকে নিয়ে নেমে এলে আমি নেমে আসি। এই উড়া কাজটি সম্পাদনের ব্যাপারে আমার কোন ভূমিকা নেই। তেমনই পরমেশ্বরই আমাকে দিয়ে কাজটি করান, আমি যন্ত্রের মত হাত-পা নাড়ি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কোন কাজই আমি করি না। মানুষের অন্তরে এই বোধ জন্মালে তখন সেই মানুষকে পূর্ণকাম বলা হয় এবং তাঁর পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ ঘটে।।২০।।

নিরাশীঃ যত-চিত্ত-আত্মা # ত্যক্ত-সর্ব-পরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম # কুর্বন্ ন আপ্নোতি কিল্বিষম্। ২১।।

নিরাশীঃ = আশা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাহীন; যত = সংযত; চিত্ত = অন্তর; আত্মা = বুদ্ধি; ত্যক্ত = পরিত্যাগ ক'রে; সর্ব = সকলপ্রকার; পরিগ্রহঃ = মালিকানাবোধ; কেবলং = শুধুমাত্র; শারীরং = দেহদ্বারা; কর্ম = কাজ; কুর্বন্ = করে; কিল্বিষম্ = পাপ বা কর্মবন্ধন; ন আপ্নোতি = লাভ করেন না।। ২১।।

অনুবাদ :- যার অন্তরে কোন আশা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা নাই, যার অন্তর ও বুদ্ধি সংযত, যিনি সকলপ্রকারে 'আমার আমার' এই মালিকানাবোধ ত্যাগ করেছেন এবং যিনি দেহ নামক যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র কাজ করেন তাঁকে পাপ বা কর্মবন্ধন স্পর্শ করতে পারে না।।২১।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত অর্থ হল যে যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তিনি জীবনের প্রকৃত রহস্য জানেন। সেইজন্য তিনি অন্তরে কোন কিছু লাভের আশা পোষণ ক'রে কর্ম করেন না এবং তাঁর অন্তর বিক্ষিপ্ত নয়, তা প্রকৃত সত্যে সমাহিত, স্থির, অচঞ্চল। কাজ তো শরীরদ্বারাই করতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিও কর্মসাধনের উপায় হিসাবে অপরাপর সকলের ন্যায় শরীরকেই ব্যবহার করেন। কিন্তু শরীরটা তাঁর নিকট একটি যন্ত্রের ন্যায়। একটি যন্ত্র যখন কাজ করে তখন সেটির চালক কর্তৃক একটি সুনিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত হয়ে কাজটি করে এবং এই কাজটি করার বিনিময়ে যন্ত্রটি নিজে কোনকিছু পাবার প্রত্যাশা করে না। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিও সেইরূপ যে কাজ করেন তার বিনিময়ে অন্তরে কোন আশা পোষণ করেন না এবং জগতের পরিচালক শ্রীভগবানের দ্বারা পরিচালিত হয়েই

নিঃস্পৃহচিত্তে কার্যটি সম্পন্ন করেন। এই ভাবে কাজ করার জন্য তাঁর কোন পাপ বা কর্মবন্ধন হয় না।।২১।।

যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্টো # দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ # কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে।।২২।।

যদৃচ্ছা-লাভ = আপনা থেকেই যা লাভ করা যায়; সন্তুষ্টঃ = পরিতুষ্ট; দ্বন্দ্বাতীতঃ = শীত-উষ্ণ; সুখ-দুঃখ এই পরস্পরবিরোধী অনুভূতি রহিত; বিমৎসরঃ = মাৎসর্য অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতা বর্জিত; সিদ্ধৌ = সাফল্য; অসিদ্ধৌ = অসাফল্য; চ = এবং; সমঃ = সমান; কৃত্বা = কর্ম ক'রে; অপি = ও; ন নিবধ্যতে = কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না।।২২।।

অনুবাদ :- কোন রকম অতিরিক্ত প্রচেষ্টা ছাড়াই আপনা থেকেই যেটুকু লাভ করা যায় তাতেই যিনি পরিতুষ্ট, যিনি শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এই পরস্পরবিরোধী অনুভূতি রহিত, যার অন্তরে মাৎসর্য অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতা নাই, যিনি সাফল্য ও অসাফল্য উভয়কেই সমান মনে করেন তিনি যদিও কর্ম করেন তথাপি তিনি কোনপ্রকার কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না।।২২।।

গত-সঙ্গস্য মুক্তস্য # জ্ঞান-অবস্থিত-চেতসঃ।
যজ্ঞায় আচরতঃ কর্ম # সমগ্রং প্রবিলীয়তে।।২৩।।

গত = দূরীভূত; সঙ্গস্য = আসক্তি; মুক্তস্য = মুক্ত; জ্ঞান = আত্মবিষয়ক জ্ঞান; অবস্থিত = অবস্থিত; চেতসঃ = চিত্ত; যজ্ঞায় = নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের কথা মাথায় রেখে কৃত; আচরতঃ = কর্ম অনুষ্ঠান করা হলে; সমগ্রং = সমস্ত; কর্ম = কর্মবন্ধন; প্রবিলীয়তে = দূর হয়।।২৩।।

অনুবাদ :- যার অন্তর থেকে আসক্তি দূরীভূত হয়েছে, যার অন্তরে আত্মবিষয়ক জ্ঞান বিরাজ করছে এবং যিনি ঈশ্বরের কথা মাথায় রেখে নিষ্কামভাবে কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করেন তাঁর সমস্ত কর্মবন্ধন দূর হয়ে যায়।।২৩।।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ # ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্ম-এব তেন গন্তব্যং # ব্রহ্ম-কর্ম-সমাধিনা।।২৪।।

অর্পণং ব্রহ্ম = উৎসর্গীকৃত দ্রব্য ব্রহ্ম; হবিঃ ব্রহ্ম = অর্পিত ঘৃত ব্রহ্ম; ব্রহ্ম-অগ্নৌ = যজ্ঞের অগ্নি ব্রহ্ম; ব্রহ্মণা = যিনি হোম করছেন তিনি ব্রহ্ম;

হুতং = যজ্ঞ; তেন = তাঁর দ্বারা; ব্রহ্ম-কর্ম = অনুষ্ঠিত কর্ম ব্রহ্ম; সমাধিনা = এই কর্মে একাগ্রচিত্তে যিনি রত তাঁর দ্বারা; ব্রহ্ম এব = ব্রহ্মকেই; গন্তব্যম্ = লাভ করা যায়।।২৪।।

অনুবাদ :- যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত দ্রব্য ব্রহ্ম, অর্পিত ঘৃত ব্রহ্ম, যজ্ঞের অগ্নি ব্রহ্ম, যিনি হোম করছেন তিনি ব্রহ্ম, তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম ব্রহ্ম—এইরূপ ভাবনায় একাগ্রচিত্তে যিনি রত তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে লাভ করেন।।২৪।।

ব্যাখ্যা :- ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩/১৪/১ মন্ত্রে বলা হয়েছে— "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অর্থাৎ সমস্ত বস্তুতে কেবলমাত্র ব্রহ্মকেই দর্শন। ব্রহ্মকে লাভ করার এই হল একমাত্র উপায়। সর্ব বস্তুতে ব্রহ্মকে দর্শন করলে মানুষের অন্তরে আর অপর কোন অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা, লালসা, আসক্তিবোধ আশ্রয় পাবে না। তখন মানুষ একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মের ধ্যান করতে পারবে এবং এর ফলে তার অবশ্যই ব্রহ্মলাভ হবে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে মানুষের উদ্দেশ্যে এই মহা উপদেশই দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই রকম অবস্থাই হয়েছিল। তিনি সর্ববস্তুতে কৃষ্ণকে দর্শন করতেন। সেইজন্য তিনি কৃষ্ণকে লাভ ক'রে এক সময় কৃষ্ণেই লীন হয়ে যান।।২৪।।

দৈবম্ এব অপরে যজ্ঞং # যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্ম-অগ্নৌ-অপরে যজ্ঞং # যজ্ঞেন এব উপজুহ্বতি।। ২৫।।

অপরে = অন্য; যোগিনঃ = যোগিগণ; দৈবম্ = দৈব; এব = এই ভাবেই; যজ্ঞং = যজ্ঞ; পর্যুপাসতে = অনুষ্ঠান করেন; অপরে = অন্য কেউ; ব্রহ্ম = ব্রহ্মরূপ; অগ্নৌ = অগ্নিতে; যজ্ঞেন এব = যজ্ঞের দ্বারাই; যজ্ঞম্ = যজ্ঞের; উপজুহ্বতি = হবন করেন।।২৫।।

অনুবাদ :- অন্য কোন কোন যোগী দেবতাদের পূজারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আবার অন্য কেউ কেউ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে অর্ঘ্য প্রদানের দ্বারাই যজ্ঞের হবন করেন অর্থাৎ সমস্ত কর্মকে ব্রহ্মে আহুতি প্রদান করেন।।২৫।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ভগবান্ বেশ কয়েকবার 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখন আমাদের জানা প্রয়োজন এই ব্রহ্মের স্বরূপ কি এবং 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ কি। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২।১।৩ মন্ত্রে বলা হয়েছে— "সত্যং জ্ঞানমন্তং ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্ম হলেন সত্য, জ্ঞান, অনন্ত স্বরূপ; বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩।৯।২৮ মন্ত্রে বলা হয়েছে— "বিজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম' অর্থাৎ ব্রহ্ম হলেন বিজ্ঞান ও আনন্দ;

বৃহদারণ্যকোপ্যনিষদের ৩।৪।১ মন্ত্রে বলা হয়েছে — "যৎসাক্ষাদ- পরোক্ষাদব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরঃ" অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ এবং যিনি অনন্ত আত্মা তিনিই ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য বলেছেন — "অশনায়াদিসর্বসংসারধর্মবর্জিতম্ নেতি নেতি ইতি নিরস্তাশেষবিশেষং ব্রহ্মশব্দেন উচ্যতে" (শাঙ্করভাষ্য ৪/২৫) অর্থাৎ যিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি যাবতীয় সংসারধর্ম রহিত, যিনি 'এরকম নয়', 'এরকম নয়' ('স এষ নেতি নেতি আত্মা' বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪/৫/১৫) ইত্যাদি বেদবাক্যদ্বারা যাবতীয় বিশেষণের ঊর্ধ্বে তাঁকেই 'ব্রহ্ম' বলা হয়।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা নাম দুইটির প্রকৃত অর্থ কি সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষ বিরাট বিভ্রান্তি বোধ করেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা নাম দুই জনকে নির্দেশ করে। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ সর্বপ্রথম যাঁকে সৃষ্টি করেন তিনি হলেন ব্রহ্মা আর এই ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্তা ভগবানই হলেন বিষ্ণু, নারায়ণ, পরব্রহ্ম দ্বাপরযুগে যিনি পরিচিত হন শ্রীকৃষ্ণ নামে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ৩।১ মন্ত্রে ব্রহ্ম কে তার সম্পর্কে একটি সুন্দর ও স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে — "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি .... তৎ ব্রহ্ম ইতি।" অর্থাৎ যাঁর থেকে এই সমগ্র জীব জগতের সৃষ্টি হয়, সৃষ্টির পর সমস্ত জীবকুল যাঁর দ্বারা লালিত-পালিত হয়, যাঁর মধ্যেই জীবনের অন্তে তারা গমন করে এবং যাঁর মধ্যে তারা বিলীন হয়ে যায় তিনিই হলেন ব্রহ্ম।

এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই হলেন সেই ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্মা ও ব্রহ্ম হল পৃথক দুইজনের নাম।।২৫।।

শ্রোত্র-আদীনি ইন্দ্রিয়াণি অন্যে # সংযম-অগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দ-আদীন্ বিষয়ান্ অন্য # ইন্দ্রিয়-অগ্নিষু জুহ্বতি।। ২৬।।

অন্যে = অন্যরা; শ্রোত্র = চোখ, কান; আদীনি = ইত্যাদি; ইন্দ্রিয়াণি = ইন্দ্রিয়সমূহকে; সংযম-অগ্নিষু = সংযমরূপ অগ্নিতে; জুহ্বতি = আহুতি দান করেন; অন্যে = অপরে; ইন্দ্রিয়-অগ্নিষু = ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে; শব্দ-আদীন্ = চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক আদি; বিষয়ান্ = বিষয়গুলি; জুহ্বতি = আহুতি প্রদান করেন।। ২৬।।

অনুবাদ :- অন্যরা চোখ, কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। অপরে, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বকের অন্তর্গত বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে উৎসর্গ করেন।। ২৬।।

ব্যাখ্যা :- দুই প্রকারের যোগী আছেন। এক প্রকারের যোগী আছেন যাঁরা চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ সংযত ক'রে রাখার মধ্য দিয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তাঁদের চেতনার মধ্যে কোন ইন্দ্রিয় কোন ক্রিয়া করতে পারে না, তারা সব নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। একে বলা হয় সংযমযজ্ঞ। কিন্তু আর এক প্রকার যোগী আছেন যাঁরা এই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত না ক'রে তাদের অন্তর্গত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে আহুতি দেন অর্থাৎ সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপ-রসাদি বিষয়গুলি তিনি গ্রহণ করেন কিন্তু এই গ্রহণের মধ্যে তাঁর কোন আসক্তি থাকে না। যেমন তাঁরা কুসুমের গন্ধ গ্রহণ করেন কিন্তু তা তাঁদের মনকে আমোদিত করে না, আবার কোন দুর্গন্ধও তাঁদেরকে বিচলিত করতে পারে না। বজ্রপাতের শব্দ তাঁরা কান দিয়ে শোনেন কিন্তু তা তাঁদেরকে ভীত করে না। আবার সুন্দরী রমণীর নূপুরের ধ্বনি কানে শোনেন কিন্তু তা তাঁদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে না। সেই কারণে এটি যজ্ঞ হিসাবে পরিগণিত হয়। শাস্ত্রে একে ইন্দ্রিয়যজ্ঞ বলা হয়। গীতার বক্তব্য অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্তচিত্তে যে কোন কর্ম সম্পাদনই হল যোগ। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিভিন্ন প্রকার যোগের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।। ২৬।।

সর্বাণি ইন্দ্রিয়-কর্মাণি # প্রাণকর্মাণি চ অপরে।
আত্ম-সংযম-যোগ-অগ্নৌ # জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে।। ২৭।।

অপরে = অন্য যোগিগণ; সর্বাণি = সকল; ইন্দ্রিয়-কর্মাণি = ইন্দ্রিয়ের কর্মসমূহ; প্রাণ-কর্মাণি = প্রাণবায়ুর কার্যকলাপ; চ = এবং; জ্ঞান-দীপিতে = আত্মজ্ঞানের দ্বারা প্রজ্বলিত; আত্ম-সংযম-যোগ-অগ্নৌ = আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে; জুহ্বতি = আহুতি দেন।।। ২৭।।

অনুবাদ :- অন্য যোগিগণ সকল ইন্দ্রিয়ের কর্মসমূহ এবং প্রাণবায়ুর কার্যকলাপসমূহকে আত্মজ্ঞানের দ্বারা প্রজ্বলিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দেন।।২৭।।

ব্যাখ্যা :-এই শ্লোকে আত্মসংযম যোগের যে বিষয় বলা হয়েছে তারই অপর নাম সমাধি-অবস্থা। যোগী যখন তাঁর মনের দ্বারা তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে স্তব্ধ করে রাখেন তখন তিনি এই সমাধি-অবস্থা লাভ করেন। যোগী যখন এই অবস্থা

লাভ করেন তখন তাঁর ইন্দ্রিয় সমূহের সমস্ত ক্রিয়া যেমন দর্শন, শ্রবণ, স্বাদ গ্রহণ, কথা বলা, নড়াচড়া এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-বর্জন সব কিছুই আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। এখানে আত্মসংযম যোগকে প্রজ্বলিত অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অগ্নিতে যেমন যা কিছুই অর্পণ করা হোক তা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে যায়, তেমনই এই আত্মসংযম-যোগরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত কিছুই দগ্ধ হয়ে যোগীর অন্তরকে খাঁটি সোনায় পরিণত করে যার ফলে যোগী তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরকে লাভ করতে সমর্থ হন।।২৭।।

দ্রব্যযজ্ঞাঃ তপোযজ্ঞা # যোগযজ্ঞাঃ তথা অপরে।
স্বাধ্যায়-জ্ঞান-যজ্ঞাঃ চ # যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।। ২৮।।

দ্রব্যযজ্ঞাঃ = যাঁরা দ্রব্যযজ্ঞ (দ্রব্য দানরূপ যজ্ঞ) করেন; তপোযজ্ঞাঃ = যাঁরা তপোযজ্ঞ করেন; যোগযজ্ঞাঃ = যাঁরা যোগযজ্ঞ করেন; তথা চ = এবং; অপরে = অন্য যোগিগণ; যতয়ঃ = যত্নবান; সংশিতব্রতাঃ = দৃঢ়সংকল্পযুক্ত যোগিগণ; স্বাধ্যায় = বেদ অধ্যয়ন; জ্ঞান-যজ্ঞাঃ = জ্ঞানরূপ যজ্ঞসমূহ।।২৮।।

অনুবাদ :- কোন কোন যোগী দ্রব্যযজ্ঞ করেন, কেউ কেউ তপোযজ্ঞ করেন অন্যরা যোগযজ্ঞ করেন। আবার কোন কোন দৃঢ়সংকল্পযুক্ত ব্যক্তি যত্নপূর্বক বেদ অধ্যয়ন ও জ্ঞান আহরণরূপ যজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান করেন।।২৮।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এই শ্লোকে চার প্রকার যজ্ঞের কথা বলেছেন যথা — দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ ও স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ। কিছু কিছু জ্ঞানী কর্মযোগী সৎপথে অর্থ উপার্জন ক'রে সেই অর্থে দেবতার পূজা, জনহিতকর কার্য যথা পুকুর খনন, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, মন্দির, চিকিৎসালয়, গোশালা, ধর্মশালা নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতিতে ব্যয় করেন তথা শাস্ত্র বিহিত হোম-যজ্ঞ প্রভৃতিতে দ্রব্য উৎসর্গ করেন। একে দ্রব্যযজ্ঞ বলা হয়। কোন কোন যোগী কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি ব্রত পালন করেন। একে তপোযজ্ঞ বলা হয়। অনেক যোগী নিজ নিজ চিত্তের বৃত্তিকে সংযত ক'রে সমাধিমগ্ন হন। একে যোগযজ্ঞ বলা হয়। আবার অনেক যোগী বেদপাঠ শ্রবণ, মনন এবং তার অর্থের জ্ঞানলাভ প্রভৃতি ক'রে থাকেন। একে স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ বা বেদপাঠরূপ যজ্ঞ বলা হয়।।২৮।।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং # প্রাণে অপানং তথা অপরে।
প্রাণ-অপান-গতী রুদ্ধ্বা # প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ।
অপরে নিয়ত-আহারাঃ # প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।।২৯।।

তথা = আবার; অপরে = অপর যোগিগণ; অপানে = প্রশ্বাস বায়ু অর্থাৎ যে বায়ু দেহের বাহির থেকে দেহের ভিতরে প্রবেশ করে তাতে; প্রাণং = নিঃশ্বাস বায়ু অর্থাৎ যে বায়ু মুখ ও নাকের মধ্য দিয়ে দেহের ভিতর থেকে দেহের বাইরে নির্গত হয় তাকে; প্রাণে = নিঃশ্বাস বায়ুতে; অপানং = প্রশ্বাস বায়ু; জুহ্বতি = আহুতিপ্রদান করেন; অপরে = অন্যরা; নিয়ত = পরিমিত; আহারাঃ = আহার গ্রহণকারী; প্রাণ-অপান-গতী = প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি; রুদ্ধ্বা = রুদ্ধ ক'রে; প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ = প্রাণায়াম পরায়ণ; প্রাণান্ = প্রাণসমূহকে; প্রাণেষু = প্রাণসমূহের মধ্যে; জুহ্বতি = আহুতি দিয়ে থাকেন।।২৯।।

অনুবাদ :- আবার অপর যোগিগণ অপানবায়ু অর্থাৎ প্রশ্বাস বায়ুতে প্রাণবায়ু অর্থাৎ নিঃশ্বাস বায়ুকে আহুতি দিয়ে পূরক যজ্ঞ করেন, অন্যরা প্রাণবায়ু অর্থাৎ নিঃশ্বাস বায়ুতে অপানবায়ু অর্থাৎ প্রশ্বাস বায়ু আহুতিপ্রদান ক'রে রেচক যজ্ঞ করেন। অন্যান্য প্রাণায়াম পরায়ণ যোগিগণ আবার যোগিগণের নিমিত্ত শাস্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ন্ত্রিত আহার গ্রহণ ক'রে প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি রুদ্ধ ক'রে প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রাণবায়ুর মধ্যে আহুতি দিয়ে কুম্ভক যজ্ঞ ক'রে থাকেন।।২৯।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে উল্লিখিত 'নিয়ত-আহারাঃ' পদটির অর্থ কি? এই পদটির অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে শ্রীধরাচার্য বলেছেন—"দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈস্তোয়েনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ ইত্বেবমাদিবচনোক্ত নিয়ত আহারো" ইতি। অর্থাৎ উদরের দুইভাগ অন্নদ্বারা পূর্ণ ক'রে, একভাগ জলদ্বারা পূর্ণ ক'রে এবং বায়ু চলাচলের জন্য অবশিষ্ট একভাগ খালি রেখে ভোজন-কার্য সমাধা করাকে 'নিয়ত আহার' বলা হয়।।২৯।।

সর্বে অপি এতে যজ্ঞবিদো # যজ্ঞক্ষয়িত-কল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্ট-অমৃত-ভুজো # যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।। ৩০।।

এতে = এই; সর্বে = সকল; অপি = ও; যজ্ঞবিদঃ = যজ্ঞবিদগণ; যজ্ঞক্ষয়িত

= যজ্ঞের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত; কল্মষাঃ = পাপসমূহ; যজ্ঞশিষ্ট = যজ্ঞের অবশিষ্ট; অমৃত = অমৃততুল্য; ভুজঃ = যিনি ভোজন করেন; সনাতনং ব্রহ্ম = সনাতন ব্রহ্মে; যান্তি = গমন করেন।। ৩০।।

অনুবাদ :- এই সকল যজ্ঞবিদগণ যজ্ঞের দ্বারাই পাপসমূহ থেকে মুক্তি লাভ করেন। যাঁরা যজ্ঞের অমৃততুল্য অবশিষ্ট ভোজন করেন তাঁরা সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করেন।। ৩০।।

ন অয়ং লোকঃ অস্তি অযজ্ঞস্য # কুতঃ অন্যঃ কুরুসত্তম।। ৩১।।

কুরুসত্তম! = হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন; অযজ্ঞস্য = যিনি যজ্ঞ করেন না তাঁর; অয়ং = এই; লোকঃ = ইহলোক; ন অস্তি = নাই; অন্যঃ = অন্য লোক; কুতঃ = কোথায়।। ৩১।।

অনুবাদ :- হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন! যে যজ্ঞ করে না তার এই ইহলোকেই কোন শান্তিলাভ হয় না, পরলোকে তার সুখ কিভাবে হবে?।। ৩১।।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা # বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বান্ # এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।। ৩২।।

ব্রহ্মণঃ = ব্রহ্মের (মতান্তরে বেদের); মুখে = মুখ থেকে; এবং = এই রকম; বহুবিধা = বহুপ্রকার; যজ্ঞা = যজ্ঞের বিষয়; বিততাঃ = বর্ণিত হয়েছে; তান্ = তাদের; সর্বান্ = সবগুলিই; কর্মজান্ = কর্মজাত; বিদ্ধি = জানিও; এবং = এইরূপ; জ্ঞাত্বা = জ্ঞানলাভ করলে; বিমোক্ষ্যসে = মুক্তিলাভ করবে।।৩২।।

অনুবাদ :- ব্রহ্মের (মতান্তরে বেদের) মুখ থেকে এই রকম বহুপ্রকার যজ্ঞের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তাদের সবগুলিই কর্মজাত ব'লে জানবে এবং তোমার এই জ্ঞান হলে তুমি মুক্তি লাভ করবে।।৩২।।

ব্যাখ্যা :- সাধারণ পাঠকের নিকট এই শ্লোকের অর্থ কিছুটা অস্পষ্ট মনে হতে পারে। আমরা দেখেছি যে এই শ্লোকের পূর্বে ভগবান্ অর্জুনকে মোক্ষলাভের উপযোগী যোগ অর্থাৎ কর্মের উপদেশ দিয়েছেন। এখানে ভগবানের বক্তব্য হল যে পূর্ববর্তী শ্লোকসমূহে বর্ণিত যজ্ঞগুলি পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত অতএব মুক্তিদায়ী। কিন্তু ঐ সমস্ত যজ্ঞ ছাড়াও ব্রহ্ম বা বেদ আরও অনেক যজ্ঞের কথা বলেছেন যেগুলির সমস্তই কর্মজাত— কেবলমাত্র বাক্য, মন ও শরীরের ক্রিয়া দ্বারাই

সংঘটিত হয় এবং এদের সঙ্গে আত্মার কোন সংযোগ নাই কারণ আত্মা কর্মের অধীন নন, তিনি কোন কর্মই করেন না। তিনি নিষ্ক্রিয় এবং নিঃস্পৃহ। সুতরাং সেই সব কর্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সম্পাদিত হয়নি। সুতরাং সেইসব কর্ম মানুষকে মুক্তি প্রদান করতে অপারগ। তাই তিনি অর্জুনকে বলছেন যে এর পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে যে সমস্ত যোগের বিষয় তিনি বলেছেন সেগুলির তত্ত্ব ভালোভাবে জেনে সেই অনুসারে কর্ম করলে অর্জুনের আর কর্মবন্ধন জন্মাবে না এবং তিনি মোক্ষ লাভ করতে সমর্থ হবেন। অর্থাৎ ভগবানের বক্তব্য হল যে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে সমস্ত কর্ম যে যে ভাবে অনুষ্ঠান করার কথা বলেছেন সেগুলি ছাড়া বেদ বা অন্যত্র যে সমস্ত সকাম কর্মের কথা বলা হয়েছে সেগুলি মোক্ষদায়ী নয়।। ৩২।।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ # জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্ম অখিলং পার্থ # জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।।৩৩।।

পরন্তপঃ = হে পরন্তপ; দ্রব্যময়াৎ = দ্রব্যময়; যজ্ঞাৎ = যজ্ঞ অপেক্ষা; জ্ঞানযজ্ঞঃ = জ্ঞানরূপ যজ্ঞ; শ্রেয়ান্ = উৎকৃষ্ট; পার্থ = হে পার্থ; অখিলং = পূর্ণরূপে; সর্বং = সকল; জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে = জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে।।৩৩।।

অনুবাদ :- হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানরূপ যজ্ঞ উৎকৃষ্ট। হে পার্থ! পূর্ণরূপে সকল কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে।।৩৩।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন কেন? শঙ্করাচার্য তাঁর গীতার ভাষ্যে এই প্রশ্নের খুব সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছেন — "দ্রব্যময়ো হি যজ্ঞঃ ফলস্য আরম্ভকো জ্ঞানযজ্ঞো ন ফলারম্ভকঃ অথ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ।" অর্থাৎ দ্রব্যময় যজ্ঞ আমাদের ফল প্রদান করে কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞ আমাদের পুনর্জন্মাদি ফল দান করে না। সেইজন্য জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠতর। দ্রব্যময় যজ্ঞ কিভাবে করা হয় সে বিষয়ে আমরা এই অধ্যায়ের ২৮তম শ্লোকে আলোচনা করেছি। এই যজ্ঞ করার লক্ষ্য সাধারণভাবে পুণ্য অর্জন করা যার সাহায্যে যজ্ঞকারী সেই পুণ্য লাভ ক'রে স্বর্গে গিয়ে অনন্ত সুখ লাভ করতে পারেন। কিন্তু পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে স্বর্গপ্রাপ্তি মানুষের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য নয়। মানুষের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হল মোক্ষলাভ। দ্রব্যযজ্ঞের মধ্যে সাংসারিক

বিষয়বিস্তারের বাসনা ও আকাঙ্খা থাকে যা মোক্ষলাভের পথে অন্তরায়। দ্রব্যযজ্ঞ অনুষ্ঠান ক'রে পুণ্য অর্জন করার ফলে মানুষের স্বর্গপ্রাপ্তি হলেও সেই পুণ্যের সঞ্চয় ক্ষয় হয়ে গেলে আবার তাকে পুনর্জন্মের কবলে পড়তে হয়। কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞের মধ্যে কোন বিষয় বিস্তারের বাসনা থাকে না। জ্ঞানযজ্ঞের সম্পর্ক বিবেক, বিচার, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সঙ্গে। এই যোগে রাগ, দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া, কামনা বাসনা, আকাঙ্ক্ষা কোন কিছুই থাকে না, জ্ঞানযজ্ঞের ক্ষেত্রে ভাবের প্রধানতা থাকে, সাংসারিক সুখ বিস্তারের নয়। যথার্থভাবে পালিত জ্ঞানযজ্ঞে কোন কর্মবন্ধন জন্মায় না। সেইজন্য জ্ঞানযোগী মোক্ষলাভ করেন। ফলে জ্ঞানযোগীর আর পুনর্জন্ম হয় না। এইজন্য ভগবান্ দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন।।৩৩।।

তৎ বিদ্ধি প্রণিপাতেন # পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং # জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ।।৩৪।।

প্রণিপাতেন = প্রণামের দ্বারা; পরিপ্রশ্নেন = প্রশ্নের দ্বারা; সেবয়া = সেবার দ্বারা; তৎ = সেই জ্ঞান; বিদ্ধি = অর্জন কর; জ্ঞানিনঃ = জ্ঞানী; তত্ত্বদর্শিনঃ = তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ; তে = তোমাকে; জ্ঞানং = তত্ত্বজ্ঞান; উপদেক্ষ্যন্তি = উপদেশ দেবেন।।৩৪।।

অনুবাদ :- তুমি গুরুর শ্রীচরণে শরণাগত হও, তাঁকে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে প্রণাম কর, বিনম্রচিত্তে শাস্ত্রবিষয়ক নানাপ্রকার প্রশ্ন কর, একাগ্রচিত্তে তাঁর সেবা কর এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতে প্রয়াসী হও। সেই জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরু তোমাকে এ বিষয়ে সম্যক উপদেশ প্রদান করবেন।।৩৪।।

যৎ জ্ঞাত্বা ন পুনঃ মোহম্ # এবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতানি অশেষাণি # দ্রক্ষসি আত্মনি অথো ময়ি।।৩৫।।

যৎ = যা; জ্ঞাত্বা = জেনে; পুনঃ = পুনরায়; এবং = এইরূপ; মোহম্ = মোহগ্রস্ত; ন যাস্যসি = হবে না; যেন = যার দ্বারা; অশেষাণি = সীমাহীন; ভূতানি = জীবকুলকে; আত্মনি = পরমাত্মায়; অথো = অর্থাৎ; ময়ি = আমার মধ্যে; দ্রক্ষসি = দেখতে পাবে।।৩৫।।

অনুবাদ :- হে পাণ্ডব! এই তত্ত্বজ্ঞান জানলে তুমি আর পুনরায় এইরকম মোহগ্রস্ত হবে না। এর দ্বারা তুমি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সীমাহীন জীবকুলকে নিজের আত্মার সঙ্গে এবং তারপর পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত অর্থাৎ আমার মধ্যে দেখতে পাবে।।৩৫।।

অপি চেৎ অসি পাপেভ্যঃ # সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞান-প্লবেন এব # বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।।৩৬।।

চেৎ = যদি; সর্বেভ্যঃ = সমস্ত; অপি = ও; পাপেভ্যঃ = পাপীদের অপেক্ষা; পাপকৃত্তমঃ = পাপাচারী; অসি = হও; সর্বং = সমগ্র; বৃজিনং = পাপসমুদ্র; জ্ঞান = আত্মজ্ঞান; প্লবেন = নৌকার দ্বারা; এব = অবশ্যই; সন্তরিষ্যসি = অতিক্রম ক'রে যাবে।।৩৬।।

অনুবাদ :- (এই আত্মজ্ঞান অর্জন করার ফলে) তুমি যদি পাপীদের অপেক্ষাও অধিক পাপকর্ম ক'রে থাকো তাহলেও এই আত্মজ্ঞানরূপ নৌকা তোমাকে অবশ্যই গভীর পাপসমুদ্র থেকে উদ্ধার করবে।।৩৬।।

যথা এধাংসি সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ # ভস্মসাৎ কুরুতে অর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি # ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।।৩৭।।

যথা = যে রকম; সমিদ্ধঃ = জ্বলন্ত; অগ্নিঃ = আগুন; এধাংসি = জ্বালানি; ভস্মসাৎ = ভস্ম; কুরুতে = করে; তথা = তেমনই; জ্ঞানাগ্নিঃ = জ্ঞানরূপ অগ্নি; সর্বকর্মাণি = সমস্ত কর্মকে; ভস্মসাৎ = ভস্ম; কুরুতে = করে।।৩৭।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! যে রকম জ্বলন্ত আগুন সমস্ত জ্বালানিকে ভস্ম করে, তেমনই জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্মফলকে ভস্ম করে।।৩৭।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ভগবান্ বলেছেন যে জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্মফলকে ভস্ম করে। কিন্তু কোন সে জ্ঞান যা অগ্নির মত সমস্ত কর্মফলকে দগ্ধ ক'রে মানুষকে কর্মবন্ধনের হাত থেকে মুক্ত করে? সেটা কিভাবে ঘটে? এর উত্তরে বলা যায় যে, এই জ্ঞান হল আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান। ভগবান্ এর পূর্বে বহু স্থলেই বলেছেন যে, আত্মা নিত্য অর্থাৎ অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী কিন্তু জীবদেহ অনিত্য, নশ্বর, অস্থায়ী। ঈশ্বর সৎ কিন্তু স্থূল জীবদেহ অসৎ। ঈশ্বর এই বৃহৎ জগৎসংসার সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এই সংসারের পালক, পোষক। তবুও তাঁর মধ্যে কোন কর্তৃত্ববোধ নেই অর্থাৎ তিনি নিজেকে এই জগৎ সৃষ্টির কারণ মনে করেন না। তিনি মনে করেন যে, তিনি প্রকৃতির গর্ভে এই জগৎ সৃষ্টির বীজ বপন করেছেন মাত্র, এই জগৎ তার নিজের মধ্যে অবস্থিত শক্তির সাহায্যেই উৎপত্তি লাভ করেছে, তিনি নিজে কিছুই করেননি, তিনি এই সৃষ্টির নিমিত্ত মাত্র। ফলে এই

সৃষ্টির প্রতি তাঁর অন্তরে কোন মমতা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি বা কর্তৃত্ববোধ নাই, তিনি তাঁর কর্মের ফলের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, নির্বিকার। সেইজন্য তাঁর কোন কর্মবন্ধন হয় না। কিন্তু মানুষ সামান্য কিছু করেই 'আমার আমার' করে, সেই কাজের ফলের প্রতি নিদারুণ আসক্তি পোষণ করে। প্রাকৃত জীব তার দেহ ও জীবনকে চিরস্থায়ী ভেবে নিয়ে আত্ম অহংকারে মত্ত হয়ে ওঠে, নিজেকে সবকিছুর কর্তা মনে করে। সেই কারণে সে কর্মবন্ধনে জড়িয়ে পরে। ফলে তাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে জড়িয়ে পড়তে হয় যার ফলে তার পক্ষে জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বরের পরমপদ প্রাপ্তি আর হয়ে ওঠে না। এই সমস্ত কিছুই ঘটে থাকে তার বহু জন্ম লালিত অন্তরের অজ্ঞানতা ও অবিদ্যার কারণে। কিন্তু উপরে বর্ণিত সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারলে তার অন্তর থেকে অজ্ঞানতা ও অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয়ে গিয়ে অন্তরে সত্যের আলো জ্বলে ওঠে। তখন তার কর্মের ফলের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না, 'আমার আমার' বোধ থাকে না। তাঁর অন্তরে কোন প্রকারের আনন্দ-দুঃখ, লাভ-লোকসান, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আপন-পর প্রভৃতি বোধের প্রভেদ থাকে না। সব কিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সে তখন পরম নির্লিপ্ত চিত্তে নিরাসক্ত হয়ে সমস্ত কাজ ক'রে যায়, সে আর নিজেকে কোন কিছুর কর্তা ভাবে না। জন্ম বা মৃত্যু তাঁকে আনন্দ বা দুঃখ দিতে পারে না। সে তখন বুঝতে পারে যে জীবের জন্ম প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে থাকে। এই জীবন একান্ত ভাবেই নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী। তাই জীবের মৃত্যু তার স্বাভাবিক পরিণতি। সে জানতে পারে যে, দেহের মৃত্যু হলেও আত্মার ক্ষয় নাই, লয় নাই। এই হল তার প্রকৃত আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করার ফলে তার সমস্ত কর্মবন্ধন দূর হয়ে যায় যার ফলে তাকে আর পুনর্জন্মের কবলে পড়তে হয় না। সে তখন ঈশ্বরের পরমপদ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে।।৩৭।।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং # পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগ-সংসিদ্ধঃ # কালেন আত্মনি বিন্দতি।।৩৮।।

ইহ = এই জীবলোকে; জ্ঞানেন = জ্ঞানের; সদৃশং = তুল্য; পবিত্রং = পবিত্র; হি = নিশ্চিতভাবে; ন বিদ্যতে = নাই; তৎ = সেই জ্ঞান; যোগ-সংসিদ্ধঃ = কর্মযোগে সিদ্ধ পুরুষ; কালেন = কালক্রমে; আত্মনি = নিজ আত্মায়; স্বয়ং = নিজে; বিন্দতি = উপভোগ করেন।।৩৮।।

অনুবাদ :- এই জীবলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র অপর কোন বিষয় নিশ্চিতভাবেই নাই। কর্মযোগে সিদ্ধ পুরুষ কালক্রমে সেই জ্ঞান নিজ আত্মায় নিজে উপভোগ করেন।।৩৮।।

ব্যাখ্যা :- দীর্ঘদিন ধরে কর্মযোগের আচরণ করতে করতে যোগীর অন্তর থেকে রাগ-দ্বেষ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁর সমস্ত অন্তঃকরণ যখন শুদ্ধ, স্বচ্ছ হয়ে যায় তখন তিনি কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ করেন। তখন তিনি অন্তর থেকে মমতা, আসক্তি, ফলের ইচ্ছা পরিত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের নিমিত্তই কর্ম ক'রে থাকেন। তখন তাঁকে 'যোগ-সংসিদ্ধঃ' পুরুষ বলা হয়। এইভাবে সেই পুরুষ যখন 'যোগ-সংসিদ্ধঃ' অবস্থা লাভ করেন তখন পরমেশ্বরের করুণায় আপনা-আপনিই সমস্ত জ্ঞান তাঁর অন্তরাত্মায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এই জ্ঞান লাভ করার জন্য তাঁকে আর অপর কোন সাধনের আশ্রয় নেবার প্রয়োজন হয় না। তখন তিনি স্বয়ং বুঝতে পারেন যে সর্বপ্রকারে প্রকৃতির গুণের অতীত, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বলোকাশ্রয়, সর্বগুণের আধার সাকার- নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ পরমপুরুষই হলেন এই বিশ্বচরাচরের পালক, চালক, পোষক। তাঁর অঙ্গুলি হেলনেই এই জগৎ চলে, তাঁর অঙ্গুলি হেলনেই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। এই জ্ঞান লাভ করার পর তাঁর অন্তরে পরম শান্তি, পরম আনন্দ বিরাজ করে।। ৩৮।।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং # তৎপরঃ সংযত-ইন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিম্ # অচিরেণ অধিগচ্ছতি।।৩৯।।

শ্রদ্ধাবান্ = সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাময়; তৎপরঃ = নিরলস; সংযত-ইন্দ্রিয়ঃ = জিতেন্দ্রিয়; জ্ঞানং = জ্ঞান; লভতে = লাভ করে; লব্ধ্বা = লাভ ক'রে; অচিরেণ = শীঘ্র; পরাং = পরম; শান্তিম্ = শান্তি; অধিগচ্ছতি = লাভ করে।।৩৯।।

অনুবাদ :- যাঁর অন্তর সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাময়, যিনি নিরলস ও একনিষ্ঠ এবং যিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করেছেন তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং এই জ্ঞান অর্জনের ফলে তিনি অন্তরে দ্রুত পরম শান্তি লাভ করেন।।৩৯।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এই শ্লোকে বলেছেন যে উপর্যুক্ত জ্ঞান লাভ করার পর যোগী অন্তরে দ্রুত পরম শান্তি লাভ করেন। শঙ্করাচার্য তাঁর গীতার ভাষ্যে এর

কারণ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন — "সম্যগ্দর্শনাৎ ক্ষিপ্রং মোক্ষো ভবতি"। অর্থাৎ অন্তরে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হলে দ্রুত মোক্ষলাভ হয়ে থাকে। বস্তুত, মোক্ষই হল জীবনের পরম ঈপ্সিত বস্তু যাকে পাওয়ার পর মানবের আর অন্য কিছু পাওয়ার অবশিষ্ট থাকে না। মানুষের অন্তরে ততক্ষণই অস্থির ভাব থাকে যতক্ষণ তার পরম প্রিয় বস্তুটি সে লাভ করতে না পারে। কিন্তু যেই মাত্র তার সেই পরম ঈপ্সিত বস্তুটি লাভ করা হয়ে যায় তখন তার মন শান্ত হয়ে যায় যদিও তার আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই ব'লে তার এই শান্তি চিত্তে স্থায়ী হয় না। কিন্তু শ্রদ্ধাবান পুরুষের একমাত্র লক্ষ্য মোক্ষ প্রাপ্তি, সেইজন্য তাঁর অন্তরে যথার্থ জ্ঞানের উদয়ের ফলে যখন তাঁর সেই চির ঈপ্সিত মোক্ষলাভ হয়ে যায় তখন তার চিত্তে আর কোন বিক্ষেপ থাকে না। তাই তার অন্তরে তখন দ্রুত পরম শান্তি বিরাজ করে।।৩৯।।

অজ্ঞশ্চ অশ্রদ্দধানশ্চ # সংশয়-আত্মা বিনশ্যতি।
ন অয়ং লোকঃ অস্তি ন পরো # ন সুখং সংশয়-আত্মনঃ।। ৪০।।

অজ্ঞঃ = অজ্ঞানী; চ = এবং; অশ্রদ্দধানঃ = যার অন্তরে শ্রদ্ধা নাই; সংশয়-আত্মা = যার অন্তর সংশয়ে পূর্ণ; বিনশ্যতি = বিনাশ হয়; সংশয়-আত্মনঃ = যার অন্তর সংশয়ে পূর্ণ; অয়ং = এই; লোকঃ = পৃথিবী; ন অস্তি = নাই; ন পরঃ = পরলোকও নাই; ন সুখং = সুখও নাই।। ৪০।।

অনুবাদ :- যে অজ্ঞানী, যার অন্তরে শ্রদ্ধা নাই, যার অন্তর সংশয়ে পূর্ণ সেই ব্যক্তির বিনাশ হয়। যার অন্তর সংশয়ে পূর্ণ তার না আছে এই পৃথিবী, না আছে পরলোক, না আছে কোন সুখ। তার ইহলোক পরলোক উভয়ই বৃথা।।৪০।।

যোগ-সংন্যস্ত-কর্মাণং # জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি # নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।।৪১।।

ধনঞ্জয় = হে ধনঞ্জয়; যোগ = যোগের দ্বারা; সংন্যস্ত = ঈশ্বরে সমর্পণ করেছেন; কর্মাণং = কর্মফল; জ্ঞান = জ্ঞানের দ্বারা; সংছিন্ন = ছিন্ন করেছেন; সংশয়ম্ = সংশয়কে; আত্মবন্তং = আত্মবান; কর্মাণি = কর্মসমূহ; ন নিবধ্নন্তি = আবদ্ধ করতে পারে না।।৪১।।

অনুবাদ :- হে ধনঞ্জয়! যে আত্মবান ব্যক্তি নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেছেন, আত্মদর্শনরূপ জ্ঞানের দ্বারা অন্তর থেকে সকল সংশয়কে দূর করেছেন তাঁকে কর্মসমূহ আবদ্ধ করতে পারে না।।৪১।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এই শ্লোকে 'যোগ-সংন্যস্ত' কর্মী সম্পর্কে বলেছেন। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে 'সন্ন্যাসী' শব্দের অর্থ হল যিনি ত্যাগ করেছেন। এখন, 'যোগ-সংন্যস্ত' কর্মী কাকে বলে এবং তাঁর স্বরূপ কি? শঙ্করাচার্য সংক্ষেপে এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়েছেন — "পরমার্থদর্শনলক্ষণেন যোগেন সন্ন্যস্তানি কর্মাণি যেন পরমার্থদর্শিনা ধর্মাধর্মাখ্যানি তং যোগসন্ন্যস্তকর্মাণম্"। অর্থাৎ যে পরমার্থদর্শী পুরুষ পরমার্থরূপ জ্ঞান দ্বারা পাপ ও পুণ্যরূপ সকল কর্মকে পরিত্যাগ করেছেন তিনি 'যোগ-সংন্যস্ত' কর্মী। তিনি আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে অভেদ দর্শন করেন। সেইজন্য তাঁর অন্তর থেকে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের অনুষ্ঠান বিষয়ে সকল সংশয় সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। সেই জন্য তাঁকে 'জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়' বলা হয়। নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান করার কারণে তাঁর অন্তর থেকে অশুদ্ধি দূর হয়ে যায়। তখন তাঁর অন্তরে আত্মজ্ঞানের আলোক জ্বলে ওঠে এবং তাঁর চিত্ত জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়ে নির্মল হয়ে যায়। কোন কর্ম তখন তাঁকে বন্ধন করতে পারে না।।৪১।।

তস্মাৎ অজ্ঞান-সম্ভূতং # হৃৎস্থং জ্ঞান-অসিনা-আত্মনঃ।
ছিত্ত্বা এনং সংশয়ং যোগম্ # আতিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ ভারত।।৪২।।

তস্মাৎ = সেই জন্য; আত্মনঃ = পরমাত্মা সম্পর্কে; অজ্ঞান-সম্ভূতং = অজ্ঞানতা থেকে উদ্ভূত; হৃৎস্থম্ = হৃদয়ে বিদ্যমান; এনং = এই; সংশয়ং = সংশয়কে; জ্ঞান-অসিনা = জ্ঞানরূপ তরবারি দ্বারা; ছিত্ত্বা = ছিন্ন ক'রে; যোগম্ = নিষ্কাম কর্মযোগ; আতিষ্ঠ = অবলম্বন কর; উত্তিষ্ঠ = যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াও।। ৪২।।

অনুবাদ :- হে ভারত! সেই জন্য আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে নিজের অজ্ঞানতা থেকে উদ্ভূত তোমার হৃদয়ে বিদ্যমান এই সংশয়কে আত্মজ্ঞানরূপ তরবারি দ্বারা ছিন্ন ক'রে নিষ্কাম কর্মযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর আর যুদ্ধ করার জন্য সোজা হয়ে দাঁড়াও।।৪২।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘ এতক্ষণ অর্জুনের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন যে তিনি অর্জুনকে এত বোঝানোর পরও অর্জুনের মনে যুদ্ধ

বিষয়ে সংশয়ের ঘোর কাটেনি। কিন্তু অর্জুনের মন থেকে এই যুদ্ধ না করার ঘোর না কাটলে এই যুদ্ধ হবে না এবং সেক্ষেত্রে পৃথিবীতে অধর্মের বিনাশ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করার শ্রীকৃষ্ণের যে উদ্দেশ্য তা বাস্তবায়িত হবে না। অর্জুন যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন সে তো যুদ্ধ করার মানসেই সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই এসেছেন। কিন্তু এখানে এসে সামনে অগণিত গুরুজন-ভাই-বন্ধু-স্বজন সকলকে দেখে তাদের আসন্ন মৃত্যুর চিত্র মানস চক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে সহসা তাঁর মনে এই যুদ্ধ করা সমীচীন হবে কি না এই সংশয়ের ঘন কৃষ্ণবর্ণের মেঘের আবির্ভাব ঘটল আর তিনি যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে আত্মার অবিনশ্বরতা এবং স্থূল দেহের ক্ষণভঙ্গুরতার বিষয়ে যথেষ্টরূপে আত্মবিষয়ক জ্ঞান দান করেছেন। তথাপি অর্জুনের মন থেকে সংশয়ের গাঢ় মেঘ দূরীভূত হয়নি। তিনি একবার বলছেন যে গুরুগণের প্রতি তিনি শরনিক্ষেপ করতে পারবেন না, আবার তিনি বলছেন যে গুরুহত্যা ও স্বজনহত্যা ক'রে তিনি যে সম্পদ লাভ করবেন তা স্বজনদের রক্তমাখা হবে, কখনও তিনি বলছেন যে যদিও কৌরবরা আততায়ী তথাপি তারা তাঁর ভ্রাতা। সেইজন্য অর্থশাস্ত্রের নির্দেশ মেনে তিনি তাদেরকে হত্যা করতে পারবেন না। তাই তিনি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ত্যাগ ক'রে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রে ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন নির্বাহ করতে চান। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়ে বললেন যে অর্জুনের মনে অজ্ঞানতা থেকে উৎপন্ন ঘোর সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্য তিনি এতক্ষণ অর্জুনকে যে আত্মবিষয়ক জ্ঞান দান করেছেন তাকে একটা সুতীক্ষ্ণ তরবারির মত ব্যবহার করে অর্জুন যেন সেই অশুভ সংশয়কে মন থেকে সমূলে বিনাশ করেন। নচেৎ অর্জুন তাঁর ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন না করার কারণে ঘোর পাপে লিপ্ত হবেন।।৪২।।

—ঃ চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ঃ—

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ন্যাসযোগ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ # পুনঃ যোগং চ শংসসি।
যৎ শ্রেয় এতয়োঃ একং # তৎ মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্।। ১।।

কৃষ্ণ = হে কৃষ্ণ; কর্মণাং = কর্মসমূহের; সন্ন্যাসং = ত্যাগ; পুনঃ = পুনরায়; যোগং = কর্মযোগ; চ = ও; শংসসি = বলছ; এতয়োঃ = এই দুইটির মধ্যে; যৎ = যেটি; শ্রেয়ঃ = শ্রেষ্ঠ; তৎ = সেই; একং = একটি; মে = আমাকে; সুনিশ্চিতং = সুনিশ্চিতভাবে; ব্রূহি = বল।। ১।।

অনুবাদ :- হে কৃষ্ণ! আপনি আমাকে একবার কর্মত্যাগ করতে বলছেন এবং পরক্ষণেই আবার কর্মযোগ অবলম্বন করতে বলছেন। এই দুইটির মধ্যে যেটি অধিকতর ভাল সেই একটির বিষয়ে আমাকে বলুন।। ১।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ # নিঃশ্রেয়সকরৌ উভৌ।
তয়োঃ তু কর্মসন্ন্যাসাৎ # কর্মযোগো বিশিষ্যতে।।২।।

উবাচ = বললেন; সন্ন্যাসঃ = কর্মত্যাগ; কর্মযোগঃ = কর্মযোগ; চ = এবং; উভৌ = দুটোই; নিঃশ্রেয়সকরৌ = মঙ্গলজনক; তয়োঃ = এই দুটির মধ্যে; তু = কিন্তু; কর্মসন্ন্যাসাৎ = কর্মত্যাগ অপেক্ষা; কর্মযোগঃ = কর্মযোগ; বিশিষ্যতে = শ্রেষ্ঠ।।২।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন - সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ দুটোর মাধ্যমেই মুক্তি লাভ করা যায়। কিন্তু এই দুটির মধ্যে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগই অধিকতর ভাল।।।২।।

ব্যাখ্যা :- গীতায় পূর্বেই বলা হয়েছে যে জ্ঞানযোগ অবলম্বন কর্মযোগ অপেক্ষা অনেক কঠিন। তুলনায় নিষ্কাম কর্মযোগ অনুষ্ঠান করা অপেক্ষাকৃত সহজ। জ্ঞানযোগ অবলম্বনকারী ব্যক্তি যদি কখনও জ্ঞানযোগের পথ ত্যাগ ক'রে সংসারজীবনের সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহলে তাঁর চূড়ান্ত অধোগতি হয়। শাস্ত্রে এই কাজকে খুব হীন দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে ধর্ম, অর্থ ও কামের আধার গৃহস্থধর্মকে ত্যাগ ক'রে পরে পুনরায় সেখানেই প্রবেশ ক'রে সংসার ধর্মের সুখ ভোগ করতে চায় তাহলে তাকে কুকুরের মত নিজের বমি পুনরায় নিজেকেই ভক্ষণ করতে হয় —

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ।
যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ।। (৭/১৫/৩৬)

অপরদিকে নিষ্কাম কর্মযোগীর এই সব ভয় নাই। তিনি যদি মাঝপথে এই যোগের পথ পরিত্যাগ ক'রে সংসারের স্বাভাবিক কর্মে আসক্ত হন তাহলে তার কোন ক্ষতি হয় না কারণ তিনি নিষ্কাম কর্মযোগ করা অবস্থায় সংসারধর্মেই ছিলেন, তাঁর সংসারে পুনঃপ্রবেশের কোন প্রয়োজন হয় না এবং তিনি যদি আবার পরে নিষ্কাম কর্মযোগে যুক্ত হন তাহলে তিনি পূর্বে নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন ক'রে যে পর্যন্ত পুণ্য অর্জন করেছিলেন সেইখান থেকেই আবার তাঁর পুণ্যার্জন শুরু হয়। কর্মযোগী যদিও কর্ম করেন তথাপি প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন সন্ন্যাসী। তিনি কর্মফল ও আসক্তিকে পরিত্যাগ ক'রে সমস্তকিছু ঈশ্বরে অর্পণ ক'রে কর্ম করেন। কর্মযোগী সহজে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান (গীতা ৫।৩) এবং তিনি দ্রুত ঈশ্বরকে লাভ করেন (৫।৬) এবং ঈশ্বর সর্বদা তাঁকে রক্ষা করেন (৯।২২), কর্মযোগের অল্পকিছু অনুষ্ঠান করলেই তা কর্মযোগীকে মরণরূপ বিরাট ভয় থেকে উদ্ধার করে (২।৪০)। অপরপক্ষে জ্ঞানযোগের আচরণ অনেক কঠিন। প্রথমে কর্মযোগের আচরণ না করলে জ্ঞানযোগের আচরণ করা সম্ভব নয় (৫।৬)। এই সমস্ত কারণে ভগবান্ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। কর্ম করা বা না করা কোনটি সঠিক— মনের এই দোলাচলের অবস্থাকে দূর করার জন্য যোগাবশিষ্ঠে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে—

মম নাস্তি কৃতেন অর্থ ন অকৃতেন ইহ কশ্চন।
যথা— প্রাপ্তেন তিষ্ঠামি হি অকর্মণি ক আগ্রহ।।

অর্থাৎ আমি কর্ম করি বা না করি তাদের দুটির অর্থই আমার নিকট সমান কারণ

প্রকৃতপক্ষে আমি নিজে কিছুই করি না। আমি পরমেশ্বরের নির্দেশে যা কিছু পাই আমি তাই করি। তাহলে কর্ম না করার প্রতি আগ্রহ কেন?।।২।।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী # যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো # সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।। ৩।।

মহাবাহো! = হে মহাবাহো! যঃ = যিনি; ন দ্বেষ্টি = ঈর্ষা করেন না; ন কাঙ্ক্ষতি = আকাঙ্ক্ষা করেন না; সঃ = তিনি; নিত্যসন্ন্যাসী = সদা সন্ন্যাসী; জ্ঞেয়ঃ = জেনে রাখ; নির্দ্বন্দ্বঃ = যিনি রাগ, হিংসা, কলহ করেন না; হি = নিশ্চিতভাবে; সুখং = মহাসুখে; বন্ধাৎ = কর্মবন্ধন থেকে; প্রমুচ্যতে = মুক্ত হন।। ৩।।

অনুবাদ :- হে মহাবাহো! জেনে রেখো যিনি ঈর্ষা করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না তিনি সদা-সন্ন্যাসী। যিনি রাগ, হিংসা, কলহ করেন না, যিনি সুখ-দুঃখের দ্বন্ধবিহীনি। তিনি নিশ্চিতভাবে মহাসুখে সকল কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন।। ৩।।

ব্যাখ্যা :- কারও অন্তরে রাগ, দ্বেষ, হিংসা, কলহ প্রভৃতির বোধ থাকে মানে সংসারের কোন বস্তুর প্রতি তার মনে আকাঙ্ক্ষা আছে এবং সেই আকাঙ্ক্ষার তাড়নাতেই সে এগুলি ক'রে থাকে এবং অন্তরে আকাঙ্ক্ষার তাড়না থাকলে তো কারও বন্ধনমুক্তি ঘটবে না। সেইজন্য তাকে আবার পুনর্জন্মের কালচক্রে পতিত হতে হবে। কিন্তু যার অন্তরে এই রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার, ক্রোধ প্রভৃতির বোধ নাই তার অন্তরে নিশ্চয়ই কোন বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা নাই। সেই জন্য তাঁর মৃত্যুর পর মোক্ষলাভ হয়ে থাকে। এই ধরণের পুরুষ দেহ-মনের দিক থেকে সর্বদাই সন্ন্যাসই অবলম্বন করেন।। ৩।।

সাংখ্য-যোগৌ পৃথক্ বালাঃ # প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একম্ অপি আস্থিতঃ সম্যক্ # উভয়োঃ বিন্দতে ফলম্।।৪।।

বালাঃ = বালকসুলভ অজ্ঞ ব্যক্তিরা; সাংখ্য = জড় পৃথিবীর বিশ্লেষণমূলক তত্ত্ব; যোগৌ = কর্মযোগ; প্রবদন্তি = বলে থাকেন; পণ্ডিতাঃ = জ্ঞানিগণ; ন = নয়; অপি = ও; আস্থিতঃ = আচরণ করলে; সম্যক = সঠিকভাবে; উভয়োঃ = উভয়ের; বিন্দতে = পাওয়া যায়।।৪।।

অনুবাদ :- যারা অজ্ঞ বালকসুলভ তারা সাংখ্য অর্থাৎ জড় পৃথিবীর বিশ্লেষণমূলক তত্ত্ব ও কর্মযোগ এই দুইটিকে ভিন্ন বলে থাকেন কিন্তু জ্ঞানিগণ একথা বলেন না। এই দুইটির মধ্যে একটিকেও যদি সঠিকভাবে আচরণ করা যায় তাহলে দুইটিরই ফল পাওয়া যায়।।৪।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ভগবান্ বলেছেন যে সাংখ্যযোগ অর্থাৎ জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ যেটিরই নিষ্ঠা সহকারে অনুষ্ঠান করা হোক না কেন দুটি থেকেই একই ফললাভ হয়। কিন্তু কিভাবে সেটি হয় তার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন কারণ কর্মযোগের মূল বিষয় হল কর্ম সম্পাদন এবং জ্ঞানযোগের মূল বিষয় হল কর্মত্যাগ করে জ্ঞানান্বেষণে ব্রতী হওয়া। ভগবান্ ইতিপূর্বে অনেকবার বলেছেন যে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে মনের সকলপ্রকার আকাঙ্ক্ষা, রাগ, দ্বেষ, মমতা প্রভৃতি সকল রিপু পরিত্যাগ ক'রে সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করে সম্পূর্ণ নিষ্কাম চিত্তে কর্ম করলে পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়। আবার তিনি বলেছেন যে পরিপূর্ণভাবে শাস্ত্রবিধি মেনে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে একাগ্রচিত্তে জ্ঞানযোগ অবলম্বন করলে যোগী পরমজ্ঞান লাভ করেন যার ফলে তাঁর মোক্ষ লাভ হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দুটি যোগের পথ ভিন্ন হলেও তারা একই সঙ্গমস্থল অর্থাৎ মোক্ষে মিলিত হয় যেমন অনেক নদী বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে সকলে সমুদ্রে গিয়ে বিলীন হয়। আর গীতার বক্তব্য অনুযায়ী মানুষের জীবনের অন্তিম লক্ষ্য তো মোক্ষ এবং কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়েই সেই একই ফল প্রদান করে। তবে ভগবান্ আরও বলেছেন যে জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কর্মযোগ অবলম্বন করা অনেক সহজ, জ্ঞানযোগ অবলম্বন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু যে কোন মানুষই নিষ্কাম কর্মযোগের পথ অনুসরণ করতে পারে। সেইজন্য তিনি অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মযোগ অর্থাৎ যুদ্ধের ফলের কথা চিন্তা না ক'রে তাঁর বর্ণধর্ম যুদ্ধ করতে উপদেশ দিয়েছেন।।৪।।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং # তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ # যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।৫।।

সাংখ্যৈঃ = সাংখ্যযোগ অবলম্বনকারী জ্ঞানিগণ; যৎ = যে; স্থানং = স্থান; প্রাপ্যতে = লাভ করেন; যোগৈঃ = কর্মযোগের দ্বারা; অপি = ও; তৎ =

সেইস্থান; গম্যতে = লাভ করেন; যঃ = যিনি; একং = সমরূপ; সাংখ্যং = সাংখ্য; চ = এবং; যোগং = কর্মযোগকে; চ = এবং; পশ্যতি = দেখেন; সঃ = তিনি; পশ্যতি = সঠিক দেখেন।।৫।।

অনুবাদ :- সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগ অবলম্বনকারী জ্ঞানিগণ যে স্থান লাভ করেন নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বনকারীরাও সেইস্থানই লাভ করেন। যিনি সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানকে এবং কর্মযোগকে সমরূপ দেখেন তিনিই সঠিক দেখেন।।৫।।

ব্যাখ্যা :- যিনি কর্মযোগকেই জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় হিসাবে মনে করে শুদ্ধচিত্তে এই কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন এবং সমস্ত কর্মের ফল শ্রদ্ধাবনতচিত্তে ঈশ্বরে অর্পণ করেন এবং নিজের সুখের জন্য কোন কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না তিনিও জ্ঞানযোগিগণের পরমার্থ-জ্ঞানরূপ সন্ন্যাস অবলম্বনের দ্বারা লব্ধ সেই একই মোক্ষ লাভ করেন। কাজেই প্রকৃত দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও উদ্দেশ্যগত কোন পার্থক্য নাই, উভয়েই এক। বৃষ্টির জলেও তৃষ্ণা নিবারিত হয় আবার কুপের জলেও তৃষ্ণা নিবারিত হয়। কাজেই যিনি জ্ঞানী অর্থাৎ সম্যক তত্ত্ব জানেন তিনি তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষেত্রে বৃষ্টির জল এবং কুপের জলের মধ্যে কোন তফাৎ দেখেন না। সেই রকম যিনি সত্যদ্রষ্টা তিনি কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের ফলদানের বিষয়ে কোন প্রভেদ দেখেন না। এইজন্যই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— যত মত তত পথ। সাংখ্যযোগও পথ নিষ্কাম কর্মযোগও পথ। তুমি নিষ্ঠাভরে শ্রদ্ধাসহকারে যে পথেই গমন কর না কেন অন্তিমে কিন্তু পৌঁছাবে সেই একই জায়গায়—পরমপুরুষ পরব্রহ্মের পরম ধামে।। ৫।।

সন্ন্যাসঃ তু মহাবাহো # দুঃখম্ আপ্তুম্ অযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনিঃ ব্রহ্ম # ন চিরেণ অধিগচ্ছতি।।৬।।

মহাবাহো! = হে মহাবাহো; অযোগতঃ = নিষ্কাম কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত না হলে; সন্ন্যাসঃ = কর্মত্যাগ; তু = কিন্তু; আপ্তুম্ = পাওয়া যায়; যোগযুক্তঃ = নিষ্কাম কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত; মুনিঃ = যোগী; ন চিরেণ = শীঘ্রই; ব্রহ্ম = ব্রহ্মকে; অধিগচ্ছতি = লাভ করেন।।৬।।

অনুবাদ :- হে মহাবাহো! নিষ্কাম কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে কেবলমাত্র সন্ন্যাস অবলম্বন অর্থাৎ কর্মত্যাগ করলে তার থেকে কিন্তু দুঃখই পাওয়া যায়। অপরদিকে নিষ্কাম কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত যোগিগণ শীঘ্রই ব্রহ্মকে লাভ করেন।।৬।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে বলেছেন যে কর্মযোগ ব্যতীত কেবলমাত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করলে তার থেকে দুঃখ ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না। বস্তুত চিত্তের শুদ্ধি না হলে, লোভ, লালসা, আকাঙ্ক্ষা, কর্তৃত্বাভিমান, ষড়রিপুর আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না ক'রে কেবলমাত্র সাধুর বসন ও কমণ্ডলু ধারণ করে অরণ্যচারী হলে তার কাজের কাজ কিছুই হবে না। বরং সেটি তার পক্ষে অনন্ত দুঃখের কারণ হবে। এই ধরণের সন্ন্যাসী প্রকৃত ত্যাগী নয়। বৃহদারণ্যকবার্তিকসারে বলা হয়েছে—

প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ।
সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ।। (১।৪।১১৬৭)

অর্থাৎ দৈবযোগহেতু দূষিত ভাবযুক্ত সন্ন্যাসী প্রমাদগ্রস্ত, বাহ্যিক বিষয়ভোগের চিন্তামগ্ন, খল এবং কলহপ্রিয়।

এই যোগী আদর্শ ত্যাগী হিসাবে গণ্য হতে পারে না। যদি কোন মুমুক্ষু পুরুষ কেবল মনে করে এই দৃশ্যমান জগতটি মায়াময়, স্বপ্নদর্শনের ন্যায় মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর কোনকিছুর অস্তিত্ব জগৎ সংসারে নেই এবং সেইজন্য সে একমাত্র ব্রহ্মকেই স্বীকার করে কিন্তু তার অন্তঃকরণ পবিত্র ও শুদ্ধ নয়, তার অন্তর থেকে আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা, রাগ, দ্বেষ, লোভ, লালসা, আত্মাভিমান অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি অহমিকা দূর হয়নি এবং সে নিজের অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করার জন্য কোনই প্রচেষ্টা করে না, তাহলে তার পক্ষে কোন প্রকারেই অনন্যচিত্তে জ্ঞানযোগে আত্মনিবেশ করা সম্ভব নয়। কারণ যতদিন পর্যন্ত উপর্যুক্ত দোষগুলি তার অন্তর থেকে সমূলে বিনাশ না হবে ততদিন পর্যন্ত অনন্যচিত্তে নিরন্তর সচ্চিদানন্দঘন নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিরাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। পরন্তু তার চিত্ত শুদ্ধ না হওয়ার কারণে তার অন্তর মোহগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং পরমেশ্বর ও স্বর্গ-নরকাদি কর্মফলসমূহে বিশ্বাসহীন হয়ে শুভ পথ থেকে বিচ্যুত হবে এবং পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে পরম ভোগাসক্ত হয়ে জ্ঞানমার্গ থেকে পতিত হয়ে তার অনন্ত দুঃখভোগের

প্রবল সম্ভাবনা দেখা দেবে। সেইজন্য যাতে তার এই ধরণের অঘটন না ঘটে তার জন্য তাকে অপেক্ষাকৃত সহজ মার্গ নিষ্কাম কর্মযোগ অনুশীলন ক'রে তার অন্তর থেকে মমতা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা, রাগ, দ্বেষ, লোভ, লালসা, আত্মাভিমান অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি সমস্ত বোধ সম্পূর্ণরূপে দূর ক'রে চিত্তের শুদ্ধি অর্জন করতে হবে। তারপর জ্ঞানযোগের পথে অগ্রসর হলে তার পক্ষে সিদ্ধিলাভের পথ সুগম হবে এবং কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে অচিরেই তিনি ব্রহ্মপদ লাভ করবেন। তাই ভগবান্ বলেছেন যে প্রথমে কর্মযোগে সিদ্ধ না হয়ে জ্ঞানযোগের পথে অগ্রসর হলে দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই লাভ হবে না।। ৬।।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধ-আত্মা # বিজিত-আত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূত-আত্মভূত-আত্মা # কুর্বন্ অপি ন লিপ্যতে।। ৭।।

যোগযুক্তঃ = যিনি নিষ্কাম কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন; বিশুদ্ধ-আত্মা = যার চিত্ত নির্মল; বিজিত-আত্মা = যার অন্তর সংযত; জিতেন্দ্রিয়ঃ = যিনি নিজের ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন; সর্ব-ভূত-আত্মভূত-আত্মা = যিনি সর্বত্রই আত্মাকে দেখতে পান; কুর্বন্ অপি = কাজ করলেও; ন লিপ্যতে = তার কর্মফল তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।। ৭।।

অনুবাদ :- যিনি নিষ্কাম কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, যাঁর চিত্ত নির্মল, যাঁর অন্তর সংযত, যিনি নিজের ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন, যিনি সর্বজীবে অবস্থিত আত্মার মধ্যে নিজের আত্মাকে দেখতে পান তিনি কাজ করলেও তার কর্মফল তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।।৭।।

ব্যাখ্যা :- 'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা' (সর্বভূত-আত্মভূত-আত্মা) পদের অর্থ কি ? শঙ্করাচার্য বলেছেন যে শুদ্ধচিত্ত, সংযতমনা, জিতেন্দ্রিয় যে ব্যক্তি ব্রহ্ম থেকে স্তম্ভ পর্যন্ত সর্বভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন অর্থাৎ যাঁর দৃষ্টিতে জগৎ সংসারের প্রতিটি কণা, অণু, পরমাণু, চেতন, অচেতন সকল বস্তুতে পরমেশ্বরের উপস্থিতি ধরা পরে সেই ব্যক্তিকে 'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা' বলা হয়— "সর্বেষাং ব্রহ্মাদীনাং স্তম্বপর্যন্তানাং ভূতানাম্ আত্মভূত আত্মা প্রত্যেক্ চেতনো যস্য স সর্বভূতাত্মভূতাত্মা সম্যগদর্শী" ইতি। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই অবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।। ৭।।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমি ইতি # যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ # অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।।৮।।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ # উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি।
ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু # বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্।।৯।।

যুক্তঃ = নিষ্কাম কর্মযোগে যুক্ত; তত্ত্ববিৎ = তত্ত্বদর্শী পুরুষ; পশ্যন্ = দেখেন; শৃণ্বন্ = শোনেন; স্পৃশন্ = স্পর্শ করেন; জিঘ্রন্ = গন্ধ নেন; অশ্নন্ = ভোজন করেন; গচ্ছন্ = চলেন; স্বপন্ = স্বপ্ন দেখেন; শ্বসন্ = শ্বাস গ্রহণ করেন; প্রলপন্ = কথা বলেন; বিসৃজন্ = (মলমূত্রাদি) ত্যাগ করেন; গৃহ্নন্ = গ্রহণ করেন; উন্মিষন্ = চোখের পাতা খোলেন; নিমিষন্ = বন্ধ করেন; অপি = তথাপি; ইন্দ্রিয়াণি = ইন্দ্রিয়গুলি; ইন্দ্রিয়ার্থেষু = ইন্দ্রিয়বিষয়ে; বর্তন্তে = কাজ ক'রে চলেছে; ইতি ধারয়ন্ = এই ধারণা মনে পোষণ ক'রে; কিঞ্চিৎ এব = কোন কিছুই; ন করোমি = করি না; ইতি = এই; মন্যেত = মনে করেন।। ৮-৯।।

অনুবাদ :- নিষ্কাম কর্মযোগে যুক্ত তত্ত্বদর্শী পুরুষ দেখেন, শোনেন,স্পর্শ করেন, গন্ধ নেন, ভোজন করেন, চলেন, স্বপ্ন দেখেন, শ্বাস গ্রহণ করেন, কথা বলেন, মলমূত্রাদি ত্যাগ করেন, অনেক কিছু গ্রহণ করেন, চোখের পাতা খোলেন ও বন্ধ করেন তথাপি তিনি মনে করেন যে ইন্দ্রিয়গুলি তাদের নিজেদের বিষয়েই কাজ ক'রে চলেছে এবং এই দৃঢ় ধারণা মনে পোষণ ক'রে তিনি ভাবেন যে তিনি নিজে কিছুই করেন না।। ৮-৯।।

ব্যাখ্যা :- তত্ত্ববিৎ বা তত্ত্বদর্শী শব্দের অর্থ কি? শঙ্করাচার্য বলেছেন যে আত্মার যথার্থ স্বরূপের নাম তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি তত্ত্বদর্শী — "আত্মনো যাথাত্ম্যং তত্ত্বং বেত্তি ইতি তত্ত্ববিৎ পরমার্থদর্শী ইত্যর্থঃ"। বিষয়টি আর একটু পরিষ্কার ক'রে বললে বলা যায় যে যিনি এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চকে নশ্বর, স্বপ্নে দেখা বস্তুর মত অসত্য, মরীচিকার মত মায়াময় মনে করেন এবং সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য মনে করেন এবং এইভাবে নিত্য ও অনিত্য বিষয়ের তত্ত্বকে সম্যক উপলব্ধি ক'রে সর্বদা নির্গুণ, নিরাকার, সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে অবস্থান করেন তাঁকে তত্ত্বদর্শী, তত্ত্ববিৎ, পরমার্থদর্শী পুরুষ বলা হয়।। ৮-৯।।

ব্রহ্মণি আধায় কর্মাণি # সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন # পদ্মপত্রম্ ইব অম্ভসা।। ১০।।

যঃ = যিনি; ব্রহ্মণি = ব্রহ্মে; আধায় = নিজেকে সমর্পণ ক'রে; সঙ্গং = আসক্তি; ত্যক্ত্বা = ত্যাগ ক'রে; কর্মাণি = সকল কর্ম; করোতি = করেন; সঃ = তিনি; অম্ভসা = জলস্থিত; পদ্মপত্রম্ = পদ্মপত্রের; ইব = ন্যায়; পাপেন = পাপের দ্বারা; ন লিপ্যতে = বদ্ধ হন না।। ১০।।

অনুবাদ :- পদ্মপত্র যেমন জলে থাকলেও জল তাকে স্পর্শ করতে পারে না তেমনি যিনি নিজেকে ব্রহ্মে সমর্পণ ক'রে আসক্তিমুক্ত হয়ে সকল কর্ম করেন তাঁকে পাপ স্পর্শ করতে পারে না।। ১০।।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা # কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি # সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে।।১১।।

যোগিনঃ = কর্মযোগিগণ; সঙ্গং = কর্মের ফলের প্রতি আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান; ত্যক্ত্বা = ত্যাগ; ক'রে; আত্মশুদ্ধয়ে = আত্মশুদ্ধির জন্য; কেবলৈঃ = কেবলমাত্র; কায়েন = শরীর দ্বারা; মনসা = মন দ্বারা; বুদ্ধ্যা = বুদ্ধির দ্বারা; ইন্দ্রিয়ৈঃ = ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; অপি = ও; কুর্বন্তি = করেন।।১১।।

অনুবাদ :- কর্মযোগিগণ কর্মের ফলের প্রতি আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ ক'রে আত্মশুদ্ধির জন্য কেবলমাত্র শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করেন।।১১।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে মোক্ষাভিলাষী নিষ্ঠাযুক্ত কর্মযোগীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন — "কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি" অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগীর কোন কর্তৃত্বাভিমান নাই। আপাতদৃষ্টিতে তিনি যা করছেন বলে মনে হয় তার কোনটিরই সঙ্গে তার আত্মিক যোগ নাই। তার কোনটিরই প্রতি তাঁর আসক্তি নাই। তিনি মনে করেন যে কায়া অর্থাৎ দেহ আছে। তাই সে স্নানাদি শৌচকর্ম করে, চোখ আছে তাই সে দেখে, কান আছে তাই সে শোনে, নাসিকা আছে তাই সে ঘ্রাণ গ্রহণ করে, জিহ্বা আছে তাই সে স্বাদ গ্রহণ করে, মন আছে তাই সে ধ্যানাদি কর্ম করে, বুদ্ধি আছে তাই সে তত্ত্বনিশ্চয়াদি কর্ম করে। ইন্দ্রিয়গুলি যা করে সেগুলির সবই তারা প্রকৃতির

মায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়ে করে থাকে। 'আমি' অর্থাৎ আত্মা তার সঙ্গে যুক্ত নয়। আত্মা তো চিরবিশুদ্ধ। তাঁর কোন শুদ্ধির প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়গুলির কাজের কোন প্রভাবই তাঁকে অবশ করতে পারে না। কোন কিছু দেখা, শোনা প্রভৃতির প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ বা মমত্ব নাই।

এইভাবে আসক্তিশূন্য হয়ে নিষ্কাম কর্মযোগিগণ কর্ম করে থাকেন যেমন জনকরাজা করতেন। তিনি রাজপাট চালিয়েছেন, প্রজাশাসন করেছেন, কিন্তু কোন কিছুতেই তাঁর অহং বোধ ছিল না। তাঁরা যে এইভাবে অনাসক্তচিত্তে এইভাবে কর্ম করেন তার বিষয়ে নিষ্কাম কর্মযোগীদের মানসিকতা ব্যাখ্যা ক'রে শঙ্করাচার্য বলেছেন— "মমত্ববর্জিতৈঃ ঈশ্বরায় এব কর্ম করোমি ন মম ফলায় ইতি মমত্ববুদ্ধিশূন্যৈঃ" অর্থাৎ তাঁরা সমস্ত প্রকার আসক্তিশূন্য হয়ে সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ ক'রে সকল প্রকার কর্মফলাসক্তি পরিত্যাগ ক'রে কর্ম করেন। কর্মযোগিগণ আপাতভাবে অপরাপর মানুষের মতই কর্ম কেন করেন সে সম্পর্কে রামানুজ বলেছেন যে তাঁদের অন্তরে যে পূর্ব জন্মের কর্মবন্ধন সঞ্চিত হয়ে আছে সেগুলিকে বিনাশ করার জন্য তাঁরা কর্ম করে থাকেন--- "আত্মগত-প্রাচীনকর্মবন্ধনবিনাশায়"। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেছেন যে জীবাত্মা যুগে যুগে বহুবার জন্মগ্রহণ করে এবং সেই সেই জন্মের কিছু কিছু কর্মবন্ধন পরের জন্মে থেকে যায়। সেইগুলিকে বিনাশ না করা পর্যন্ত আত্মার মুক্তি নাই। আবার গীতা একথাও বলেছেন যে কর্ম না করলে কর্মের বন্ধন দূর হয় না। সেই জন্য যোগী কর্মফলের প্রতি মমত্ববুদ্ধিশূন্য হয়ে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করে থাকেন, ইন্দ্রিয়াদির কোন লালসা বা বাসনা পূরণের জন্য নয়।। ১১।।

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা # শান্তিম্ আপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ # ফলে সক্তো নিবধ্যতে।।১২।।

যুক্তঃ = যাঁরা নিষ্কাম কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত; কর্মফলং = কর্মের ফল; ত্যক্ত্বা = ত্যাগ ক'রে; নৈষ্ঠিকীং শান্তিম্ = ব্রহ্মের প্রতি নিষ্ঠাজাত মহা শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ; আপ্নোতি = লাভ করেন; অযুক্তঃ = যারা নিষ্কাম কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত হয়নি অর্থাৎ সকামচিত্ত ব্যক্তিগণ; কামকারেণ = বাসনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে; ফলে = কর্মফলে, সক্তঃ = আসক্ত হয়ে; নিবধ্যতে = কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।।১২।।

অনুবাদ :- যাঁরা নিষ্কাম কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা কর্মের ফল ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মের প্রতি নিষ্ঠাজাত মহাশান্তি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন। যারা নিষ্কাম কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত হয়নি অর্থাৎ যারা সকামচিত্ত ব্যক্তি তারা বাসনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলে কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।।১২।।

ব্যাখ্যা :- নৈষ্ঠিকী শান্তি কাকে বলে? নৈষ্ঠিক শব্দের অর্থ হল চূড়ান্ত, অন্তিম, পরম প্রভৃতি অর্থাৎ যার পর আর কিছু নাই। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল বেলা শেষে সচ্চিদানন্দঘন পরম প্রেমময় বিশ্ববিধাতা পরম পুরুষের শ্রীচরণকমলে অভয় পরমাশ্রয় লাভ করা। মাটির পৃথিবী তো দুঃখের আগার। মরুবক্ষে যেমন দিগন্তবিস্তৃত বালিরাশি, একফোঁটা জলের দেখা পাওয়া নিতান্ত দুষ্কর, তেমনি মায়াময় এই জগৎসংসারে যে দিকে চোখ যায় সেদিকেই অনন্ত দুঃখের প্লাবন। শান্তি কোথাও নাই। তাই একটু শান্তিসুধা পান করার জন্য দিকে দিকে মানুষের হাহাকার। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব জানে না শান্তির হদিশ কোথায়। তার সামনেই শীতল জলরাশিপূর্ণ শান্তির জলধি। কিন্তু সে তাকে দেখতে পায় না। তাই মায়াবদ্ধ চোখে মরীচিকার ছলনায় ভুলে সেইদিকেই ছোটে। তাই পরিণামে তৃষ্ণায় তার মৃত্যু হয়। কিন্তু যিনি তত্ত্বদর্শী তিনি জানেন জীবনের চূড়ান্ত, অন্তিম, পরম শান্তি সঞ্চিত আছে চির অবিনশ্বর শাশ্বত, সনাতন পরমপুরুষের পরম ধামে। তাই তাঁরা জীবনে অনন্যচিত্তে নিষ্ঠা সহকারে যোগ অবলম্বন ক'রে সেই পরমেশ্বরের করুণায় তাঁর শ্রীচরণকমলে অভয় আশ্রয় লাভ ক'রে পরম শান্তি লাভ করেন। এই শান্তির ঊর্ধ্বে বা সমতুল্য আর কোন শান্তি নেই। একেই বলা হয় নৈষ্ঠিকী শান্তি।। ১২।।

সর্বকর্মাণি মনসা # সন্ন্যস্য আস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী # নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্।।১৩।।

বশী = সংযত ইন্দ্রিয়যুক্ত; দেহী = দেহের অধিকারী অর্থাৎ আত্মা; মনসা = মনের দ্বারা; সর্বকর্মাণি = সকল কর্ম; সন্ন্যস্য = পরিত্যাগ ক'রে; নবদ্বারে = নয়টি দুয়ার বিশিষ্ট; পুরে = নগরীতে; ন কুর্বন্ = নিজে কিছু না ক'রে; ন কারয়ন্ এব = কাউকে দিয়ে কিছু না করিয়েও; আস্তে = জীবন ভোগ করেন।।১৩।।

অনুবাদ :- সংযত ইন্দ্রিয়যুক্ত কর্মযোগী মনের দ্বারা সকল কর্ম পরিত্যাগ ক'রে নয়টি দুয়ার বিশিষ্ট নগরীতে অর্থাৎ দেহের মধ্যে নিজে কিছু না ক'রে এবং কারও দ্বারা কিছু না করিয়েও সুখে জীবন ভোগ করেন।।১৩।।

ব্যাখ্যা :- আমাদের দেহের মধ্যে যিনি বাস করেন তিনিই দেহী অর্থাৎ আত্মা। সাধারণ মানুষ অজ্ঞতা বশত নিজেকেই দেহী ব'লে ভাবে। শ্রীমদ্ভাগবত—মহাপুরাণের একাদশ স্কন্ধে বলা হয়েছে— "ন আত্মা বপুঃ পার্থিবম্ ইন্দ্রিয়াণি..." ইতি। অর্থাৎ এই দেহ বা ইন্দ্রিয় কেউই আত্মা নয়। আমাদের দেহ কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়ে গঠিত। এদের প্রত্যেকটির নির্দিষ্ট কর্ম আছে যেগুলি তারা অহরহ করতেই থাকবে। অজ্ঞ ব্যক্তি ভাবে যে ইন্দ্রিয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মগুলি ইন্দ্রিয় নয়, সেই ক'রে থাকে এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার কোন প্রয়াস তার মধ্যে দেখা যায় না। কর্মগুলির ফলাফলের প্রতি তার মনে আসক্তি সৃষ্টি হয় এবং এদের কারণে তার অন্তরে ক্ষণস্থায়ী সুখ ও দীর্ঘস্থায়ী নিবিড় দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু যিনি সত্যদ্রষ্টা তিনি জানেন যে এই কর্মগুলি একান্তভাবেই ইন্দ্রিয়গুলিই করে, এ বিষয়ে তাঁর কোন ভূমিকাই নাই, তাই এদের প্রতি তাঁর মনে কোন আসক্তি নাই, কোন আনন্দ-দুঃখের বোধ নাই, কোন কর্তৃত্বাভিমান নাই। সেইজন্য এই ইন্দ্রিয়গুলির কর্মের ফলাফলের কারণে তাঁর মনে কোন সুখ বা দুঃখ সৃষ্টি হয় না। জলে অবস্থিত পদ্মপত্রকে যেমন জল স্পর্শ করতে পারে না তেমনই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম পরিবেষ্টিত হয়ে বাস করা সত্ত্বেও সেই সমস্ত কর্মের ফল তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। সকল কিছুর মধ্যে থেকেও সব কিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ। অন্তরে সত্য জ্ঞান প্রজ্বলিত হওয়ার কারণে তাঁর পূর্ণ উপলব্ধি হয় যে কোন কর্মই তিনি নিজে করেন না বা কারও দ্বারাও তিনি কোন কাজ করান না। তিনি জানেন যে প্রকৃতির কর্ম প্রকৃতিই করে, এর মধ্যে তাঁর বা অপর কারোর হস্তক্ষেপের সুযোগ নাই। এই সত্যের আলোকে তিনি তাঁর মনকে প্রস্তুত করেন এবং এভাবে প্রস্তুত মনের সাহায্যেই তিনি অন্তর থেকে কর্তৃত্বাভিমান দূর করতে সক্ষম হন এবং এর ফলে দেহী অর্থাৎ আত্মা সদানন্দচিত্তে সর্বদা দুইটি চোখ, দুইটি নাসারন্ধ্র, দুইটি কান, মুখ, মলদ্বার ও মূত্রদ্বার এই নয়টি দুয়ার বিশিষ্ট দেহরূপ নগরীতে

মনের সুখে বাস করেন। এখানে গীতার শিক্ষা হল যে সমস্ত কিছুর মূলে আছে মন। মনই মানুষকে তার ঈপ্সিত পথে যেতে সাহায্য করে। মন সম্পর্কে মৈত্রেয়ী সংহিতার চতুর্থ প্রপাঠকের ষষ্ঠ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে মন দুই প্রকার — শুদ্ধ মন ও অশুদ্ধ মন। কামনা-বাসনাময় মনকে অশুদ্ধ মন এবং কামনা-বাসনা বিবর্জিত মনকে শুদ্ধ মন বলা হয় —

মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধং চ অশুদ্ধমএব চ।
অশুদ্ধং কামসম্পর্কাত শুদ্ধং কামবিবর্জিতম।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তত্ত্ব অনুযায়ী মনে কামনা বাসনার অধিষ্ঠান হলে মানুষের জীবনে কর্মবন্ধন সৃষ্টি হয় এবং ফলে মানব জীবনের পরম ঈপ্সিত মোক্ষলাভ কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু অন্তরে পার্থিব নশ্বর বস্তুর প্রতি তীব্র বৈরাগ্য সৃষ্টি হলে মন থেকে কামনা-বাসনার অবলুপ্তি ঘটে এবং একমাত্র তখনই যোগী পরমেশ্বর বিভু ভগবানের পরম পদ অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপযোগী হয়ে ওঠেন। মনের সাহায্যেই মানুষ পতন বা উত্থান যা চায় তাই সে পেতে পারে। মন হল উদ্দাম ঘোড়ার ন্যায়। উদ্দাম ঘোড়াকে বশ করতে না পারলে আরোহীর মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়। আবার সেই উদ্দাম ঘোড়াকে সঠিক ভাবে চালনা করতে পারলে তাকে দিয়ে অনেক কঠিন পথও সহজেই অতিক্রম করা যায়। তাই মানুষের প্রাথমিক কর্তব্য হল মনোরূপ উদ্দাম ঘোড়াকে বশ ক'রে আরোহীর ইচ্ছামত তাকে পরিচালনা করা। তাহলেই মানুষ শুভপথে অগ্রসর হয়ে ব্রহ্মলোকে গমনের পথ প্রস্তুত করতে পারবে। নতুবা অবাধ্য মন ইন্দ্রিয়সমূহকে বিপথে পরিচালিত ক'রে মানুষকে নরক পথগামী ক'রে তুলবে।।১৩।।

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি # লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফল-সংযোগং # স্বভাবঃ তু প্রবর্ততে।। ১৪।।

প্রভুঃ = আত্মা; লোকস্য = মানুষের; কর্তৃত্বং = কর্তৃত্ব; ন = না; সৃজতি = সৃষ্টি করেন; কর্মাণি = কর্মসমূহ; কর্মফল-সংযোগং = কর্মফলের সঙ্গে সংযুক্তি; স্বভাবঃ = প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বাসনা; তু = কিন্তু; প্রবর্ততে = প্রবৃত্ত হয়।। ১৪।।

অনুবাদ :- আত্মা মানুষের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, তিনি মানুষের জন্য কর্মও সৃষ্টি করেন না বা মানুষকে কর্মফলের সঙ্গে যুক্তও করেন না। এই সমস্তই হয় মানুষের স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বাসনার প্রভাবে।। ১৪।।

ন আদত্তে কস্যচিৎ পাপং # ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেন আবৃতং জ্ঞানং # তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।।১৫।।

বিভুঃ = সর্বব্যাপী পরমেশ্বর; কস্যচিৎ = কারও; পাপং = পাপ; সুকৃতং = পুণ্য; চ = এবং; এব = অবশ্যই; ন = না; আদত্তে = গ্রহণ করেন; অজ্ঞানেন = অজ্ঞানের দ্বারা; জ্ঞানং = জ্ঞান; আবৃতং = আবৃত থাকে; তেন = তার দ্বারাই; মুহ্যন্তি = মোহগ্রস্ত হয়; জন্তবঃ = জীবসমূহ।।১৫।।

অনুবাদ :- সর্বব্যাপী ভগবান্ পরমেশ্বর কারও পাপও গ্রহণ করেন না আবার পুণ্যও গ্রহণ করেন না। জীবগণের জ্ঞান অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় জীব ভ্রমবশতঃ মোহিত হয়ে ভাবে যে ভগবানই শুভ-অশুভ সকল কর্মই করান ও গ্রহণ করেন।।১৫।।

ব্যাখ্যা :- উপর্যুক্ত পরপর দুটি শ্লোকে ভগবান্ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে তিনি নিজে কোন কর্ম করেন না বা কাউকে সেই কর্ম করার জন্য প্রবৃত্তও করেন না বা তিনি কারও পাপ-পুণ্য গ্রহণও করেন না। কিন্তু জীবগণ অজ্ঞানতার কারণে তাঁকে সেইভাবে ভেবে থাকে। বস্তুত জীবজগতের প্রায় সকলেই সকামচিত্তে যে কর্মগুলি করে সেগুলি তারা ভগবানের নির্দেশেই করে ব'লে মনে করে। কিন্তু তাদের এইরূপ ধারণার কারণ কি? উত্তরে বলা যায় তাদের এইরূপ ধারণা এসেছে কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদের একটি বক্তব্য থেকে—"এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষৎ এষ উ এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষত।" অর্থাৎ ঈশ্বর যাকে এই ইহলোক থেকে উপরে নিয়ে যাবেন মনে করেন তাকে দিয়ে পুণ্য কর্ম করান এবং তিনি যাকে অধঃপতিত করতে চান তাঁকে অশুভকর্মে লিপ্ত করেন। এই কথাটিই কিন্তু বেশীরভাগ মানুষ মনে ক'রে থাকে। কিন্তু গীতা বলছেন যে মানুষের এই ধারণা সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা প্রসূত এবং সর্বৈব ভ্রান্ত। এর পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে ভগবানের অন্তরে কারোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব, হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা কিছুই নেই, তিনি কারোরই অমঙ্গল করেন না, তিনি প্রাকৃত জগতের সর্ব বিষয়ে উদাসীন, নির্বিকার, তাই তাঁর দ্বারা মানুষের জন্য কর্ম সৃষ্টি করা বা মানুষকে দিয়ে কোন কাজ করানোর কোন প্রশ্ন বা সম্ভাবনাই নেই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেহেতু স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত উপদেশ সেইজন্য অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্রীয় গ্রন্থের বক্তব্যের সঙ্গে গীতার কোন রকম বিরোধের ক্ষেত্রে আমরা সর্বক্ষেত্রে গীতার অভিমতকেই প্রাধান্য দেব।। ১৫।।

জ্ঞানেন তু তৎ অজ্ঞানং # যেষাং নাশিতম্ আত্মনঃ।
তেষাম্ আদিত্যবৎ জ্ঞানং # প্রকাশয়তি তৎ পরম্।১৬।।

তু = কিন্তু; যেষাং = যাদের; তৎ = সেই; অজ্ঞানং = অজ্ঞানতা; আত্মনঃ = আত্মতত্ত্ব বিষয়ের; জ্ঞানেন = জ্ঞানের দ্বারা; নাশিতম্ = দূর হয়েছে; তেষাম্ = তাদের; তৎ = সেই; পরম্ = পরমতত্ত্ববিষয়ক; জ্ঞানং = জ্ঞান; আদিত্যবৎ = সূর্যের মত; প্রকাশয়তি = প্রকাশ করে।।১৬।।

অনুবাদ :- কিন্তু যাদের সেই অজ্ঞানতা আত্মতত্ত্ব বিষয়ের জ্ঞানের দ্বারা দূর হয়েছে তাদের সেই পরমজ্ঞান সূর্য যেমন সমগ্র লোকসমূহকে প্রকাশ করে তেমনই পরম সত্য অর্থাৎ পরম পুরুষকে প্রকাশ করে।।১৬।।

তৎ বুদ্ধয়ঃ তৎ আত্মানঃ # তৎ নিষ্ঠাঃ তৎ পরায়ণাঃ।
গচ্ছন্তি অপুনরাবৃত্তিং # জ্ঞান-নির্ধূর্ত-কল্মষাঃ।।১৭।।

তৎ বুদ্ধয়ঃ = যাঁর বুদ্ধি পরমাত্মায় অধিষ্ঠিত; তৎ আত্মানঃ = যাঁরা তাঁর চিন্তাতেই একাগ্রচিত্ত; তৎ নিষ্ঠাঃ = যাঁর চিত্ত তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ; তৎ পরায়ণাঃ = তিনিই যাঁর শরণাগতি; জ্ঞান-নিধুর্ত = জ্ঞানের দ্বারা দূরীভূত; কল্মষাঃ = অবিদ্যা; অপুনরাবৃত্তিং = পুনর্জন্মের অপ্রাপ্তি; গচ্ছন্তি = হয়।।১৭।।

অনুবাদ :- যাঁর বুদ্ধি পরমাত্মায় অধিষ্ঠিত, যিনি তাঁর চিন্তাতেই একাগ্রচিত্ত, যাঁর চিত্ত তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ, তিনিই যাঁর শরণাগতি, যাঁর অন্তর থেকে জ্ঞানের আলোকে অবিদ্যা দূরীভূত হয়েছে তাঁকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না অর্থাৎ তাঁর মুক্তিলাভ হয়।।১৭।।

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে # ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ # পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।। ১৮।।

*চৈব = চ এব

পণ্ডিতাঃ = পণ্ডিতগণ; বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে = বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত; গবি = গরু; হস্তিনি = হাতি; শুনি = কুকুরে; চ = এবং; শ্বপাকে = চণ্ডালে; এব = অবশ্যই; সমদর্শিনঃ = সমদর্শী।।১৮।।

অনুবাদ :- পণ্ডিতগণ বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ এবং গরু, হাতি, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী অর্থাৎ সকলের মধ্যেই তাঁরা পরমাত্মাকে দর্শন করেন।।১৮।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকের মর্মার্থ সঠিকভাবে অনুধাবন না করলে পাঠকের মনে এক বিরাট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। তাঁরা ভাবতে পারেন যে ভগবানের এ আবার কি রকম কথা যে তিনি বলছেন যে তিনি বর্ণশ্রেষ্ঠ পরম জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে যে চোখে দেখবেন অর্থাৎ তাঁকে যে সম্মান দেবেন সেই সমান চোখেই তিনি সবচাইতে নিম্নবৃত্তি সম্পন্ন চণ্ডালকেও দেখবেন অর্থাৎ তিনি ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে একই সম্মান প্রদান করবেন এবং সর্বোৎকৃষ্ট পশু গাভী এবং মধ্যম শ্রেণীর পশু হাতী ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর পশু কুকুরের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখবেন না? তাহলে মানুষের বা প্রাণীর মধ্যে গুণবত্তার স্বীকৃতি কোথায় ? তাহলে কি উন্নত ও অনুন্নতের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকবে না? ঠিক এইখানেই হল বোঝার সবচাইতে বড় ভ্রান্তি। ভগবান্ এখানে এই কথাটি একেবারেই বলেননি। তিনি বলেছেন যে তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধ পুরুষের অন্তরে কোন বিষম ভাব থাকে না। তিনি সম্যক জানেন যে সংসারে একমাত্র সত্ত্বা হলেন পরব্রহ্ম। এছাড়া আর কারও সত্ত্বা নাই। সেইজন্য তিনি সকলকে সমান চোখে দেখেন। পরমতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী ব্যক্তি সূর্যের মত। সূর্য যখন উদিত হয় তখন সে পবিত্র, অপবিত্র, উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র, পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি ইত্যাদি কোন স্থানের মধ্যে পার্থক্য বিচার না করেই সমভাবেই সকলকে আলোক বিতরণ করে। তেমনই পরমতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী ব্যক্তি উচ্চ-নীচের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেন না। এর কারণ হল এই যে তিনি সকলের মধ্যেই সেই এক পরমাত্মাকে দর্শন করেন। ভগবান্ এখানে দুটি বস্তুর মধ্যে ব্যবহারিক ভেদকে অস্বীকার করেননি। যেমন মাথা এবং পা। মাথা দিয়ে যে কাজ করা যায় পা দিয়ে তো সেই কাজ করা যায় না। কিন্তু যদি মাথা এবং পা উভয়স্থানেই আঘাত লাগে তাহলে মাথা এবং পা উভয় স্থানের জন্য একই গুরুত্ব দিয়ে একই দৃষ্টি দিয়ে উপযুক্ত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে হয়। মাথা বলে বেশী গুরুত্ব দেওয়া এবং পা বলে অবহেলা করলে চলে না। ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল উভয়েরই সমাজে ভিন্ন ভিন্ন উপযোগিতা আছে। একজনের কাজ অপরকে দিয়ে হবে না। এ হল ব্যবহারগত তফাৎ। কিন্তু সকলের মধ্যে যে এক অভিন্ন পরমাত্মা বিরাজ করেন তাঁর সঙ্গে তো কোন ভেদাভেদ চলে না। দুটি মাথার একটি টুপিতে ঢাকা অপরটি পাগড়ীতে ঢাকা। দুটির বাহ্যিক দর্শন ভিন্ন কিন্তু টুপি ও পাগড়ী খুলে দেখলে একই বস্তু মাথা দেখা যাবে। তেমনই

যিনি তত্ত্বদর্শী পুরুষ তিনি মানুষ, জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ সকলের বাহ্যিক ভিন্ন দর্শনের অভ্যন্তরে একই সত্ত্বা পরমাত্মাকে দর্শন করেন। এই কারণে তিনি সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আচরণে যা হল আদ্বিজ চণ্ডাল বিধর্মী সকলকেই একই প্রেম বিতরণ। সেইজন্য ভগবান্ উপদেশ দিয়েছেন যে জীবের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ না করে সকলের মধ্যে তিনিই অবস্থান করেন এই জ্ঞান করে কাউকেই হীন দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়।। ১৮।।

ইহ এব তৈঃ জিতঃ সর্গো # যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম # তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।।১৯।।

যেষাং = যাদের; মনঃ = অন্তর; সাম্যে স্থিতং = ভেদাভেদ জ্ঞান রহিত; ইহ = এই ইহলোকেই; এব = অবশ্যই; তৈঃ = তাদের দ্বারা; সর্গঃ = বিশ্ব সংসার; জিতঃ = বিজিত হয়; ব্রহ্ম সমং = ব্রহ্মের ন্যায়; হি = অবশ্যই; নির্দোষং = নিষ্কলুষ; তস্মাৎ = সেইজন্য; তে = তাঁরা; ব্রহ্মণি = ব্রহ্মে; স্থিতাঃ = বিরাজ করেন।। ১৯।।

অনুবাদ :- যাদের অন্তরে কোন ভেদাভেদ জ্ঞান নাই তারা এই ইহলোকেই জন্ম-মৃত্যুরূপ বিশ্ব সংসারকে জয় করেন। তাঁরা পরম ব্রহ্মের ন্যায় নিষ্কলুষ ও সমবুদ্ধি হওয়ার কারণে ব্রহ্মেই বিরাজ করেন।। ১৯।।

ব্যাখ্যা :- এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে মানুষের অন্তর সর্বজীবে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হলে তবেই নিষ্কলুষ ব্রহ্ম তাঁকে করুণা করেন এবং তাঁর ব্রহ্মলোকে স্থান হয় অর্থাৎ তিনি মুক্তি লাভ করেন। এর বিপরীত ঘটলে মানুষের পক্ষে কখনই পরম ব্রহ্মের করুণা লাভ করা সম্ভব নয় সে তিনি যতই পূজা-অর্চনা, আচার-অনুষ্ঠান পালন প্রভৃতি করুন না কেন।।১৯।।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য # ন উদ্বিজেৎ প্রাপ্য চ অপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ো # ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।। ২০।।

স্থিরবুদ্ধিঃ = যার বুদ্ধি অচঞ্চল; অসংমূঢ়ঃ = যিনি মোহমুক্ত; ব্রহ্মবিদ্ = যিনি ব্রহ্মকে জানেন; ব্রহ্মণি = ব্রহ্মে; স্থিতঃ = অবস্থিত; প্রিয়ং = প্রিয়বস্তু; প্রাপ্য = লাভ ক'রে; ন প্রহৃষ্যেৎ = আনন্দিত হন না; চ = এবং; অপ্রিয়ম্ = অপ্রিয় বস্তু; প্রাপ্য = লাভ ক'রে; ন উদ্বিজেৎ = উদ্বিগ্ন হন না।।২০।।

অনুবাদ :- যার বুদ্ধি অচঞ্চল, যিনি মোহমুক্ত, যিনি ব্রহ্মাকে জানেন তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করেন। তিনি প্রিয়বস্তু লাভ ক'রে উল্লসিত হন না এবং অপ্রিয় বস্তু লাভ ক'রে উদ্বিগ্নও হন না।।২০।।

বাহ্যস্পর্শেষু অসক্ত-আত্মা # বিন্দতি আত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্ত-আত্মা # সুখম্ অক্ষয়ম্ অশ্নুতে।।২১।।

বাহ্যস্পর্শেষু = ইন্দ্রিয়সমূহে; অসক্তাত্মা = আসক্তিহীন; আত্মনি = আত্মায়; যৎ = যে; সুখম্ = সুখ; বিন্দতি = বিদ্যমান; সঃ = তিনি; ব্রহ্মযোগযুক্ত-আত্মা = ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত; অশ্নুতে = লাভ করেন।।।২১।।

অনুবাদ :- আত্মায় যে সুখ বিদ্যমান ইন্দ্রিয়সমূহে আসক্তিহীন পুরুষ সেই সুখ লাভ করেন এবং ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে সেই অক্ষয় সুখ অনুভব করেন।।।২১।।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা # দুঃখ-যোনয় এব তে।
আদি অন্তবন্তঃ কৌন্তেয় # ন তেষু রমতে বুধঃ।।২২।।

কৌন্তেয় = হে কুন্তীপুত্র অর্জুন; যে = যে সমস্তই; ভোগাঃ = সুখসমূহ; সংস্পর্শজাঃ = ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত; তে = সেগুলি; হি = নিশ্চিতভাবে; দুঃখ-যোনয়ঃ এব = দুঃখেরই কারণ; আদি অন্তবন্তঃ = আদি ও অন্তযুক্ত; চ = এবং; তেষু = তার মধ্যে; বুধঃ = বিবেকবান ব্যক্তি; ন রমতে = আনন্দ লাভ করেন না।।২২।।

অনুবাদ :- হে কুন্তীপুত্র অর্জুন! যে সমস্ত সুখ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লাভ করা যায় সেগুলির সমস্তই আমাদের জন্য দুঃখ বহন ক'রে আনে এবং সেগুলির সবই ক্ষণস্থায়ী। সেইজন্য বিবেকবান ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়জাত সুখভোগে কোন আনন্দ লাভ করেন না।।২২।।

শক্নোতি ইহ এব যঃ সোঢুং # প্রাক্ শরীর-বিমোক্ষণাৎ।
কাম-ক্রোধ-উদ্ভবং বেগং # স যুক্তঃ স সুখী নরঃ।।২৩।।

যঃ = যিনি; শরীর = বর্তমান নশ্বর দেহ; বিমোক্ষণাৎ = পরিত্যাগের; প্রাক্ = পূর্বে; ইহ এব = ইহ লোকেই; কাম-ক্রোধ-উদ্ভবং = কাম ও ক্রোধ থেকে উদ্ভূত; বেগং = বেগ; সোঢুম্ = সহ্য করতে; শক্নোতি = সক্ষম হয়; সঃ = তিনি; যুক্তঃ = নিষ্কাম কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত; নরঃ = পুরুষ।।২৩।।

অনুবাদ :- যিনি এই ইহ জগতেই মৃত্যুর পূর্বেই বর্তমান নশ্বর দেহেই কাম-ক্রোধজনিত সকল প্রকার প্রলোভন ত্যাগ করতে সমর্থ হন তিনি নিষ্কাম কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত, তিনিই সুখী পুরুষ।।২৩।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এই শ্লোকে একজন মানুষ কিভাবে প্রকৃত সুখী হতে পারেন তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে যিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কাম, ক্রোধ থেকে মন, নেত্র প্রভৃতির ক্ষোভরূপ যে বেগ উৎপন্ন হয় তাকে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এই নশ্বর দেহেই দূর করতে সক্ষম হন তিনিই সুখী হন। সেই কাম ক্রোধ পরিত্যাগের বিষয়টি ঠিক কি রকম তার গভীরতা শুধুমাত্র এই কয়েকটি শব্দের দ্বারা বোঝা বেশ দুষ্কর। জীবদ্দশায় এই সুখ-দুঃখের পরিত্যাগের মাত্রাটি কেমন হবে সেই বিষয়টি সম্পর্কে শ্রীধরাচার্য বলেছেন— "যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে তথা মরণাৎপ্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহতে স এব যুক্তঃ সুখী চ"। অর্থাৎ দেহে যখন প্রাণ থাকে না তখন সেই দেহ যেভাবে কাম-ক্রোধজনিত বেগ সহ্য করে অর্থাৎ মৃতদেহকে কত সুন্দরী রমণী স্পর্শ ক'রে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, সন্তানরা বিলাপ করে, তাকে আগুনে দাহ করে কিন্তু সেই মৃতদেহ কাম-ক্রোধ, সুখ-দুঃখ বিষয়ে নির্বিকার থাকে ঠিক সেই রকমভাবে যে জ্ঞানী জীবদ্দশাতেই কাম-ক্রোধজনিত বেগ সহ্য করতে পারে তিনিই প্রকৃত নিষ্কাম কর্মযোগী ও সুখী পুরুষ।

নারদপরিব্রাজক উপনিষদে আমরা এই মতের সমর্থন পাই—

প্রাণো গতে যথা দেহঃ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি।
তথা চেৎপ্রাণযুক্তা অপি স কৈবল্যাশ্রয়ো ভবেৎ।। (৩।২৭)

অর্থাৎ প্রাণ চলে যাওয়ার পর যেমন দেহের সুখ-দুঃখের কোন অনুভূতি থাকে না ঠিক তেমনি যদি জীবিত থাকা অবস্থায় মানুষের সুখ-দুঃখের কোন বোধ না থাকে তাহলে তিনি কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেছেন বলা যায়।

সুতরাং এই শ্লোকে বর্ণিত ভগবানের বক্তব্যের যথার্থ মর্মার্থ অনুধাবন ক'রে কর্ম করলে আর কোন কর্মবন্ধন হয় না। ২৩।।

যঃ অন্তঃসুখঃ অন্তরারামঃ # তথা অন্তর্জ্যোতিঃ এব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং # ব্রহ্মভূতঃ অধিগচ্ছতি।।২৪।।

যঃ = যিনি; অন্তঃসুখ = যিনি নিজের মধ্যেই নিজে সুখ অনুভব করেন, অন্তঃ -আরামঃ = যিনি নিজের মধ্যেই নিজে ক্রীড়ারত; তথা = সেইরূপ; যঃ = যাঁর;

অন্তর্জ্যোতিঃ = অন্তর সত্য জ্ঞানের আলোকে আলোকিত; এব = অবশ্যই; সঃ = তিনি; যোগী = নিষ্কামকর্মযোগী; ব্রহ্মভূতঃ = তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করেন; ব্রহ্মনির্বাণং = ব্রহ্মেই নির্বাণ; অধিগচ্ছতি = লাভ করেন।।২৪।।

অনুবাদ :- যিনি নিজের অন্তরাত্মার মধ্যেই নিজে সুখ অনুভব করেন, যিনি নিজের অন্তরাত্মার মধ্যেই নিজে ক্রীড়ারত অর্থাৎ আনন্দ অনুভব করেন তথা যাঁর অন্তর সত্য ও জ্ঞানের আলোকে আলোকিত, তিনি নিষ্কাম কর্মযোগী, তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করেন এবং ব্রহ্মেই নির্বাণ লাভ করেন।।২৪।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ভগবান্ যোগীর ব্রহ্মনির্বাণ ও ব্রহ্মভূত অবস্থা লাভের কথা বলেছেন। এখানে ব্রহ্মনির্বাণ ও 'ব্রহ্মভূত অবস্থা' কাকে বলে সেটি জানা প্রয়োজন। ব্রহ্মভূত শব্দ দ্বারা উচ্চশ্রেণীর অভেদমার্গীয় যোগীকে নির্দেশ করা হয়। যখন জ্ঞানযোগী যোগের অভ্যাস করতে করতে অন্তরের সমস্ত আসক্তি, অহঙ্কার, রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি চিত্তের সমস্ত গ্লানিকে পরিত্যাগ করেন তখন তাঁর অন্তর থেকে রজোগুণ ও তমোগুণ শান্ত হয়ে গিয়ে তিনি সচ্চিদানন্দমন ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন। তখন তিনি এমন এক উচ্চস্তরে পৌঁছে যান যে তিনি নিজেকে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বোধ করেন এবং তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পান না। তখন তিনি নিজেকেই ব্রহ্ম মনে করেন—'সোহমস্মি' (ঈশোপনিষৎ-১০), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১/৪/১০) এবং তিনি পরমাত্মার মধ্যে অটল স্থিতি লাভ করেন। তবে এই অবস্থায় তাঁর অন্তর থেকে রজঃ ও তমঃ এই দুই গুণ দূর হয়ে গেলেও তিনি এই অবস্থায় প্রকৃতির এই গুণসমূহকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করতে পারেননি এবং ব্রহ্মকে লাভ করতে পারেননি যদিও তিনি সর্বদা নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ভাবেন, সর্বদা ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকেন। যোগীর ব্রহ্মপ্রাপ্তির ঠিক পূর্বের এইরূপ অবস্থাকেই 'ব্রহ্মভূত অবস্থা' বলা হয়। তবে এইরকম অবস্থায় দৃঢ় ও স্থিরভাবে অবস্থান করতে করতে তিনি অচিরেই ব্রহ্মকে লাভ করে থাকেন। যখন যোগী ব্রহ্মভূত অবস্থা অতিক্রম ক'রে ব্রহ্মকে লাভ করেন তখন তাকে 'ব্রহ্মনির্বাণ' বলা হয়। সুতরাং ব্রহ্মনির্বাণ হল ব্রহ্মভূত অবস্থার পরিণাম বা ফল।। ২৪।।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্ # ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্ন-দ্বৈধাঃ যত-আত্মানঃ # সর্বভূত-হিতে রতাঃ।।২৫।।

ছিন্ন = দূরীভূত; দ্বৈধাঃ = দ্বিধা; যত = সংযত; আত্মানঃ = আত্মা; সর্বভূত = সমস্ত জীবের; হিতে = কল্যাণে; রতাঃ = রত; ক্ষীণকল্মষাঃ = কলুষতা

দূর হয়েছে; ঋষয়ঃ = ঋষিগণ; ব্রহ্মনির্বাণম্ = ব্রহ্মে লীন হয়ে মোক্ষ; লভন্তে = লাভ করেন।।২৫।।

অনুবাদ :- যাঁদের অন্তর থেকে সমস্ত রকম কলুষতা দূর হয়েছে, যাঁদের অন্তরে কোন সংশয় নাই, যাঁদের আত্মা সংযত, যাঁরা সমস্ত জীবের কল্যাণে রত, সেই ঋষিগণ ব্রহ্মে লীন হয়ে ব্রহ্ম নির্বাণ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন।।২৫।।

কাম-ক্রোধ-বিযুক্তানাং # যতীনাং যত-চেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং # বর্ততে বিদিত-আত্মনাম্।।২৬।।

কাম-ক্রোধ-বিযুক্তানাং = যাদের হৃদয় কাম ও ক্রোধের অনুভূতি মুক্ত; যত = সংযুক্ত; চেতসাং = চিত্ত; বিদিত = জানেন; আত্মনাং = আত্মাকে; যতীনাম্ = সাধকের; অভিতঃ = চারিদিকে; ব্রহ্মনির্বাণং = ব্রহ্মনির্বাণ; বর্ততে = বিরাজ করে।।২৬।।

অনুবাদ :- যাঁদের হৃদয় কাম ও ক্রোধের অনুভূতি মুক্ত, যাঁদের চিত্ত সংযত, যাঁরা আত্মাদর্শী, সেই সমস্ত সাধকদের চারিদিকে ব্রহ্মনির্বাণ বিরাজ করে অর্থাৎ তাঁরা ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন।।২৬।।

ব্যাখ্যা :- এখানে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মনির্বাণ সাধকের চারিদিকে অবস্থান করে। কিন্তু কিভাবে? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর চারিদিকেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতেন — তিনি জলেও কৃষ্ণকে দেখতেন, স্থলেও কৃষ্ণকে দেখতেন, বৃক্ষ-অরণ্য-লতা, ইতর প্রাণী, মদ্যপ, সমুদ্রের নীল জলরাশি, সমুদ্রকুলের বৃক্ষরাজি সকলের মধ্যেই তিনি কৃষ্ণকে দর্শন ক'রে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু মোচন করতেন এবং 'হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!' রবে ছুটে যেতেন কারণ তিনি সর্বদা কৃষ্ণের চিন্তায় এমনই বিভোর থাকতেন যে তাঁর উপলব্ধি হত যে চারিদিকের বস্তুসমূহের রূপ ধারণ ক'রে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চারিদিকেই বিরাজমান। তেমনই সাধকগণের সমগ্র চিন্তার মধ্যে ব্রহ্ম-চেতনা এমন ভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে যে তাঁরা সর্বদা সম্মুখে-পশ্চাতে, ডাহিনে-বামে, নিম্নে-ঊর্ধ্বে সর্বত্রই ব্রহ্মের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন এবং তাঁদের অনুভব হয় যে তাঁদের মুক্তি স্বয়ং ব্রহ্মের রূপ ধারণ ক'রে তাদের সর্বদিকেই বিরাজ করছে। সেইজন্য এখানে বলা হয়েছে যে নিষ্কাম কর্মযোগী তাঁদের চারিদিকেই ব্রহ্মনির্বাণের মধ্যেই বাস করেন।।২৬।।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহিঃ বাহ্যান্ # চক্ষুঃ চ এব অন্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণ-অপানৌ সমৌ কৃত্বা # নাসা-অভ্যন্তর-চারিণৌ।।২৭।।
যত-ইন্দ্রিয়-মনো বুদ্ধিঃ # মুনিঃ মোক্ষ-পরায়ণঃ।
বিগত-ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধো # যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।।২৮।।

বাহ্যান্ = বাইরের; স্পর্শান্ = ইন্দ্রিয়াদি বিষয়সমূহ; বহিঃ = বাইরে; কৃত্বা = ক'রে; চক্ষুঃ = চোখ; চ = এবং; ভ্রুবোঃ = ভ্রুদ্বয়ের; অন্তরে = মধ্যখানে; এব = অবশ্যই; নাসা = নাসারন্ধ্র দুইটির; অভ্যন্তর = ভিতরে; চারিণৌ = বিচরণরত রেখে; প্রাণ-অপানৌ = প্রাণ ও অপান বায়ুকে; সমৌ = স্থির; কৃত্বা = ক'রে; যত = সংযত; বিগত = দূরীভূত; মোক্ষ = মুক্তি; পরায়ণঃ = কামী; যঃ = যিনি; সঃ = তিনি; সদা = সর্বদা; এব = নিশ্চয়ই।।২৭-২৮।।

অনুবাদ :- বাইরের ইন্দ্রিয়াদি বিষয়সমূহকে বাইরে রেখে অর্থাৎ তাদেরকে পরিত্যাগ ক'রে, চোখ এবং ভ্রুদ্বয়ের মধ্যখানে নাসারন্ধ্র দুইটির ভিতরে বহমান প্রাণ ও অপান বায়ুকে স্থির ক'রে, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত ক'রে, মন থেকে ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধকে বর্জন ক'রে যে সাধক মুক্তিলাভের চেষ্টায় রত হয়েছেন তিনি নিশ্চিতভাবেই সর্বদা মুক্ত।।।২৭-২৮।।

ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাং # সর্ব-লোক-মহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব-ভূতানাং # জ্ঞাত্বা মাং শান্তিম্ ঋচ্ছতি।।২৯।।

মাং = আমাকে; যজ্ঞ-তপসাং = যজ্ঞ ও তপস্যার; ভোক্তারম্ = ভোগকর্তা বা প্রাপক; সর্ব-লোক = স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল সর্ব লোকের; মহেশ্বরং = প্রভু; সর্ব-ভূতানাং = সকল জীবের; সুহৃদং = শুভানুধ্যায়ী; জ্ঞাত্বা = জেনে; শান্তিম্ = শান্তি; ঋচ্ছতি = লাভ করেন।। ২৯।।

অনুবাদ :- আমিই সকল যজ্ঞ ও তপস্যার প্রাপক, আমিই সর্ব-লোক-মহেশ্বর অর্থাৎ সকল লোকের ঈশ্বরের ঈশ্বর, আমি সকল জীবের শুভানুধ্যায়ী। এই পরমতত্ত্ব যাঁরা জানেন সেই জ্ঞানিগণ অন্তরে পরম শান্তি লাভ করেন।।২৯।।

ব্যাখ্যা :- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এখানে বলেছেন যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎসও শ্রীকৃষ্ণ, সকল কিছুর পরিণতিও শ্রীকৃষ্ণ। সেইজন্য যে ব্যক্তি যাঁর পূজাই করুন না কেন, যে যজ্ঞই অনুষ্ঠান করুন না কেন, যে তপস্যাই করুন না কেন তার সব কিছুরই উদ্দেশ্য হলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ভক্ত যে দেবতার উদ্দেশ্যেই অর্ঘ্য প্রদান করুন না কেন সেই সমস্ত অর্ঘ্যই পৌঁছে যায় একমাত্র কৃষ্ণেরই চরণে। এই সত্য জেনে সকলেরই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।। ২৯।।

—ঃ পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ঃ—

ষষ্ঠ অধ্যায়

অভ্যাসযোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং # কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ # ন নিরগ্নিঃ ন চ অক্রিয়ঃ।।১।।

শ্রীভগবান্ উবাচ = শ্রীভগবান্ বললেন; যঃ = যিনি; অনাশ্রিতঃ = আশ্রয় না ক'রে অর্থাৎ না ভেবে; কার্যং = কর্তব্য; কর্ম = কর্ম; করোতি = করেন; সঃ = তিনি; চ = এবং; ন = নন; নিরগ্নিঃ = অগ্নিদ্বারা করণীয় হোম, যজ্ঞাদি বেদোক্ত আচারসমূহ করেন না; অক্রিয়ঃ = সকল প্রকার কর্মত্যাগী।।১।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন — যিনি কর্মফলের কথা না ভেবে কর্তব্য কর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী। যিনি কেবলমাত্র অগ্নিদ্বারা করণীয় হোম, যজ্ঞাদি বেদোক্ত আচারসমূহ এবং সকল প্রকার কর্ম ত্যাগ করেছেন তাঁকে সন্ন্যাসী বা যোগী হিসাবে গণ্য করা যায় না অর্থাৎ কেউ কেবলমাত্র সমস্ত শারিরীক ক্রিয়া ত্যাগ করে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকলেই তিনি সন্ন্যাসী হন না।।১।।

ব্যাখ্যা :- তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ এই দুই প্রকার নিষ্ঠার কথা বলেছেন। যাঁরা জ্ঞাননিষ্ঠ তাঁরা সন্ন্যাসী এবং যাঁরা কর্মনিষ্ঠ তাঁরা নিষ্কাম কর্মযোগী। এখানে ভগবান্ কখন পুরুষ একই সঙ্গে সন্ন্যাসীও হতে পারেন এবং কর্মযোগীও হতে পারেন আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কোন পুরুষ সন্ন্যাস নিলেও সন্ন্যাসী বলে গণ্য হতে পারেন না সে সম্পর্কে বলেছেন। যে পুরুষ পরমেশ্বরের নিকট থেকে ফললাভের কোন প্রত্যাশা না ক'রে মনে করেন যে তাঁর একান্ত কর্ম হল নিঃস্বার্থভাবে পরমপুরুষের সেবা করা ও নিজ কর্তব্যকর্ম পালন করা। তিনি হলেন একাধারে জ্ঞাননিষ্ঠ অর্থাৎ সন্ন্যাসী এবং কর্মযোগনিষ্ঠ অর্থাৎ যোগী। ভগবান্ এখানে বলছেন যে, যে পুরুষ নিজ নিজ বর্ণাশ্রম অনুসারে যে সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম বিহিত আছে যথা নিত্যনৈমিত্তিক যোগ, দান,

তপ, শরীরনির্বাহ সংক্রান্ত কর্ম, লোকসেবা প্রভৃতি সেগুলিকে নিরাসক্তচিত্তে সমস্ত সংকল্প অর্থাৎ জড় জগতের বাসনা ও আলস্য ত্যাগ ক'রে নিজের শক্তি অনুসারে পালন করেন তিনি সেই জ্ঞান লাভ করেন যা সাংখ্যযোগ এবং নিষ্কাম কর্মযোগ উভয়ের মিলিত ফল। সেইজন্য তিনি একাধারে সন্ন্যাসী এবং কর্মযোগী। কারণ তিনি ফললাভের আশা ত্যাগ ক'রে বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপও করছেন তাই তিনি জ্ঞানী অর্থাৎ সন্ন্যাসী আবার নিষ্কাম চিত্তে অন্যান্য কর্তব্যকর্মও করছেন তাই তিনি কর্মযোগী।

যোগী যখন চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক এই পাঁচপ্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচপ্রকার কর্মেন্দ্রিয়কে বুদ্ধি থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাঁর মনের মধ্যে এমনভাবে বিলীন ক'রে দিতে পারেন যাতে তাঁর আর বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ না থাকে এবং মনের মধ্যে এই স্থির ধারণা জন্মে যে একমাত্র ঈশ্বরই হলেন পরম আশ্রয়, তিনি ব্যতীত অপর আর কেউ নেই, তাঁর মনে আর অন্য কোন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকে না তখনই তিনি প্রকৃত জ্ঞানযোগী হয়ে ওঠেন। এই অবস্থায় তিনি জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দর্শন করেন। সেইজন্য কঠোপনিষদও জ্ঞানী ব্যক্তিগণকে ইন্দ্রিয়সমূহকে মনে অর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন— "যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি" (১।৩।১৩)।

কিন্তু যিনি অগ্নিকে বা সকল প্রকার কর্মকে কেবলমাত্র ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নিয়েছেন কিন্তু মন থেকে আসক্তি, কর্তৃত্বাভিমান, মমতা, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি ত্যাগ করতে পারেননি তাঁকে সন্ন্যাসীও বলা যায় না, যোগীও বলা যায় না। সন্ন্যাসী বা যোগী হিসাবে গণ্য হওয়ার আবশ্যিক শর্ত হল অন্তর থেকে সমস্ত ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ।।১।।

যং সংন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ # যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হি অসংন্যস্ত-সঙ্কল্পো # যোগী ভবতি কশ্চন।।২।।

পাণ্ডব = হে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন; যং = যাকে; সংন্যাসম্ = সন্ন্যাস; ইতি প্রাহুঃ = বলা হয়; তং = তাকেই; যোগং = যোগ; বিদ্ধি = জানবে; হি = অবশ্যই; অসংন্যস্ত = পরিত্যক্ত; সঙ্কল্পঃ = রাগ-দ্বেষের সঙ্গে সংযুক্ত সাংসারিক বস্তুর চিন্তা; ভবতি = হতে পারে; কশ্চন = কেউ।। ২।।

অনুবাদ :- হে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন! যাকে সন্ন্যাস বলা হয় সেইটিই হল যোগ অর্থাৎ কর্মযোগ। কেউ কখনও সংকল্প অর্থাৎ বাসনা ত্যাগ না করলে নিশ্চিতভাবেই যোগী হতে পারে না।। ২।।

ব্যাখ্যা :- 'ন্যাস' = নিক্ষেপ অর্থাৎ ত্যাগ। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ হল ত্যাগ করা। কিন্তু কি সেই ত্যাগ যাকে গীতায় সন্ন্যাস বলা হয়েছে? গীতায় 'সন্ন্যাস' শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তার ব্যাখ্যা দিয়ে শ্রীধরাচার্য বলেছেন--- "ফলসংকল্পত্যাগসাম্যাৎ সংন্যাসী"।

অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্মের ফলের প্রতি সঙ্গ বা আসক্তি ত্যাগ করাই হল সন্ন্যাস। ভগবান্ বলেছেন যে, সন্ন্যাস ও যোগ শব্দদুটি সমার্থক। শঙ্করাচার্য গীতোক্ত যোগীর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন— "যঃ কশ্চন কর্মী সন্ন্যস্তফলসংকল্পো ভবেৎ স যোগী সমাধানবান্ অবিক্ষিপ্তচিত্তো ভবেৎ চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ ফলসংকল্পস্য সন্ন্যস্তত্বাৎ ইতি অভিপ্রায়ঃ"। অর্থাৎ যিনি অন্তর থেকে ফলবিষয়ক সংকল্প অর্থাৎ বাসনা ত্যাগ করেছেন তিনি যোগী। এর অভিপ্রায় হল যে চিত্তবিপক্ষের কারণ যে ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা তাকে অন্তর থেকে সম্পূর্ণভাবে যিনি ত্যাগ করতে পারেন তাঁকেই সন্ন্যাসী বা যোগী বলা হয়। সুতরাং গীতার ভাষায় কর্মের ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ না ক'রে কেবলমাত্র গৃহত্যাগ ক'রে অরণ্যচারী হলেই কেউ সন্ন্যাসী পদবাচ্য হতে পারেন না, অপরপক্ষে কেউ গৃহস্থ হয়েও মনের সমস্ত কামনা-বাসনা ত্যাগ ক'রে কর্ম করতে পারলে তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী ব'লে বিবেচিত হবেন যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।। ২।।

আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ যোগং # কর্ম কারণম্ উচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্য এব # শমঃ কারণম্ উচ্যতে।।৩।।

যোগং = নিষ্কাম কর্মযোগে; আরুরুক্ষোঃ = আরোহণ করতে ইচ্ছুক; মুনেঃ = মুনির; কর্ম = নিরাসক্ত কর্মই; কারণম্ = উপায়; উচ্যতে = বলা হয়; যোগারূঢ়স্য = যিনি যোগে আরোহণ করেছেন; তস্য = তাঁর; শমঃ এব = চিত্তের স্থিরতাই অর্থাৎ সেই অবস্থা বজায় রাখাই; কারণম্ = উপায়; উচ্যতে = বলা হয়।।৩।।

অনুবাদ :- যিনি কর্মযোগের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক তাঁকে নিরাসক্ত কর্ম করতে হবে। কিন্তু যিনি ইতোমধ্যেই যোগযুক্ত অবস্থায় আছেন তাঁর পক্ষে সেই অবস্থায় বিদ্যমান থাকার উপায় হল শমঃ অর্থাৎ কর্ম থেকে নিবৃত্তি এবং অন্তরের সর্বসংকল্প ত্যাগ করে চিত্তের শান্তি অর্থাৎ সেই অবস্থাই বজায় রাখা।। ৩।।

ব্যাখ্যা :- নিরাসক্ত কর্ম পালনই হল সিদ্ধি লাভের উপায়। নিরাসক্ত কর্মের প্রশস্তি গেয়ে ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে —

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি ন অন্যথা অস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শতবৎসর আয়ু কামনা করে তাকে একমাত্র কর্ম ক'রেই বাঁচতে হবে। নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত তার পক্ষে জীবনে অশুভের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার অন্য কোন উপায় নাই। এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে যে বেশীদিন বাঁচতে হলে মানুষকে অবশ্যই নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। নচেৎ জীবন কলুষতায় ভরে উঠবে।। ৩।।

যদা হি ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু # ন কর্মসু অনুষজ্যতে।
সর্বসঙ্কল্প-সন্ন্যাসী # যোগারূঢ়ঃ তদা উচ্যতে।।৪।।

যদা হি = যখনই; সর্বসঙ্কল্প = জড় জগতের বাসনা; সন্ন্যাসী = ত্যাগী; ইন্দ্রিয়ার্থেষু = ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা উপভোগ্য বিষয়; ন = না; অনুষজ্যতে = আসক্ত হন; কর্মসু = সকাম কর্মে; তদা = তখন; যোগারূঢ়ঃ = যোগে অবস্থিত; উচ্যতে = বলা হয়।।৪।।

অনুবাদ :- যখন যোগী জড় জগতের বাসনা মুক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা উপভোগ্য বিষয়সমূহের প্রতি এবং কর্মের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করেন তখন সেই সর্বসংকল্প সন্ন্যাসীকে যোগারূঢ় অর্থাৎ যোগে অবস্থিত বলা হয়।।৪।।

ব্যাখ্যা :- এখানে যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ 'সর্বসঙ্কল্প-সন্ন্যাসী' পদটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখন সর্বসঙ্কল্প এবং সন্ন্যাসী শব্দদুটির অর্থ জানা প্রয়োজন। মমতা, আসক্তি ও দ্বেষ সহকারে সাংসারিক বিষয়সমূহের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি সম্পর্কে যে চিন্তা করা হয় তাকে সংকল্প বলা হয়। আবার আনন্দগিরি বলেছেন সংকল্প হল 'শোভনধ্যাসঃ' অর্থাৎ যা প্রকৃতপক্ষে সুন্দর নয় তাকে সুন্দর মনে করা। যেমন অনিন্দ্যকান্তি চিরসুন্দর পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের রূপে মোহিত না হয়ে কেউ রক্ত-মাংসের সুন্দরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই হল সংকল্প। তাহলে সর্বসঙ্কল্প বলতে বোঝায় ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত প্রকার ভোগের কামনা। আবার সন্ন্যাস শব্দের অর্থ হল কাম্যকর্ম পরিত্যাগ। সুতরাং সর্বসঙ্কল্প-সন্ন্যাসী

শব্দের অর্থ হল ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত প্রকার ভোগের কামনাকে পরিত্যাগ। মনুসংহিতায় (২/৩) বলা হয়েছে যে সমস্ত কামনা উৎপন্ন হয় সংকল্প থেকে — "সঙ্কল্পমূলঃ কামো"। শঙ্করাচার্যের মতে সকল প্রকার কামনাকে ত্যাগ করতে পারলেই সমস্ত কর্মের ত্যাগও সিদ্ধ হয়ে যায়— "সর্বকামপরিত্যাগে চ সর্বকর্মসন্ন্যাসঃ সিদ্ধো ভবতি।" যোগী যখন একমাত্র আত্মাকে অনুভব করার স্বভাব অর্জন করার ফলে আত্মা ব্যতীত ইহলোক ও পরলোকে ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ করা যায় এমন কোন প্রকার বস্তুর প্রতি আসক্ত হন না এবং স্থির, অচঞ্চল চিত্তে একমাত্র পরমাত্মার চিন্তায় নিমগ্ন হন তখন তিনি যোগারূঢ় অবস্থা লাভ করেন। সেইজন্য যাঁরা যোগারূঢ় অবস্থা লাভ করতে চান তাঁদের পক্ষে প্রথমে বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় বিষয়ে আসক্ত না হওয়ার যে অনাসক্ত কর্মযোগ সেইটিরই অভ্যাস করে যেতে হবে। এই অভ্যাস একসময় সুফল দান করবে এবং তিনি অবশ্যই একসময় যোগারূঢ় অবস্থা লাভ করবেন।।৪।।

উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানং # ন আত্মানম্ অবসাদয়েৎ।
আত্মা এব হি আত্মনো বন্ধুঃ # আত্মা এব রিপুঃ আত্মনঃ।। ৫।।

আত্মনা = নিজের মনের দ্বারা, আত্মানং = আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে; উদ্ধরেৎ = উদ্ধার করতে হবে; আত্মানম্ = নিজেকে; ন অবসাদয়েৎ = নিম্নগামী করবে না; হি = নিশ্চিতভাবে; আত্মা এব = মনই; আত্মনঃ = তোমার; বন্ধুঃ = মিত্র; আত্মা এব = মনই; আত্মনঃ = তোমার; রিপুঃ = শত্রু।। ৫।।

অনুবাদ :- নিজের মনের দ্বারাই নিজের অন্তরাত্মাকে সংসারসমুদ্র থেকে উদ্ধার কর। মনকে এমনভাবে চালিত করবে না যাতে নিজের অন্তরাত্মার গতি নিম্নগামী হয়। মনই হল তোমার অন্তরাত্মার বন্ধু, মনই হল তোমার অন্তরাত্মার শত্রু।। ৫।।

ব্যাখ্যা :- শ্রীমদ্ভাগবত—মহাপুরাণে বলা হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে মনের ক্ষমতা আপরিসীম। জাগতিক মানুষ যে সমস্ত সুখ-দুঃখ লাভ করে তার কোনটিরই কারণ মানুষ, দেবতা, শরীর, গ্রহ এগুলি নয়। এর সমস্ত কারণই হল মন, সংসার চক্র মনের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে —

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুঃ
ন দেবতাঽঽত্মা গ্রহকর্মকালাঃ।

মনঃ পরং কারণমামনন্তি
সংসারচক্রং পরিবর্তয়েদ্ যৎ।।

শ্রীমদ্ভাগবত—মহাপুরাণ ১১/২৩/৪৩

এই মন যখন বিষয় থেকে দূরে গিয়ে চিত্তে সমাহিত হয় তখন যোগাবস্থা লাভ হয় —

"পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবত—মহাপুরাণ ১১/২৩/৪৬।

যোগীর এই অবস্থায় বিদ্যমানতাকে যোগারূঢ় অবস্থা বলা হয়।

বস্তুত মন হল এক বিচিত্র বস্তু। মনকে কল্পতরুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। কল্পতরুর নিচে দাঁড়িয়ে যেমন যে যা কামনা করে তার সবই সে লাভ করে তেমনই মনোরূপ কল্পতরুর নিচে দাঁড়িয়ে মানুষ যদি ভাবে যে সে ঈশ্বর দর্শন করতে চায় তাহলে অবশ্যই তার সেই বাসনা একদিন পূর্ণ হবে। আবার সে যদি কামনা করে যে সে বিষয়পাপে ডুবে যেতে চায় তাহলে সে নিশ্চিতভাবে মদ্যপান, জুয়াখেলা, পরদারগমন প্রভৃতি পাপে লিপ্ত হয়ে একদিন নরক পথগামী হবে। তাই মনই হল স্বর্গের সোপান, মনই হল নরকের দ্বার, মনই হল আত্মার উদ্ধারকারী আবার সেই মনই হল আত্মার হননকারী। কাজেই প্রকৃত মানুষের প্রয়োজন বিশুদ্ধ মন। সেইজন্য যজুর্বেদে শান্ত, সমাহিত, পবিত্র মনের প্রার্থনা করা হয়েছে — "তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু"।। ৫।।

বন্ধুঃ আত্মা আত্মনঃ তস্য # যেন আত্মা এব আত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনঃ তু শত্রুত্বে # বর্তেত আত্মা এব শত্রুবৎ।। ৬।।

যেন আত্মনা এব = যে আত্মা অর্থাৎ মনের দ্বারাই; আত্মা = মনকে; জিতঃ = জয় অর্থাৎ বশ করা হয়েছে; আত্মা = সেই মন; তস্য = তার; আত্মনঃ = মনের; অনাত্মনঃ = যে মনকে বশ করা যায় নি; তু = কিন্তু; আত্মা এব = সেই মনই; শত্রুবৎ = শত্রুর মত; শত্রুত্বে = শত্রুতায়; বর্তেত = রত থাকে।। ৬।।

অনুবাদ :- যে আত্মা অর্থাৎ মনের দ্বারা মনকে জয় অর্থাৎ বশ করা যায় সেই মনই তার মনের বন্ধু, কিন্তু যে মনকে বশে আনা যায় না সেই মনই শত্রুর মত আত্মার সঙ্গে শত্রুতা ক'রে যায়।।৬।।

ব্যাখ্যা :- শরীর, মন এবং ইন্দ্রিয় এদের সকলের নাম হল আত্মা। সাধারণত শরীর, মন এবং ইন্দ্রিয় বড়ই অবাধ্য। এদেরকে সহজে বশ করা যায় না। এগুলি হল এক একটি কামানের গোলাস্বরূপ। কামানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে সহজেই আত্মরক্ষার কাজে লাগানো যায়। কিন্তু নিয়ম মেনে ব্যবহার করতে না জানলে বিস্ফোরণ ঘটে গোলন্দাজেরই অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতে পারে। সেই রকম শরীর, মন এবং ইন্দ্রিয়কে বশে রাখতে পারলে মানুষের কল্যাণ হয় কিন্তু অবাধ্য শরীর, মন এবং ইন্দ্রিয় মানুষের জীবনে অশেষ দুঃখ ও কষ্ট বয়ে আনতে পারে। শরীর এবং ইন্দ্রিয় বিপথে যাওয়ার মূল কারণ হল অসংযত মন। সেইজন্য এই তিন বস্তুকে বশে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু এদেরকে বশে রাখার উপায় কি? একমাত্র সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গ ও উপদেশ, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের মাধ্যমেই এদেরকে বশে রাখা যেতে পারে। বিষ্ণুপুরাণে (৬/৭/২৮) বলা হয়েছে—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধস্য বিষয়াসঙ্গি মুক্তোর্নির্ব্বিষয়ং মনঃ।।

অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে মনই হল বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বা বন্ধনমুক্তির কারণ। মন যখন বিষয়ে আসক্ত হবে তখন সে বন্ধনের কারণ হবে এবং যখন বিষয়াসক্তি থেকে বিরত হবে তখন সে বন্ধনমুক্তির কারণ হবে।। ৬।।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য # পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু # তথা মান-অপমানয়োঃ।। ৭।।

জিতাত্মনঃ = যিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় অর্থাৎ সংযত করেছেন; প্রশান্তস্য = যার মন থেকে রাগ, হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতি রিপু দূর হওয়ার কারণে চিত্তে নিবিড় শান্তি বিরাজ করছে; পরমাত্মা = ভগবানে; শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখ তথা মান অপমানয়োঃ = শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখ-মান-অপমান সমস্ত বোধ; সমাহিতঃ = সমাহিত থাকে।।৭।।

অনুবাদ :- যিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় অর্থাৎ সংযত করেছেন, যার মন থেকে রাগ, হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতি রিপু দূর হওয়ার কারণে চিত্তে নিবিড় শান্তি

বিরাজ করছে তিনি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেছেন। শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখ-মান-অপমান প্রভৃতি কোন বোধ তাঁকে আর বিচলিত করতে পারে না অর্থাৎ তাঁর সমগ্র চেতনা জুড়ে কেবলমাত্র শ্রীভগবানের চিন্তাই বিরাজ করে, অন্য কোন বস্তুর প্রভাব তাঁর চিত্তকে আর বিচলিত করতে পারে না।।৭।।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্ত-আত্মা # কূটস্থো বিজিত-ইন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইতি উচ্যতে যোগী # সম-লোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ।। ৮।।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্ত-আত্মা = জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোক দ্বারা তৃপ্ত অর্থাৎ পূর্ণরূপে সমৃদ্ধ; আত্মা = অন্তর; কূটস্থঃ = অপরিবর্তনশীল; বিজিত-ইন্দ্রিয়ঃ = যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন; সম = সমান; লোষ্ট = মাটির খণ্ড বা ঢিল; অশ্ম = পাথর; কাঞ্চনঃ = সোনা; যুক্ত = ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত; ইতি উচ্যতে = বলা হয়।।৮।।

অনুবাদ :- যাঁর অন্তর জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোকে পূর্ণরূপে সমৃদ্ধ, যাঁর অন্তর অপরিবর্তনশীল, যিনি সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন, যিনি মাটির খণ্ড বা ঢিল, পাথর, সোনা সব কিছুকেই সমান জ্ঞান করেন সেই যোগী ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন বলা হয়।। ৮।।

ব্যাখ্যা :- (ক) আত্মা তো চির অপরিবর্তনশীল। আত্মার এই অপরিবর্তনশীলতাকে বোঝানোর জন্য শাস্ত্রে 'কূটস্থ' শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়। এই 'কূটস্থ' শব্দটির অর্থ সাধারণ পাঠকদের নিকট সুবোধ্য নয়। আমরা দেখি যে স্বর্ণকার বা কর্মকাররা একটি লোহার পিণ্ডের উপর সোনা বা লোহা রেখে তাকে হাতুড়ি দ্বারা সজোরে পেটায়। ঐ লৌহ পিণ্ডটিকে নেহাই বা কূট বলা হয়। তার উপর যতই হাতুড়ির আঘাত পড়ুক সেই নেহাই বা কূটের কোন পরিবর্তন হয় না। সেই রকম যে অবস্থায় আত্মজ্ঞানী পুরুষ পুনঃ পুনঃ দুঃখের সংস্পর্শে কোনরূপ বিচলিত হন না, তাঁর অন্তরে কোনরূপ বিকার উৎপন্ন হয় না, সর্বদা নিশ্চলভাবে পরমাত্মার মধ্যে অবস্থান করেন সেই অবস্থাকে 'কূটস্থ' বলা হয়।

(খ) যখন কোন পুরুষের অন্তরের তৃষ্ণা আত্মস্বরূপবিষয়ক জ্ঞান ও প্রকৃতি বিষয়ক বিজ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তখন তাঁর মনে আর কোন লৌকিক ও পারলৌকিক সুখভোগের বাসনা থাকে না। তখন তাঁর মনে হয় যে তাঁর আর অন্য কিছু পাওয়ার, ভোগ করার মত নেই, তাঁর

আর কিছু চায় না, তিনি তাঁর অন্তরে ঈশ্বরের মত পরশমণির অনুভব লাভ করেছেন যে পরশমণির স্পর্শে তাঁর অন্তরের সমস্ত লোহা সোনায় পরিণত হয়েছে, বাহ্যিক সম্পদ তাঁর কাছে মূল্যহীন, সমগ্র অন্তর জুড়ে তখন নিবিড় আনন্দ, নিবিড় প্রশান্তি বিরাজ করছে, তখনই তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যান।। ৮।।

সুহৃৎ-মিত্র-অরি-উদাসীন্ # মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু।
সাধুষু অপি চ পাপেষু # সমবুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে।।৯।।

সুহৃৎ = শুভাকাঙ্ক্ষী; মিত্র = বন্ধু; অরি = শত্রু; উদাসীন্ = নিরপেক্ষ অর্থাৎ যিনি কোন পক্ষেই থাকেন না; মধ্যস্থ = যিনি বিবদমান উভয়পক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী; দ্বেষ্য = বিদ্বেষী; বন্ধুষু = স্বজন; সাধুষু = সাধুতে; অপি = ও; পাপেষু = পাপীর প্রতি; চ = এবং; সমবুদ্ধিঃ = সকলকে সমানভাবে দেখেন অর্থাৎ কারও মধ্যে ভেদাভেদ করেন না; বিশিষ্যতে = শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হন।।৯।।

অনুবাদ :- যিনি শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু, শত্রু, উদাসীন (অর্থাৎ নিরপেক্ষ অর্থাৎ যিনি কোন পক্ষেই থাকেন না), মধ্যস্থ (অর্থাৎ যিনি বিবদমান উভয়পক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী), বিদ্বেষী, স্বজন, সাধু এবং পাপী সকলের প্রতি সমবুদ্ধি অর্থাৎ সকলকে সমানভাবে দেখেন, কারও মধ্যে ভেদাভেদ করেন না তিনিই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হন।। ৯।।

যোগী যুঞ্জীত সততম্ # আত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যত-চিত্ত-আত্মা # নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ।। ১০।।

রহসি = নির্জন স্থানে; একাকী = একা; স্থিতঃ = অবস্থান ক'রে; যত = সংযত; চিত্ত-আত্মা = মন-বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ; নিরাশীঃ = বাসনাশূন্য হয়ে; অপরিগ্রহঃ = পরিজন শূন্য; সততম্ = সর্বদা; আত্মানং = নিজের আত্মাকে; যুঞ্জীত = পরমেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত রাখেন।। ১০।।

অনুবাদ :- যোগী নির্জন স্থানে একাকী অবস্থান ক'রে মন-বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণকে সংযত ক'রে, অন্তর থেকে সমস্ত বাসনা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ ক'রে সর্বদা নিজের আত্মাকে পরমেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে মনকে সমাধিযুক্ত করবেন।।১০।।

ব্যাখ্যা :- যোগী মনকে কিভাবে সমাধিযুক্ত করবেন সে বিষয়ে বলতে গিয়ে ভগবান্ বলছেন যে তাঁকে কোন নির্জন স্থানে অর্থাৎ অরণ্য, পর্বত, গুহা প্রভৃতিতে গিয়ে একাকী অর্থাৎ কাউকে সঙ্গে না নিয়ে, নিরাশী অর্থাৎ লৌকিক ও পারলৌকিক জগতের কোন ভোগ্য বিষয়ের প্রতি মনে কোন রকম আকাঙ্ক্ষা না রেখে অপরিগ্রহ অর্থাৎ পরিজন শূন্য অবস্থায় পরমেশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হতে হবে। পরমেশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হতে হলে চিত্তের সম্পূর্ণ একাগ্রতা একান্ত প্রয়োজন। যতই লোক-জনের মাঝে থাকা যাবে ততই চিত্তের একাগ্রতা বিঘ্নিত হবে। ফলে ঈশ্বরের ধ্যানে লীন হয়ে যাওয়ার পথে বিঘ্ন ঘটবে। সেইজন্য যোগীর একাকী নির্জন স্থানে বাস প্রয়োজন। এখন অপরিগ্রহ শব্দের অর্থ বোঝা প্রয়োজন। 'অ' নঞর্থক অর্থ বহন করে যেমন—অযোগ্য—যে যোগ্য নয়। তেমনি 'অপরিগ্রহঃ' পদের অর্থ হল পরিগ্রহ নয় অর্থাৎ পরিগ্রহ ত্যাগ। এখন পরিগ্রহ শব্দের অর্থ কি তা জানা প্রয়োজন। পরিগ্রহঃ = পরিতঃ গ্রহ। পরিত শব্দের অর্থ হল চারিদিকে এবং গ্রহ শব্দের অর্থ হল যাকে আঁকড়ে ধরা যায়। গৃহস্থের পক্ষে এই পরিগ্রহ হল স্ত্রী, সন্তান, পরিবার, ধন, সম্পদ প্রভৃতি এবং ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী বা সন্ন্যাসীর পক্ষে এই পরিগ্রহ হল শাস্ত্রপ্রতিকূল বিষয়সমূহ। সেইজন্য ভগবান্ বলেছেন যে যোগীর পক্ষে স্ত্রী, সন্তান, পরিবার, ধন, সম্পদ প্রভৃতি এবং ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী বা সন্ন্যাসীর পক্ষে শাস্ত্রপ্রতিকূল বিষয়সমূহ সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। তা না হলে তাঁর পক্ষে অনন্যচিত্তে ঈশ্বরচিন্তায় বা তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকা সম্ভব হবে না।।১০।।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য # স্থিরম্ আসনম্ আত্মনঃ।
ন অতি উচ্ছ্রিতং ন অতি নীচং # চৈল-অজিন-কুশ-উত্তরম্।।১১।।
তত্র একাগ্রং মনঃ কৃত্বা # যত-চিত্ত-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্য আসনে যুঞ্জাৎ # যোগম্ আত্ম-বিশুদ্ধয়ে।।১২।।

শুচৌ = পবিত্র; দেশে = স্থানে; স্থিরম্ = স্থিরভাবে; ন = নয়; অতি = খুব বেশী; উচ্ছ্রিতং = উঁচু; নীচং = নিচু; চৈল = বস্ত্র নির্মিত; অজিন = হরিণের চামড়া; কুশ = কুশঘাস; উত্তরম্ = পরে; প্রতিষ্ঠাপ্য = স্থাপন ক'রে; আত্মনঃ = নিজের; আসনম্ = আসন; তত্র আসনে; উপবিশ্য = উপবেশন ক'রে; যত = সংযত; চিত্ত = মন; ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ = ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া কলাপ; মনঃ = চিত্ত;

একাগ্রং = একাগ্র; কৃত্বা = ক'রে; আত্ম = অন্তরকে; বিশুদ্ধয়ে = শুদ্ধির জন্য; যোগং = যোগে; যুঞ্জাৎ = যুক্ত হবে।। ১১-১২।।

অনুবাদ :- পবিত্র এবং খুব উঁচুও নয় আবার খুব নিচুও নয় এমন স্থানে দৃঢ়ভাবে আসন স্থাপন ক'রে তার উপর প্রথমে বস্ত্র খণ্ড ও তার উপরে হরিণের চামড়া এবং তার উপরে কুশ বিছিয়ে তার উপরে ব'সে মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপ সমূহকে সংযত রেখে চিত্তশুদ্ধির জন্য একমনে যোগের অভ্যাস করতে হবে।। ১১-১২।।

সমং কায়-শিরঃ গ্রীবং # ধারয়ন্ অচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকা-অগ্রং স্বং # দিশশ্চ-অনবলোকয়ন্।।১৩।।

(এটি যুগ্ম শ্লোক হওয়ার কারণে পরবর্তী শ্লোক থেকে 'আসীত = বসতে হবে' পদটি গ্রহণ ক'রে এই শ্লোকের অর্থ সম্পূর্ণ করা হবে)

ধারয়ন্ = ধারণ ক'রে; সংপ্রেক্ষ্য = দৃষ্টি রেখে; দিশশ্চ অনবলোকয়ন্ = কোন দিকে লক্ষ্য না রেখে।।১৩।।

অনুবাদ :- মেরুদণ্ড, মাথা ও ঘাড় সোজা রেখে নাকের অগ্রভাগে (ডগায়) দৃষ্টি রেখে অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে স্থিরভাবে (আসনে) বসতে হবে।।১৩।।

প্রশান্ত-আত্মা বিগতভীঃ # ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো # যুক্ত আসীত মৎপরঃ।। ১৪।।

বিগতভীঃ = ভয়রহিত; মচ্চিত্তঃ, যুক্তঃ = আমার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে; মৎপরঃ = আমাতে সমর্পিত চিত্ত।। ১৪।।

অনুবাদ :- প্রশান্তচিত্ত, ভয়রহিত, ব্রহ্মচারিব্রত পালনকারী ব্যক্তি সংযত মনে সাবধানতার সহিত আমার প্রতি মনঃপ্রাণ সমর্পণ ক'রে (আসনে) বসবেন।। ১৪।।

ব্যাখ্যা :- এখানে ভগবান্ একজন যোগীর ধ্যানে বসার জন্য চিত্তের প্রশান্তি, ভয়হীনতা ও ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। বাস্তবিকপক্ষে একজন যোগীর চিত্ত যদি লৌকিক ভোগ্যবস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ থাকে তাহলে নিয়ত মন বিভিন্ন কারণে বিচলিত ও চঞ্চল থাকবে। তাহলে তাঁর পক্ষে একাগ্রচিত্তে তাঁর মনঃপ্রাণ পরমেশ্বরে সমর্পণ করা সম্ভব হবে না।

ফলে তাঁর পক্ষে যোগারূঢ় অবস্থাও লাভ করা সম্ভব হবে না। আবার অন্তরে ভীতির উপস্থিতিও অনন্যচিত্তে ঈশ্বরে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করার পথে অন্তরায়। কিন্তু সে ভয় কি রকম? বস্তুত সংসারী মানুষের প্রতি পদক্ষেপে বিভিন্ন প্রকারের ভয় তাঁর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাকে তাড়া করে। ভর্তৃহরি মানুষের জীবনে কত প্রকার ভয় থাকে তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর বৈরাগ্যশতক গ্রন্থে—

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মৌনে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্।

শাস্ত্রে বাদভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ম্
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।।

—বৈরাগ্যশতক - ১১৬

অর্থাৎ ভোগবিলাসে রোগের ভয়, সৎকুলে বংশপরম্পরা নষ্ট হওয়ার ভয়, সম্পদে রাজার ভয়, মৌনধারণে দীনতার ভয়, বীরত্বে শত্রুর ভয়, সুন্দরতায় জরাগ্রস্ত হওয়ার ভয়, শাস্ত্রজ্ঞানে বাদভয়, গুণে দুর্জনের ভয়, শরীরে মৃত্যুভয়, এই পৃথিবীতে আরও অন্যান্য বস্তু আরও বিভিন্ন প্রকারের ভয়ের কারণ। কিন্তু একমাত্র বৈরাগ্যের কোন ভয় নাই।

তাহলে জীবনের পদে পদে এত প্রকারের ভয়কে সঙ্গী ক'রে মানুষ কিভাবে শান্তচিত্তে ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হবে। প্রতি মুহূর্তেই তো তার চিত্তকে চঞ্চল, বিচলিত ক'রে তুলবে! ভর্তৃহরি এর একটা সমাধান ব'লে দিয়েছেন—'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্' অর্থাৎ এই সমস্ত ভয়ের হাত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল লৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত বস্তুর উপরে তাঁর অন্তরের বৈরাগ্য যা তাঁকে জগতের সমস্ত প্রকারের ভয় থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং এই সমস্ত ভয় থেকে মুক্তি মানেই হল অন্তরে প্রশান্তি লাভ যা একজন যোগীর একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্যই ভগবান্ অর্জুনকে সর্বপ্রকার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন ক'রে তাঁর কর্তব্যকর্ম পালন করার উপদেশ দিয়েছেন।

আবার ভগবান্ এখানে যোগীকে ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত হওয়ার উপদেশও দিয়েছেন। ব্রহ্মচারিব্রত শব্দের অর্থ সম্যকভাবে জানা প্রয়োজন। ব্রহ্মচারীর আদর্শ

আচরণবিধি কি সে সম্পর্কে অত্রি সংহিতায় বলা হয়েছে-

স্মরণং কীর্তনং কেলীঃ প্রেক্ষণং গৃহ্যভাষণম্
সংকল্পো অধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবশ্চ।।

অর্থাৎ ব্রহ্মচারীকে কোন সুন্দরী নারীকে স্মরণ করা, তার কীর্তন করা, তার সঙ্গে হাস্য কৌতুক করা, তাকে শকুনির দৃষ্টিতে দেখা, গোপনে কথাবার্তা বলা, তাকে পাবার জন্য সংকল্প ও চেষ্টা করা, মৈথুন করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে। এই হল ব্রহ্মচারী ব্রত।

এইভাবে মনের ভীতি সৃষ্টি হওয়ার সমস্ত কারণকে পরিত্যাগ ক'রে ব্রহ্মচারিব্রতে স্থির হয়ে অনন্যচিত্তে পরমেশ্বরের ধ্যান করলে তার মনের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত জড়তা, অন্ধকার দূর হয়ে অন্তরে সত্যের আলো জ্বলে উঠবে।। ১৪।।

যুঞ্জন্ এবং সদা-আত্মানং # যোগী নিয়ত-মানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং # মৎসংস্থাম্ অধিগচ্ছতি।।১৫।।

যুঞ্জন্ = যুক্ত হয়ে; এবং = এই প্রকারে; নিয়ত-মানস = সংযতচিত্ত; শান্তিং নির্বাণপরমাং = নির্বাণ অর্থাৎ মোক্ষ অপেক্ষাও অধিক শান্তি; মৎসংস্থাম্ = আমার মধ্যে অবস্থিত; অধিগচ্ছতি = লাভ করবে।

অনুবাদ :- এইভাবে আমার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে সংযতচিত্ত যোগী আমার মধ্যে অবস্থিত নির্বাণ অর্থাৎ মোক্ষ অপেক্ষাও অধিক শান্তি লাভ করবে।।১৫।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ভগবান্ সংযতচিত্ত যোগীর 'নির্বাণপরমাং' অর্থাৎ নির্বাণ লাভের চাইতেও অধিকতর শান্তিলাভের কথা বলেছেন। অনেকে 'শান্তিং নির্বাণপরমাং' পদের অর্থ করেছেন নির্বাণরূপ পরম শান্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'নির্বাণপরমাং' পদের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন—"মোক্ষাবধিকমিতি" অর্থাৎ মোক্ষেরও অধিক। কিন্তু ভগবান্ এখানে 'নির্বাণপরমাং' শান্তি বলতে এমন শান্তির কথা বলেছেন যা মোক্ষেরও উপরে। কিন্তু মোক্ষ তো হল চিরশান্তি। এখানে নাই কোন জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ, বেদনা, তাপ, আবার পুনর্জন্ম, আবার জীবন নামক নরক যন্ত্রণা ভোগ করার ভয়। তাহলে এর অপেক্ষাও অধিক শান্তি আছে কি? উত্তর হল আছে। কোন ক্ষুধার্ত জননী যখন অনেক কষ্টে কোন খাদ্য যোগাড় করতে

পারেন তখন তিনি সেই খাদ্য গ্রহণ ক'রে পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ ক'রে থাকেন। কিন্তু সেই জননী যখন সেই খাদ্য তাঁর ক্ষুধার্ত সন্তানের মুখে তুলে দিতে পারেন তখন তাঁর যে শান্তি লাভ হয় তা সকল শান্তির ঊর্ধ্বে। তদ্রূপ ভগবান্ বলছেন যে মোক্ষপ্রাপ্তির মাধ্যমে যে শান্তি লাভ করা যায় সেই শান্তিই শেষ নয়। এর উপরেও আছে আর এক শান্তি যা কেবল পাওয়া যায় পরমেশ্বরের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণের মাধ্যমে। এ শান্তি মোক্ষেরও অধিক। কিন্তু কি সেই শান্তি? ভগবান্ শ্রীমদ্ভবদ্গীতায় পঞ্চম, নবম ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই শান্তি তিন প্রকারের ব'লে উল্লেখ করেছেন যথা নৈষ্ঠিকী শান্তি (৫/১২), শাশ্বতী শান্তি (৯/৩১ ও পরা শান্তি (১৮/৬২)।

'নৈষ্ঠিকী' শব্দের অর্থ হল 'নিষ্ঠা থেকে উৎপন্ন'। সুতরাং কর্মযোগনিষ্ঠ যোগী তাঁর কর্মযোগে নিষ্ঠার ফলস্বরূপ যখন পরমেশ্বরকে লাভ করেন তখন তাঁর মনে যে অপার শান্তির উদয় হয় তাকে 'নৈষ্ঠিকী' শান্তি বলা হয়। ভগবদ্প্রাপ্তির ফলস্বরূপ যে পরম শান্তি যোগীর অন্তরে সদা অচল, অনড়, অক্ষয়রূপে বিরাজ করে তাকে শাশ্বতী শান্তি বলা হয়। আবার ভক্ত ভগবানকে সর্বব্যাপী জ্ঞান ক'রে অন্তর থেকে সমস্ত আসক্তি, কর্তৃত্বাভিমান, কামনা, বাসনা ত্যাগ ক'রে ভগবানের ইচ্ছানুসারে নিজের কর্ম দ্বারা সর্বজীবে পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ ক'রে তাদের সেবা ক'রে, যা কিছু সুখ-দুঃখ তার সমস্তই সেই পরমেশ্বরেরই দান মনে ক'রে সর্বদা সন্তুষ্ট থেকে, ভগবানের নিকট কোন কিছু পাওয়ার ব্যাপারে কখনও মনে অসন্তুষ্ট না হয়ে, মনের সমস্ত মান-অভিমান ত্যাগ ক'রে একমাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত আর কোন কিছুর প্রতি আসক্ত না হয়ে শ্রীভগবানের প্রতি পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁরই নাম, গান, লীলা, মাহাত্ম্য, স্বরূপ, তত্ত্ব প্রভৃতির কীর্তন, শ্রবণ, চিন্তন, কথন ইত্যাদির মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই শরণাগত হলে পরম করুণাময়, পরম দয়ালু সচ্চিদানন্দ ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের প্রতি অনন্ত করুণাবারি বর্ষণ করেন যার দ্বারা ভক্তের সমস্ত দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা চিরতরে দূর হয়ে ভক্তের অন্তরে চির অক্ষয় শান্তি লাভ হয়। এই শান্তিকেই পরা শান্তি বলা হয়। এই তিনপ্রকার শান্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে নিরন্তর স্থিরভাবে অবস্থান করে। ধ্যানযোগের সিদ্ধ সাধক ভগবানের নিকট থেকে এই তিন প্রকার শান্তিই লাভ ক'রে থাকেন।।১৫।।

ন অতি-অশ্নতঃ তু যোগঃ অস্তি # ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ।
ন চ অতি স্বপ্নশীলস্য # জাগ্রতো ন এব চ অর্জুন।।১৬।।

অতি-অশ্নতঃ = অতি ভোজনকারী; অনশ্নতঃ = অনাহারী; স্বপ্নশীলস্য = অতিশয় ঘুমকাতুরে।।১৬।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! যিনি অতিরিক্ত ভোজনে আসক্ত বা যিনি একেবারে আহার করেন না, যিনি অতি নিদ্রায় আসক্ত বা যিনি একেবারেই নিদ্রা যান না তাঁদের কারোরই পক্ষে যোগসমাধি লাভ করা সম্ভব হয় না।।১৬।।

যুক্ত-আহার-বিহারস্য # যুক্ত-চেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্ত-স্বপ্ন-অববোধস্য # যোগো ভবতি দুঃখহা।।১৭।।

যুক্ত = পরিমিত; চেষ্টস্য = কর্মের; অববোধস্য = জাগরণকারীর; ভবতি = হয়; দুঃখহা = দুঃখহরণকারী।। ১৭।।

অনুবাদ :- যে যোগী পরিমিত আহার-বিহার, নিদ্রা, কর্ম প্রচেষ্টা জাগরণে অভ্যস্ত, যোগ তাঁর ক্লেশ হরণ করে।। ১৭।।

যদা বিনিয়তং চিত্তম্ # আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো # যুক্ত ইতি উচ্যতে তদা।।১৮।।

নিঃস্পৃহ = স্পৃহাহীন; সর্বকামেভ্যঃ = সকল বাসনা থেকে; বিনিয়তং = বিশেষভাবে সংযত; অবতিষ্ঠতে = অবস্থান করে।। ১৭।।

অনুবাদ :- যখন কোন যোগী তাঁর চিত্তকে বিশেষভাবে সংযত ক'রে এবং মন থেকে সকল কামনা-বাসনা দূর ক'রে নিষ্পৃহ হয়ে আত্মাতেই অবস্থান করেন তখন তাঁকে যোগযুক্ত বলা হয়।।১৮।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ভগবান্ যোগীকে সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু থেকে নিঃস্পৃহ হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে মনের ময়লা দূর না হলে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎলাভ সম্ভব নয়। শরীরের ময়লা তো স্নানাদির দ্বারা দূর করা যায়। কিন্তু মনের ময়লাই বা কি এবং তাকে কিভাবেই বা দূর করা যায়? বিষয়ের প্রতি মনের কামনা, বাসনা, আসক্তি, বৈরিতা প্রভৃতি হল মনের ময়লা। মায়াবদ্ধ জীব প্রকৃতিগত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের অমোঘ দুর্বার প্রভাবে স্বভাব বশতই

প্রতিনিয়ত বিষয়বিষে আসক্ত হয়। মৌমাছি যেমন পাত্রে রক্ষিত মধুর উপরে বসলে নিজের মধুতেই আটকে গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, জীবও তেমনি তার নিজের তৈরী বিষয়বিষে বদ্ধ হয়ে নরক পথগামী হয়। তথাপি বিষয়ভোগের প্রতি লালসা তার চিত্তকে কিছুতেই নির্মল হতে দেয় না। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে যোগীর প্রয়োজন নিরন্তর পরমেশ্বরের মধ্যে স্থিত হওয়ার প্রয়াস। এইভাবে নিরন্তর প্রয়াসের ফলস্বরূপ যখন যোগী অন্তরে ভগবানের উপস্থিতির অনুভূতির কারণে অন্তরে অপার শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করেন তখন তিনি সমস্ত লৌকিক ও পারলৌকিক অনিত্য, নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য অনুভব করেন, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি আসক্তি তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। এইভাবে সংসারের সমস্ত ভোগ্যবস্তুর প্রতি বাসনারূপ মনের ময়লা তাঁর মন থেকে দূর হয়ে যায়। তখন তিনি চিত্তের নিঃস্পৃহতা লাভ করেছেন বলা যায়।

এই উপদেশ যে ভগবান্ কেবলমাত্র যোগীদেরই দিয়েছেন তাই নয়, তিনি এই উপদেশ জগতের সমগ্র মানবকুলের উদ্দেশ্যেই দিয়েছেন।।১৮।।

যথা দীপো নিবাতস্থো # ন ইঙ্গতে সা উপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য # যুঞ্জতো যোগম্ আত্মনঃ।।১৯।।

নিবাতস্থঃ = গতিহীন বায়ুযুক্ত স্থানে; ন ইঙ্গতে = আন্দোলিত হয় না; যতচিত্তস্য = সংযত চিত্তের; যোগম্ যুঞ্জতঃ = যোগের সঙ্গে যুক্ত।।১৯।।

অনুবাদ :- যোগযুক্ত সাধকের চিত্তের সঙ্গে গতিহীন বায়ুযুক্ত স্থানে অবস্থিত দীপের তুলনা করা যায়। গতিহীন বায়ুযুক্ত স্থানে যেমন দীপের শিখা আন্দোলিত হয় না, তেমনি পরমাত্মার ধ্যানে যুক্ত যোগীর চিত্তেও কোনপ্রকার চঞ্চলতা দেখা যায় না।।১৯।।

যত্র উপরমতে চিত্তং # নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চ এব আত্মনা আত্মানং # পশ্যন্ আত্মনি তুষ্যতি।।২০।।

যত্র = যে অবস্থায়; উপরমতে = সংসারের প্রতি আসক্তি শূন্য হয়; নিরুদ্ধং = সংযত; যোগসেবয়া = যোগের সেবা অর্থাৎ অভ্যাসদ্বারা; তুষ্যতি = তুষ্ট করে।। ২০।।

অনুবাদ :- এই যোগযুক্ত অবস্থায় যোগ অভ্যাসের সাহায্যে চিত্ত সংযত হয়ে সংসারের প্রতি আসক্তিশূন্য হয় এবং যোগী আত্মা অর্থাৎ মনের দ্বারা আত্মাতেই আত্মাকে দেখতে দেখতে পরম আত্মতুষ্টি লাভ করেন।।২০।।

ব্যাখ্যা :- মানুষ কখন আত্মতুষ্টি অনুভব করে? এর উত্তরে বলা যায় যে যখন মানুষ তার জীবনের পরম ঈপ্সিত বস্তুটি লাভ করে তখনই সে পরম আত্মতুষ্টি বোধ করে। এই অবস্থায় তার মনে আর অন্য কোনকিছুর প্রতি আগ্রহ থাকে না, তার আর কোনকিছুর অভাব থাকে না। সে তখন নিবিষ্টচিত্তে সেই পরম ঈপ্সিত বস্তুটির স্পর্শে বাহ্য বিষয়ের উপস্থিতির কথা ভুলে যায়। তার মনে আর কোন দুঃখ, অভাব প্রভৃতির বোধ থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে দেবতার মন্দিরকে আমাদের শরীরের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আমাদের শরীরের মধ্যে যেমন বাস করেন জীবাত্মা, তেমনই মন্দিরের মধ্যে বাস করেন ভগবানের বিগ্রহরূপী ঈশ্বর। সেই বিগ্রহের মধ্যে যখন যোগযুক্ত ভক্ত পরমাত্মাকে দর্শন করেন তখন তাঁর সমস্ত আত্মা অর্থাৎ অন্তর আনন্দে পরিপ্লাবিত হয়ে ওঠে এবং সমস্ত বিশ্বজগতের আর সবকিছু তাঁর চেতনা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে যায়। তখন আর কোন দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ থাকে না, তিনি এক নিবিড় ভাবসমাধির মধ্যে অবস্থান করেন, তাঁর কোথায় শোক, কোথায় দুঃখ! তাঁর সমগ্র চেতনা জুড়ে তখন অবস্থান করেন সেই বিগ্রহের অভ্যন্তরে বিরাজমান ঈশ্বর। যেমন মীরাবাঈ। ভক্তের এই অবস্থাকে খুব সুন্দরভাবে ঈশাবাস্যোপনিষদের সপ্তম মন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে —

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিভাজতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।।

অর্থাৎ যোগযুক্ত যোগী যখন সর্বজীবে পরমাত্মাকে দর্শন করেন তখন তার আর কোন মোহ, শোক কিছুই থাকে না।।২০।।

সুখম্ আত্যন্তিকং যৎ তৎ # বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চ এব অয়ং # স্থিতঃ চলতি তত্ত্বতঃ।।২১।।

সুখম্ আত্যন্তিকং = পরম সুখ; বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ = বুদ্ধিদ্বারা যা জানা যায়; অতীন্দ্রিয়ম্ = যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূত হয় না; বেত্তি = অনুভব করেন; যত্র = যে অবস্থায়; চলতি = বিচলিত হন না।।২১।।

অনুবাদ :- এই অবস্থায় যোগী কেবলমাত্র শুদ্ধ মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অতীত পরম সুখ অনুভব করেন এবং সেই অবস্থায় অবস্থান করতে করতে তিনি অপর কোন সুখলাভের আশায় সেই অবস্থা থেকে ভ্রষ্ট হন না।।২১।।

যং লব্ধ্বা চ অপরং লাভং # মন্যতে ন অধিকং ততঃ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন # গুরুণা অপি বিচাল্যতে।।২২।।

যং লব্ধ্বা = যা লাভ ক'রে; মন্যতে = মনে করেন; যস্মিন্ স্থিতঃ = যার মধ্যে অবস্থান ক'রে; গুরুণা = চরম; ন বিচাল্যতে = বিচলিত হন না।।২২।।

অনুবাদ :- এই অবস্থা লাভ ক'রে যোগী তার চাইতেও অপর কোন অধিক ভাল অবস্থা আছে ব'লে ভাবেন না এবং এই অবস্থায় থেকে তিনি সকল প্রকারের চরম দুঃখেও অবিচল থাকেন।।২২।।

তং বিদ্যাৎ দুঃখ-সংযোগ # বিয়োগং যোগ-সংজ্ঞিতম্।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো # যোগো অনির্বিণ্ণ-চেতসা।।২৩।।

বিদ্যাৎ = জানবে; দুঃখ-সংযোগং = দুঃখের সঙ্গে সংযোগ; বিয়োগং = হীনতা;যোগ-সংজ্ঞিতম্ = যোগ হিসাবে; নিশ্চয়েন = দৃঢ় চিত্তে; যোক্তব্যঃ = এই যোগ অভ্যাস করা উচিত; অনির্বিণ্ণ = ভয়, দুঃখ, শোক প্রভৃতি বিষয়ে উদাসীন; চেতসা = মনে।

অনুবাদ :- এইরূপ অবস্থায় শোক, দুঃখ প্রভৃতির সঙ্গে কোন সংযোগ বা অন্তরে এদের কোন বোধ থাকে না। এইরূপ অবস্থাকেই যোগ ব'লে জানবে। ভয়, দুঃখ, শোক প্রভৃতি বিষয়ে উদাসীন হয়ে আনন্দিত মনে দৃঢ়চিত্তে এই যোগ পালন করা উচিত।।২৩।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ব্যবহৃত 'দুঃখ' পদটির গূঢ়ার্থ সম্পর্কে শ্রীধরাচার্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ মত দিয়েছেন— "দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতত্বাদ্ বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে।" অর্থাৎ দুঃখ শব্দের দ্বারা বৈষয়িক সুখকেও গ্রহণ করতে হবে কারণ বৈষয়িক সুখ পরিণামে দুঃখেরই কারণ ঘটে। পার্থিব জগতে এমন কোন মানুষ পাওয়া যাবে না যে কখনও আধ্যাত্মিক বা দৈহিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক কোন প্রকার দুঃখের কবলে পড়েনি। যেমন কোন মানুষের হয়ত অনেক ধন আছে

কিন্তু তার একটি অঙ্গ পঙ্গু, বা তার কোন সন্তান দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে ইত্যাদি। ভগবান্ বলছেন যে যোগের কাজ হল এই সমস্ত দুঃখ থেকে মানুষকে বিযুক্ত করা অর্থাৎ মুক্তি দান করা। এ সংসার দুঃখের আগার। মানুষের সেই দুঃখের হাত থেকে মুক্তি না হলে তার শান্তি আসবে কোথায় থেকে? সেইজন্য ভগবান্ সকলকে যোগ অভ্যাস করার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন যে দৃঢ় ও প্রসন্ন চিত্তে, মন থেকে সকল সংশয়, ভয়, দুঃখ, শোক প্রভৃতি সম্পূর্ণ দূর ক'রে এই যোগ আচরণ করতে হবে কারণ মানুষের রিপুস্বরূপ চিত্তের এই সমস্ত বিষয় চিত্তকে দুর্বল ক'রে তোলে এবং দুর্বলচিত্ত মানুষের পক্ষে যোগে সিদ্ধিলাভ ক'রে পরমাত্মাকে লাভ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য মুণ্ডকোপনিষদে (৩।২।৪) বলা হয়েছে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো"।। ২৩।।

সংকল্প-প্রভবান্ কামান্ # ত্যক্ত্বা সর্বান্ অশেষতঃ।
মনসা এব ইন্দ্রিয়গ্রামং # বিনিয়ম্য সমন্ততঃ।।২৪।।

(এইটি একটি যুগ্ম শ্লোক হওয়ার কারণে শ্লোকটির অর্থ সম্পূর্ণ করার জন্য পরবর্তী শ্লোকটি থেকে 'কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ = অন্য কিছু চিন্তা করবে না' অংশটি গ্রহণ করা হবে)।

সংকল্প-প্রভবান্ = সংকল্প থেকে উৎপন্ন; ত্যক্ত্বা = পরিত্যাগ ক'রে; অশেষতঃ = সম্পূর্ণরূপে; মনসা এব = মনের দ্বারাই; বিনিয়ম্য = ইন্দ্রিয়সমূহকে নিবৃত্ত ক'রে; সমন্ততঃ = সমস্ত বিষয় থেকে।।২৪।।

অনুবাদ :- সংকল্প থেকে উৎপন্ন সর্ব প্রকার কামনাসমূহকে সম্পূর্ণরূপে মনের দ্বারাই পরিত্যাগ ক'রে ইন্দ্রিয়সমূহকে সমস্ত বিষয় থেকে নিবৃত্ত ক'রে (আর অন্য কিছু চিন্তা করবে না)।।২৪।।

শনৈঃ শনৈঃ উপরমেদ্ # বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা # ন কিঞ্চিৎ অপি চিন্তয়েৎ।। ২৫।।

শনৈঃ শনৈঃ = ধীরে ধীরে; উপরমেৎ = সংসারের প্রতি আসক্তি শূন্য হবে; ধৃতিগৃহীতয়া = ধৈর্য গ্রহণের দ্বারা; আত্মসংস্থং = চিত্তকে আত্মাতে স্থাপন; কৃত্বা = ক'রে; কিঞ্চিৎ অপি ন চিন্তয়েৎ = অন্য কোন কিছুর চিন্তা করবে না।। ২৫।।

অনুবাদ :- এভাবে ধীরে ধীরে সংসারের প্রতি আসক্তি শূন্য হবে এবং ধৈর্য ধরে চিত্তকে আত্মাতে স্থাপন ক'রে আর অন্য কোন কিছুর চিন্তা করবে না।। ২৫।।

যতো যতো নিশ্চরতি # মনঃ চঞ্চলম্ অস্থিরম্।

ততস্ততো নিয়ম্য এতৎ # আত্মনি এব বশং নয়েৎ।। ২৬।।

যতঃ যতঃ = যে যে বিষয়ের প্রতি; নিশ্চরতি = ধাবিত হয়; ততঃ ততঃ = সেই সেই বিষয় থেকে; আত্মনি এব = আত্মারই; বশং নয়েৎ = বশে আনতে হবে।। ২৬।।

অনুবাদ :- মন স্বভাবতই চঞ্চল ও অস্থির। মন বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের প্রতি ধাবিত হবে। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ধাবিত সেই মনকে সেখান থেকে সরিয়ে এনে তাকে আত্মারই বশে আনতে হবে।। ২৬।।

প্রশান্ত-মনসং হি এনং # যোগিনং সুখম্ উত্তমম্।

উপৈতি শান্তরজসং # ব্রহ্মভূতম্ অকল্মষম্।।২৭।।

প্রশান্তমনসং = প্রশান্তচিত্ত; এনং = এই; উপৈতি = আশ্রয় করে; শান্তরজসং = রজোগুণ শূন্য; ব্রহ্মভূতম্ = ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত; অকল্মষম্ = পাপমুক্ত।। ২৭।।

অনুবাদ :- এইভাবে অভ্যাসের ফলে যোগীর মন আসক্তি, স্পৃহা, লোভ, তৃষ্ণা প্রভৃতি রজোগুণের অবসানের কারণে প্রশান্ত ও নিষ্পাপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তখন তিনি ব্রহ্মভাব অবস্থা লাভ ক'রে পরম সুখ ভোগ করেন।।২৭।।

যুঞ্জন্ এবং সদা আত্মানং # যোগী বিগতকল্মষঃ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ # অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে।। ২৮।।

যুঞ্জন্ = যুক্ত করতে করতে; বিগতকল্মষ = পাপরহিত; অশ্নুতে = লাভ করেন।। ২৮।।

অনুবাদ :- এইভাবে মনকে যোগের সঙ্গে যুক্ত করতে করতে একসময় যোগী সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধার পান এবং ক্রমে অন্তরে ব্রহ্মের স্পর্শ অর্থাৎ উপস্থিতি অনুভব করেন এবং পরম সুখ লাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হয়ে যান।। ২৮।।

সর্বভূতস্থম্ আত্মানং # সর্বভূতানি চ আত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্ত আত্মা # সর্বত্র সমদর্শনঃ।।২৯।।

সর্বভূতস্থম্ = সর্বজীবের মধ্যে; আত্মানং = আত্মাকে; সর্বভূতানি = সকল জীবকে; আত্মনি = আত্মার মধ্যে; ঈক্ষতে = দেখেন।।২৯।।

অনুবাদ :- যোগযুক্ত পুরুষ সকল জীবকে সমান চোখে দেখেন। তিনি সর্ব জীবের অন্তরে আত্মাকে এবং আত্মার মধ্যে সমগ্র জীবকে দেখতে পান।।২৯।।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র # সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।

তস্য অহং ন প্রণশ্যামি # স চ মে ন প্রণশ্যতি।।৩০।।

পশ্যতি = দেখে; = ন প্রণশ্যামি = অদৃশ্য হই না; ন প্রণশ্যতি = অদৃশ্য হয় না।। ৩০।।

অনুবাদ :- যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন এবং সকলের মধ্যে আমাকে দেখেন তাঁর কাছ থেকে আমি কখনই অদৃশ্য হই না বা তিনিও আমার কাছ থেকে অদৃশ্য হন না অর্থাৎ তিনিও সব সময় আমাকে দেখতে পান এবং আমিও তাঁকে সর্বদা দেখি অর্থাৎ খেয়াল করি অর্থাৎ আমি তাঁকে সর্বদা করুণা করি।। ৩০।।

ব্যাখ্যা :- ভক্ত কখন ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখতে পান? মুণ্ডকোপনিষদে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে— "পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (৩।১।৩)। অর্থাৎ মানুষের মন থেকে যখন সর্বপ্রকার পাপপুণ্যের বোধ দূর হয়ে যায় তখন মন সর্বপ্রকার মালিন্যবর্জিত হয়ে যায় এবং তখন তিনি মনের সমতা অর্থাৎ মনের রাগদ্বেষাদি বর্জিত ভাব লাভ করেন এবং তখনই তিনি সকল বস্তুতে ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরের মধ্যে সকল বস্তুকে দর্শন করেন। কিন্তু মন থেকে কখন সর্বপ্রকার পাপপুণ্যের বোধ দূর হবে? যখন মানুষ বিষয়াসক্তি প্রভৃতি রজোগুণ, পাপ, অধর্ম, মন্দকর্ম প্রভৃতি তমোগুণ এবং পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠান প্রভৃতি সত্ত্বগুণ ইত্যাদি সকলের ঊর্ধ্বে উঠে যায় তখন আর মানুষের আত্ম-পর কোন ভেদ থাকে না, তখন মন সর্বপ্রকার মালিন্যবর্জিত হয়ে যায় এবং তখনই সৃষ্টির সমস্ত কিছুই ঈশ্বরময় মনে হয়।। ৩০।।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং # ভজতি একত্বম্ আস্থিতঃ।

সর্বথা বর্তমানঃ অপি # স যোগী ময়ি বর্ততে।। ৩১।।

যঃ = যে; সর্বভূতস্থিতং = সর্বজীবে অবস্থিত; মাম্ = আমাকে; একত্বম্ = আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে; আস্থিতঃ = অবস্থিত; ভজতি = পূজা করে; সর্বথা = যে

কোন অবস্থায়; বর্তমানঃ অপি = থেকেও; সঃ যোগী = সেই যোগী; ময়ি = আমাতে; বর্ততে = অবস্থান করেন।।৩১।।

অনুবাদ:- যে যোগী সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে সর্বজীবে অবস্থিত আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমার ভজনা করেন তিনি সর্ব অবস্থাতেই আমার মধ্যেই অবস্থান করেন।।৩১।।

আত্ম ঔপম্যেন সর্বত্র # সমং পশ্যতি যঃ অর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং # স যোগী পরমো মতঃ।।৩২।।

যঃ = যিনি; আত্ম = নিজের সঙ্গে; ঔপম্যেন = তুলনার দ্বারা; সর্বত্র সুখং বা যদি বা দুঃখং = সুখ বা দুঃখ যে কোন অবস্থাতেই; সমং = সমান; পশ্যতি = দেখেন; সঃ যোগী = সেই যোগী; পরমঃ = শ্রেষ্ঠ; মতঃ = আমার অভিমতে।।৩২।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! যিনি সুখ বা দুঃখ সকল অবস্থাতেই নিজের সঙ্গে তুলনার দ্বারা সকলকে সমান দেখেন (অর্থাৎ অপরের দুঃখ যেন তাঁরই দুঃখ, অপরের আনন্দ যেন তাঁরই আনন্দ এই ভাবেন), আমার অভিমতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী ।।৩২।।

অর্জুন উবাচ

যঃ অয়ং যোগঃ ত্বয়া প্রোক্তঃ # সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্য অহং ন পশ্যামি # চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্।।৩৩।।

ত্বয়া = তোমার দ্বারা; সাম্যেন = সাম্যের দ্বারা অর্থাৎ পরের সুখ-দুঃখ আমার নিজের সুখ-দুঃখের তুল্য এই বুদ্ধিদ্বারা; অয়ং = এই; যঃ = যে; যোগঃ = যোগ; প্রোক্তঃ = বলা হল; এতস্য = এর; স্থিরাং স্থিতিং = স্থায়ী স্থিতি; চঞ্চলত্বাৎ = চিত্তচাঞ্চল্যের জন্য; অহং = আমি; ন পশ্যামি = দেখতে পাচ্ছি না।।৩৩।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন - হে মধুসূদন! আপনি সাম্যবোধ অর্থাৎ পরের সুখ-দুঃখ আমার নিজের সুখ-দুঃখের তুল্য এই বুদ্ধিরূপ যে যোগের বিষয়ে বললেন, আমার চিত্তের চঞ্চলতার কারণে আমার মনে হচ্ছে না যে সমত্ববোধযুক্ত এই যোগ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।।৩৩।।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ # প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্।

তস্য অহং নিগ্রহং মন্যে # বায়োঃ ইব সুদুষ্করম্।।৩৪।।

হি = নিঃসন্দেহে; মনঃ = চিত্ত; চঞ্চলং = চঞ্চল; প্রমাথী = পীড়নকারী; বলবৎ দৃঢ়ং = প্রবল শক্তিসম্পন্ন; অহং = আমি; তস্য = তার; নিগ্রহং = দমন; বায়োঃ ইব = বায়ুকে দমন করার মতই; সুদুষ্করং = ভয়ানক কঠিন; মন্যে = মনে করি।। ৩৪।।

অনুবাদ :- হে কৃষ্ণ! নিঃসন্দেহে চিত্ত হল চঞ্চল এবং ইন্দ্রিয় হল পীড়নকারী, প্রবল শক্তিসম্পন্ন। আমি মনে করি তাদের দমন করা বায়ুকে দমন করার মতই ভয়ানক কঠিন।।৩৪।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো # মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় # বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।।৩৫।।

শ্রীভগবান্ উবাচ = শ্রীভগবান্ বললেন; মহাবাহো = হে মহাবাহো; মনঃ = চিত্ত; দুর্নিগ্রহং = অপ্রতিরোধ্য; চলম্ = চঞ্চল; অসংশয়ং = নিঃসন্দেহে; তু = কিন্তু; কৌন্তেয় = হে কুন্তীপুত্র; অভ্যাসেন = অভ্যাসর দ্বারা; বৈরাগ্যেণ = বৈরাগ্যের দ্বারা; চ = এবং; গৃহ্যতে = বশ করা যায়।।৩৫।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন— হে মহাবাহো! মনকে বশে রাখা খুবই কঠিন। সে স্বভাবতই খুবই চঞ্চল। হে কুন্তীপুত্র! মনকে একমাত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা বশ করা যায়।।৩৫।।

অসংযত আত্মনা যোগো # দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্য-আত্মনা তু যততা # শক্যঃ অবাপ্তুম্ উপায়তঃ।।৩৬।।

অসংযত = অবশীকৃত; আত্মনা = চিত্ত; যোগঃ = যোগ; দুষ্প্রাপঃ = লাভ করা কঠিন; ইতি মে মতিঃ = এই আমার মত; তু = কিন্তু; উপায়তঃ = যথাবিহিত উপায়দ্বারা; যততা = যত্ন সহকারে; বশ্য = বশীকৃত; আত্মনা = চিত্তের দ্বারা; অবাপ্তুং লাভ করতে; শক্যঃ = সমর্থ হয়।।৩৬।।

অনুবাদ :- আমার মতে যাদের চিত্ত সংযত নয় তাদের পক্ষে যোগসিদ্ধি লাভ করা বড়ই কঠিন। কিন্তু যত্ন সহকারে যথাবিহিত উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে আত্মাকে সংযত করা সম্ভব হয় এবং যোগ সিদ্ধি লাভ করা যায়।। ৩৬।।

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়া উপেতো # যোগাৎ চলিত মানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং # কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি।।৩৭।।

শ্রদ্ধয়া উপেতঃ = শ্রদ্ধাযুক্ত; অযতিঃ = যত্নবান নয়; যোগাৎ = যোগের পথ থেকে; চলিত-মানসঃ = ভ্রষ্টচিত্ত; যোগসংসিদ্ধিম্ = যোগসিদ্ধি অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে যোগ; অপ্রাপ্য = লাভ না করলে; কাং গতিং = কোন গতি; গচ্ছতি = লাভ করে? ৩৭

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন— হে কৃষ্ণ! যদি কেউ যোগসাধনের পথে শ্রদ্ধাসহকারে অগ্রসর হয়ে যোগসিদ্ধি লাভের পূর্বেই সেই পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে মৃত্যুর পর সে কোন গতি লাভ করবে।।৩৭।।

কচ্চিৎ ন উভয়-বিভ্রষ্টঃ # ছিন্ন-অভ্রম্ ইব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো # বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি।।৩৮।।

মহাবাহো = হে মাহাবাহো; ব্রহ্মণঃ = ব্রহ্মলাভের; পথি = পথ; বিমূঢ়ঃ = বিচ্যুত; অপ্রতিষ্ঠঃ = আশ্রয়বিহীন; উভয় = ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভ ও নিষ্কাম কর্মযোগের মাধ্যমে ব্রহ্মকে লাভ এই উভয়বিধ পথ; বিভ্রষ্টঃ = বিচ্যুত; ছিন্ন-অভ্রম্ ইব = ছিন্ন মেখখণ্ডের মত; ন নশ্যতি কচ্চিৎ = বিনাশ প্রাপ্ত হয় না কি?।।৩৮।।

অনুবাদ :- হে মাহাবাহো! সেই ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে কর্ম ক'রে স্বর্গসুখলাভও করতে পারল না আবার পরে পরমাত্মাকে প্রাপ্তির সাধনপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পরমাত্মাকেও লাভ করতে পারল না এরূপ ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মলাভের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যোগমার্গের আশ্রয়হীন হয়ে পরার ফলে একখণ্ড মেঘ যেমন বৃহৎ মেঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাকাশে ভাসতে ভাসতে একসময় মহাকাশের বুকে হারিয়ে যায় সেইরকম সেই ব্যক্তিও ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভ ও নিষ্কাম কর্মযোগের মাধ্যমে ব্রহ্মকে লাভ এই উভয়বিধ পথ থেকে পতিত হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না কি? ৩৮

এতৎ মে সংশয়ং কৃষ্ণ # ছেত্তুম্ অর্হসি অশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্য অস্য # ছেত্তা ন হি উপপদ্যতে।।৩৯।।

কৃষ্ণ = হে কৃষ্ণ; মে = আমার; এতৎ = এই; সংশয়ং = সন্দেহ; অশেষতঃ = সম্পূর্ণ; ছেত্তুম্ = ছিন্ন করতে অর্থাৎ দূর করতে; অর্হসি = সক্ষম; ত্বদন্যঃ = আপনি ছাড়া অপর কেউ; অস্য = এই; সংশয়স্য = সন্দেহের; ছেত্তা = ছিন্নকারী; ন হি উপপদ্যতে = নিশ্চিতভাবে কেউ নাই।। ৩৯।।

অনুবাদ :- হে কৃষ্ণ! আমার মনে এই বিষয়ে বিরাট সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আমার মন থেকে এই সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূর করার ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে একমাত্র আপনারই আছে, অপর আর কারও নাই।। ৩৯।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

পার্থ ন এব ইহ ন অমুত্র # বিনাশঃ তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ # দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।।৪০।।

তস্য = সেই যোগ ভ্রষ্ট ব্যক্তির; বিনাশঃ = বিনাশ; ন এব ইহ = এই ইহলোকেও হবে না; ন অমুত্র বিদ্যতে = পরলোকেও হবে না; তাত = বৎস; কল্যাণকৃৎ = যিনি অপরের কল্যাণ করেন তাঁর; হি = নিশ্চিতভাবেই; কশ্চিৎ = কোনপ্রকার; দুর্গতিং = দুর্গতি; ন গচ্ছতি = ঘটে না।।৪০।।

অনুবাদ:- শ্রীভগবান্ বললেন— পার্থ! এই ইহলোক বা পরলোকে কোথাও তাঁর অর্থাৎ সেই যোগভ্রষ্টব্যক্তির বিনাশ ঘটবে না কারণ যিনি কল্যাণ কর্ম অর্থাৎ যোগসাধন করেন নিশ্চিতভাবেই তাঁর কোনপ্রকার দুর্গতি ঘটে না।।৪০।।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ # উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে # যোগভ্রষ্টঃ অভিজায়তে।।৪১।।

যোগভ্রষ্টঃ = যোগের পথ থেকে বিচ্যুত; পুণ্যকৃতাং = পুণ্যকর্মকারিগণের; লোকান্ = লোক; প্রাপ্য = লাভ ক'রে; শাশ্বতীঃ = অনন্ত; সমাঃ = বৎসর; উষিত্বা = বাস ক'রে; শুচীনাং = সদাচারী; শ্রীমতাং = শ্রীযুক্ত অর্থাৎ ধনবান; গেহে = গৃহে; অভিজায়তে = জন্মগ্রহণ করেন।।৪১।।

অনুবাদ :- নিষ্কাম কর্মযোগের পথ অবলম্বন ক'রে চলার পর কোন ব্যক্তি যদি সেই যোগের পথ থেকে বিচ্যুত হন অর্থাৎ আর সেই যোগের পথে থাকতে না পারেন তাহলেও সেই সমস্ত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণও অন্যান্য পুণ্যকর্মকারিগণের মতই তাঁরা স্বর্গাদি যে সমস্ত লোক লাভ করেছেন, সেই একই লোক লাভ করেন এবং সেখানে অনন্ত বৎসর সুখে বাস করার পর পুনরায় কোন সদাচারী ধনবান ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।।৪১।।

অথবা যোগিনাম্ এব # কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতৎ হি দুর্লভতরং # লোকে জন্ম যৎ ঈদৃশম্।। ৪২।।

অথবা ধীমতাং = জ্ঞানী; যোগিনাম্ = যোগিগণের; এব কুলে = বংশেই; ভবতি = (জন্ম) হয়; ঈদৃশং = এইরূপ; যৎ জন্ম = যে জন্ম; এতৎ হি = এই জন্মই; লোকে = ইহলোকে; দুর্লভতরং = অতীব দুর্লভ।।৪২।।

অনুবাদ :- অথবা যোগে সিদ্ধি লাভ করার পূর্বে যাঁরা যোগের পথ কোন কারণে পরিত্যাগ করেছেন তাঁরা মৃত্যুর পর কোন জ্ঞানী যোগিগণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহলোকে এইরূপ জন্ম বড়ই দুর্লভ।। ৪২।।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং # লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ # সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন।। ৪৩।।

তত্র = এই জন্মে; তং = সেই; পৌর্বদেহিকম্ = পূর্বশরীর অর্থাৎ পূর্বজন্মে অর্জিত; বুদ্ধিসংযোগং = সমবুদ্ধিরূপ যোগের সুফল; লভতে = লাভ করেন; যততে = যত্নসহকারে চেষ্টা করেন; ততঃ = তারপর; ভূয়ঃ = অধিকতর; সংসিদ্ধৌ = সিদ্ধিলাভের জন্য।।৪৩।।

অনুবাদ :- সেই উভয় জন্মে (অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুই শ্লোকে কথিত যে জন্মে যোগী সমবুদ্ধিরূপ যোগের আচার আরম্ভ করেও অধিক অগ্রসর হতে পারেননি এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে সদাচারী ধনবান ব্যক্তির গৃহে বা জ্ঞানী যোগিগণের বংশে যে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন) অর্জিত সমবুদ্ধিরূপ যোগের সকল সুফল এই জন্মে

লাভ করেন এবং হে কুরুনন্দন! এই জন্মে অধিকতর যত্নসহকারে সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করেন (যাতে তাঁকে আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করতে না হয়)।।৪৩।।

পূর্ব-অভ্যাসেন তেন এব # হ্রিয়তে হি অবশঃ অপি সঃ।
জিজ্ঞাসুঃ অপি যোগস্য # শব্দব্রহ্ম অতিবর্ততে।। ৪৪।।

অবশঃ অপি = (মায়ার দ্বারা অন্য বিষয়ের প্রতি আকর্ষণের ফলে) অবশ হলেও; তেন পূর্বাভ্যাসেন এব = সেই পূর্বজন্মে অর্জিত সুসংস্কারের দ্বারা; হ্রিয়তে = আকৃষ্ট হন; হি = নিশ্চিতভাবে; যোগস্য = যোগের; জিজ্ঞাসুঃ অপি = সমবুদ্ধিরূপ যোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণও; শব্দব্রহ্ম = বেদ; অতিবর্ততে = অতিক্রম করেন।।৪৪।।

অনুবাদ :-জ্ঞানী যোগিগণের বংশে জন্মগ্রহণ করার পর মায়ার দ্বারা অন্য বিষয়ের প্রতি আকর্ষণের ফলে অবশ হলেও অর্থাৎ এই জন্মেও তাঁর মনে যোগসিদ্ধি অবলম্বনের পথে অনাসক্তি জাগলেও সেই পূর্বজন্মে অর্জিত সুসংস্কারের প্রভাবে এই জন্মে যোগসিদ্ধি অবলম্বনের পথের প্রতিই তিনি আকৃষ্ট হন এবং নিশ্চিতভাবে যোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ বেদবর্ণিত কাম্য কর্মের ফলকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ বেদে বর্ণিত সকাম কর্মের ফলের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন।। ৪৪।।

প্রযত্নাৎ যতমানঃ তু # যোগী সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ।
অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধঃ # ততো যাতি পরাং গতিম্।। ৪৫।।

তু = কিন্তু; প্রযত্নাৎ = যত্ন সহকারে; যতমানঃ যোগী = যত্নশীল যোগী; সংশুদ্ধ = পরিশুদ্ধ; কিল্বিষঃ = পাপ; অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধঃ = অনেক জন্মে সিদ্ধিলাভ ক'রে; ততঃ = তারপর; পরাং = পরম; গতিং = গতি; যাতি = লাভ করেন।। ৪৫।।

অনুবাদ :- তারপর সেই যোগী সম্পূর্ণ পাপমুক্ত হয়ে পূর্বজন্মের চাইতেও অধিকতর যত্নসহকারে অনেক জন্মে সিদ্ধিলাভ ক'রে অবশেষে পরম গতি লাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মপদ লাভ করেন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর কালচক্র থেকে তিনি মুক্তি পান অর্থাৎ তিনি মোক্ষলাভ করেন।।৪৫।।

তপস্বিভ্যঃ অধিকো যোগী # জ্ঞানিভ্যঃ অপি মতঃ অধিকঃ।
কর্মিভ্যঃ চ অধিকো যোগী # তস্মাৎ যোগী ভব অর্জুন।। ৪৬।।

যোগী = কর্মযোগিগণ; তপস্বিভ্যঃ = তপস্বিগণ অপেক্ষা; অধিকঃ = শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ = সাংখ্যজ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কর্মিভ্যঃ চ অধিকঃ যোগী = কর্মীদের অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ; মতঃ = এই আমার অভিমত; তস্মাৎ = সেইজন্য; যোগী ভব = যোগী হও অর্থাৎ কর্মযোগ অবলম্বন ক'রে যুদ্ধ কর।।৪৬।।

অনুবাদ :- যোগিগণ তপস্বিগণের চাইতে শ্রেষ্ঠ, সাংখ্যজ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং কর্মীদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই আমার অভিমত। হে অর্জুন! সেইজন্য তুমি যোগী হও অর্থাৎ কর্মযোগ অবলম্বন ক'রে যুদ্ধ কর।।৪৬।।

যোগিনাম্ অপি সর্বেষাং # মদ্গতেন অন্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং # স মে যুক্ততমো মতঃ।। ৪৭।।

সর্বেষাং = সকল; যোগিনাম্ = যোগিগণের মধ্যে; অপি = ও; যঃ = যিনি; শ্রদ্ধাবান্ = শ্রদ্ধাবান চিত্তে; মদ্গতেন = আমাতেই চিত্ত সমর্পণ ক'রে; অন্তরাত্মনা = সমস্ত অন্তর দিয়ে; মাং = আমার; ভজতে = পূজা করেন; সঃ = তিনি; যুক্ততমঃ = শ্রেষ্ঠ; মে = আমার; মতঃ = অভিমত।।৪৭।।

অনুবাদ :- যোগিগণের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাবান চিত্তে আমাতেই চিত্ত সমর্পণ ক'রে সমস্ত অন্তর দিয়ে আমার ভজনা করেন আমার মতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।। ৪৭।।

—ঃ ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ঃ—

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময়ি আসক্ত-মনাঃ পার্থ # যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং # যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু।।১।

ময়ি = আমাতে; আসক্ত-মনাঃ = নিবিষ্টচিত্ত; যোগং যুঞ্জন্ = যোগে যুক্ত হয়ে; মৎ আশ্রয়ঃ = আমার শরণাপন্ন হও; অসংশয়ং = নিশ্চিতভাবেই; সমগ্রং মাং = আমার সমগ্র স্বরূপ; জ্ঞাস্যসি = জানতে পারবে; তৎ শৃণু = সেই বিষয় শোন।।১।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন— হে পার্থ! তুমি আমার মধ্যেই তোমার মন সমর্পণ কর এবং আমার শরণাপন্ন হও। তাহলে তুমি নিশ্চিতভাবেই আমার সমগ্র স্বরূপ জানতে পারবে। তুমি কিভাবে আমাকে জানতে পারবে সেই বিষয়ে আমি তোমাকে বলছি। তুমি মন দিয়ে শোন।।১।।

জ্ঞানং তে অহং সবিজ্ঞানম্ # ইদং বক্ষ্যামি অশেষতঃ।
যৎ জ্ঞাত্বা ন ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ # জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্যতে।।২।।

অহং = আমি; তে = তোমাকে; ইদং = সেই; জ্ঞানং = জ্ঞান; সবিজ্ঞানম্ = বিজ্ঞানের সহিত অর্থাৎ অনুভবের সঙ্গে; অশেষতঃ = পূর্ণরূপে; বক্ষ্যামি = বলব; যৎ = যা; জ্ঞাত্বা = জেনে; ইহ = ইহলোকে; ভূয়ঃ = পুনরায়; অন্যৎ = অন্যকিছু; জ্ঞাতব্যম্ = জানার; ন অবশিষ্যতে = অবশিষ্ট থাকবে না।।২।।

অনুবাদ :- এখন আমি তোমাকে যে জ্ঞানের কথা বলব তা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানযুক্ত। এই জ্ঞানলাভ করার পর তোমার আর অপর কিছু জানার জন্য অবশিষ্ট থাকবে না।।২।।

ব্যাখ্যা :- এখানে ‘জ্ঞান’ বলতে নির্গুণ নিরাকার শ্রীভগবানের তত্ত্বের প্রভাব, মাহাত্ম্য ও রহস্যের যথার্থ জ্ঞানকে ‘জ্ঞান’ রূপে নির্দেশ করা হয়েছে এবং তাঁর সগুণ নিরাকার এবং দিব্য সাকার তত্ত্বের লীলা, রহস্য, গুণ, মহত্ত্ব এবং প্রভাবের যথার্থ জ্ঞানকে ‘বিজ্ঞান’ বলা হয়েছে। শ্রীধরাচার্য বলেছেন যে শাস্ত্রীয় জ্ঞানকে ‘জ্ঞান’ বলা হয় এবং অনুভবকে বিজ্ঞান বলা হয় — “জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং বিজ্ঞানম্ অনুভবম্।” এখানে ভগবান্ বলতে চেয়েছেন যে তিনি অর্জুনকে তাঁর স্বরূপের বিষয়ের জ্ঞানের উপদেশও দেবেন আবার অর্জুন কিভাবে সেই জ্ঞান অনুভব করতে পারবেন সে উপায়ও বলে দেবেন।।২।।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু # কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততাম্ অপি সিদ্ধানাং # কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।। ৩।।

সহস্রেষু = হাজার হাজার; মনুষ্যাণাং = মানুষের মধ্যে; কশ্চিৎ = কেউ কেউ; যততি = যত্ন করে; সিদ্ধয়ে = সিদ্ধির জন্য; যততাম্ = যত্নবান; অপি= ও; সিদ্ধানাং = সিদ্ধগণ; কশ্চিৎ = কদাচিৎ; মাং = আমাকে; তত্ত্বতঃ = স্বরূপত; বেত্তি = জানতে পারে।। ৩।।

অনুবাদ :- হাজার হাজার মানুষের মধ্যে হয়ত একজন আমাকে সঠিকভাবে জানার চেষ্টা করে। আবার যাঁরা চেষ্টা করেন সেই সমস্ত হাজার হাজার মানুষের মধ্যে হয়ত একজন আমাকে সঠিকভাবে জানতে পারে।। ৩।।

ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ুঃ # খং মনো বুদ্ধিঃ এব চ।
অহংকার ইতি ইয়ং মে # ভিন্না প্রকৃতিঃ অষ্টধা।।৪।।

অনুবাদ :- আমার বাহ্যিক রূপ অর্থাৎ প্রকৃতি আটভাগে বিভক্ত যথা — ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার।।৪।।

অপরা ইয়ম্ ইতঃ তু অন্যাং # প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো # যয়া ইদং ধার্যতে জগৎ।। ৫।।

অপরা = নিকৃষ্ট প্রকৃতি; ইয়ম্ ইতঃ = এর চাইতে; বিদ্ধি = জানবে; মে = আমার; পরাম্ = পরম; জীবভূতাং = জীবরূপা; যয়া = যার দ্বারা; ইদং = এই; ধার্যতে = ধারণ ক’রে আছে।।৫।।

অনুবাদ :- হে মহাবাহো! এই যে আমার আট প্রকার বাহ্যিক রূপ সেগুলি প্রকৃতপক্ষে আমার জড়রূপী অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্ট প্রকৃতি। এছাড়াও আমার একটি পরম প্রকৃতি আছে যাকে পরা অর্থাৎ জীবরূপা প্রকৃতি বলা হয়। সেই পরা প্রকৃতি এই জগৎ সংসারকে ধারণ ক'রে আছে।। ৫।।

ব্যাখ্যা :- অপরা শক্তি নিকৃষ্ট কেন? অপরা শক্তি হল জড়তা ও ভোগতারূপ গুণসম্পন্না অর্থাৎ চেতনাহীন এবং ভোগ্যবস্তু কাজেই সংসারবন্ধনের কারণ। এই অপরাশক্তি তার জড়ত্বের কারণে স্বয়ং স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে অপারগ। জীবরূপী পরাশক্তি তাকে পরিচালিত না করলে তার নিজের কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। সেইজন্য অপরাশক্তি নিকৃষ্ট। কিন্তু পরাশক্তি জীবরূপা ও উৎকৃষ্ট কারণ এই শক্তির চেতনা আছে এবং ভোগকারী। সেই জীবরূপা চেতন শক্তি নিজের কর্মের দ্বারা এই জগতকে ধারণ ক'রে আছে অর্থাৎ জগতকে সচল রেখেছে। সেইজন্য এই পরা শক্তি শ্রেষ্ঠ।।৫।।

এতদ্ যোনীনি ভূতানি # সর্বাণি ইতি উপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ # প্রভবঃ প্রলয়ঃ তথা।।৬।।

সর্বাণি ভূতানি = জীব সকল; উপধারয় = জেনে রাখো; কৃৎস্ন = সমস্ত; প্রভবঃ = উৎপত্তি; প্রলয়ঃ = বিনাশ।।৬।।

অনুবাদ :- সমস্ত জীবজগৎ আমার পরা ও অপরা এই দুই প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয়। সুতরাং জেনে রাখো যে আমার দ্বারাই সমগ্র বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়ে থাকে।। ৬।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ পূর্বের শ্লোকে বলেছেন যে তিনিই অপরা অর্থাৎ সমস্ত জড় ভোগ্য বস্তু এবং সেই সমস্ত ভোগ্যবস্তুর ভোগকারী জীবশক্তিকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এই কথার দ্বারা এটিই বোঝানো হয়েছে যে এই জগতের সমস্ত জড় ও চেতন বস্তু এককথায় ব্রহ্মা থেকে স্তম্ভ পর্যন্ত সমস্ত কিছুই তাঁর এই জড় ও চেতনরূপ শক্তির দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ তিনিই এই বিশ্ব-সংসারের স্রষ্টা।।৬।।

মত্তঃ পরতরং ন অন্যৎ # কিঞ্চিৎ অস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বম্ ইদং প্রোতং # সূত্রে মণিগণা ইব।। ৭।।

মত্তঃ = আমার চাইতে; পরতরং = শ্রেষ্ঠ; অন্যৎ = অপর কেউ; ন অস্তি = নাই; ময়ি = আমার মধ্যে; সর্বম্ ইদং = এই সমস্ত; প্রোতং = গ্রথিত।। ৭।।

অনুবাদ :- যে ধনঞ্জয়! এই নিখিল সংসারে আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নাই। অনেক মণি যেমন একটি সুতো দিয়ে গাঁথা থাকে তেমনি সমস্ত জীবজগতকে একমাত্র আমিই ধারণ করে থাকি।। ৭।।

রসঃ অহম্ অপ্সু কৌন্তেয় # প্রভা অস্মি শশি-সূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু # শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।।৮।।

অপ্সু = জলে; প্রভা = কিরণ; অস্মি = হই; শশি-সূর্যয়োঃ = চন্দ্র ও সূর্যের; প্রণবঃ = ওঙ্কার ধ্বনি; খে = আকাশে; পৌরুষং = পৌরুষ; নৃষু = মানুষের মধ্যে।।৮।।

অনুবাদ :- জলের যা রস অর্থাৎ স্বাদ তা আমিই, চন্দ্র ও সূর্যের যে কিরণ তাও আমি, বেদসমূহের ওঙ্কার ধ্বনিও আমিই, আকাশের মধ্যে শব্দও আমিই আর পুরুষের মধ্যে যে পৌরুষ তাও আমি (অর্থাৎ এই নিখিল ভুবনের কর্তা বলতে আমি ব্যতীত অপর কেউ নাই)।।৮।।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ # তেজঃ চ অস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু # তপঃ চ অস্মি তপস্বিষু।। ৯।।

পুণ্যো = পবিত্র; বিভাবসৌ = অগ্নির; তপস্বিষু = তপস্বীদের।

অনুবাদ :- আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের পবিত্র গন্ধস্বরূপ, অগ্নির তেজ স্বরূপ, সর্বজীবের প্রাণ স্বরূপ এবং তপস্বীদের তপস্যা স্বরূপ।।৯।।

ব্যাখ্যা :- এর পূর্বে রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্রার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এখানে পবিত্র গন্ধ বলতে সেই পঞ্চ তন্মাত্রার গন্ধের কথা বলা হয়েছে।। ৯।।

বীজং মাং সর্বভূতানাং # বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধিঃ বুদ্ধিমতাম্ অস্মি # তেজঃ তেজস্বিনাম্ অহম্।।১০।।

বীজং = উৎপত্তির নিত্য কারণ; মাং = আমাকে; সর্বভূতানাং = সর্বজীবের; বিদ্ধি = জানবে; বুদ্ধিমতাম্ = বুদ্ধিমানদের; অস্মি = হই; তেজস্বিনাম্ = বীরগণের।।১০।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! জেনে রাখবে যে আমিই সর্বজীবের মূল বীজ অর্থাৎ সর্বজীবের উৎপত্তির নিত্য কারণ, আমিই বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি এবং বীরগণের বীরত্ব (অর্থাৎ আমাকে ছাড়া কারও কোন গতি নাই)।।১০।।

বলং বলবতাম্ অস্মি* # কাম-রাগ-বিবর্জিতম্।
ধর্ম-অবিরুদ্ধো ভূতেষু # কামঃ অস্মি ভরত-ঋষভ।।১১।।

* ভিন্নপাঠ — চাহং

বলং বলবতাম্ = শক্তিমানের শক্তি; কাম-রাগ-বিবর্জিতম্ = কামনা-বাসনা বর্জিত; ধর্ম-অবিরুদ্ধঃ = ধর্মানুসারী; ভূতেষু = প্রাণিগণের।।১১।।

অনুবাদ :- হে শ্রেষ্ঠ ভরতবংশীয়! আমি শক্তিমানের কামনা-বাসনা বর্জিত শক্তি, আমি প্রাণিগণের ধর্মানুসারী পবিত্র কাম।।১১।।

যে চ এব সাত্ত্বিকা ভাবা # রাজসাঃ তামসাঃ চ যে।
মত্ত এব ইতি তান্ বিদ্ধি # ন তু অহং তেষু তে ময়ি।।১২।।

যে চ এব = যে সকলই; মত্ত এব = আমার মধ্য থেকেই; বিদ্ধি = জানবে; তেষু = তাদের।।১২।।

অনুবাদ :- সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভাব সমূহ আমারই প্রকৃতির গুণকার্য। সেগুলি আমারই মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলির সবই আমার মধ্যে আছে কিন্তু আমি তাদের থেকে মুক্ত অর্থাৎ জীবসমূহের মত আমি তাদের অধীন নই।।১২।।

ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ # এভিঃ সর্বম্ ইদং জগৎ।
মোহিতং ন অভিজানাতি # মাম্ এভ্যঃ পরম্ অব্যয়ম্।।১৩।।

ত্রিভিঃ = তিন; গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ = গুণময় ভাবের দ্বারা; এভিঃ = এই; ইদং = এই; মোহিতং = আচ্ছন্ন; ন অভিজানাতি = জানতে পারে না; এভ্যঃ পরম্ অব্যয়ম্ = এই চির অক্ষয় রূপ।।১৩।।

অনুবাদ :- এই জগৎ এই তিন গুণময় ভাবের দ্বারা মোহিত হয়ে আছে। তাই সাধারণ মানুষ নিকৃষ্ট এই গুণের চাইতে শ্রেষ্ঠ আমার চির অক্ষয় রূপ দেখতে পায় না।।১৩।।

ব্যাখ্যা :- ভগবানের বক্তব্যের মর্মার্থ হল যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির এই তিনটি গুণ যেন এক একটি সুগভীর সমুদ্র। এগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং আপাত মধুর। সেইজন্য মানুষ এই তিনটি গুণের সমুদ্রে ডুবে হাবুডুবু খেতে ভালোবাসে। তারা ঐ তিনগুণের নেশায় এমনই মত্ত যে তারা পরমেশ্বরের সেই উৎকৃষ্ট রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। যাঁরা সাত্ত্বিক তাঁরা অনেক পবিত্র কর্ম, দান-ধ্যান, জনসেবা প্রভৃতি করেন এবং তাঁদের দৃষ্টি কেবলমাত্র সেইখানেই সীমাবদ্ধ থাকে। যারা রজোগুণের অধিকারী তারা নিয়ত ভোগকার্যে মগ্ন থাকে এবং যারা তামসিক গুণ সমন্বিত তারা সর্বদা কলুষিত কর্মে লিপ্ত থাকে। তাদের সময় বা প্রবৃত্তি হয় না সেই সমস্ত কর্মের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে পরমাত্মার চির অক্ষয় শ্রেষ্ঠ আত্মরূপের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার। সেইজন্য তারা তাঁর স্বরূপকে জানতে বা বুঝতে পারে না।।১৩।।

দৈবী হি এষা গুণময়ী # মম মায়া দুরত্যয়া।
মাম্ এব যে প্রপদ্যন্তে # মায়াম্ এতাং তরন্তি তে।।১৪।।

দৈবী = অলৌকিক; এষা = এই; গুণময়ী = গুণাত্মিকা; দুরত্যয়া = দুস্তরা; মাম্ এব = আমাকেই; প্রপদ্যন্তে = আশ্রয়গ্রহণ করে; মায়াম্ = মায়াকে; এতাং = এই; তরন্তি = অতিক্রম করতে পারে; তে = তারা।।১৪।।

অনুবাদ :- সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ আমার এই অলৌকিক ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি আমারই দৈবী মায়া। আমার এই মায়া অতিক্রম করা খুবই কঠিন। যাঁরা একমাত্র আমাতেই আশ্রয় গ্রহণ ক'রে আমার ভজনা করেন তাঁরাই আমার এই মায়া অতিক্রম করতে পারেন।।১৪।।

ব্যাখ্যা :- মায়া কাকে বলে? রামানুজাচার্য বলেছেন যে অসুর, রাক্ষস ও অস্ত্রের ন্যায় যে শক্তি বিচিত্র কর্ম করতে সক্ষম তাকে মায়া বলা হয় — "মায়াশব্দবাচ্যত্বম্ আসুর-রাক্ষসাস্ত্রাদীনাম্ ইব বিচিত্রকার্যকরত্বেন।" তিনি বলেছেন যে মায়া কোন মিথ্যা বিষয় নয় — "মায়াশব্দো ন মিথ্যার্থবাচী।" কোন জাদুগর যখন জাদুমন্ত্রবলে কোন মিথ্যা বিষয়কে দর্শকদের সামনে প্রদর্শন করে তখন তাকে সত্য বলেই বোধ হয়। কোন মিথ্যা বস্তুকে কখনই চোখে দেখা সম্ভব নয়। যেমন কেউ কখনও সোনার পাথরবাটি দেখেনি। কিন্তু যখন একটি পাথরবাটিকে জাদুগর তার জাদুর বলে সোনার ব'লে প্রদর্শন করে তখন তাকে সত্য বলেই বোধ হয়। কিন্তু যে জাদুর রহস্য জানে তার চোখে এই বিষয়টি দেখা যাবে না।

যাদের চোখ সত্যের আলোকে পূর্ণ তাদের চোখে এই মায়া দেখা যায় না। এই মায়া কেবল প্রাকৃত চোখেই দেখা যায়। এই জগতকে মায়া বলা হয়। সেইজন্য এই জগতকে সকলে প্রাকৃত চোখে দেখতে পায়। আবার জাদুগর যেমন নিজে জাদু নয় তেমনি ভগবানও মায়া নন। সেইজন্য তাঁর স্বরূপকে কেউ দেখতে পায় না। ভগবান্ যদি মায়া হতেন তাহলে তাঁর বিশ্বরূপ দেখার জন্য অর্জুনের দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন হত না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ।
সসর্জোচ্চাবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে।।

—শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ ১১।৩।৩

অর্থাৎ আদি পুরুষ পরমাত্মা পরব্রহ্ম যে শক্তির সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার দেব-মনুষ্যাদি শরীর সৃষ্টি করেন তাকে মায়া বলা হয়।।১৪।।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ # প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়া অপহৃত-জ্ঞানা # আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ।।১৫।।

মাং = আমাকে; মূঢ়াঃ = বিবেকহীন; ন প্রপদ্যন্তে = ভজনা করে না; মায়য়া = মায়ার দ্বারা; অপহৃত-জ্ঞানা = জ্ঞানশূন্য; আসুরং ভাবম্ = আসুরিক প্রবৃত্তি; আশ্রিতাঃ = লাভ করে।।১৫।।

অনুবাদ :- দুষ্কৃতি, বিবেকহীন, নরাধম ব্যক্তিরা মায়ার প্রভাবে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে এবং সেইজন্য তারা আসুরিক প্রবৃত্তির অধিকারী হয় এবং এই কারণে তারা আমার ভজনা করে না।।১৫।।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং # জনাঃ সুকৃতিনঃ অর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুঃ অর্থার্থী # জ্ঞানী চ ভরত-ঋষভ।।১৬।।

চতুর্বিধা = চার ধরণের; ভজন্তে = ভজনা করে; মাং = আমাকে; সুকৃতিনঃ = সৎ কর্ম আচরণকারী।।১৬।।

অনুবাদ:- হে শ্রেষ্ঠ ভরতবংশীয় অর্জুন! চার প্রকারের ব্যক্তি আছেন যাঁরা সৎ কর্ম সম্পাদনকারী। তাঁরা হলেন— আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। এঁরা আমার ভজনা করেন।।১৬।।

ব্যাখ্যা :- 'আর্ত' পদের অর্থ - যাঁরা শারীরিক বা মানসিক সন্তাপ, বিপদ, শত্রুভয়, রোগ, অপমান, চোর, ডাকাত, আততায়ী বা হিংস্র জন্তুর আক্রমণ ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিচলিত হয়ে হৃদয়ের পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করেন তাঁদেরকে আর্ত বলা হয় যেমন দ্রৌপদী।

জিজ্ঞাসু পদের অর্থ — যিনি ধন, জন, দারা, পুত্র, পরিবার, রোগ, শোক, মৃত্যুভয় প্রভৃতি সমস্তকে অগ্রাহ্য ক'রে একনিষ্ঠচিত্তে ভগবানের তত্ত্ব জানতে চান এবং ভগবানের ভজনা করেন তাঁকে জিজ্ঞাসু বলা হয় যেমন উদ্ভব, রাজা পরীক্ষিত প্রভৃতি।

অর্থার্থী পদের অর্থ— যিনি ঐহিক ও পারত্রিক তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী এবং লৌকিক ও পারলৌকিক সুখলাভের জন্য ভজনা করেন যেমন সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতি।

জ্ঞানী পদের অর্থ— যিনি সম্যকরূপে জানেন যে অন্তরের কামনা বাসনা মায়া থেকে উদ্ভূত এবং সেই জন্য কামনা বাসনাকে মন থেকে বহিষ্কার ক'রে ঈশ্বরের ভজনায় রত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করেছেন এবং অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই তাঁকে জ্ঞানী বলা হয় যেমন শুকদেব, সনকাদি, নারদ, ভীষ্ম প্রভৃতি মহাত্মাগণ ভগবান এখানে জ্ঞানী ভক্ত বলতে তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তকে নির্দেশ করেননি। তিনি এখানে জ্ঞানী ভক্ত বলতে প্রেমিকভক্তকে নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ যে ভক্ত শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে, সর্ব অবস্থায়, সর্ব প্রকারে তাঁর প্রেমে আপ্লুত থাকেন তাঁরাই হলেন ভগবানের জ্ঞানীভক্ত।।১৬।।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত # একভক্তিঃ বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনঃ অত্যর্থম্ # অহং স চ মম প্রিয়ঃ।।১৭।।

তেষাং = তাদের মধ্যে; নিত্যযুক্তঃ = সদা যুক্ত; একভক্তিঃ = একমাত্র আমাতেই ভক্তিরত; বিশিষ্যতে = শ্রেষ্ঠ; অত্যর্থম্ = অতীব।।১৭।।

অনুবাদ :- আমার এই চার প্রকার ভজনাকারীর মধ্যে জ্ঞানী ভজনাকারীই শ্রেষ্ঠ কারণ তিনি সর্বদা একমাত্র আমাকেই ভক্তি করেন। আমি জ্ঞানী ভক্তের খুবই প্রিয় এবং জ্ঞানী ভক্তগণ আমারও খুবই প্রিয়।।১৭।।

ব্যাখ্যা :- জ্ঞানী ভক্ত ভগবানের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কেন? রামানুজাচার্য এই প্রশ্নের খুব সংক্ষেপে যথার্থ উত্তর দিয়েছেন — "মদেক প্রাপ্যস্য ময়া যোগো নিত্যঃ" ইতি। অর্থাৎ সেই ভক্ত একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই লাভ করার জন্য তাঁর সঙ্গে সদা সর্বদা যুক্ত থাকেন। কিন্তু অন্য প্রকারের ভক্ত যতক্ষণ ভগবানের

নিকট থেকে তাঁদের বাঞ্ছিত বস্তু লাভ না হয় ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। কৃষ্ণের জ্ঞানী ভক্তদের মধ্যে সকলের উপরে আছেন ভক্ত প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপুর আদেশে কুহক, অন্ধক, তক্ষক প্রভৃতি বিষাক্ত সাপেরা যখন তাঁকে দংশন করতে শুরু করে তখন তিনি এমনই নিবিষ্টচিত্তে কৃষ্ণের চিন্তায় এতই মগ্ন ছিলেন যে সর্পদংশনের জ্বালা তিনি অনুভবই করতে পারেননি—

স ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দৃশ্যমানো মহোরগৈঃ।
ন বিবেদাত্মনো গাত্রং তৎস্মৃত্যাহ্লাদসংস্থিতঃ।।

—বিষ্ণুপুরাণ ১।১৭।৩৯

উদারাঃ সর্বে এব এতে # জ্ঞানী তু আত্মা এব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্ত আত্মা # মাম্ এব অনুত্তমাং গতিম্।।১৮।।

উদারাঃ = মহৎ; তু = কিন্তু; আস্থিতঃ = আশ্রয় ক'রে থাকেন; সঃ হি = তিনিই; যুক্ত আত্মা = আমার সঙ্গে একাত্ম; মাম্ এব = আমাকেই; অনুত্তমাং গতিম্ = সর্বোৎকৃষ্ট ও পরম গতি।।১৮।।

অনুবাদ :- এই চার প্রকার ভক্তের মধ্যে সকলেই মহৎ। কিন্তু আমার মতে জ্ঞানী ভক্ত আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় কারণ জ্ঞানী ভক্ত সদা সর্বদা আমার প্রতি তাঁর মন-প্রাণ অর্পণ ক'রে থাকেন এবং আমাকেই সর্বোৎকৃষ্ট ও পরম গতি জ্ঞানে আমাকেই আশ্রয় ক'রে থাকেন।।।১৮।।

ব্যাখ্যা :- ভগবানের নিকট কোন ভক্তই ছোট নয় এমনকি তাঁর অভক্তকেও তিনি করুণা করেন। কিন্তু তথাপি ব্যবহারগত দিক থেকে প্রিয়-অপ্রিয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ তারতম্য তো থাকেই। যেমন তাঁর প্রিয় ভক্তদের মধ্যে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের চাইতেও উদ্ধব অধিকতর প্রিয় আবার তাঁর অপেক্ষাও গোপিকাগণ অধিক প্রিয়। অর্থাৎ যে ভক্ত তাঁর প্রতি যত বেশী অনন্যচিত্ত সেই ভক্তই তাঁর তত বেশী প্রিয়। জ্ঞানী ভক্ত সর্বদা শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত স্থাপন ক'রে রাখেন, কোন সময় কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু চিন্তা করেন না, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে তাঁর পদে অনন্য ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই কামনা করেন না, তিনি কৃষ্ণ ব্যতীত একদণ্ডও থাকতে পারেন না, তাঁর নিকট কৃষ্ণ ব্যতীত জগতটাই শূন্য, তিনি কৃষ্ণকেই পরম গতি, পরমাশ্রয় মনে করেন। সেইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে জ্ঞানী ভক্ত তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়।।১৮।।

বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে # জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি # স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।।১৯।।

বহূনাং = অনেক; জন্মনাম্ = জন্মের; অন্তে = পরে; জ্ঞানবান্ = জ্ঞান লাভ; প্রপদ্যতে = লাভ করে।

অনুবাদ :- অনেক অনেক জন্ম অতিবাহিত করার পর জ্ঞানী ভক্তের পরম জ্ঞান হয় যে এই বাসুদেব আমিই জগতের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছি এবং তখনই তিনি আমার শরণ গ্রহণ করেন। এইরূপ ভক্ত খুবই দুর্লভ।।১৯।।

কামৈঃ তৈঃ তৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ # প্রপদ্যন্তে-অন্য-দেবতাঃ।
তং তং নিয়মম্ আস্থায় # প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।।২০।।

হৃতজ্ঞানাঃ = যাদের বুদ্ধিনাশ হয়েছে; প্রপদ্যন্তে = পূজা ক'রে থাকে; আস্থায় = আশ্রয় গ্রহণ ক'রে; স্বয়া = নিজের; প্রকৃত্যা = স্বভাবের; নিয়তাঃ = বশীভূত হয়ে।

অনুবাদ :- যাদের অন্তর দারা-পুত্র-পরিবার, ধন-সম্পদ ইত্যাদিতে প্রবলভাবে আসক্ত তাদের বুদ্ধিনাশ হয়েছে। তারা অন্যান্য দেবতাদের পূজার পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে কেবল তাদেরই পূজা ক'রে থাকে।। ২০।।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ # শ্রদ্ধয়া অর্চিতুম্ ইচ্ছতি।
তস্য তস্য অচলাং শ্রদ্ধাং # তামেব বিদধামি অহম্।২১।।

যঃ যঃ = যে যে; যাং যাং তনুং = যে যে দেবমূর্তি; শ্রদ্ধয়া = শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে; অর্চিতুম্ = পূজা করতে; ইচ্ছতি = ইচ্ছা করে; তস্য তস্য = তার তার; অচলাং শ্রদ্ধাং = অচলা ভক্তি ; তাম্ এব = সেই দেবতাতেই; বিদধামি = ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে থাকি; অহম্ = আমি।।২১।।

অনুবাদ :- যে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে যে যে দেবতার পূজাই করুক না কেন আমি তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য সেই সেই দেবতাতে তাদের অচলা ভক্তি স্থাপনের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে থাকি।।২১।।

ব্যাখ্যা :- ইন্দ্র, সূর্যাদি যত দেবতারই পূজা মানুষ করেন সেই সকল দেবতার অভ্যন্তরে নারায়ণের অবস্থান। তাঁরা সকলেই নারায়ণের শরীর। কিন্তু ঐসব

মানুষ এই সত্যটি জানেন না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে —"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং" (৩।৭।৩) অর্থাৎ যিনি পৃথিবীদেবতার অভ্যন্তরে অবস্থান করেন এবং পৃথিবী তাঁর শরীর কিন্তু পৃথিবীদেবতা তাঁকে জানেন না, জলদেবতা যাঁর শরীর সেই নারায়ণ জলদেবতার অভ্যন্তরে অবস্থান করেন তথাপি সেই জলদেবতাও নারায়ণকে জানেন না — "যঃ অপ্সু তিষ্ঠন্ অদ্ভ্যঃ অন্তরো যমাপো ন বিদুঃ যস্য আপঃ শরীরং"(৩।৭।৪), অগ্নিদেবতা তাঁর শরীর এবং তিনি অগ্নিদেবতার অভ্যন্তরে অবস্থান করলেও অগ্নিদেবতা তাঁকে জানেন না— "যঃ অগ্নৌ তিষ্ঠন্ অগ্নেঃ অন্তরো যমগ্নিঃ ন বেদ যস্য অগ্নিঃ শরীরং" (৩।৭।৫), যে অন্তরিক্ষ তাঁর শরীর তিনি সেই অন্তরিক্ষের অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকলেও অন্তরিক্ষ দেবতাগণ তাঁকে জানেন না— "যঃ অন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্ অন্তরিক্ষাৎ অন্তরো যম্ অন্তরিক্ষং ন বেদ যস্য অন্তরিক্ষং শরীরং" (৩।৭।৬), যে বায়ু তাঁর শরীর সেই বায়ুদেবতার অভ্যন্তরে তিনি বাস করলেও সেই বায়ুদেবতা তাঁকে চেনেন না — "যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োঃ অন্তরো যং বায়ুঃ ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং"(৩।৭।৭), সূর্য যাঁর শরীর সেই নারায়ণ সূর্যের ভিতরে অবস্থান করলেও সূর্যদেবতা তাঁকে জানেন না — "য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাৎ অন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্য আদিত্যঃ শরীরং" (৩।৭।৭) প্রভৃতি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সূর্যাদি সমস্ত দেবতাই কৃষ্ণের শরীর অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণময়। সুতরাং সেই সেই দেবতাদের পূজা করার অর্থ হল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা আর যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরম উদার সেইজন্য সেই সমুদায় দেবতাদের পূজা করলে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে তাঁদের উপরেই ভক্তের অচলা ভক্তি স্থাপনের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন।। ২১।।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ # তস্য আরাধনম্ ঈহতে।

লভতে চ ততঃ কামান্ # ময়া এব বিহিতান্ হি তান্।২২।।

ঈহতে = পূজা করে; লভতে = লাভ করে; ততঃ = সেখান থেকে; কামান্ = কাম্যবস্তু; ময়া এব = আমার দ্বারাই; বিহিতান্ = বিহিত।। ২২।।

অনুবাদ :- সেই ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে সেই সেই দেবতার পূজা করে এবং তাদের জন্য আমি সেই সেই দেবতাদের নিকট থেকে যে যে কাম্যবস্তু পাবার ব্যবস্থা করে থাকি তারা সেই সেই বস্তু সেই সেই দেবতাদের নিকট থেকে পেয়ে থাকে।।২২।।

অন্তবৎ তু ফলং তেষাং # তৎ ভবতি অল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি # মদ্ভক্তা যান্তি মাম্ অপি।।২৩।।

অন্তবৎ = নশ্বর; তু = কিন্তু; তেষাং = সেই সমস্ত; ভবতি = হয়; অল্পমেধসাম্ = অল্পবুদ্ধি; দেবান্ = দেবতাদের; দেবযজঃ = দেবতাদের পূজকগণ; যান্তি = লাভ করে; মৎভক্তাঃ = আমার ভক্তগণ; যান্তি মাম্ = আমাকেই লাভ করে।। ২৩।।

অনুবাদ :- এই সমস্ত উপাসকগণের বুদ্ধি অল্প। তাঁরা ঐ সমস্ত দেবতাদের পূজা ক'রে যে ফললাভ করেন সেগুলি নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী। ওই সমস্ত উপাসকগণ ঐ সব দেবতাদের পূজা ক'রে দেবলোকে স্থান পান। কিন্তু যাঁরা আমার পূজা করেন তাঁরা স্বয়ং আমাকেই লাভ করেন।।২৩।।

অব্যক্তং ব্যক্তিম্ আপন্নং # মন্যন্তে মাম্ অবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবম্ অজানন্তো # মম অব্যয়ম্ অনুত্তমম্।।২৪।।

অব্যক্তং = অক্ষয় অবিনাশী; ব্যক্তিম্ আপন্নং = প্রাকৃত মনুষ্যরূপে; মন্যন্তে = মনে করে; মাম্ = আমাকে;অবুদ্ধয়ঃ = অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ; পরং = শ্রেষ্ঠ; ভাবম্ = স্বরূপ; অজানন্তঃ = না জেনে; মম = আমার; অব্যয়ম্ = চির অক্ষয়; অনুত্তমম্ = সর্বোত্তম।।২৪।।

অনুবাদ:- অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার অক্ষয় অবিনাশী সর্বোত্তম অব্যক্ত রূপ দেখতে পায় না। সেইজন্য তারা ভাবে যে আমি তাদেরই মত একজন রক্ত-মাংসের মানুষ।।২৪।।

ন অহং প্রকাশঃ সর্বস্য # যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়ঃ অয়ং ন অভিজানাতি # লোকো মাম্ অজম্ অব্যয়ম্।।২৫।।

ন = না; অহং = আমি; প্রকাশঃ = প্রকাশিত; সর্বস্য = সকলের সামনে; যোগমায়া-সমাবৃতঃ = যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকি; মূঢ়ঃ লোকঃ = অজ্ঞানীরা; অয়ং = এই সমস্ত; ন অভিজানাতি = জানে না; মাম্ = আমাকে; অজম্ = জন্মরহিত; অব্যয়ম্ = অক্ষয় অবিনাশী।।২৫।।

অনুবাদ :- আমি সর্বদা যোগমায়ার আড়ালে থাকি। সেইজন্য আমি সব সময় প্রকাশিত হই না এবং এই কারণে অজ্ঞানীরা আমার জন্মরহিত চির অক্ষয় রূপ দেখতে পায় না।।২৫।।

ব্যাখ্যা :- যোগমায়া কি? মায়া দুই প্রকার — মহামায়া ও যোগমায়া। জগৎ সংসারের সকল জীব মহামায়ার মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। সেই মায়ার কবল থেকে সে বেড়িয়ে আসতে পারে না। তাই সে জীবনের প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। সে এই মায়ার হাতের পুতুল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকেন। কিন্তু তিনি সেই মায়ার বশ নন, বরং সেই মায়াই তাঁর বশে থাকে। এ হল যোগমায়া। শ্রীকৃষ্ণের সংকল্পকে যোগ বলা হয়। সেই যোগের দ্বারা যে মায়া লাভ করা যায় তাই হল যোগমায়া। শ্রীকৃষ্ণ জানেন কখন এই যোগমায়াকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি সমর্পিত চিত্ত কামনা-বাসনাহীন জ্ঞানী ভক্তের সামনে তাঁকে আবির্ভূত হতে হবে যার ফলে সেই জ্ঞানী ভক্ত তাঁর অব্যয়, অক্ষয় মোহন রূপ দর্শন ক'রে তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের অভিলাষ পূর্ণ করতে পারেন। সুতরাং মহামায়া জীবের বশ নয়, কিন্তু যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের বশ।।২৫।।

বেদ অহং সমতীতানি # বর্তমানানি চ অর্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি # মাং তু বেদ ন কশ্চন।।২৬।।

সমতীতানি = অতীত; ভবিষ্যাণি চ ভূতানি = ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান; বেদ = জান; ন কশ্চন = কেউই না।।২৬।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! অতীতে যা কিছু ঘটেছে তার সবই আমি জানি, বর্তমানে যা যা ঘটছে তার সবই আমি জানি এবং ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে তার সমস্ত কিছুও আমি জানি। কিন্তু আমার প্রকৃত স্বরূপ কেউই জানতে পারে না।।২৬।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ভগবান্ তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে একটি বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত জীবসমূহকে জানেন কিন্তু জীবসমূহ তাঁকে জানেন না। অর্থাৎ তিনি এখানে বলেছেন যে তিনি সর্বজ্ঞ কিন্তু জীবগণ অল্পজ্ঞ। এই বিশ্বচরাচরে একমাত্র ব্রহ্মাই হলেন সর্বজ্ঞ, তিনি জীব নন, তিনি জীবের অনন্ত উর্ধ্বে। জীব তো বহু কিন্তু ভগবান্ পরমেশ্বর ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। ভগবান্ ব্যতীত জীব কখনও সর্বজ্ঞ হতে পারে না। তাই জীব কখনও ব্রহ্ম হতে পারে না। কিন্তু জীবদেহধারী মায়াবাদীরা নিজেদেরকেই ব্রহ্ম ব'লে ভাবেন। অল্পজ্ঞ মায়াবাদীরা নিজেদের অজ্ঞানতার কারণে এরূপ ভেবে থাকেন। অল্পজ্ঞ জীবের সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সমগ্র স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা হবে কি প্রকারে? ভগবানের স্বরূপ যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকার কারণে অজ্ঞ জীব তাঁকে একজন সামান্য ব্যক্তি মনে করে। তাঁর সর্বজ্ঞতাকে ঘোষণা ক'রে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ১।৯ মন্ত্রে বলা হয়েছে — "জ্ঞ-অজ্ঞৌ দ্বৌ অজৌ ঈশ-অনীশৌ অজা হি একা ভোক্তৃ-ভোগ্য-অর্থ-যুক্তা। অনন্তঃ চ আত্মা বিশ্বরূপঃ হি অকর্তা" ইতি। অর্থাৎ ব্রহ্ম হলেন 'জ্ঞ' অর্থাৎ সর্বজ্ঞ কিন্তু জীব হল অজ্ঞ। তিনি 'ঈশ' অর্থাৎ সকলের প্রভু, মায়ার অধীন নন, তিনি মায়াধীশ, স্বাধীন, স্বতন্ত্র। একমাত্র তিনিই হলেন অজ অর্থাৎ জন্মরহিত অর্থাৎ তাঁর জন্ম হয় না। তিনি অনাদি, অনন্ত, সর্বস্বরূপ এবং সেইজন্য তাঁর কোন কর্তৃত্ববোধ নাই।

ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের পার্থক্য এইখানেই। সুতরাং তিনি জীবদেহে বিরাজমান হলেও তিনি জীব নন। তিনি বলেছেন যে, অল্পজ্ঞ মায়াবদ্ধ জীব তাঁকে জানতে পারে না। তাহলে কি সত্যই তাঁকে কেউই জানতে পারে না? তাহলে তিনি কি সকলের নিকটই অধরা? এর উত্তরে ভগবান্ বলেছেন যে, যে সকল ভক্ত তাঁদের অন্তরে তাঁর প্রতি অহৈতুকী অর্থাৎ কোনপ্রকার প্রত্যাশাবিহীন অনন্য ভক্তি পোষণ করেন তাঁদের দৃষ্টি হতে মায়ার অঞ্জন স্খলিত হয়ে অন্তরে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে এবং তখন তাঁর প্রতি অনন্য ভক্তি পরায়ণ একমাত্র সেই সমস্ত ভক্তবৃন্দই তাঁর স্বরূপ জানতে পারেন। মুণ্ডকোপনিষদের ৩।২।৩

মন্ত্রে বলা হয়েছে — "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য'। অর্থাৎ যে সাধক পরমাত্মাকে বরণ করেন একমাত্র তিনিই সেই আত্মবরণের দ্বারা অর্থাৎ 'আমিই সেই পরমাত্মা' এই অভেদ অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাঁকে লাভ করেন। সাধকের এই প্রয়াস একমাত্র তখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যখন তিনি পরমাত্মাকে অনন্যচিত্তে ভক্তি অর্পণ করেন। এক কথায় ভগবানকে লাভ করার একমাত্র উপায় হল তাঁর প্রতি একাগ্রচিত্ততা। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণ নিয়ে ভগবানকে লাভ করা সম্ভব নয়।।২৬।।

ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থেন # দ্বন্দ্ব-মোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং # সর্গে যান্তি পরন্তপ।।২৭।।

ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থেন = ইচ্ছা-দ্বেষ জনিত; সর্বভূতানি = জীবসকল; সম্মোহং = মোহিত; সর্গে = উৎপত্তিকালে; যান্তি = লাভ করে; পরন্তপ = শত্রুনাশকারী।।২৭।।

অনুবাদ :- হে শ্রেষ্ঠ ভরতবংশীয় শত্রু নাশকারী অর্জুন! জীবসমূহ উৎপত্তিকালে অর্থাৎ স্থূলদেহে জন্মকালেই ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহের দ্বারা মোহিত হয়ে পরে।।২৭।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনেক স্থানেই বলেছেন যে, কাম-ক্রোধ, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি রিপুগুলি মানুষের জীবনের পরম শত্রু। এগুলি পাপ, অজ্ঞানতা ও অবিদ্যার ফল। এই রিপুগুলি মানুষকে ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত ক'রে বিপথগামী ক'রে তোলে। এই কাম-ক্রোধ, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি রিপুগুলিকে ভগবান্ এখানে ইচ্ছা-দ্বেষ নামে বর্ণনা করেছেন। কোন বস্তুকে লাভ করার যে বাসনা তাকে ইচ্ছা বলা হয় এবং সেই বস্তু লাভে ব্যর্থ হলে অন্তরে যে রোষ জন্মে তাকেই দ্বেষ বলা হয়। ভগবান্ এখানে বলছেন যে মানুষ জন্মকালেই ইচ্ছা-দ্বেষ, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সেটি কি রকম ? একটি স্থূল উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে উত্তমরূপে বোঝানো যেতে পারে। একজন শিশুর যখন জন্ম হয় তখন সে মাতৃস্তন্য পান করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এটি তার ইচ্ছা। কিন্তু সে তখন মাতৃস্তন্য পান করতে না পারলে ক্রন্দন করে। সেটি হল তার দ্বেষ। এই সুখ ও দুঃখের মধ্যে যে সংঘাত তাকে শিশু অতিক্রম করতে পারে না। তাই এই সংঘাতের দ্বারা মোহিত হয়ে সে ক্রন্দন শুরু করে। অনুরূপভাবে প্রাকৃত মানুষ পার্থিব জগতের অসৎ অর্থাৎ নশ্বর বস্তুর

প্রাপ্তিতে ভ্রান্ত সুখ এবং অপ্রাপ্তিতে মিথ্যা দুঃখের সংঘাতের দ্বারা এত বেশী মোহিত থাকে সে এই মোহের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ অনুভবে ব্যর্থ হয়। বৃহত্তর অর্থে এই ইচ্ছা-দ্বেষ পরবর্তীকালে মানুষের জীবনে উত্তরোত্তর ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং মানুষের জীবনকে ব্যর্থ, বিষময় করে তোলে। এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই দুষ্কর। কিন্তু যে সমস্ত জ্ঞানী পুরুষ সুখ ও দুঃখের এই সংঘাতকে অতিক্রম করতে পারেন তাঁদের অন্তর হতে পার্থিব জগতের তুচ্ছ, ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায় এবং তখন তাঁরা শান্ত-সমাহিত চিত্তে পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হতে পারেন।।২৭।।

যেষাং তু অন্তগতং পাপং # জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্ব-মোহ-নির্মুক্তা # ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ।।২৮।।

যেষাং তু = কিন্তু যাদের; অন্তগতং = ক্ষয় হয়েছে; পুণ্যকর্মণাম্ জনানাং পুণ্যকর্ম আচরণকারী ব্যক্তিগণের; তে = তাঁরা; দ্বন্দ্ব-মোহ- নির্মুক্তা = সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দের প্রতি মোহমুক্ত; ভজন্তে = ভজনা করে; মাং = আমাকে; দৃঢ়ব্রতাঃ = দৃঢ়চিত্ত।।২৮।।

অনুবাদ :- কিন্তু যখন যে সব পুণ্যবান ব্যক্তির পুণ্যকর্ম আচরণ করার জন্য তাঁদের পাপের ক্ষয় হয়ে যায় তখন আর তাঁদের অন্তরে সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দের প্রতি কোন মোহ থাকে না। তখন তাঁরা দৃঢ়চিত্তে আমার ভজনা করেন।।২৮।।

জরা-মরণ-মোক্ষায় # মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তৎ বিদুঃ কৃৎস্নম্ # অধ্যাত্মং কর্ম চ অখিলম্।।২৯।।

জরা-মরণ-মোক্ষায় = জরা ও মরণের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে; মাম্ = আমাকে; আশ্রিত্য = আশ্রয় ক'রে; যতন্তি = যত্ন করেন; যে = যাঁরা; তে = তাঁরা; তৎ ব্রহ্ম = সেই ব্রহ্মকে; বিদুঃ = জানেন; কৃৎস্নম্ = সমস্ত; অধ্যাত্মং = অধ্যাত্মতত্ত্বকে; কর্ম চ অখিলম্ = সমস্ত কর্ম।। ২৯।।

অনুবাদ :- যাঁরা জরা ও মরণের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে এবং মোক্ষ লাভ করতে ইচ্ছুক হন তাঁরা আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার মধ্যে আশ্রয় নেন এবং তার ফলে আমাতে সমর্পিতপ্রাণ পুণ্যাত্মাগণ ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব ও অখিলকর্মতত্ত্ব সমস্ত কিছুই জানতে পারেন।।২৯।।

সাধিভূত-অধিদৈবং মাং # সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণ-কালে অপি চ মাং # তে বিদুঃ যুক্ত-চেতসঃ।। ৩০।।

সাধিভূত-অধিদৈবং = অধিভূত ও অধিদৈবের সহিত; সাধিযজ্ঞং = অধিযজ্ঞের সহিত; যে বিদুঃ = যিনি জানেন; তে = তাঁরা; যুক্ত-চেতসঃ = চিত্ত স্থাপন ক'রে।। ৩০।।

অনুবাদ :- যাঁরা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞসহ পূর্ণরূপে আমাকে জানেন তাঁদের চিত্ত আমার প্রতি আসক্ত থাকে এবং মৃত্যুকালেও তাঁরা আমাকে বিস্মৃত হন না।।৩০।।

ব্যাখ্যা :- রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দসহ এই সমগ্র নশ্বর জগৎ অর্থাৎ ভগবানের অপরা প্রকৃতিকে এবং গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে কথিত ক্ষর পুরুষ যিনি ভূত অর্থাৎ প্রাণিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ দেহকে অধিকার ক'রে থাকেন তাঁকে 'অধিভূত' বলা হয়। যিনি ইন্দ্র, প্রজাপতি আদি সমস্ত দেবতাদেরও উপরে, যিনি সমস্ত দেবতাকে অধিকার ক'রে আছেন, যিনি সমস্ত জীব ও ইন্দ্রিয়ের শাসনকর্তা সেই আদিপুরুষ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে 'অধিদৈব' বলা হয়। যে অব্যয় অব্যক্ত ভগবান্ সমস্ত প্রাণীর অন্তরে অন্তর্যামীরূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ হলেন অধিযজ্ঞ।।৩০।।

—ঃ সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ঃ—

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষর-ব্রহ্মযোগ

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিম্ অধ্যাত্মং # কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্ # অধিদৈবং কিম্ উচ্যতে।।১।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন — হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম কি? অধিভূত এবং অধিদৈবই বা কাকে বলে? ১

অধিযজ্ঞঃ কথং কঃ অত্র # দেহে অস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়ঃ # অসি নিয়ত আত্মভিঃ।।২।।

অধিযজ্ঞঃ কঃ = অধিযজ্ঞ কে; অত্র দেহে = এই দেহে; অস্মিন্ = এই; কথং = কি ভাবে; প্রয়াণকালে = মৃত্যুর সময়; জ্ঞেয়ঃ = জানা যায়; অসি = হও; নিয়ত আত্মভিঃ = সংযুক্ত চিত্ত।।২।।

অনুবাদ :- কে এই অধিযজ্ঞ? তিনি কিভাবে এই দেহে অবস্থান করেন? সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ কিভাবে মৃত্যুর সময় আপনাকে জানতে পারেন?।।২।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং # স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে।
ভূত-ভাব-উদ্ভব-করো # বিসর্গঃ কর্ম-সংজ্ঞিতঃ।। ৩।।

অক্ষরং = চিরস্থায়ী; অধ্যাত্মম্ উচ্যতে = অধ্যাত্ম ব'লে কথিত হয়; ভূত-ভাব-উদ্ভব-করঃ = জীবসমূহের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ; বিসর্গঃ = দ্রব্যত্যাগ; কর্ম-সজ্ঞিতঃ = কর্ম নামে অভিহিত।।৩।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন— যিনি অক্ষর অর্থাৎ চিরস্থায়ী, যাঁর কখনও বিনাশ হয় না সেই পরম তত্ত্ব হলেন ব্রহ্ম। তিনি প্রতিটি পৃথক জীবদেহে জীবাত্মা হিসাবে বাস করেন এবং এইটিকে তাঁর স্বভাব তথা অধ্যাত্ম বলা হয়। জীবগণের

উদ্ভব অর্থাৎ উৎপত্তিকর ও বিসর্গ অর্থাৎ দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞকে কর্ম বলা হয়।।৩।।

ব্যাখ্যা :- একথায় জীবকে ব্রহ্ম বলা হয়। দেহটি জীব নয়, দেহের ভিতরে যিনি বাস করেন তিনি জীবাত্মা এবং তাঁকেই ব্রহ্ম বলা হয়। দেহটি তাঁর খোলস বা পোষাক। মায়াগ্রস্ত মানুষ দেহকেই জীব ব'লে ভুল করে। ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের মধ্যে তফাৎ আছে। জীব ব্রহ্ম কিন্তু যিনি সকলের অর্থাৎ ব্রহ্মেরও উপরে একমাত্র সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরব্রহ্ম। সেই পরব্রহ্ম স্বয়ংই অংশরূপে সমস্ত জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। এইটি হল তাঁর অভ্যাস বা স্বভাব এবং শরীর, মন, বুদ্ধিরূপ অপরাশক্তিকে আশ্রয় করার তাঁর এই অভ্যাসকেই অধ্যাত্ম বলা হয়। তিনি যে শরীর গ্রহণ করছেন এবং একসময় সেই শরীর পরিত্যাগ করছেন সেই বিষয়টিকে তাঁর কর্ম বলা হয়।।৩।।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ # পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞঃ অহম্ এব অত্র # দেহে দেহভৃতাং বর।।৪।।

ক্ষরঃ = নশ্বর; অহম্ এব = আমিই; দেহভৃতাং বর = প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।।৪।।

অনুবাদ :- হে নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন! নশ্বর দেহকে অধিভূত বলা হয় আর এই দেহসমূহের যিনি অধিপতি সেই বিরাট্ পুরুষ হলেন অধিদৈব এবং এই দেহে অবস্থিত আমিই হলাম অধিযজ্ঞ।।৪।।

ব্যাখ্যা :- জীবের দেহসহ এই সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু নশ্বর অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশশীল তাকেই অধিভূত বলা হয়। অধিদৈব শব্দের অর্থ হল অধিষ্ঠাতা দেবতা। সূর্যমণ্ডলে অবস্থিত বিরাট্ পুরুষ নিজের অংশরূপ সমস্ত দেবতাদের অধিপতি। এইজন্য তিনি অধিদৈব। নিঃসন্দেহে তিনি হলেন আদিপুরুষ, সকল প্রাণীর আদি কর্তা ব্রহ্মা। আর স্বয়ং পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যিনি সকল জীবের অন্তরে নিয়ত বাস করেন তিনিই হলেন অধিযজ্ঞ।।৪।।

অন্তকালে চ মাম্ এব # স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং # যাতি নাস্তি অত্র সংশয়ঃ।। ৫।।

অন্তকালে = দেহান্তরপ্রাপ্তির সময়; চ = এবং; মাম্ এব = আমাকেই;

মুক্ত্বা কলেবরম্ = দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যান; যঃ প্রয়াতি = প্রয়াণ করেন; সঃ মদ্ভাবং যাতি = তিনি আমারই ভাব লাভ করেন; নাস্তি = নাই; অত্র = এখানে; সংশয়ঃ = সন্দেহ।। ৫।।

অনুবাদ :- যিনি অন্তকালে অর্থাৎ দেহান্তরপ্রাপ্তির সময় আমাকে স্মরণ করতে করতেই পরলোক গমন করেন তিনি নিঃসন্দেহে আমারই ভাব প্রাপ্ত হন।।৫।।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং # ত্যজতি অন্তে কলেবরম্।
তং তমেব এতি কৌন্তেয় # সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ।। ৬।।

যং যং = যে যে বিষয়ের; স্মরন্ = চিন্তা করতে করতে; ভাবং = বিষয়; ত্যজতি = ত্যাগ করেন; অন্তে = অন্তিমে; কলেবরম্ = দেহ; তং তমেব = সেই বিষয়কেই; এতি = প্রাপ্ত হন; সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ = সর্বদা সেই বিষয়ের চিন্তায় বিভোর।।৬।।

অনুবাদ :- হে কুন্তীপুত্র অর্জুন! দেহান্তরপ্রাপ্তির সময় যে জন যে যে বিষয়ের চিন্তা করতে করতে ভবপারের দিকে পা বাড়ায় সে মৃত্যুর পর সেই সেই বিষয়ই লাভ করে থাকে।। ৬।।

ব্যাখ্যা :- ভাব শব্দের অর্থ হল মনঃস্থিত বিষয়। মানুষ তার অন্তরে অবস্থিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে সারা জীবন অন্তরে এই তিনগুণের তারতম্য অনুযায়ী ঈশ্বর, দেবতা, মানুষ, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ, জমি-জায়গা, ঘর-বাড়ী, গহনা, পোষাক প্রভৃতি কোন না কোন বিষয়ে অধিক চিন্তা করে। এই সমস্ত বিষয়গুলিকেই ভাব বলা হয়। যে বিষয়কে সে অত্যধিক ভালবাসে সেই বিষয়ের চিন্তায় সর্বদা বিভোর থাকা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় এবং মৃত্যুর সময়ও সে সেই বিষয়টি সম্পর্কেই ভাবতে থাকে এবং পরজন্মে সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। যেমন সত্ত্বগুণের অধিকারী মানুষ যদি ঈশ্বরের সম্পর্কে ভাবে তাহলে সে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে, যদি সে মানুষ, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির সম্পর্কে ভাবতে থাকে তাহলে সেই রূপেই তার জন্ম হয়। কিন্তু কোন রজোগুণ বা তমোগুণের অধিকারী মানুষ যদি গৃহ, গহনা প্রভৃতি সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে পরলোক যাত্রা করে তাহলে তার কি হবে? উত্তর হল তারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ

হবে। শিয়াল, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীরা তো মাটির তলায় ঘর নির্মাণ করে থাকে অথবা অনেকে গৃহপালিত পশুর গলায় গহনা পড়ায়। সেই ব্যক্তি তামসিক কাজে অনুরক্ত থাকলে ঐ রকম শিয়াল, ইঁদুর প্রভৃতি ইতর প্রাণী হয়ে জন্মাবে এবং তাদের মত মাটির তলায় ঘর পাবে অথবা কোন সৌখিন গৃহে গহনা পরিহিত গৃহপালিত পশু হয়ে জন্মাবে। মন হল একটি দর্পণ। সেই দর্পণে যার ছায়া পরে সেই ছায়া সেই দর্পণে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং পরজন্মে তার জীবনে সেই ছায়ার প্রতিফলন ঘটে যেমন ঘটেছিল রাজা ভরতের ক্ষেত্রে। রাজা ভরত একটি হরিণশিশুর চিন্তা করতে করতে পরলোক গমন করেন এবং পরজন্মে তিনি হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করেন ।। ৬।।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু # মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ।
ময়ি অর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ # মাম্ এব এষ্যসি অসংশয়ম্।। ৭।।

তস্মাৎ = সেইজন্য; সর্বেষু কালেষু = সব সময়; মাম্ = আমাকে; অনুস্মর = স্মরণ কর; যুধ্য চ = এবং যুদ্ধ কর; ময়ি অর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ = আমাতে চিত্ত অর্পণ কর; মাম্ এব = আমাকেই; এষ্যসি = লাভ করবে; অসংশয়ম্ = কোন সন্দেহ নেই।। ৭।।

অনুবাদ :- সেইজন্য সদা সর্বদা আমাকেই চিন্তা কর এবং যুদ্ধে যুক্ত হও। অর্থাৎ তোমার কর্তব্য পালন কর। এভাবে তুমি আমাতেই তোমার মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করতে পারলে নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করতে পারবে।। ৭।।

অভ্যাসযোগ-যুক্তেন # চেতসা ন অন্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং # যাতি পার্থ অনুচিন্তয়ন্।।৮।।

অভ্যাসযোগ-যুক্তেন = অভ্যাসরূপ যোগে যুক্ত হয়ে; চেতসা = অন্তর; ন অন্যগামিনা = অন্য অভিমুখে না নিয়ে গিয়ে; পরমং পুরুষং = শ্রেষ্ঠ পুরুষকে; দিব্যং = স্বর্গীয়; যাতি = লাভ করে; অনুচিন্তয়ন্ = চিন্তা করতে করতে।। ৮।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! দিব্য পরম পুরুষকে সর্বদা অন্তরে চিন্তা করার অভ্যাস তৈরী ক'রে মনকে অন্য সমস্ত বিষয় থেকে দূরে রেখে সদা তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকলে সেই পরম দিব্য পুরুষকে লাভ করা যায়।। ৮।।

ব্যাখ্যা :- এখানে ভগবান্ কিভাবে পূর্বশ্লোকে বর্ণিত সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় সে বিষয়ে ভক্তদের উদ্দেশ্যে উপায় হিসাবে বলেছেন যে মানুষকে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে সদা সর্বদা নিজেকে যুক্ত রাখার অভ্যাস গ'ড়ে তুলতে হবে। তাহলেই সে একদিন তাঁর চরণে অভয় আশ্রয় লাভ করবে। একজন সাধারণ ভক্ত কিভাবে সদা সর্বদা অন্তরে কৃষ্ণের চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে সে ব্যাপারে পদ্মপুরাণে একটি সুন্দর উপায় বলা হয়েছে—

আদ্যং তু বৈষ্ণবং প্রোক্তং শঙ্খচক্রাঙ্কনং হরেঃ।
ধারণং চ ঊর্ধ্বপুণ্ড্রাণাং তন্মন্ত্রাণাং পরিগ্রহঃ।।
কীর্তনং শ্রবণং চৈব বন্দনং পাদসেবনম্।
তৎপাদোদকসেবা চ তন্নিবেদিতভোজনম্।
তদীয়ানাং চ সেবা চ দ্বাদশী ব্রতনিষ্ঠিতম্।।
তুলসীরোপণং বিষ্ণোর্দেবদেবস্য শাঙ্গিণঃ।
ভক্তিঃ ষোড়শধা প্রোক্তা ভববন্ধনবিমুক্তয়ে।।

অর্থাৎ নারী যেমন বিবাহের পূর্বে ষোল শৃঙ্গারে সজ্জিতা হয় ঠিক সেইভাবে ভক্তও ষোলপ্রকার ভক্তিরূপী শৃঙ্গার আশ্রয় ক'রে সদা সর্বদা কৃষ্ণভজনায় মগ্ন থাকার অভ্যাস গড়ে তুললে অনায়াসে সেই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লাভ করতে পারবে। সেই ষোলপ্রকার ভক্তিরূপী শৃঙ্গার হল — বৈষ্ণব হওয়া, শঙ্খচক্র ধারণ করা, কপালে ঊর্ধ্বমুখ তিলক ধারণ করা, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকথা শ্রবণ করা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য মঙ্গল মূর্তিকে চিন্তা করা, শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করা, শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্তন করা, ভগবানের চরণামৃত পান করা, শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা করা, ভগবানের উদ্দেশ্যে ভোগ অর্পণ ক'রে তারপর সেই ভোগ অন্ন হিসাবে গ্রহণ করা, নিজের আত্মাকে নৈবেদ্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করা, ভগবানের ভক্তদের সেবা করা, নিষ্ঠা সহকারে দ্বাদশী ব্রত পালন করা ও তুলসীবৃক্ষ রোপণ করা ।। ৮।।

কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ # অণোঃ অণীয়াংসম্ অনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপম্ # আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।। ৯।।

কবিং = সর্বজ্ঞ; পুরাণম্ = অনাদি; অনুশাসিতারম্ = নিয়ন্তা; অণোঃ

অণীয়াংসম্ = অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর; ধাতারম্ = বিধাতা; অচিন্ত্যরূপম্ = যা মন ও বুদ্ধির সাহায্যে বোঝা যায় না; আদিত্যবর্ণং = সূর্যের মত জ্যোতিষ্মান; তমসঃ পরস্তাৎ = অজ্ঞানতার অন্ধকার অপেক্ষাও গভীর; অনুস্মরেৎ = স্মরণ করেন।। ৯।।

অনুবাদ :- যিনি কবি অর্থাৎ সর্বজ্ঞ তিনি প্রয়াণকালে সনাতন, জগতের নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর, বিশ্ব সংসারের বিধাতা, মন ও বুদ্ধির অতীত, সূর্যের মত মহা জ্যোতিষ্মান, অজ্ঞান রূপ মোহময় অন্ধকার অপেক্ষাও গভীর যাঁর রহস্য সেই পরম পুরুষকে স্মরণ করেন।। ৯।।

প্রয়াণকালে মনসা অচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চ এব।
ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্।। ১০।।

প্রয়াণকালে = দেহান্তরপ্রাপ্তির সময়; মনসা অচলেন = একাগ্রচিত্তে; ভক্ত্যা= ভক্তি সহকারে; যুক্তঃ যোগবলেন = যোগবলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে; ভ্রুবোঃ মধ্যে = ভ্রূদ্বয়ের মধ্যখানে; প্রাণম্ = প্রাণবায়ুকে; সম্যক্ আবেশ্য = সঠিকভাবে স্থাপন ক'রে; তং দিব্যম্ পরং পুরুষম্ = সেই দিব্য পরম পুরুষকে; উপৈতি = লাভ করেন।।১০।।

অনুবাদ:- যিনি দেহান্তরপ্রাপ্তির সময় একাগ্রচিত্তে, ভক্তি সহকারে, যোগবলে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যখানে প্রাণবায়ুকে স্থাপন ক'রে পরমেশ্বরের চিন্তা করেন তিনি সেই দিব্য পুরুষকে লাভ করেন।।১০।।

যৎ অক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যৎ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যৎ ইচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।।১১।।

যৎ = যাঁকে; অক্ষরং = অবিনাশী; বেদবিদঃ = বেদজ্ঞ জ্ঞানিগণ; বদন্তি = বলেন; বিশন্তি = প্রবেশ করেন; যৎ = যাঁকে; যতয়ঃ = ব্রহ্মচারিগণ;

বীতরাগাঃ = বাসনাশূন্য; যৎ ইচ্ছন্তঃ = পাওয়ার জন্য ইচ্ছা করেন; ব্রহ্মচর্যং চরন্তি = ব্রহ্মচর্য পালন করেন; তৎ = সেই; তে = তোমাকে; পদং = পদ; সংগ্রহেণ = সংক্ষেপে; প্রবক্ষ্যে = বলছি।।১১।।

অনুবাদ :- বেদজ্ঞ জ্ঞানিগণ যাঁকে অবিনাশী বলেন, আসক্তিহীন যোগিগণ যাঁর অন্তরে প্রবেশ করেন, ব্রহ্মচারিগণ যাঁকে পাওয়ার জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করেন, সেই পরম পদ কিভাবে লাভ করা যায় সে বিষয়ে আমি তোমাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।।১১।।

সর্বদ্বারাণি সংযম্য # মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্নি আধায় আত্মনঃ প্রাণম্ # আস্থিতো যোগধারণাম্।। ১২।।

(এটি একটি যুগ্ম শ্লোক হওয়ার কারণে পরবর্তী শ্লোক থেকে 'সঃ যাতি পরমাং গতিম্ = তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন—অংশটি গ্রহণ ক'রে এই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করা হবে)

সর্বদ্বারাণি = সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার; সংযম্য = বন্ধ ক'রে; মনঃ হৃদি নিরুধ্য = মনকে হৃদয়ে আবদ্ধ ক'রে; মূর্ধ্নি = ভ্রুযুগলের মধ্যে; আধায় = স্থাপন ক'রে; আত্মনঃ = আত্মবিষয়ক; প্রাণম্ = প্রাণকে; আস্থিতঃ = অবস্থিত; যোগধারণাম্ = যোগভ্যাস।১২।।

অনুবাদ :- সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ ক'রে, মনকে হৃদয়ে আবদ্ধ ক'রে, ভ্রুযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপন ক'রে যোগে অবস্থিত হয়ে যিনি (আমাকে স্মরণ করতে করতে প্রস্থান করেন তিনি পরমপদ লাভ করেন অর্থাৎ তিনি মোক্ষ লাভ করেন)।।১২।।

ওম্ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম # ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং # স যাতি পরমাং গতিম্।।১৩।।

ব্যাহরন্ = উচ্চারণ করতে করতে; মাম্ = আমাকে; অনুস্মরন্ = স্মরণ করে; যঃ = যিনি; প্রয়াতি = প্রয়াণ লাভ করেন; ত্যজন্ = ত্যাগ ক'রে; দেহং = দেহ; যাতি = লাভ করেন; পরমাং গতিম্ = পরম গতি।।১৩।।

অনুবাদ :- (উপরোক্ত প্রকারে যোগে স্থিত হয়ে) যিনি ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্মবাচক শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহকে ত্যাগ

ক'রে প্রয়াত হন তিনি পরম গতি লাভ করেন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন।। ১৩।।

অনন্যচেতাঃ সততং # যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্য অহং সুলভঃ পার্থ # নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।।১৪।।

অনন্যচেতাঃ = অনন্যচিত্ত; সততং = সর্বদা; যঃ = যিনি; মাং = আমাকে; স্মরতি = স্মরণ করেন; নিত্যশঃ = প্রতিদিন; তস্য = তাঁর; অহং = আমি; সুলভঃ = সহজলভ্য; নিত্যযুক্তস্য = নিত্যযুক্ত; যোগিনঃ = যোগীর পক্ষে।। ১৪।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! যিনি আমার প্রতি অনন্যচেতা হয়ে অর্থাৎ আমি ছাড়া অন্য কোনরূপ কর্ম ও যোগাদি সাধনে অথবা স্বর্গ মোক্ষাদি সাধ্যবিষয়ে মন না দিয়ে কেবলমাত্র আমাকেই সদা সর্বদা স্মরণ করেন সেই নিত্যযুক্ত যোগী সহজেই আমাকে লাভ করেন।। ১৪।।

মাম্ উপেত্য পুনর্জন্ম # দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্।
ন আপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ # সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।।১৫।।

মাম্ উপেত্য = আমাকে লাভ ক'রে; দুঃখালয়ম্ = দুঃখের জগৎ; অশাশ্বতম্ = অনিত্য; ন আপ্নুবন্তি = লাভ করতে হয় না; মহাত্মনঃ = মহাত্মাগণ; সংসিদ্ধিং = সিদ্ধি; পরমাং = পরম; গতাঃ = লাভ করেন।।১৫।।

অনুবাদ :- আমাকে লাভ ক'রে তাঁদের পরম সিদ্ধিলাভ হয়ে যায়। সেইজন্য আমার সেই সমস্ত মাহাত্মা ভক্তদের আর অনিত্য পুনর্জন্মরূপ দুঃখের জগতে প্রবেশ করতে হয় না।।১৫।।

আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ # পুনঃ আবর্তিনঃ অর্জুন।
মাম্ উপেত্য তু কৌন্তেয় # পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।১৬।।

আব্রহ্মভূবনাৎ = ব্রহ্মলোক থেকেও; লোকাঃ = সকল জীব; পুনঃ আবর্তিনঃ = পুনরায় জন্মলাভ করে; মাম্ উপেত্য = আমাকে লাভ ক'রে; তু = কিন্তু; পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে = পুনর্জন্ম হয় না।। ১৬।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! (আমার প্রতি বিমুখ বিশেষ বিশেষ কর্মের সাহায্যে) যাঁরা ব্রহ্মলোকসহ অন্যান্য লোকসমূহ পর্যন্তও পৌঁছাতে পারেন তাদেরকেও

একসময় পুনরায় জন্মলাভ করতে হয়। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমার যে অনন্যচিত্ত ভক্ত আমাকে লাভ করেন তাঁকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না।।১৬।।

ব্যাখ্যা :- শ্রীধরাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যে বলেছেন যে ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকারের লোক আছে সবই পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ এই সমস্ত লোকের বাসিন্দাদের একসময় আবার পুনর্জন্ম স্বীকার করতে হবে এবং ব্রহ্মলোকও তার ব্যতিক্রম নয়, ব্রহ্মলোকও বিনাশশীল — "সর্বে লোকাঃ পুনরাবর্তনশীলাঃ ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশীঃ" ইতি। সেইজন্য যাঁরা ব্রহ্মলোকে স্থান পাবেন তাঁদেরকে একদা আবার ফিরে আসতেই হবে এই মরজগতে — "অনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যম্ভাবি পুনর্জন্ম"। তাহলে সেই সমস্ত আত্মার মুক্তির উপায় কি? এ বিষয়ে শ্রীধরাচার্য বলেছেন যে জন্ম-মরণ এই কালচক্রের কবল থেকে মুক্তিপ্রদানকারী উপাসনাসমূহের দ্বারা যাঁরা ব্রহ্মলোকে স্থান লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা একমাত্র সেখানে অবস্থানকালে পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবেন একমাত্র তাঁরাই ব্রহ্মার সঙ্গে মুক্তি লাভ করবেন— "য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভির্বহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণাসহ মোক্ষো নান্যেষাম্।" এই শ্লোকে ভগবান্ বলেছেন যে ব্রহ্মলোকে আশ্রয় পাওয়ার অর্থ তাঁদের পুনর্জন্মের চক্রের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া নয়। তার কারণটি স্পষ্ট হয়ে যায় শ্রীধরাচার্যের ভাষ্যে। তিনি বলেছেন যে ব্রহ্মলোকের বাসিন্দা পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করার পরে ব্রহ্মার সঙ্গেই মুক্তি লাভ করেন। তাহলে একথা স্পষ্ট যে স্বয়ং ব্রহ্মারই মুক্তি হয়নি। তাহলে যে জগতের অধিপতিরই মুক্তি হয়নি সেই লোকের অন্যান্য বাসিন্দাদের মুক্তি হবে কিভাবে? ব্রহ্মার মুক্তি কখন কিভাবে ঘটে সেই বিষয়টিও জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে স্মৃতিতে বলা হয়েছে যে যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয় তখন ব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদে প্রবেশ ক'রে মুক্তিলাভ করেন এবং সেই সময়েই ব্রহ্মলোকে স্থানপ্রাপ্ত শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণও বিষ্ণুপদে প্রবেশ ক'রে মুক্তিলাভ করেন—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বেসম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশ্যন্তি পরং পদম্।।

সুতরাং সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হল যে মুক্তিলাভ

করার জন্য উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হয়ে বিভিন্ন লোকে প্রবেশ করার প্রচেষ্টা করা ঈপ্সিত ফললাভের পক্ষে উপযুক্ত নয়। সেইজন্য সকল মুক্তিকামী মানুষের কর্তব্য হল সরাসরি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আলয়ে আশ্রয়লাভ করার জন্য প্রথম থেকেই প্রয়োজনীয় কর্তব্যানুষ্ঠান করা।। ১৬।।

সহস্র-যুগ-পর্যন্তম্ # অহঃ যৎ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্র-অন্তাং # তে অহোরাত্র-বিদো জনাঃ।।১৭।।

সহস্র-যুগ-পর্যন্তম্ = একহাজারটি চতুর্যুগ; অহঃ = দিন; যৎ ব্রহ্মণঃ = ব্রহ্মার; বিদুঃ = জানে; রাত্রিং যুগসহস্র-অন্তাং = একহাজারটি চতুর্যুগ পর্যন্ত এক রাত্রি; তে অহোরাত্র-বিদঃ = তাঁরা দিবা-রাত্রির তত্ত্ববিৎ।।১৭।।

অনুবাদ :- মানুষের একহাজারটি চতুর্যুগ ব্রহ্মার এক দিন এবং একহাজারটি চতুর্যুগ ব্রহ্মার এক রাত্রির সমান। এই বিষয়টি যাঁরা জানেন তাঁরাই দিন-রাত্রির প্রকৃত তত্ত্ব জানেন।।১৭।।

ব্যাখ্যা :- সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগের মোট সময়কাল ৪৩২০০০০ বৎসর। সুতরাং ব্রহ্মার একদিন = মানুষের ৪৩,২০,০০০×১০০০ = ৪৩২,০০,০০,০০০ বৎসর। অনুরূপভাবে ব্রহ্মার একরাত্রি মানুষের ৪৩২, ০০,০০,০০০ বৎসরের সমান। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মার একদিন চার হাজার যুগের সমান — "চতুর্যুগসহস্রস্তু কথ্যতে ব্রহ্মণো দিনম্ (৬।৩।১১)। এখানে 'যুগ' বলতে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চতুর্যুগের সমষ্টিকে বোঝানো হয়েছে — "যুগশব্দেন অত্র চতুর্যুগম্ অভিপ্রেতম্ (শ্রীধরাচার্য, গীতাভাষ্য)।।১৭।।

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ # প্রভবন্তি অহঃ আগমে।
রাত্রি আগমে প্রলীয়ন্তে # তত্র এব অব্যক্ত-সংজ্ঞকে।।১৮।।

অব্যক্তাৎ = অব্যক্ত প্রকৃতি; ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ = জীব সকল; প্রভবন্তি = জন্মলাভ করে; অহঃ আগমে = দিন শুরু হলে; রাত্রি আগমে = রাত্রি শুরু হলে; প্রলীয়ন্তে = লয় পায়; তত্র অব্যক্ত-সংজ্ঞকে = পুনরায় অব্যক্ত হয়ে যায়।।১৮।।

অনুবাদ :- ব্রহ্মার যখন দিন শুরু হয় তখন অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্য থেকে জীব সকল জন্মলাভ করে অর্থাৎ ব্যক্ত হয়। আবার যখন ব্রহ্মার রাত্রি শুরু হয় তখন

সমগ্র জীবলোক লোপ পেয়ে সেই প্রকৃতির মধ্যেই মিশে যায় অর্থাৎ পুনরায় অব্যক্ত হয়ে যায়।।১৮।।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং # ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্রি আগমে অবশঃ পার্থ # প্রভবতি অহঃ আগমে।।১৯।।

* এবায়ং = এব অয়ং

ভূতগ্রামঃ = সকল জীব; অয়ং = এই; ভূত্বা ভূত্বা = বারে বারে; প্রলীয়তে = বিনাশপ্রাপ্ত হয়; রাত্রি আগমে = রাত্রিকাল আরম্ভ হলে; অবশঃ = অবশভাবে; প্রভবতি = উদ্ভব হয়; অহঃ আগমে = দিবাকাল আরম্ভ হলে।।১৯।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! এই সকল জীবই বারে বারে জন্মগ্রহণ ক'রে ব্রহ্মার রাত্রিকাল আরম্ভ হলে সকলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁর দিবাকাল পুনরায় আরম্ভ হলে আবার সমগ্র প্রাণিকুলের পুনরায় উদ্ভব হয়।।১৯।।

পরঃ তস্মাৎ তু ভাবঃ অন্যঃ # অব্যক্তঃ অব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু # নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।।২০।।

পরঃ = শ্রেষ্ঠ; তস্মাৎ অব্যক্তাৎ = সেই অব্যক্ত থেকেও; তু = কিন্তু; ভাবঃ অন্যঃ অব্যক্তঃ = অন্য স্বতন্ত্র, শ্রেষ্ঠ ও সনাতন ভাব; সর্বেষু ভূতেষু = সকল জীবের; নশ্যৎসু = নাশেও; ন বিনশ্যতি = বিনশপ্রাপ্ত হন না।।২০।।

অনুবাদ :- কিন্তু উপর্যুক্ত অব্যক্ত ভাবেরও ঊর্ধ্বে এক স্বতন্ত্র, শ্রেষ্ঠ ও সনাতন ভাব আছেন যিনি মরজগতের প্রাণিসকল বিনাশপ্রাপ্ত হলেও নিজে বিনাশপ্রাপ্ত হন না।।২০।।

অব্যক্তঃ অক্ষর ইতি উক্তঃ # তম্ আহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে # তৎ ধাম পরমং মম।।২১।।

অব্যক্তঃ অক্ষরঃ = অব্যক্ত অবিনাশী; ইতি উক্তঃ = বলা হয়েছে; তম্ = তাঁহাকে; আহুঃ = বলা হয়; পরমাং গতিম্ = পরম গতি; যং = যাঁকে; প্রাপ্য = লাভ ক'রে; ন নিবর্তন্তে = পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না; তৎ = সেই; ধাম পরমং মম = আমার পরম ধাম।।২১।।

অনুবাদ :- যিনি অব্যক্ত অর্থাৎ অপ্রকাশিত এবং অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী রূপে পরিচিত তিনিই সকলের পরম গতি। তাঁকে লাভ করতে পারলে জীবের আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না। সেইটিই আমার পরম ধাম।।২১।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে বর্ণিত 'সকলের পরম গতি' এবং ভগবানের 'পরম ধাম' সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে গন্তব্যস্থল অর্থে 'গতি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই গতি হল পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গতি অর্থাৎ এমন গন্তব্যস্থল যেখানে পৌঁছানোর পর আর যাবার মত অন্য কোন গন্তব্যস্থল নাই, যেখানে পৌঁছানোর অর্থ হল মুক্তিলাভ যে পাওয়ার পর আর কোন প্রাপ্তি অবশিষ্ট থাকে না, সমস্ত দুঃখের চির অবসান হয়। সেইজন্য সেই নির্গুণ, নিরাকার, অব্যক্ত, জন্মাদিরহিত পরম অক্ষর বা অবিনাশী সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই হলেন সকল জীবের পরম গতি। কঠোপনিষদের ১।৩।১১ মন্ত্রে বলা হয়েছে — "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"। অর্থাৎ পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যতীত শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তিনিই সকলের পরম গতি। যেমন নদীবাহিত সমগ্র জলরাশির অন্তিম লক্ষ্য সমুদ্র, সেই জলরাশির সমুদ্র ব্যতীত অপর কোন গন্তব্যস্থল নাই, তেমনই পরমপুরুষ ভগবান্ ব্যতীত জীবের গতির অভিমুখ অপর কোন দিকে হতে পারে না আর তা যদি হয় তা হলে সেই জীব ভ্রষ্ট, নষ্ট হবে যেমন নদীবাহিত জলরাশি যদি সমুদ্রে গিয়ে উপনীত হয় তাহলে তার পরম শান্তি লাভ হয়, কিন্তু সে যদি পথ ভুলে মরুভূমির দিকে ধাবিত হয় তাহলে সে অচিরেই নষ্ট হবে। তাই ভগবান্ বলছেন যে প্রতিটি জীবকে যত্নবান হতে হবে যেন সে অন্তিমে পরমাত্মাকে প্রাপ্তির লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারে।

'ধাম' শব্দের প্রচলিত অর্থ হল বাসস্থান। তাহলে এই শ্লোকে কথিত ভগবানের ধাম মানে হয় ভগবান্ যেখানে বাস করেন। বাস্তবে কিন্তু তা নয়। এখানে ভগবানের ধাম বলতে আশ্রয়স্থল বলা হয়েছে যার কর্তা বা মালিক হলেন স্বয়ং ভগবান্ যেটি তাঁর ভক্তদের জন্য নির্দিষ্ট। যেমন কেউ বলে— "বৃন্দাবনে আমার একটি অতিথি নিবাস আছে"। এর অর্থ এই নয় যে সেই ব্যক্তি সেখানে বাস করে, এর অর্থ হল যে সেই অতিথি নিবাসের সে মালিক এবং পুণ্যার্থীরা সেখানে গিয়ে আশ্রয় পেতে পারে। তদ্রূপ ভগবানের ধামও সেই রকম একটি আশ্রয়স্থল যেখানে ভক্তগণ নিশ্চিন্তে অন্তিম আশ্রয় পেতে

পারে। এখন প্রশ্ন আসে ভগবান্ তাঁর পরম ধাম বলতে ঠিক কোন স্থানটিকে নির্দেশ করেছেন। তাঁর পরম ধাম বলতে ভগবানের সচ্চিদানন্দময়, দিব্য স্বরূপ ও ভগবদ্ভাবকে বোঝানো হয়েছে। কাজেই ভগবানের সচ্চিদানন্দময়, দিব্য স্বরূপ ও ভগবদ্ভাবকে যথার্থ উপলব্ধিই হল ভক্তের তাঁর ধামে পৌঁছানো অর্থাৎ পরম গতি লাভ।।২১।।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ # ভক্ত্যা লভ্যঃ তু অনন্যয়া।
যস্য অন্তঃস্থানি ভূতানি # যেন সর্বম্ ইদং ততম্।। ২২।।

সঃ পরঃ পুরুষঃ = সেই পরম পুরুষ; অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ = অনন্য ভক্তির দ্বারা লভ্য; তু = কিন্তু; যস্য অন্তঃস্থানি = যাঁর মধ্যে অবস্থিত; ভূতানি = জীবসকল; যেন = যাঁর দ্বারা; সর্বম্ ইদং = এই সর্ব জগৎ; ততম্ = পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।।২২।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! সমগ্র জীবজগৎ যাঁর মধ্যেই অবস্থান করেন, যিনি এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আমিই সেই পরম পুরুষ। আমাকে লাভ করার একমাত্র উপায় হল আমার প্রতি অবিচল ভক্তি, এছাড়া অন্য কোন ভাবেই আমাকে লাভ করা যাবে না।।২২।।

ব্যাখ্যা :- পরমপুরুষ কাকে বলে? শঙ্করাচার্য বলেছেন— "পুরি শয়নাৎ পূর্ণত্বাদ্ বা" ইতি। অর্থাৎ শরীররূপ পুরে যিনি শয়ন করেন এবং যিনি সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান সেই পরমাত্মাকে পুরুষ বলা হয় এবং যে পুরুষের উপরে আর কিছুই নাই এবং যাঁর মধ্যে এই কার্যরূপ সমগ্র ভূত অর্থাৎ জড়জগৎ অন্তর্গত এবং যিনি সমগ্র সংসারে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন তিনিই হলেন পরমপুরুষ (শাঙ্করভাষ্য ৮।২২)।

যত্র কালে তু অনাবৃত্তিম্ # আবৃত্তিং চ এব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং # বক্ষ্যামি ভরত-ঋষভ।।২৩।।

যত্র কালে তু = কিন্তু যে পথে গমন করলে; অনাবৃত্তিম্ = পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হয় না; আবৃত্তিং = পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হয়; চ এব যোগিনঃ = যোগিগণ; প্রয়াতা যান্তি = প্রয়াত হন; তৎ কালং = সেই পথের বিষয়ে; বক্ষ্যামি = বলব; ভরত-ঋষভ = ভরতকুল শ্রেষ্ঠ।।২৩।।

অনুবাদ:- হে ভরতকুল শ্রেষ্ঠ! দেহত্যাগের পর যে যে পথে গমন করলে যোগিগণকে আর পুনরায় জন্ম গ্রহণ করতে হয় না বা পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় সে বিষয়ে আমি তোমাকে এখন বলছি।।২৩।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ব্যবহৃত 'কাল' শব্দটি সময় অর্থে ব্যবহার করা হয়নি, ব্যবহার করা হয়েছে মার্গ বা পথ অর্থে। কারণ চব্বিশ ও পঁচিশতম শ্লোকে যে 'অগ্নি', 'জ্যোতিঃ' এবং 'ধূম' শব্দ ও ছাব্বিশ ও সাতাশতম শ্লোকে 'সৃতী' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের কোনটিই সময়জ্ঞাপক নয়, তাদের প্রত্যেকটিই মার্গজ্ঞাপক। সুতরাং চব্বিশ ও পঁচিশতম শ্লোকে ব্যবহৃত 'তত্র' পদের অর্থ হিসাবে 'সময়' গণ্য করা উচিত হবে না। এখানে 'কাল' শব্দটি কালাভিমানী দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 'মার্গ' অর্থাৎ পথ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। রামানুজাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যে (৮/২৩) এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন—"অত্র কালশব্দো মার্গস্য অহঃ প্রভৃতিসংবৎসরান্তকালাভিমানিদেবতাভূয়স্তয়া মার্গোপলক্ষণার্থঃ"।। ২৩।।

অগ্নির্জ্যোতিঃ অহঃ শুক্লঃ # ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি # ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।।২৪।।

অগ্নির্জ্যোতিঃ = জ্যোতির্ময় অগ্নির দেবতা; অহঃ = শুভদিন; শুক্লঃ = শুক্লপক্ষ; ষণ্মাসাঃ = ছয় মাস; উত্তরায়ণম্ = উত্তরায়ণ; তত্র প্রয়াতাঃ = দেহত্যাগকারী; ব্রহ্ম গচ্ছন্তি = ব্রহ্মকে লাভ করেন; ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ = ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ।।২৪।।

অনুবাদ :- যে মার্গে জ্যোতির্ময় অগ্নির দেবতা, শুভদিনের দেবতা, শুক্লপক্ষের দেবতা, উত্তরায়ণের দেবতা গমন করেন, মৃত্যুর পর ব্রহ্মের উপাসকগণ সেই দেবযানমার্গে গমন করলে অর্থাৎ শুভদিন, শুক্লপক্ষ এবং সূর্যের উত্তরায়ণকালে দেহান্তর প্রাপ্তি হলে সেই আত্মা ব্রহ্মকে লাভ করেন অর্থাৎ তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না।।২৪।।

ধূমো রাত্রিঃ তথা কৃষ্ণঃ # ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ # যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে।।২৫।।

ধূমঃ = ধূম দেবতা; রাত্রিঃ = রাত্রি দেবতা; তথা কৃষ্ণঃ = কৃষ্ণপক্ষের দেবতা; ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্ = দক্ষিণায়নের ছয়মাস; চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ = স্বর্গলোক;

যোগী = কর্মযোগী; প্রাপ্য = লাভ ক'রে; নিবর্ততে = পুনরায় এই পৃথিবীতেই ফিরে আসেন।।২৫।।

অনুবাদ :- মৃত্যুর পর ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, সূর্যের দক্ষিণায়নের ছয়মাস — এদের সংশ্লিষ্ট দেবতাদের গমন পথে গমন করলে অর্থাৎ সেই সেই সময়ে মৃত্যু হলে কর্মযোগিগণ চন্দ্রের জ্যোতিঃ সমন্বিত স্বর্গলোকে প্রবেশ ক'রেও তাদের পুণ্যকর্মের ফলের ভোগ শেষ হলে পুনরায় এই পৃথিবীতেই ফিরে আসেন।।২৫।।

শুক্ল-কৃষ্ণে গতী হি এতে # জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাতি অনাবৃত্তিম্ # অন্যয়া আবর্ততে পুনঃ।।২৬।।

শুক্ল-কৃষ্ণে = শুক্ল ও কৃষ্ণ; গতী হি এতে = এই দুই পথে; জগতঃ = জগতের; শাশ্বতে = চিরন্তন; একয়া = একটির দ্বারা; যাতি অনাবৃত্তিম্ = মোক্ষ লাভ হয়; অন্যয়া = অপরটির দ্বারা; আবর্ততে পুনঃ = পুনরায় জন্ম হয়।।২৬।।

অনুবাদ :- জীবের পরলোক গমনের দুইটি শাশ্বত মার্গ আছে— একটি শুক্ল মার্গ ও অপরটি কৃষ্ণ মার্গ। শুক্ল মার্গে গমন করলে মোক্ষলাভ হয় অর্থাৎ আর পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু কৃষ্ণমার্গে গমন করলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়।।২৬।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ভগবান্ মৃত্যুর পর জীবাত্মার গন্তব্যস্থলের দিকে যাওয়ার দুটি পথের উল্লেখ করেছেন— একটি শুক্ল পথ অপরটি কৃষ্ণ পথ। ভগবান্ এখানে বলতে চেয়েছেন যে পরমেশ্বর পরমাত্মার নিকট যাওয়ার যে পথ তা সদা উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়, সেই পথে অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ সর্বদা প্রকাশমান থাকেন এবং সেই পথে গমনকারীর অন্তর সদা জ্ঞানে পূর্ণ থাকে। সেইজন্য এই পথকে শুক্লপথ বলা হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মলোক পর্যন্ত অন্যান্য সমস্ত দেবলোক যাওয়ার যে পথ আছে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং সেই মার্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ অন্ধকারযুক্ত। সেইজন্য সেই পথে গমনকারীদের অন্তর অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। সেই কারণে এই পথটিকে কৃষ্ণ পথ বলা হয়েছে। সুতরাং পরমপুরুষ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ধামে যাবার যে পথ তা উজ্জ্বল আলোকময় শুক্লপথ এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দেবতাদের নিকট যাওয়ার

যে পথ সেটি অন্ধকারময়। সেইজন্য অন্যান্য দেবতাদের ধামে যাওয়ার পথকে কৃষ্ণপথ বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই বলেছেন যে অন্যান্য দেবতাদের আরাধনা ক'রে যে ফল পাওয়া যায় তা নশ্বর কিন্তু তাঁর ভজনা ক'রে যে ফল পাওয়া যায় তা চির অক্ষয়, অবিনশ্বর। সুতরাং একমাত্র তাঁকেই লাভ করার পথই হল শ্রেষ্ঠ পথ।।২৬।।

ন এতে সৃতী পার্থ জানন্ # যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু # যোগযুক্তো ভব অর্জুন।।২৭।।

এতে সৃতী = এই পথ দুইটি; জানন্ = জেনে; ন মুহ্যতি = মোহগ্রস্ত হন না; কশ্চন = কখনও; তস্মাৎ = সেইজন্য; সর্বেষু কালেষু = সব সময়; যোগযুক্তঃ ভব = যোগ অবলম্বন কর।।২৭।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! এই উভয় প্রকার পথকে সঠিকভাবে জানলে যোগিগণ আর মোহগ্রস্ত হন না। সুতরাং হে অর্জুন! তুমি সর্বদা যোগ অবলম্বন কর।।২৭।।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চ এব # দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বম্ ইদং বিদিত্বা # যোগী পরং স্থানম্ উপৈতি চ আদ্যম্।।২৮।।

বেদেষু = বেদ অধ্যয়ন; যজ্ঞেষু = যজ্ঞ সম্পাদন; তপঃসু চ এব দানেষু= তপস্যা ও দান থেকে; যৎ পুণ্যফলং = যে পুণ্যফল; প্রদিষ্টম্ = শাস্ত্রে বলা আছে; অত্যেতি তৎ সর্বম্ = তার সমস্তই অতিক্রম করেন; ইদং = এই তত্ত্ব; বিদিত্বা = জেনে; পরং স্থানম্ = শ্রেষ্ঠ স্থান অর্থাৎ মোক্ষ; উপৈতি = লাভ করেন।।২৮।।

অনুবাদ :- বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞ সম্পাদন, তপস্যা ও দান প্রভৃতি কর্ম থেকে পুণ্যলাভ করা যায়। কিন্তু আমি যে তত্ত্বসমূহের বিষয় বলছি তা ভালভাবে বুঝলে যোগিগণ সেই সকল পুণ্যেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত স্থান অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে থাকেন।। ২৮।।

—ঃ অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ঃ—

নবম অধ্যায়

রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং # প্রবক্ষ্যামি অনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং # যৎ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে অশুভাৎ ।।১।।

ইদং = এই; গুহ্যতমং = পরম গোপনীয়; প্রবক্ষ্যামি = বলব; অনসূয়বে = ঈর্ষা, হিংসাবিহীন; জ্ঞাত্বা = জেনে; মোক্ষ্যসে = মুক্তিলাভ করবে; অশুভাৎ = সংসাররূপী অশুভের হাত থেকে।। ১।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন— তোমার অন্তরে কোন প্রকার ঈর্ষাবোধ নাই। সেইজন্য তোমার কাছে এই পরম গোপনীয় বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান বর্ণনা করছি যা জেনে তুমি জরা-মরণময় সংসাররূপী অশুভ থেকে উদ্ধার পেতে পারবে।।১।।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং # পবিত্রম্ ইদম্ উত্তমম্।
প্রত্যক্ষ-অবগমং ধর্ম্যং # সুসুখং কর্তুম্ অব্যয়ম্।২।।

রাজবিদ্যা = শ্রেষ্ঠ জ্ঞান; রাজগুহ্যং = সর্বাপেক্ষা গোপনীয়; ইদম্ = এই; উত্তমম্ প্রত্যক্ষ-অবগমং = প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ; ধর্ম্যং = ধর্মসঙ্গত; সুসুখং = সুখপ্রদ; অব্যয়ম্ = অক্ষয় ফলপ্রদানকারী।।২।।

অনুবাদ :- এই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত গুহ্যতত্ত্বের অপেক্ষা গুহ্য, পরম পবিত্র, সর্বোত্তম, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, ধর্মসঙ্গত, অত্যন্ত সুখপ্রদ, অক্ষয় ফলপ্রদানকারী।।২।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ভগবান্ 'রাজবিদ্যা' ও 'রাজগুহ্য' বলতে কি নির্দেশ করেছেন? আমরা দেখেছি যে পূর্বোক্ত শ্লোকে ভগবান্ অর্জুনের নিকট

বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান বর্ণনার কথা বলেছেন। এই শ্লোকে তাঁর বক্তব্য হল যে সেই বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান সমস্ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিদ্যার উপরে। এই বিদ্যা যিনি যথার্থভাবে অর্জন করতে পারেন তাঁর আর অপর কিছু জানার অবশিষ্ট থাকে না। সেইজন্য এই বিদ্যাকে বিদ্যার রাজা অর্থাৎ রাজবিদ্যা বলা হয়েছে। এই বিদ্যায় ভগবানের সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ স্বরূপের তত্ত্ব, তাঁর গুণ, প্রভাব, মহত্ত্ব, তাঁর উপাসনা পদ্ধতি ও তার ফল সমস্তকিছু পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে তিনিই এই জগতের স্রষ্টা, কর্তা, অভিভাবক, সকলের আধার, সর্বশক্তিমান, পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম। এই বিদ্যা পরম কল্যাণপ্রদ। তাই ভগবান্ অর্জুনকে পরিপূর্ণভাবে তাঁর শরণাগত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। বস্তুত এই বিদ্যা এমন যা সকলের সম্মুখে বর্ণনা করা যায় না। রাজার রাজ্যপরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি যেমন পরম গোপনীয়, সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা যায় না, তেমনই এই বিদ্যাও খুবই গোপনীয়। একমাত্র পরম শ্রদ্ধাবান, শুদ্ধচিত্ত ভক্তই এই জ্ঞান শ্রবণের অধিকারী। এইজন্য ভগবান্ এই জ্ঞানকে রাজগুহ্য অর্থাৎ পরম গোপনীয় বলেছেন। তাঁর বিচারে অর্জুন এই জ্ঞান শ্রবণের উপযুক্ত ব্যক্তি। সেই জন্য তিনি এই জ্ঞান অর্জুনের নিকট বর্ণনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

এই জ্ঞানই হল ধর্ম কারণ যা কিছুই পরম কল্যাণসাধন করে তাই হল ধর্ম। এই জ্ঞান ভগবানের সঙ্গে ভক্তের তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ ঘটিয়ে ভক্তের পরম কল্যাণ করে, ভক্তের অন্তরে পরম শান্তি ও পরম সুখ উৎপাদন করে। বর্ণ-আশ্রামাদির যত ধর্ম বর্ণনা করা হয়েছে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এই জ্ঞান। সেইজন্য ভগবান্ একে ধর্ম আখ্যা দিয়েছেন।।২।।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা # ধর্মস্য অস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে # মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি।।৩।।

অশ্রদ্দধানাঃ = শ্রদ্ধাবিহীন; ধর্মস্য = বিজ্ঞানসহিত পরম গুহ্য জ্ঞানের; পরন্তপ = শত্রুহন্তা; অপ্রাপ্য = না পেয়ে; মাং = আমাকে; নিবর্তন্তে = ঘুরে বেড়ায়; মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি = সংসাররূপ এই মৃত্যুপুরীর পথে পথে।।৩।।

অনুবাদ :- হে পরন্তপ অর্জুন! যাদের আমার উপর্যুক্ত বিজ্ঞানসহিত পরম গুহ্য জ্ঞানের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নাই তারা আমাকে লাভ করতে পারে না। সেই সমস্ত লোক কেবল সংসাররূপ এই মৃত্যুপুরীর পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।। ৩।।

ময়া ততম্ ইদং সর্বং # জগৎ-অব্যক্ত-মূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি # ন চ অহং তেষু অবস্থিতঃ।।৪।।

ময়া = আমার দ্বারা; ততম্ = পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে; ইদং সর্বং জগৎ = এই সমগ্র বিশ্ব; অব্যক্ত-মূর্তিনা = অপ্রকাশিতভাবে; মৎস্থানি = আমার মধ্যে অবস্থিত; সর্বভূতানি = সমস্ত জড় ও চেতন পদার্থ; অহং = আমি; তেষু = তাদের মধ্যে; ন চ অবস্থিতঃ = অবস্থিত নই।।৪।।

অনুবাদ :- আমি অপ্রকাশিতভাবে এই সমগ্র বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যেই ছড়িয়ে আছি, সমস্ত জড় ও চেতন জগৎ আমার মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু আমি প্রকৃতপক্ষে এ সকলের মধ্যে অবস্থিত নই অর্থাৎ আমি সকলের মধ্যে থেকেও কারও অন্তর্গত নই। আমি সকলের থেকে মুক্ত, অধরা।।৪।।

ব্যাখ্যা :- বস্তুত ভগবান্ এই বিশ্বচরাচরের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তিনি এই জড়চেতন জগতের স্বামী। কিন্তু কোন বস্তুর সঙ্গে তাঁর কোন সংযোগ নেই। যেমন আকাশ পৃথিবীব্যাপী ব্যাপ্ত হয়ে আছে কিন্তু আকাশের সঙ্গে পৃথিবীর কোন সংযোগ গড়ে ওঠে না, যেমন কোন মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন তার মনে হয় পৃথিবীর কত বস্তুর মধ্যে সে বিচরণ করছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেই সমস্ত বস্তুর সঙ্গে কোন যোগ তার থাকে না তেমনি ভগবান্ এই জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে বিরাজমান হলেও কোন বস্তুর সঙ্গে তাঁর বন্ধন গড়ে ওঠে না। তিনি জগতের মধ্যে আছেন ঠিকই তবে এই জগতের সমস্ত বস্তুর নিকট তিনি অধরা থাকেন। তাই বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে — "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্.......... যং পৃথিবী ন বেদ" (৩।৭।৩) অর্থাৎ তিনি পৃথিবীতে আছেন কিন্তু পৃথিবী তাঁকে জানে না। অনুরূপভাবে শতপথ ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে- "যং আত্মনি তিষ্ঠন্.......... যমাত্মা ন বেদ" (১৪।৫।৩০) অর্থাৎ ব্রহ্ম আত্মার মধ্যে অবস্থান করলেও আত্মা তাঁকে জানেন না। সুতরাং সমস্ত চেতন ও অচেতন জগৎ তাঁর মধ্যে অবস্থিত হলেও তারা তাঁকে জানতে পারে না। ফলে উভয়ের মধ্যে কোন বন্ধন গড়ে ওঠে না। তাই তিনি সকলের মধ্যে থেকেও সকলের থেকে ভিন্ন।। ৪।।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি # পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরম্।
ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থো # মম আত্মা ভূতভাবনঃ।। ৫।।

ন চ মৎস্থানি = আমার মধ্যে অবস্থিত নয়; ভূতানি = জীবসকল; পশ্য = দেখ; মে যোগম্ = আমার আশ্চর্যজনক যোগের মাহাত্ম্য; ঐশ্বরম্ = ঐশ্বরিক; ভূতভৃৎ = জীব সকলের ধারক; ন চ ভূতস্থঃ = জীবের মধ্যে অবস্থিত নয়; মম আত্মা = আমার আত্মা ; ভূতভাবনঃ = জীবের পালক।।৫।।

অনুবাদ :- আবার প্রকৃতপক্ষে জীবসকলও আমার মধ্যে অবস্থিত নয়। আমার আশ্চর্যজনক যোগের মাহাত্ম্য দেখ যে আমি জীব সকলকে ধারণ ও পালন করলেও আমার আত্মা তাদের মধ্যে অবস্থিত নয় অর্থাৎ আমি তাদের অধীন নই।।৫।।

যথা আকাশ-স্থিতো নিত্যং # বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি # মৎস্থানি ইতি উপধারয়।।৬।।

যথা আকাশ-স্থিতঃ = যেমন আকাশে অবস্থিত; নিত্যং = সদা; সর্বত্রগঃ = সর্বত্রগামী; তথা সর্বাণি ভূতানি = তেমনই সকল জীব; মৎস্থানি = আমার মধ্যে; উপধারয় = জেনে রাখ।। ৬।।

অনুবাদ :- জেনে রাখ যে যেমন সর্বত্রগামী বায়ু আকাশে থাকে, তেমনই সকল জীব আমার মধ্যে থাকে।। ৬।।

ব্যাখ্যা :- এখানে পাঠকের অন্তরে একটি নিবিড় বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। ভগবান্ একবার বলছেন যে জীবসকল তাঁর মধ্যে থাকে না, পুনরায় তিনি বলছেন যে বায়ু যেমন আকাশে থাকে, তেমনই সকল জীব আমার মধ্যে থাকে। সাধারণভাবে বিষয়টি খুবই বিভ্রান্তিজনক। কিন্তু আসল সত্য হল এই যে তাঁর মহিমা পদ্মপত্রে নীরের মত। দেখে মনে হয় যে পদ্মপাতায় জল লেগে আছে। কিন্তু জলকে পাতা থেকে গড়িয়ে দিলেই সেই পাতার উপর জলের লেশমাত্র দেখা যায় না। তার অর্থ এই যে প্রকৃতপক্ষে জল পদ্মপাতায় আছে ব'লে মনে হলেও পদ্মপাতার সঙ্গে তার কোন সংযোগ থাকে না। যেমন বায়ু আকাশে থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বায়ুর সঙ্গে আকাশের কোন সংযোগ থাকে না আবার আকাশ ব্যতীত অন্য কোথাও বাতাসের পক্ষে থাকাও সম্ভব নয়। জীবের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্কও একই রকম। জীবের পক্ষে পরমেশ্বরের আশ্রয় ব্যতীত অন্য

কোথাও অবস্থান করা সম্ভব নয়। আবার বায়ু সর্বদা আকাশে স্থিত হলেও বায়ুর গমনাদি বিষয়ের সঙ্গে আকাশের কোন সম্বন্ধ থাকে না। বায়ুর ব্যাপারে আকাশ নির্বিকার। তেমনই সকল জীব ভগবানের মধ্যেই আছে কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেই। ভগবান্ আকাশের মত নিরাকার, নির্বিকার, অকর্তা, অন্তহীন, নির্লিপ্ত, আসক্তিবর্জিত, বিকাররহিত। যেমন বায়ুর উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আকাশের বুকেই হয়ে থাকে সেইজন্য আকাশের বুক ব্যতীত তার পক্ষে অন্যত্র থাকা সম্ভব নয়, তেমনই জীবসমূহেরও উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ভগবানের মধ্যেই হয়ে থাকে, তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান করা জীবের পক্ষে সম্ভব নয়, সর্বদা তারা ভগবানের মধ্যেই অবস্থিত থাকে তথাপি আকাশ যেমন বায়ুর অতীত ভগবানও তেমনই জীবসমূহের অতীত, বায়ুর নিকট আকাশ যেমন অধরা, জীবসমূহের নিকট পরমেশ্বরও তেমনই অধরা। সেইজন্য জীবের প্রতি ভগবানের মনে কোন মমতা অর্থাৎ আসক্তি নাই।। ৬।।

সর্বভূতানি কৌন্তেয় # প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনঃ তানি # কল্পাদৌ বিসৃজামি অহম্।। ৭।।

সর্বভূতানি = সকল জীব ; প্রকৃতিং = ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে; যান্তি = গমন করে; মামিকাম্ = আমার; কল্পক্ষয়ে = প্রলয়কালে; পুনঃ = আবার; তানি = তাদেরকে; কল্পাদৌ = কল্প অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে; বিসৃজামি = সৃষ্টি করি; অহম্ = আমি।।৭।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! কল্পের অবসানে অর্থাৎ প্রলয়কালে সকল জীব আমার ত্রিগুণময়ী অপরা-নিকৃষ্ট প্রকৃতির কাছে ফিরে আসে এবং কল্পারম্ভে অর্থাৎ সৃষ্টিকালে তাদের সকলকে আমি আবার সৃষ্টি করি।।৭।।

ব্যাখ্যা :- কল্প কাকে বলা হয়? কল্প হল একটি সময় যার শেষে এই সৃষ্টির লয় হয়ে যায়। শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মার এক দিনকে এক কল্প বলা হয়। ব্রহ্মার একদিন মানুষের এক হাজার চতুর্যুগের সমান এবং এক কল্পে চৌদ্দজন মনুর আবির্ভাব হয় —

চতুর্যুগসহস্রং চ ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে।
স কল্পো যত্র মনবশ্চতুর্দশ বিশাংপতে।।

—(১২।৪।২।)

প্রলয়কালের স্থিতিও ব্রহ্মার এক রাত্রির সমান যারও স্থিতিকাল মানুষের এক হাজার চতুর্যুগের সমান এবং এই প্রলয়কালে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এই ত্রিলোকের বিনাশ হয়ে যায়—

তদন্তে প্রলয়স্তাবান্ ব্রাহ্মী রাত্রিরুদাহৃতা।
ত্রয়ো লোকো ইমে তত্র কল্পন্তে প্রলয়ায় হি।।
—(১২।৪।৩।)

কল্পের অন্তে প্রলয়কালে চরাচরের জীব ও জড় সমস্ত প্রকৃতি অর্থাৎ ভগবানের শরীরে বিলীন হয়ে যায়। এই প্রকৃতির অপর নাম 'তম'। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে সৃষ্টির পূর্বে 'তম্' অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা বিরাজ করছিল—"আসীদিদং তমোভূতম্" ইতি (১।৫)। ঋগ্বেদেও আমারা এই একই রকম বর্ণনা পাই— "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে" (১০।১২৯।৩) অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে গভীর অন্ধকার ছিল।

প্রলয়কালে চরাচরের চেতন-অচেতন পদার্থের সঙ্গে ব্রহ্মারও লয় হয়ে যায়। এই কল্পের অন্তে কিন্তু জীব ও মায়া বিনষ্ট হয়ে যায় না। তারা উভয়ে মিলিতভাবে একাকার হয়ে নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বর্জিত অব্যক্ত অবস্থায় বিরাজ করে এবং প্রলয়ের অন্তে আবার যখন কল্পের শুরু হয় তখন ভগবান্ সেই সমুদায় জীবকে তাঁর সত্য সংকল্পের দ্বারা পুনর্বার সৃষ্টি করেন।।৭।।

প্রকৃতিং স্বাম্ অবষ্টভ্য # বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামম্ ইমং কৃৎস্নম্ # অবশং প্রকৃতেঃ বশাৎ।। ৮।।

প্রকৃতিং = প্রকৃতিকে; স্বাম্ = নিজের; অবষ্টভ্য = বশে রেখে; বিসৃজামি = সৃষ্টি করি; পুনঃ পুনঃ = বারে বারে; ভূতগ্রামম্ = জীবজগৎ; ইমং = এই; কৃৎস্নম্ = সমগ্র; অবশং প্রকৃতেঃ বশাৎ = অবশ হয়ে প্রকৃতির অধীন।। ৮।।

অনুবাদ :- এই সমগ্র জীবজগৎ আমারই প্রকৃতির অধীন। তারা নিজেদের পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলের প্রভাবের দ্বারা আবদ্ধ। সেই সকল জীবকে আমি আমার প্রকৃতিকে অবলম্বন করে বারে বারে সৃষ্টি করি।।৮।।

ন চ মাং তানি কর্মাণি # নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবৎ আসীনম্ # অসক্তং তেষু কর্মসু।। ৯।।

মাং = আমাকে; তানি কর্মাণি = সেই সমস্ত কাজ; ন নিবধ্নন্তি = আবদ্ধ করতে পারে না; উদাসীনবৎ = উদাসীনের মত; আসীনম্ = অবস্থান করি; অসক্তং = আসক্তিহীন; তেষু = সেই সমস্ত; কর্মসু = কাজে।।৯।।

অনুবাদ :- হে ধনঞ্জয়! আমার কোন কাজেই আসক্তি নাই, আমি সকল বিষয়েই উদাসীন। সেইজন্য কোন কর্মের ফল আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না।। ৯।।

ময়া অধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ # সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনা অনেন কৌন্তেয় # জগৎ বিপরিবর্ততে।। ১০।।

ময়া অধ্যক্ষেণ = আমার পরিচালনায়; সূয়তে = জন্ম দেয়; সচরাচরম্ হেতুনা অনেন = এই কারণে; জগৎ বিপরিবর্ততে = বারে বারে জগৎ সৃষ্টি করে।।১০।।

অনুবাদ :- প্রকৃতিকে আমিই পরিচালনা করি। আমারই পরিচালনায় প্রকৃতি বারে বারে জগৎ সৃষ্টি করে।।১০।।

ব্যাখ্যা :- এখানে ভগবান্ বলেছেন যে তিনি তাঁরই অধ্যক্ষতাতেই বারে বারে জগতকে সৃষ্টি করে থাকেন। আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন যে তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি নিজে কোন কিছুই করেন না। এই বক্তব্য দুটি পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে। কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে বক্তব্য দুটির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। তিনি যে বলেছেন যে তিনি নিজে কিছুই করেন না সেই বক্তব্য সত্য। আবার তিনি এই শ্লোকে বলেছেন যে তিনি সমস্ত কর্মই পরিচালনা করেন। সেক্ষেত্রেও এই বক্তব্যের দ্বারা এইটিই প্রমাণিত হয় যে তিনি নিজে কিছুই করেন না, তবে তিনি সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন মাত্র এবং সেই সেই কর্মের মধ্যে নিহিত আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার ফল সৃষ্টি হয়। একটি স্থূল দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। আমরা মাটিতে বীজ বপন করি অর্থাৎ বীজকে মাটির সঙ্গে সম্পর্কিত করি। কিন্তু সেই বীজ থেকে উদ্ভিদ সৃষ্টি হওয়ার কাজটি আমরা করি না। আমরা কেবল চেতন বীজ ও জড় মৃত্তিকার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে দিই এবং আমাদের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি তার বীজের

মধ্যে অন্তর্নিহিত গুণাগুণ অনুযায়ী উদ্ভিদ সৃষ্টি করার কাজটি সম্পন্ন করে। অনুরূপভাবে ভগবানও স্বয়ং নিজে কিছু করেন না। তিনি তাঁর স্বভাবরূপ প্রকৃতিকে স্বীকার ক'রে সেই প্রকৃতির দ্বারাই সৃষ্টিরচনাদি কর্ম করিয়ে নেন। যেমন যতক্ষণ না আমরা কোন স্থানের মৃত্তিকাকে স্বীকার অর্থাৎ নির্বাচন ক'রে বীজকে সেই মৃত্তিকার সংস্পর্শে আনি ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্তিকার উদ্ভিদ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে না কারণ জড়বস্তুর সঙ্গে চেতনবস্তুর সংযোগ না ঘটলে সৃষ্টি হতে পারে না, ঠিক তেমনই প্রকৃতির নিজের পক্ষে কোন প্রকার সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করার ক্ষমতা থাকে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পরমেশ্বরের সাহায্য লাভ করে কারণ প্রকৃতি জড় এবং পরমেশ্বর সাক্ষী অর্থাৎ চেতন। ফলে দেখা যাচ্ছে যে ভগবান্ নিজে কিছুই করেন না, তিনি প্রকৃতিকে নিয়োগ ক'রে সমস্ত কর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনের নিমিত্ত প্রকৃতির সৃষ্টিকর্মকে পরিচালনা করেন। তাঁর এই পরিচালকের ভূমিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ উপযুক্ত পরিচালনা না থাকলে সৃষ্টিকার্য সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে না। সুতরাং এই শ্লোকে ভগবান্ কথিত তিনি নিজে কিছু করেন না এবং সব কর্ম তিনি পরিচালনা করেন এই দুই বক্তব্যের মধ্যে অর্থগত কোন বিরোধ নেই।।১০।।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া # মানুষীং তনুম্ আশ্রিতম্।
পরং ভাবম্ অজানন্তো # মম ভূতমহেশ্বরম্।। ১১।।

অবজানন্তি = জানে না; মূঢ়া = মূর্খ; মানুষীং তনুম্ = মানুষ-দেহ; আশ্রিতম্ = আশ্রয়কারী; পরং ভাবম্ = শ্রেষ্ঠ ভাব বা তত্ত্ব; অজানন্তঃ = না জানার কারণে; ভূতমহেশ্বরম্ = সর্বভূতের অধীশ্বর।।১১।।

অনুবাদ :- আমিই সর্বভূতের অধীশ্বর। কিন্তু মূর্খ মানুষরা একথা জানে না। সেই কারণে তারা মনুষ্য দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে।।১১।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টের দলন ও শিষ্টের পালন এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। অবতীর্ণ হওয়ার সময় তিনি যদিও তাঁর চতুর্ভুজ দিব্যরূপ ধারণ করে প্রকট হয়েছিলেন তথাপি জন্মমুহূর্তে পিতার অনুরোধে তিনি সেই দিব্যরূপ সম্বরণ ক'রে সেই জন্মপরবর্তী সময় থেকে পরবর্তীকালে সর্বসমক্ষে প্রাকৃত মানুষের রূপ ধারণ করেই বিরাজমান ছিলেন এবং সমস্ত

মানুষের নিকট তিনি মানুষরূপেই ব্যবহারের আদান-প্রদান করেছিলেন। ফলে অন্তর্দৃষ্টিহীন মানুষ তাঁর মানবসুলভ অপার কারুণ্য, ঔদার্য, সৌশীল্য, বাৎসল্য প্রভৃতি গুণগুলি দেখে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশতঃ তাঁকে তাদেরই মত একজন রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষভ্রমে তাঁর সর্বাধার, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সকলের প্রভু, সকলের কর্তা, সর্বভূতমহেশ্বর পরমাত্মারূপ গূঢ়তত্ত্বের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকার কারণে তাঁকে পরমপুরুষের মর্যাদা দেয় না।। ১১।।

মোঘ-আশা মোঘ-কর্মাণো # মোঘ-জ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীম্ আসুরীং চ এব # প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ।। ১২।।

মোঘ = বিফল; কর্মাণঃ = কর্মসমূহ; জ্ঞানাঃ = জ্ঞান; বিচেতসঃ = চেতনাহীন; রাক্ষসীম্ = হিংস্র; আসুরীং = ভোগবিলাসী; প্রকৃতিং = প্রবৃত্তি; মোহিনীং = মোহ সৃষ্টিকারী; শ্রিতাঃ = অবলম্বন করে।। ১২।।

অনুবাদ :- তাদের আশা, কর্ম, জ্ঞান — সবই নিষ্ফল, বৃথা। তাদের চেতনা নাই। তারা রাক্ষসী, আসুরী ও মোহিনী প্রবৃত্তির দাস।।১২।।

মহাত্মানঃ তু মাং পার্থ # দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ।
ভজন্তি অনন্যমনসো # জ্ঞাত্বা ভূতাদিম্ অব্যয়ম্।।১৩।।

মহাত্মানঃ = মহাত্মাগণ; তু = কিন্তু; মাং = আমাকে; দৈবীং প্রকৃতিম্ = দৈব সাত্ত্বিক প্রকৃতিকে; আশ্রিতাঃ = আশ্রয় ক'রে; ভজন্তি = ভজনা করেন; অনন্যমনসঃ = অনন্যচিত্ত; জ্ঞাত্বা = জেনে; ভূতাদিম্ = সর্বজীবের আদি কারণ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা; অব্যয়ম্ = অবিনশ্বর।।১৩।।

অনুবাদ :- পরন্তু হে পার্থ! মহাত্মাগণ দৈব সাত্ত্বিক প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে অনন্যচিত্তে আমাকে অবিনশ্বর এবং সর্বজীবের আদি কারণ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা জ্ঞানে আমার ভজনা করেন।।১৩।।

সততং কীর্তয়ন্তো মাং # যতন্তঃ চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তঃ চ মাং ভক্ত্যা # নিত্যযুক্তা উপাসতে।।১৪।।

সততং = সর্বদা; কীর্তয়ন্তঃ মাং = আমার কীর্তন ও ভজনা করে; যতন্তঃ = যত্ন ও ভক্তিসহকারে; দৃঢ়ব্রতাঃ = দৃঢ়চিত্তে; নমস্যন্তঃ = প্রণাম করতে করতে;

চ = এবং; মাং = আমাকে; ভক্ত্যা = ভজনা ক'রে; নিত্যযুক্তা = সর্বদা আমার মধ্যে নিজেকে যুক্ত ক'রে; উপাসতে = উপাসনা করে।।১৪।।

অনুবাদ :- তাঁরা সদা সর্বদা দৃঢ়চিত্তে যত্ন ও ভক্তিসহকারে আমাকে প্রণাম করতে করতে অনন্যচিত্তে আমার কীর্তন ও ভজনা করে।।১৪।।

জ্ঞানযজ্ঞেন চ অপি অন্যে # যজন্তো মাম্ উপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন # বহুধা বিশ্বতোমুখম্।। ১৫।।

জ্ঞানযজ্ঞেন = জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা; চ অপি অন্যে = এবং অন্যরা; যজন্তঃ = পূজা করতে করতে; মাম্ উপাসতে = আমার উপাসনা করে; একত্বেন = নিজেকেই আমার সঙ্গে এক ভেবে; পৃথক্ত্বেন = নিজেকে এবং আমাকে পৃথক ভেবে; বহুধা বিশ্বতোমুখম্ = নানাপ্রকার দেবতা জ্ঞানে।।১৫।।

অনুবাদ :- অন্যরা আমাকে বিভিন্ন প্রকারে পূজা করে — কেউ আমার পূজা করে তাদের জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ সর্বজীবে আত্মাকে দর্শনের দ্বারা, কেউ কেউ নিজেকেই আমার সঙ্গে এক ভেবে নিজের উপাসনার দ্বারাই আমার পূজা করে। কেউ কেউ আবার নিজেকে এবং আমাকে পৃথক ভেবে দাস্য ভক্তিতে আমার ভজনা করে। অপরে নানাপ্রকার দেবতাকেই যথা ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতিকে আমি জ্ঞানে আমার অর্চনা করে। আর অন্যরা দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চের সমস্ত কিছুকে আমি জ্ঞানে আমার বিশ্বরূপের পূজা করে।।১৫।।

অহং ক্রতুঃ অহং যজ্ঞঃ # স্বধা অহম্ অহম্ ঔষধম্।
মন্ত্রঃ অহম্ অহম্ এব আজ্যম্ # অহম্ অগ্নিঃ অহং হুতম্।।১৬।।

অহং = আমি; ক্রতুঃ = অগ্নিষ্টোমাদি শ্রুতি অর্থাৎ বেদসিদ্ধ যজ্ঞ; অহং যজ্ঞঃ = দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, সাধ্যায় যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ প্রভৃতি পঞ্চ মহাযজ্ঞ আদি স্মার্তকর্ম; স্বধা = শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞ; ঔষধম্ = অন্ন ও ওষধি; আজ্যম্ = হোমের জন্য প্রয়োজনীয় ঘৃত; হুতম্ = হোম।।১৬।।

অনুবাদ :- আমি ক্রতু অর্থাৎ অগ্নিষ্টোমাদি বেদসিদ্ধ যজ্ঞ, আমি দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, সাধ্যায় যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ আদি পঞ্চ মহাযজ্ঞ স্মার্তকর্ম, আমি স্বধা অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞ, আমি ওষধি থেকে উৎপন্ন অন্ন ও ঔষধ। আমি মন্ত্র, আমি হোমের জন্য প্রয়োজনীয় ঘৃত; আমি অগ্নি, আমি হোম।।১৬।।

পিতা অহম্ অস্য জগতো # মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রম্ ওঙ্কার # ঋক্ সাম যজুরেব চ।।১৭।।

অস্য = এই; জগতো = জগতের; ধাতা = সম্পূর্ণ জগতের ধারণকর্তা এবং কর্মের ফল প্রদান কারী; বেদ্যং = যা কিছু জানার বিষয় আছে।। ১৭।।

অনুবাদ :- আমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, মাতা, বিধাতা, পিতামহ, যা কিছু জানার বিষয় আছে তার সবই আমি, আমিই পবিত্র ওঙ্কার ধ্বনি, আমি ঋক্ সাম, যজুর্বেদ।।১৭।।

গতিঃ ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী # নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং # নিধানং বীজম্ অব্যয়ম্।।১৮।।

গতিঃ = কর্মফল; ভর্তা = ভরণ-পোষণকারী; প্রভুঃ = নিয়ন্ত্রণকারী শাসক; সাক্ষী = সর্বদ্রষ্টা; নিবাসঃ = শ্রেষ্ঠ বাসস্থান; শরণং = পরম আশ্রয়; সুহৃৎ = পরম উপকারী; প্রভবঃ = সৃষ্টিকর্তা; প্রলয়ঃ = বিনাশকারী; স্থানং = আধার; নিধানং = লয়স্থান; বীজম্ = কারণ; অব্যয়ম্ = অবিনাশী।।১৮।।

অনুবাদ:- আমিই সর্বজীবের গতি, পরমেশ্বর, জগতের দ্রষ্টা, সকলজীবের পরম ধাম, পরম আশ্রয়, পরমসুহৃৎ, আমি সৃষ্টিকর্তা, আমি সংহারকারী, সকলের লয়স্থান এবং আমিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির চিরন্তন অবিনাশী কারণ।।১৮।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ নিজেকে সর্বজীবের গতি বলেছেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে, সকল জীবকে একসময় তাঁর কাছেই ফিরে আসতে হবে। তিনি ছাড়া কারও অন্য কোন গতি নাই। তিনিই সকলের পরমগতি।

সাক্ষী কাকে বলে? সাক্ষী শব্দের অর্থ হল প্রত্যক্ষদর্শী। ভগবান্ এই সমগ্র জগৎসংসারের জীবসমূহকে, তাদের সমস্ত শুভাশুভকে, সমস্ত কর্মকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বস্তু নাই যা তাঁর দৃষ্টির বাইরে। তাই তিনি নিজেকে 'সাক্ষী' বলেছেন।।১৮।।

তপামি অহম্ অহং বর্ষং # নিগৃহ্ণামি উৎসৃজামি চ।
অমৃতং চ এব মৃত্যুশ্চ # সৎ অসৎ চ অহম্ অর্জুন।।১৯।।

তপামি = উত্তাপ দান করি; বর্ষং = জল বর্ষণ করি; নিগৃহ্ণামি = আকর্ষণ করি; উৎসৃজামি = নিক্ষেপ করি।।১৯।।

অনুবাদ :- আমি সূর্যরূপে সমগ্র জগতকে উত্তাপ প্রদান করি, আমি বরুণরূপে জলবর্ষণ করি, আমি ভূমি থেকে জল শোষণ করি, আমিই অমৃত, আমিই মৃত্যু এবং হে অর্জুন! আমিই সৎ অর্থাৎ অবিনশ্বর অর্থাৎ এই দৃশ্য জগতের অতীত যে ব্রহ্মবস্তু আছে তাও আমিই এবং আমিই অসৎ অর্থাৎ এই নশ্বর দৃশ্যমান জগৎ।। ১৯।।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈঃ ইষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যম্ আসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।। ২০।।

ত্রৈবিদ্যাঃ = ঋক সাম ও যজু এই তিন বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান; সোমপাঃ = সোমরস পান ক'রে, পূতপাপা = নিষ্পাপ হয়ে; যজ্ঞৈঃ = যজ্ঞ দ্বারা; ইষ্ট্বা = পূজা ক'রে; স্বর্গতিং = স্বর্গে গমন; প্রার্থয়ন্তে = প্রার্থনা করেন; তে = তাঁরা; পুণ্যম্ আসাদ্য = পুণ্য অর্জন ক'রে; সুরেন্দ্রলোকম্ = স্বর্গ; অশ্নন্তি = ভোগ করেন; দিব্যান্ = স্বর্গীয়; দিবি = স্বর্গ; দেবভোগান্ = দেবভোগ্য বস্তুসমূহ।। ২০।।

অনুবাদ :- ঋক্ সাম ও যজু এই তিন বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান ক'রে ব্যক্তিগণ আমার পূজা করার পর সোমরস পান ক'রে নিষ্পাপ হন এবং স্বর্গে গমনের প্রার্থনা করেন এবং পুণ্য অর্জন করার ফলে স্বর্গে গমন ক'রে তাঁরা সেখানে দেবভোগ্য স্বর্গীয় ভোগ্যবস্তুসমূহ ভোগ করেন।।২০।।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মম্ অনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে।। ২১।।

তে = তারা; তং = সেই; ভুক্ত্বা = ভোগ ক'রে; স্বর্গলোকং বিশালং = বিশাল স্বর্গলোক; ক্ষীণে পুণ্যে = পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে; মর্ত্যলোকং বিশন্তি = পৃথিবীতে ফিরে আসেন; এবং ত্রয়ীধর্মম্ = এইভাবে ত্রিবেদবিহিত কর্ম; অনুপ্রপন্না = অনুষ্ঠান ক'রে; গতাগতং = যাতায়াত; কামকামা = ভোগকামীব্যক্তিগণ; লভন্তে = লাভ করেন।।২১।।

অনুবাদ :- এই ভাবে সেই সব পুণ্যবান লোকেরা ত্রিবেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান করার ফলে অর্জিত পুণ্যের সাহায্যে স্বর্গে দীর্ঘদিন দেবভোগ্য স্বর্গীয় বস্তুসমূহ ভোগ করার পর সেই অর্জিত পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন এবং এই একইভাবে আবার ত্রিবেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে পুণ্য অর্জন ক'রে পুনরায় স্বর্গলোকে গমন করেন এবং এইভাবে ভোগাসক্ত মানুষের স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে যাতায়াত চলতেই থাকে।।২১।।

অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তো মাং # যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্য-অভিযুক্তানাং # যোগক্ষেমং বহামি অহম্।। ২২।।

অনন্যাঃ = একাগ্রচিত্তে; চিন্তয়ন্তঃ = চিন্তা করতে করতে; মাং = আমাকে; যে জনাঃ = যে ব্যক্তিগণ; পর্যুপাসতে = উপাসনা করে; তেষাং = তাঁদের; নিত্য-অভিযুক্তানাং = সদা আমাতে যুক্ত; যোগক্ষেমং = যোগ ও ক্ষেম; বহামি অহম্ = আমি বহন করি।।২২।।

অনুবাদ :- আমার যে সমস্ত অনন্যচিত্ত ভক্তগণ অন্য কোনদিকে মন না দিয়ে সর্বভূতে আমাকেই দর্শন ক'রে কেবলমাত্র আমারই ভজনা করে তাদের যোগ ও ক্ষেমের দায়িত্ব আমি বহন করে থাকি।।২২।।

ব্যাখ্যা :- পরম পুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ভক্তের একান্ত বাসনাকে যোগ বলা হয় এবং তার সেই বাসনা পূরণ হওয়ার পর তিনি যাতে সেই অবস্থা থেকে বিচ্যুত না হয়ে পরেন তার জন্য সেই ভক্তকে সেই অবস্থায় তাঁর রক্ষা করাকে ক্ষেম বলা হয়।।২২।।

যে অপি অন্য-দেবতা-ভক্তা # যজন্তে শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ।
তে অপি মাম্ এব কৌন্তেয় # যজন্তি অবিধিপূর্বকম্।।২৩।।

যে অপি অন্য-দেবতা-ভক্তাঃ = যে সকল ব্যক্তি অন্য দেবতাদের ভক্তিপূর্বক; যজন্তে = পূজা করে; শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ = শ্রদ্ধাসহকারে; তে অপি = তারাও; মাম্ = আমাকে; যজন্তি = পূজা করে; অবিধিপূর্বকম্ = আমাকে পূজার পদ্ধতি থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে।।২৩।।

অনুবাদ :- হে কৌন্তেয়! যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে অন্য দেবতাদের পূজা করে তারাও সেই পূজার মাধ্যমে আমারই পূজা করে যদিও তাদের সেই পূজার পদ্ধতি আমাকে পূজার পদ্ধতি থেকে ভিন্ন ।।২৩।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ভগবান্ বলেছেন যে, কোন ভক্ত সরাসরি তাঁর পূজা না ক'রে যে দেবতারই পূজা করুক না কেন তাঁদের সকল পূজার গতি কিন্তু তাঁরই প্রতি হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভগবান বলেছেন যে কোন ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে প্রত্যক্ষভাবে যে দেবতারই পূজা করুক না কেন সেই সমস্ত পূজা পরোক্ষভাবে তাঁকেই করা হয় কারণ তিনি দশম অধ্যায়ে বলেছেন যে অন্য সমস্ত দেবতাগণ তাঁরই বিভূতি অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। তাঁর থেকে তাঁদের রূপ ভিন্ন, কিন্তু তাঁদের স্বরূপ এক। ফলে তাঁদেরকে পূজা করার অর্থ কৃষ্ণেরই পূজা করা। যেমন দুগ্ধ, ননী, ছানা, মাখন, বিভিন্ন মিষ্টান্ন প্রভৃতি। আপাতভাবে তারা সকলেই ভিন্ন দর্শন কিন্তু স্বরূপতঃ তাদের সকলেরই উৎস দুগ্ধ — শরীরের পুষ্টির নিমিত্ত এই সমস্ত বস্তুর যেটিকেই ভক্ষণ করা হোক না কেন তা প্রকারান্তরে দুগ্ধপানেরই সমার্থক। সেইরকম সমস্ত দেবতাই ভগবানেরই বিভূতি। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে ঐ সমস্ত দেবতাদের অর্চনা করার নিমিত্ত অর্ঘ্য প্রদান করা হলে সেই সমস্ত অর্ঘ্যই প্রকৃতপক্ষে পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল অভিমুখে ফিরে আসে।

মহাভারতেও তাঁর এই কথার সমর্থন করে বলা হয়েছে—

আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্।
সর্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি।।
সর্বদেবেষু যৎ পুণ্যং সর্বতীর্থেষু যৎ ফলম্।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি স্তুত্বা দেব জনার্দনম্।।

অর্থাৎ আকাশ থেকে পতিত সমস্ত জল যেমন বিভিন্ন নদীর মাধ্যমে অনন্ত সমুদ্রে মিলিত হয় তদ্রূপ সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পিত সমস্ত প্রণাম পরমেশ্বর বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে আশ্রয়লাভ করে। সমস্ত দেবতাদের অর্চনা করে যে পুণ্য, যে ফল অর্জন করা যায় সেই সমস্ত ফলই নন্দনন্দন ব্রজরাখাল বনমালী মুরলীধারী গোপগোপীশ্বর তমালশ্যামল যমলার্জুনভঞ্জন নন্দগোপপ্রিয়াত্মজ নবনীতনটন মুচুকুন্দপ্রসাদক সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কোটিসূর্যসমপ্রভ ইলাপতি বেনুনাদবিশারদ সর্বভূতাত্মক বেদবেদ্য দয়ানিধি পুণ্যশ্লোক জগদ্গুরু জগন্নাথ শ্রীপদাম্বুজ পরমব্রহ্ম গোবিন্দ দামোদর নারায়ণ দেবদেব শ্রীহরি জনার্দন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে অর্চনা করেই লাভ করা যায়।।২৩।।

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং # ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

ন তু মাম্ অভিজানন্তি # তত্ত্বেন অতঃ চ্যবন্তি তে।।২৪।।

অহং হি = আমিই; সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা = সর্বযজ্ঞের ভোক্তা; মাম্ ন অভিজানন্তি = আমাকে জানে না; তত্ত্বেন = সঠিকভাবে; অতঃ = এই কারণে; চ্যবন্তি তে = তারা আমার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সংসারে পতিত হয়।।২৪।।

অনুবাদ :- আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও ফল প্রদানকারী। কিন্তু তারা আমাকে সঠিকভাবে জানে না। সেইজন্য তাদেরকে আবার মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণ ক'রে এই পৃথিবীর দুঃখে পতিত হতে হয়।।২৪।।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ # পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা # যান্তি মৎ যাজিনঃ অপি মাম্।।২৫।।

যান্তি = লাভ করেন; দেবব্রতা = দেবতাদের পূজক; দেবান্ = দেবতাদের; পিতৃন যান্তি = পিতৃলোক লাভ করেন; পিতৃব্রতাঃ = পিতৃপূজকগণ; ভূতানি যান্তি = ভূতলোক লাভ করেন; ভূতেজ্যাঃ = ভূতপূজকগণ; যান্তি = লাভ করেন; মৎ যাজিনঃ অপি = আমার ভজনাকারিগণও; মাম্ = আমাকে।।২৫।।

অনুবাদ :- যাঁরা বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করেন তাঁরা মৃত্যুর পর দেবলোক লাভ করেন, যাঁরা শ্রাদ্ধ, তর্পণ আদির দ্বারা পিতৃপুরুষের পূজা করেন তাঁরা পিতৃলোক লাভ করেন, যাঁরা ভূতগণের পূজা করেন তাঁরা ভূতলোক গমন করেন আর যাঁরা আমার পূজা করেন তাঁরা আমাকে লাভ করেন।। ২৫।।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং # যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্তি-উপহৃতম্ # অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।। ২৬।।

তোয়ং = জল; যো মে ভক্ত্যা = যে আমাকে ভক্তি ক'রে; প্রযচ্ছতি = দেয়; তৎ = সেগুলি; অহং = আমি; ভক্তি-উপহৃতম্ = ভক্তিভরে অর্পিত; অশ্নামি = গ্রহণ ক'রে থাকি; প্রযতাত্মনঃ = শুদ্ধচিত্ত।।২৬।।

অনুবাদ :- আমার যে ভক্ত পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি যা কিছুই আমার উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে অর্পণ করুক না কেন, আমি শুদ্ধচিত্ত ভক্তের সেই অর্ঘ্য আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ ক'রে থাকি।।২৬।।

যৎ করোষি যৎ অশ্নাসি # যৎ জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় # তৎ কুরুষ্ব মৎ অর্পণম্।। ২৭।।

যৎ করোষি = যা যা কর্ম কর; যৎ অশ্নাসি = যা ভোজন কর; যৎ জুহোষি = যে হোম কর; দদাসি = যা দান কর; যৎ যৎ তপস্যসি = যে তপস্যা ; তৎ কুরুষ্ব = করবে; মৎ অর্পণম্ = আমাকে অর্পণ।। ২৭।।

অনুবাদ :- হে কৌন্তেয়! তুমি যা যা কর্ম করবে যথা ভোজন, হোম, দান, তপস্যা তাদের সমস্তই আমাকে অর্পণ করবে।।২৭।।

ব্যাখ্যা :- ভগবানের মুখনিঃসৃত এই শ্লোকটি গীতার সর্বোত্তম গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। সমগ্র গীতা জুড়ে ভগবানের যে বাণী প্রচারিত হয়েছে তার সার সমাহিত হয়ে আছে এই শ্লোকের মধ্যে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে বহুবার প্রিয় শিষ্য অর্জুনের মাধ্যমে জগৎ সংসারের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে অনিত্য নশ্বর মানব জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হল ভগবানের পরম পদ অর্থাৎ মোক্ষ অর্থাৎ ভগবানের আনুকূল্য লাভ করা। জীব তার সেই লক্ষ্য কিভাবে পূরণ করতে পারে সে বিষয়ে তিনি পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়ে বলেছেন যে তাঁর প্রতি ভক্তের একাগ্রচিত্তে নিষ্কাম নিঃস্বার্থ পূর্ণ আত্মসমর্পণই হল তাঁকে লাভ করার একমাত্র পথ। কিন্তু নিরেট পাথরের মত কঠিন হৃদয় মানুষের পক্ষে তাঁর সেই মূল্যবান উপদেশ সহজে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই তিনি পুনরায় এই শ্লোকে তাঁর সেই অমৃত বাণী অর্থাৎ কিভাবে ভক্ত তাঁর চরণপদ্মে নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে পারে তা তিনি সকলের সুবিধার্থে অতি সরল ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি এই শ্লোকে বলেছেন যে ভক্তের যদি তাঁকে লাভ করার বাসনা থাকে তাহলে ভক্তের উচিত হবে শয়নে-স্বপনে-নিদ্রায়-জাগরণে যা কিছু করবে তার সমস্ত কিছুই তাঁর শ্রীচরণে সমর্পণ করা। অর্থাৎ ভক্ত যা কিছু করবে যেমন অন্নগ্রহণ, পূজা-পাঠ, যজ্ঞ, দান-ধ্যান, তপস্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সমাজ রক্ষার নিমিত্ত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা প্রভৃতি সমস্তই তাকে ভগবানের চরণে একাগ্রচিত্তে

নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থভাবে সমর্পণ করে দিতে হবে। সেই কাজের মধ্যে যেন তার অন্তরে কোন অহং বোধ, কোন আসক্তি, মায়া মোহ না থাকে। তাহলেই সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বর ভগবান্ তার প্রতি প্রসন্ন হবেন। এইভাবে কর্ম করলে তার আর কোন কর্মবন্ধন জন্মাবে না এবং এর ফলে ভগবানের অসীম করুণায় সে জীবনের পরম লক্ষ্য মোক্ষ লাভ করতে সক্ষম হবে।।২৭।।

শুভ-অশুভ-ফলৈঃ এবং # মোক্ষসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাস-যোগ-যুক্ত-আত্মা # বিমুক্তো মাম্ উপৈষ্যসি।।২৮।।

শুভ-অশুভ-ফলৈঃ = শুভ ও অশুভ কর্মের ফল থেকে; এবং = এইভাবে; মোক্ষসে = মুক্তিলাভ করবে; কর্মবন্ধনৈঃ = কর্মবন্ধন থেকে; সন্ন্যাস-যোগ-যুক্ত-আত্মা = সমস্ত কর্ম সমর্পণের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে; বিমুক্তো = মুক্ত হয়ে; মাম্ উপৈষ্যসি = আমাকে পাবে।।২৮।।

অনুবাদ :- এইভাবে কর্ম করলে আমার প্রতি তোমার সমস্ত কর্ম সমর্পণের মাধ্যমে তোমার আর শুভ ও অশুভ কর্মের কোন কর্মবন্ধন থাকবে না। তুমি সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমার মধ্যেই পরমগতি লাভ করবে।।২৮।।

সমঃ অহং সর্বভূতেষু # ন মে দ্বেষ্যঃ অস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা # ময়ি তে তেষু চ অপি অহম্।। ২৯।।

সমঃ অহং সর্বভূতেষু = আমি সকলকে সমান চোখে দেখি; মে = আমার; দ্বেষ্যঃ = শত্রু; ন অস্তি = নাই; যে ভজন্তি = যাঁরাই আমার ভজনা করেন; তু = কিন্তু; মাং = আমাকে; ভক্ত্যা = ভক্তিসহকারে; ময়ি তে = তাঁরা সকলেই আমার মধ্যে থাকেন; তেষু চ অপি অহম্ = আমিও তাঁদের অন্তরে বাস করি।।২৯।।

অনুবাদ :- আমি সকলকে সমান চোখে দেখি। কারও প্রতি আমার দ্বেষ নাই, কেউ আমার প্রিয় নয়, কেউ আমার অপ্রিয় নয়। তবে যাঁরাই ভক্তিসহকারে আমার ভজনা করেন তাঁরা সকলেই আমার মধ্যে থাকেন এবং আমিও তাঁদের অন্তরে বাস করি।।২৯।।

অপি চেৎ সুদুরাচারো # ভজতে মাম্ অনন্যভাক্।
সাধুঃ এব স মন্তব্যঃ # সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।। ৩০।।

অপি = ও; চেৎ = যদি; সুদুরাচারো = অতি দুরাচারী; ভজতে = ভজনা করে; মাম্ = আমাকে; অনন্যভাক্ = অনন্যচিত্ত হয়ে; সাধুঃ এব স = তিনি সাধু; মন্তব্যঃ = মনে করা উচিত; সম্যক্ = যথার্থ; ব্যবসিতো = নিঃশ্চয়াত্মকবুদ্ধিবিশিষ্ট।।৩০।।

অনুবাদ :- যদি কোন ব্যক্তি অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন কিন্তু তিনি যদি অতি দুরাচারী হন তাহলেও তাঁকে সাধু ব'লে জানবে কারণ তিনি জেনেছেন যে আমার ভজনাই হল নিশ্চিতভাবে শ্রেষ্ঠ কর্ম।।৩০।।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা # শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি # ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।। ৩১।।

ক্ষিপ্রং = দ্রুত; ধর্মাত্মা = ধর্মপরায়ণ; শশ্বৎ শান্তিং = চির শান্তি, নিগচ্ছতি = লাভ করেন; প্রতিজানীহি = জেনে রাখ; মে ভক্তঃ = আমার ভক্ত; ন প্রণশ্যতি = বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।। ৩১।।

অনুবাদ :- আমার সেই অনন্য ভক্ত শীঘ্রই ধর্মপরায়ণ হয়ে চির শান্তি লাভ করেন। হে কুন্তীপুত্র তুমি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখবে যে আমার ভক্ত কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।। ৩১।।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য # যে অপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ # তে অপি যান্তি পরাং গতিম্।। ৩২।।

মাং = আমাকে; হি = নিশ্চয়; ব্যপাশ্রিত্য = শরণ নিয়ে; যে অপি = যারাই; স্যুঃ = হয়েছে; পাপযোনয়ঃ = অধমকুলজাত; স্ত্রিয়ো বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ = স্ত্রীলোক, বৈশ্য বা শূদ্র; তে অপি = তারাও; যান্তি = লাভ করে; পরাং গতিম্ = পরম গতি অর্থাৎ মোক্ষ।। ৩২।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! যে ব্যক্তিই আমার শরণ নেবে সে অধমকুলজাতই হোক, স্ত্রীজাতি, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি যে কেউই হোক না কেন, সে নিশ্চিতভাবেই আমার মধ্যে পরম গতি লাভ করবে।। ৩২।।

কিং পুনঃ ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা # ভক্তা রাজর্ষয়ঃ তথা।
অনিত্যম্ অসুখং লোকম্ # ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।। ৩৩।।

কিং পুনঃ ব্রাহ্মণাঃ = ব্রাহ্মণগণ; পুণ্যা = পুণ্যবান; ভক্তা রাজর্ষয়ঃ = ভক্ত রাজর্ষিগণ; তথা অনিত্যম্ = অস্থায়ী; অসুখং = সুখহীন; লোকম্ = জগৎ; ইমং = এই; প্রাপ্য = লাভ ক'রে; ভজস্ব = ভজনা কর; মাম্ = আমাকে।।৩৩।।

অনুবাদ :- পুণ্যবান ব্রাহ্মণগণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণ স্বাভাবিকভাবেই পরম গতি লাভ করেন। এতে কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য তুমি এই নশ্বর ও সুখহীন ইহজগতে আমার ভজনা কর।।৩৩।।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো # মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মাম্ এব এষ্যসি যুক্ত্বা এবম্ # আত্মানং মৎপরায়ণঃ।। ৩৪।।

মন্মনা = মদ্গত চিত্ত; মদ্ভক্তঃ = আমার ভক্ত; মদ্যাজী = আমার পূজা পরায়ণ; নমস্কুরু = প্রণাম কর; মাম্ এব = আমাকেই; এষ্যসি = লাভ করবে; মৎপরায়ণঃ = আমার শরণ নাও।।৩৪।।

অনুবাদ :- তুমি সর্বদা আমার মধ্যেই তোমার চিত্ত স্থাপন কর, আমাকে ভক্তি কর, আমার উপাসনা কর, আমাকে নমস্কার কর। এইভাবে আমার প্রতি সমর্পিতপ্রাণ হয়ে আমার মধ্যে তোমার চিত্ত স্থাপন করলে তুমি আমাকে লাভ করবে।।৩৪।।

—ঃ নবম অধ্যায় সমাপ্ত ঃ—

দশম অধ্যায়

বিভূতি-যোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ

ভূয় এব মহাবাহো # শৃণু মে পরমং বচঃ।
যৎ তে অহং প্রীয়মাণায় # বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া।।১।।

ভূয় = পুনরায়; শৃণু = শোন; মে = আমার; পরমং বচঃ = পরমার্থ বিষয়ক কথা; অহং = আমি; প্রীয়মাণায় = আমার প্রিয়পাত্র মনে ক'রে; হিতকাম্যয়া = কল্যাণের জন্য; বক্ষ্যামি = বলছি।

অনুবাদ :- হে মহাবাহো অর্জুন! তুমি আমার আগে বলা কথাগুলি শুনে আনন্দ লাভ করেছ। সেইজন্য আমি তোমার কল্যাণের নিমিত্ত আবার আমার পূর্বের সেই পরমার্থ বিষয়ক শ্রেষ্ঠ কথাগুলো বলছি, তুমি শোন।।১।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে 'পরমং বচঃ' অর্থাৎ পরমার্থ বিষয়ক কথা বলতে বোঝাতে চেয়েছেন সেই সমস্ত উপদেশকে যেগুলি তিনি অর্জুনকে এর পূর্বে বলেছেন। এই উপদেশগুলি মানুষকে পরমাত্মার পরম গোপনীয় গুণ, প্রভাব এবং তত্ত্ব বুঝতে এবং সেই পরমেশ্বরকে লাভ করতে সাহায্য করে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে ভগবান্ তো ইতিপূর্বে এই কথাগুলি অর্জুনকে ভালোভাবেই বুঝিয়ে বলেছেন। তাহলে সেগুলির আবার পুনরাবৃত্তি করার কি প্রয়োজন ছিল? আমরা সকলেই জানি যে কোন অজ্ঞ মানুষকে কোন কঠিন বিষয় বোঝাতে হলে সেটি বারে বারে তার কানের কাছে বলতে হয়। কঠিন পাথরের উপরে মৃত্তিকানির্মিত জলের কলস দীর্ঘদিন রাখতে রাখতে তবেই সেই পাথরের উপরে স্বচ্ছন্দে সেই কলস স্থাপন করার মত ক্ষতস্থানের সৃষ্টি হয়। এক-আধদিন জলপাত্র রাখলে সেই কঠিন প্রস্তরের উপর কোনই প্রভাব পরে না। অজ্ঞ মানুষের অন্তর তো আত্মতত্ত্ববিষয়ে কঠিন প্রস্তরের মত। সহজে সেখানে পারমার্থিক তত্ত্বের দাগ বসে না। অর্জুন একজন উচ্চস্তরীয় বীর যোদ্ধা। আত্মতত্ত্বের

আলোকে তো তার অন্তর পরিপূর্ণ আলোকিত নয় আর ভগবান্ ইতিপূর্বে যে উপদেশগুলি তাঁকে দিয়েছেন সেগুলি নিঃসন্দেহে বড়ই দুরূহ, হৃদয়ের পাথর ভেঙ্গে সহজে তা হৃদয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সেইজন্য ভগবান্ অর্জুনের সামনে সেই উপদেশগুলি পুনঃ পুনঃ বিভিন্নভাবে ব'লে অর্জুনের অন্তরে সেগুলিকে দৃঢ়বদ্ধ করতে চেয়েছেন।। ১।।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ # প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহম্ আদিঃ হি দেবানাং # মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ।।২।।

মে = আমার; ন বিদুঃ = জানেন না; সুরগণাঃ = দেবতাগণ; প্রভবং = প্রভাব; মহর্ষয় = মহর্ষিগণ; সর্বশঃ = সর্বপ্রকারে।।২।।

অনুবাদ:- আমিই সর্বপ্রকারে আদি পুরুষ অর্থাৎ আমার পূর্বে এই ব্রহ্মাণ্ডে অপর কারোরই অস্তিত্ব ছিল না। সেইজন্য কোন দেবতা বা মহর্ষি আমার উৎপত্তি, লীলা, প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে কিছুই জানেন না।।২।।

ব্যাখ্যা :- এখানে ভগবানের কথায় পাঠকের মনে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। ভগবান্ এখানে বলেছেন যে যেহেতু সকল দেবতা, মহর্ষিরা তাঁর পরে জন্মগ্রহণ করেছেন সেইজন্য তাঁরা তার নাম, জন্ম, কর্ম, স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে কিছুই জানে না। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে আমরা জানি যে আমাদের বহুপূর্বে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের বিষয়ে আমরা সমস্ত কিছুই জানি। তাহলে ভগবান্ একথা বললেন কেন? রামানুজ তাঁর গীতাভাষ্যে সহজ ও সাবলীল ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন— "তেষাং দেবত্বদেবঋষিত্বাদিহেতুভূতপুণ্যানুগুণং ময়া দত্তং জ্ঞানং পরিমিতম্, অতঃ তে পরিমিতজ্ঞানাঃ মৎস্বরূপাদিকং যথাবৎ ন জানন্তি।" অর্থাৎ সেইসমস্ত দেবতা, ঋষিগণের অর্জিত পুণ্য অনুযায়ী তিনি যে জ্ঞান তাঁদেরকে দিয়েছেন তা তাঁর স্বরূপ ইত্যাদি সম্যক জানার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সেইজন্য তাঁরা তাঁর অতি গভীর স্বরূপাদি বিষয়ে তেমন কিছু জানতে পারেন না। ভগবানের এই অভিমতকে খুবই যত্ন সহকারে বিচার করতে হবে। বাস্তব জীবনে কোন শিক্ষক যখন বিদ্যাদান করেন তখন তিনি সকল ছাত্রকে একই বিদ্যাদান করেন না। ছাত্রের বুদ্ধিমত্তার মান অনুযায়ী তিনি জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা করেন। কাজেই

যে ছাত্র মেধার দিকে দুর্বল তাকে সর্বোচ্চ জ্ঞান দেওয়া যায় না। এই সমস্ত দেবতা, ঋষিদের ক্ষেত্রে সেইটিই হয়েছে। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলে যা যা জ্ঞান অর্জন করেছে তার সমস্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দান। যে যেমন পুণ্য অর্জন করেছে তাকে ভগবান্ সেই রকমই জ্ঞান দান করেন কারণ ভগবানের নিকট কেউই প্রিয় নয়, কেউই শত্রু নয়। সেইজন্য এই সমস্ত দেবতা, ঋষিদের অর্জিত পুণ্য অনুযায়ী তাঁরা যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তা ভগবানের সুগভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেইজন্য ঐ সমস্ত দেবতা, ঋষিগণ ভগবানের উৎপত্তি, লীলা প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে কিছুই জানেন না।।২।।

যো মাম্ অজম্ অনাদিং চ # বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু # সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।। ৩।।

যঃ = যিনি; মাম্ = আমাকে; অজম্ = জন্মহীন; বেত্তি = জানেন; লোকমহেশ্বরম্ = সকল জগতের প্রভু; অসংমূঢ়ঃ = মোহমুক্ত; মর্ত্যেষু = ইহলোকে; সর্বপাপৈঃ = সমস্ত পাপ থেকে; প্রমুচ্যতে = মুক্তি লাভ করেন।।৩।।

অনুবাদ :- যে ভক্ত জানেন যে আমার আদি নাই, অন্ত নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আমি সকল জগতের প্রভু, তাঁর অন্তর থেকে সমস্ত মোহ নষ্ট হয়ে তাঁর সর্বপাপ দূর হয়ে যায়।। ৩।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ অজন্মা অর্থাৎ ভগবানের জন্ম হয় না। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ তো তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে দেখেছে। তাহলে ভগবানের বক্তব্যের সত্যতা কোথায়? বিষয়টি একটু স্পষ্টভাবে বোঝা প্রয়োজন। প্রাকৃত জীবসকল যেভাবে জন্মগ্রহণ করে থাকে, ভগবানের জন্ম সেভাবে হয় না। তাঁর জন্ম জন্মহীনের জন্ম। আমরা যে তাঁকে জন্ম নিতে দেখি সেটি আমরা মায়ার প্রভাবে ধারণা ক'রে থাকি। ভগবান্ যে যুগে যুগে প্রকট হয়ে থাকেন সেটি তাঁর জন্ম নয়, পরম অপার্থিব পবিত্র দিব্য লীলা মাত্র। ভগবান্ তাঁর যোগমায়া বলে লোকরঞ্জন, অধর্মের বিনাশ ও ধর্মের উত্থানের জন্য যুগে যুগে মায়ার কায়া ধারণ ক'রে ধরায় অবতীর্ণ হন। তাঁর মৃত্যু নাই কারণ যাঁর জন্ম নাই তাঁর মৃত্যু হবে কিভাবে?।। ৩।।

বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্ অসংমোহঃ # ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবঃ অভাবঃ # ভয়ং চ অভয়ম্ এব চ।।৪।।
অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ # তপঃ দানং যশঃ অযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং # মত্ত এব পৃথগ্ বিধাঃ।।৫।।

অসংমোহঃ = মোহমুক্তি; দমঃ = হস্ত-পদাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম; শমঃ = অন্তরের সংযম; ভবঃ = জন্ম; অভাবঃ = মৃত্যু; চ = এবং; ভবন্তি = হয়; ভাবাঃ = ভাবসমূহ; ভূতানাং = জীবসমূহের; মত্ত এব = আমার থেকেই; পৃথগ্ বিধাঃ = বিভিন্ন প্রকার।।৪-৫।।

অনুবাদ :- জীবগণের বিভিন্ন প্রকার ভাবসমূহ যথা বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ অর্থাৎ মোহমুক্তি, ক্ষমা, সত্যবাদিতা, হস্ত-পদাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম, অন্তরের সংযম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তুষ্টি, তপ, দান, যশ এবং অযশ প্রভৃতি আমার থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।।৪-৫।।

ব্যাখ্যা :- সঠিক-বেঠিক, ভালো-মন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্য প্রভৃতি বিষয় নির্ণয় করার ক্ষমতাকে বুদ্ধি বলা হয়। শ্রীধরাচার্যের মতে সার ও অসার বস্তুর যথার্থভাবে অনুধাবনের ক্ষমতাকে বুদ্ধি বলা হয় —"বুদ্ধিঃ সারাসারবিবেকনৈপুণ্যম্।" আবার শঙ্করাচার্য বলেছেন যে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর আদি পদার্থকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করার অন্তরের যে জ্ঞানশক্তি তারই নাম হল বুদ্ধি — "বুদ্ধিঃ অন্তঃকরণস্য সূক্ষ্মাদ্যর্থাববোধনসামর্থ্যম্।" রামানুজাচার্য সহজ ভাষায় বুদ্ধি শব্দের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে নিরূপণ করার মানসিক যে সামর্থ্য তাকে বুদ্ধি বলা হয়— "বুদ্ধিঃ মনসো নিরূপণসামর্থ্যম্।" সুতরাং প্রাকৃত মানুষ 'বুদ্ধি' শব্দের যে অর্থ করে শাস্ত্রে সেই 'বুদ্ধি' শব্দের অর্থ অনেক বেশী ব্যাপক।

আমরা বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের উপরে জ্ঞানকেই জ্ঞান ব'লে বুঝে থাকি। শাস্ত্রে এই জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান বলা হয় না। বিদ্যালয় থেকে আমরা যে জ্ঞান পুস্তকের মাধ্যমে লাভ করে থাকি তা কেবল জড়জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সমস্ত পুস্তক আমাদেরকে পারমার্থিক জ্ঞানদানে অক্ষম। সেইজন্য শাস্ত্রের ভাষায় সেই জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নয়। প্রকৃত জ্ঞান হল সেই জ্ঞান যা আমাদেরকে পারমার্থিক জগতের সঙ্গে যুক্ত করে।

রামানুজাচার্যের মতে জ্ঞান হল সেই বস্তু যা আমাদেরকে চেতন ও অচেতন বিষয়ের ভেদকে নিশ্চিতভাবে অনুভব করার যোগ্যতা দান করে—"জ্ঞানং চিদচিদ্বস্তুবিশেষবিষয়ঃ নিশ্চয়ঃ।"

আত্মা হল অবিনশ্বর চেতন পদার্থ এবং দেহ হল নশ্বর জড় পদার্থ। মানুষ যখন প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হন তখন তিনি আত্মা ও দেহের পার্থক্য বুঝতে পারেন। ফলে তখন তিনি আর দেহটির জন্য নিশ্চিতভাবেই কোন আকর্ষণ অনুভব করেন না এবং আত্মাকে শাশ্বত, চির অবিনশ্বর ভেবে পরমাত্মাকে লাভের সাধনায় ব্রতী হন। শঙ্করাচার্য বলেছেন যে আত্মা আদি পদার্থের বোধকে 'জ্ঞান' বলা হয়— "জ্ঞানম্ আত্মাদিপদার্থানাম্ অববোধঃ"। শ্রীধরাচার্যও আত্মবিষয়ক উপলব্ধিকেই জ্ঞান নামে অভিহিত করেছেন — "জ্ঞানমাত্মবিষয়ম্।"

'অসংমোহঃ' পদের অর্থ মোহমুক্তি। মায়াবদ্ধ প্রাকৃত মানুষের অন্তর সদা মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে। সেই কারণে এই দৃশ্যমান নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী, নিরন্তর বেদনাময় প্রাকৃত মিথ্যা জগটিকেই সে সত্য এবং অতীব সুখদায়ক ভেবে থাকে আর যতই সে এই অনিত্য জগতটিকে আপন করতে চেষ্টা করে ততই নিত্য নূতন দুঃখের আঘাতে তার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়। কিন্তু যখনই তার অন্তরে সত্য জ্ঞানের আলোক জ্বলে ওঠে তখনই তার মোহমুক্তি ঘটে, তখনই সে চেতন-অচেতন সকল পদার্থের মধ্যেই সেই পরমেশ্বরের উপস্থিতি দর্শন করে। তখনই সে পার্থিব জড়জগতের সমস্ত বিষয়ের প্রতি অন্তরে বৈরাগ্য লাভ ক'রে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ পরমেশ্বরই একমাত্র অন্তিম আশ্রয়স্থল এই জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিরাসক্ত চিত্তে নিজের কর্তব্য পালন ক'রে পরমেশ্বরের পরম ধামে গমনের পথ রচনা করে।।৪-৫।।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে # চত্বারো মনবঃ তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা # যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ।।৬।।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত = সাতজন মহর্ষি; পূর্বে চত্বারঃ = তার পূর্বের চারজন; মনবঃ = মনু; মদ্ভাবাঃ = আমা থেকেই ভাব অর্থাৎ জন্ম; মানসাঃ জাতাঃ = মন থেকে উৎপন্ন; যেষাং = যাদের; লোকে = জগতে; ইমাঃ = এই সমস্ত; প্রজাঃ = সন্তান-সন্ততি।। ৬।।

অনুবাদ :- সাতজন মহর্ষি, তারও পূর্বের চারজন ব্রহ্মর্ষি, চতুর্দশ মনু প্রভৃতি আমারই মন থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তারপর তাঁদেরই সন্তান-সন্ততিদের দ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ হয়েছে।।৬।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে কথিত সাতজন মহর্ষির পরিচয় আমরা মহাভারতের শান্তিপর্ব থেকে জানতে পারি —

মরীচিরঙ্গিরাশ্চাত্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
বশিষ্ঠ ইতি সপ্তৈতে মানসা নির্মিতা হি তে।।

—(শান্তিপর্ব ৩৪০।৬৯)

অর্থাৎ এই সাত জন মহর্ষি হলেন মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। অন্য যে চারজন ব্রহ্মর্ষির বিষয় বলা হয়েছে তাঁদের পরিচয় আমরা শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ থেকে জানতে পারি যে আদিতে ভগবানের মন থেকে 'সন্' নামযুক্ত চারজন ব্রহ্মর্ষি সৃষ্টি হন — "আদৌ সনাৎ স্বতপসঃ স চতুঃ-সনোঽভূৎ" (২।৭।৫)। এঁরা হলেন সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। কৌমারসর্গে জন্মগ্রহণকারী এই চারজন কুমার হলেন ভগবানের প্রথম অবতার।

চৌদ্দজন মনু হলেন — স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চক্ষু, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণের অষ্টম স্কন্ধের প্রথম, পঞ্চম ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এঁদের বিস্তারিত বিবরণ আছে। ব্রহ্মার একদিন চৌদ্দজন মনুর সময়কালের সমান। প্রতিটি মনুর সময়কালকে মন্বন্তর বলা হয়। প্রত্যেকটি মন্বন্তরে ধর্মের ব্যবস্থা ও লোকরক্ষার জন্য পৃথক পৃথক সপ্তর্ষি থাকেন। এক একটি মন্বন্তরের সময়কাল কত হবে সে সম্পর্কে বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—

অষ্টৌ শতসহস্রাণি দিব্যয়া সংখ্যয়া গতিঃ।
দ্বাপঞ্চাশৎ তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি চ।।
ত্রিংশৎকোট্যস্তু সম্পূর্ণাঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া দ্বিজ।
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতানি মহামুনে।
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোঽয়মধিকং বিনা।
মন্বন্তরস্য সংখ্যেয়ং মানুষৈর্বৎসরৈর্দ্বিজ।। (১।৩।১৮-১৯)

অর্থাৎ দিব্য সংখ্যার গণনায় এক মন্বন্তরের সময়কাল আটলক্ষ, বাহান্ন হাজার

বৎসর এবং মানুষের বৎসরের হিসাবে এক মন্তরের সময়কাল হল ত্রিশকোটী সাতষট্টি লক্ষ কুড়ি হাজার বছর।। ৬।।

এতাং বিভূতিং যোগং চ # মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সঃ অবিকম্পেন যোগেন # যুজ্যতে ন অত্র সংশয়ঃ।।৭।।

বেত্তি = জানেন; তত্ত্বতঃ = যথার্থভাবে; অবিকম্পেন = স্থির; যোগেন = ভক্তিযোগের দ্বারা; যুজ্যতে = যুক্ত হন।।৭।।

অনুবাদ :- যিনি আমার এই ভৃগু, মনু আদি পরমৈশ্বর্যরূপ বিভূতি ও ভক্তিযোগের বিষয় যথার্থভাবে জানেন তিনি স্থির ভক্তিযোগ লাভ করেন এবং তিনি সংশয়াতীতভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত হন।। ৭।।

ব্যাখ্যা :- বিভূতি শব্দের অর্থ হল ঐশ্বর্য। ঈশ্বরের অধীনে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রবৃত্তিরূপ সকল বস্তুই হল ভগবানের বিভূতি— "সর্বস্য মদায়ত্তোৎপত্তিস্থিতিপ্রবৃত্তিরূপাং বিভূতিং মম" (রামানুজাচার্য)। অর্থাৎ চরাচরের দৃশ্য-অদৃশ্য, চিন্ত্য-অচিন্ত্য, জড়-অজড় সমস্ত বস্তুই হল শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি, সকলই তাঁর বিভূতি অর্থাৎ তাঁর স্বরূপ।।৭।।

অহং সর্বস্য প্রভবো # মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং # বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।।৮।।

অহং = আমি; প্রভবঃ = উৎপত্তির কারণ; মত্তঃ = আমার থেকেই; সর্বং = সকলে; প্রবর্ততে = আবর্তিত হয়; মত্বা = জেনে; ভজন্তে = ভজনা করে; মাং = আমাকে; বুধাঃ = জ্ঞানিগণ; ভাবসমন্বিতাঃ = ভাবযুক্ত হয়ে।।৮।।

অনুবাদ:-আমার বুদ্ধিমান ভক্তগণ সম্যকরূপে জানেন যে আমার মধ্য থেকেই সমগ্র জগতের সৃষ্টি হয়েছে, আমাকে কেন্দ্র করেই জগতের সমস্ত কর্ম আবর্তিত হয়। আমার এই স্বরূপ জেনে তাঁরা পরম ভাবে বিভোর হয়ে আমার ভজনা করেন।।৮।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে স্পষ্টভাবে অর্জুনকে বলছেন যে তিনিই পরব্রহ্ম বাসুদেব সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরম বীজস্বরূপ। তিনিই এই জগতের হোতা, ভোক্তা, ধাতা, এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্তা। সমগ্র জগৎ তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই আবর্তিত হয়ে চলেছে। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারেন। সেইজন্য

তাঁরা ভাবাবিষ্ট হয়ে তাঁর ভজনায় রত হন। কিন্তু যারা অজ্ঞানী তারা তাঁর এই তত্ত্ব জানতে পারে না। সেইজন্য তারা তাঁকে অবহেলা করে এবং এইজন্য তাঁদের পরমার্থ লাভের পথ বন্ধ হয়ে থাকে।।৮।।

মচ্চিত্তা মদ্গত-প্রাণা # বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।

কথয়ন্তঃ চ মাং নিত্যং # তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।। ৯।।

মচ্চিত্তাঃ = যাঁরা তাঁদের চিত্ত আমার মধ্যেই সমর্পণ করেছেন; মদ্গত-প্রাণাঃ = যাঁরা তাঁদের চক্ষু আদি প্রাণ আমার মধ্যেই স্থাপন করেছেন; মাং = আমার তত্ত্ব; বোধয়ন্তঃ = আমার কথা বুঝাতে বুঝাতে; কথয়ন্তঃ = কীর্তন করতে করতে; নিত্যং = সর্বদা; তুষ্যন্তি = সন্তুষ্টি লাভ করেন; রমন্তি = আনন্দ লাভ করেন।।৯।।

অনুবাদ :- আমার যে সব শুদ্ধ ভক্ত তাঁদের চিত্ত আমার মধ্যেই সমর্পণ করেছেন, যাঁরা তাঁদের চক্ষু আদি প্রাণ আমার মধ্যেই স্থাপন করেছেন অর্থাৎ যাঁরা ক্ষণমাত্র আমাকে ছাড়া বাঁচতে পারেন না, তাঁরা সর্বদা নিজেদের মধ্যে পরস্পর আমার বিষয়ে আলোচনায় ও আমার কীর্তনে রত থাকেন এবং এইভাবে তাঁরা সন্তুষ্টি ও আনন্দ লাভ করেন।।৯।।

তেষাং সততযুক্তানাং # ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং # যেন মাম্ উপযান্তি তে।।১০।।

তেষাং = তাঁদেরকে; সততযুক্তানাং = যাঁরা আমার সঙ্গে সর্বদা যুক্ত থাকেন; ভজতাং = ভজনা করেন; প্রীতিপূর্বকম্ দদামি = দান করি; যেন = যার দ্বারা; মাম্ = আমাকে; উপযান্তি তে = তারা লাভ করতে পারে।। ১০।।

অনুবাদ :- যাঁরা সর্বদা আমার সঙ্গে যুক্ত থাকেন, যাঁরা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদেরকে সেই বুদ্ধিযোগ দান করি যার দ্বারা তাঁরা আমাকে লাভ করতে পারেন।।১০।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে কোনকিছু পাওয়ার আশায় তাঁর ভজনা করলে সেই ভজনা নিষ্ফল হবে।।১০।।

তেষাম্ এব অনুকম্পার্থম্ # অহম্ অজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়ামি আত্মভাবস্থো # জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।।১১।।

তেষাম্ = তাঁদের প্রতি; অনুকম্পার্থম্ = অনুগ্রহ করার জন্য; অজ্ঞানজং = অজ্ঞানজনিত; তমঃ = অন্ধকার; নাশয়ামি = দূর করি; আত্মভাবস্থঃ = আত্মভাবে স্থিত হয়ে; জ্ঞানদীপেন = জ্ঞানের আলোকের দ্বারা; ভাস্বতা = উজ্জ্বল।।১১।।

অনুবাদ :- আমার সেই সকল ভক্তদেরকে অনুগ্রহ করার জন্য আমি তাঁদের অন্তরে অবস্থান ক'রে তাঁদের অন্তরে সত্য জ্ঞানের সঞ্চার করি এবং সেই জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকের প্রভায় তাদের অন্তর থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে দিয়ে থাকি।। ১১।।

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম # পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্ # আদিদেবম্ অজং বিভুম্।।১২।।
আহুঃ ত্বাম্ ঋষয়ঃ সর্বে # দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ # স্বয়ং চ এব ব্রবীষি মে।।১৩।।

উবাচ = বললেন; পরং ব্রহ্ম = পরব্রহ্ম; পরং ধাম = পরম আশ্রয়; ভবান্ = আপনি; অজং = জন্মরহিত; বিভুম্ = সর্বব্যাপী; আহুঃ = বলে; ত্বাম্ = আপনাকে; ব্রবীষি = বলছেন।।১২-১৩।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন - দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ বলেছেন এবং স্বয়ং আপনিও আমাকে বলেছেন যে আপনিই হলেন পরব্রহ্ম, জীবের পরমাশ্রয়, পরম পবিত্র, অবিনশ্বর, দিব্য, আদিদেব, জন্মরহিত সর্বব্যাপী বিরাট্ পুরুষ।।১২-১৩।।

ব্যাখ্যা:- দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান্ নিজেকে পরব্রহ্ম রূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পরব্রহ্ম পদের অর্থ কি? রামানুজাচার্য বলেছেন যে যিনি অক্ষর তিনিই হলেন পরব্রহ্ম — "অক্ষরশব্দনির্দিষ্টং পরম্ এব ব্রহ্ম"। অক্ষর কাকে বলে? যাঁর কোন ক্ষয় নাই, লয় নাই, যিনি চির অপরিবর্তনশীল তাঁকেই অক্ষর বলা হয় এবং তিনিই হলেন পরব্রহ্ম। মুণ্ডকোপনিষদের ১।১।৫ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে একমাত্র পরাবিদ্যার সাহায্যে তাঁকে জানা যায় — 'পরা যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে'। পরাবিদ্যা কি? উপনিষদে দুই

প্রকার বিদ্যার কথা বলা হয়েছে — অপরা বিদ্যা ও পরা বিদ্যা। অপরাবিদ্যা হল এই জড়জগতের জ্ঞান আর পরাবিদ্যা হল ব্রহ্মবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা যার সাহায্যে বিবেকীরা অক্ষর অর্থাৎ ক্ষয়হীন, লয়হীন, অব্যয়, অবিনাশী পরব্রহ্মকে সর্বতোভাবে দর্শন করেন —"তদব্যয়ং যদ্ভুতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা" (মুণ্ডকোপনিষদ১।১।৬)। অপরাবিদ্যার যেখানে শেষ সেইখান থেকেই পরাবিদ্যার শুরু। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ৩।১ মন্ত্রে পরব্রহ্ম শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে যাঁর নিকট থেকে সকল জীবসমূহ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হওয়ার পর যাঁর মধ্যে তারা জীবনধারণ করে, জীবনের অন্তে যাঁর মধ্যে সেই জীবকুল বিলীন হয়ে যায় তিনি হলেন ব্রহ্ম — "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ব্রহ্মেতি।" শ্রীগীতায় অনেকবার এবং অন্যান্য বিভিন্ন শ্রুতি ও শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে এই সমস্ত গুণের আধার হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণই হলেন পরব্রহ্ম।। ১২-১৩।।

সর্বম্ এতৎ ঋতং মন্যে # যৎ মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং # বিদুঃ দেবা ন দানবাঃ।।১৪।।

ঋতং = সত্য; মন্যে = মনে করি; মাং = আমাকে; বদসি = বলছেন; ব্যক্তিং = আবির্ভাবতত্ত্ব বা প্রভাব; বিদুঃ = জানে।।১৪।।

অনুবাদ :- হে কেশব! আপনি আমাকে যা কিছু বলছেন তার সমস্তটিকেই আমি সত্য ব'লে মনে করি। হে ভগবন্! দেব, দানব কেউই আপনার লীলাময় স্বরূপ জানে না।।১৪।।

ব্যাখ্যা :- অর্জুনের এই বাক্য সর্বৈব সত্য। দেবতারা জানেন না পরব্রহ্ম তিনি দেবতাদের অনুগ্রহ করার জন্য প্রকট হয়েছেন এবং দানবরাও জানে না যে তিনি তাদেরকে নিগ্রহ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।।১৪।।

স্বয়মেব আত্মনা আত্মানং # বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ # দেবদেব জগৎপতে।।১৫।।

স্বয়মেব = নিজেই; আত্মনা = নিজের দ্বারা; আত্মানং = নিজেকে; বেত্থ = জানেন; ত্বং = আপনি; পুরুষোত্তম = শ্রেষ্ঠ পুরুষ; ভূতভাবন = যিনি সমস্ত জীবকে সৃষ্টি করেন; ভূতেশ = সকল জীবের নিয়ন্তা; দেবদেব = দেবতাদেরও পরম দেবতা; জগৎপতে = জগতের পালনকারী।।১৫।।

অনুবাদ :- হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! আপনি নিজেই নিজের আত্মজ্ঞানের দ্বারা নিজেকে জানেন।।১৫।।

ব্যাখ্যা :- এখানে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণ আদিপুরুষ, তাঁর গুণ, প্রভাব, লীলা, মাহাত্ম্য, রহস্য ও রূপ অসীম অনন্ত। এই কারণে সীমিত বুদ্ধিসম্পন্ন দেব-মানব-দানব কারোরই পক্ষে তাঁর সেই অনাদি অপরিসীম বৈশিষ্ট্যকে পরিপূর্ণভাবে জানা সম্ভব নয়। প্রাকৃত জীবের পক্ষে কোন বিষয়কে জানতে হলে তাকে তার বুদ্ধিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রপাঠ ও গুরুর মুখ থেকে উপদেশ শুনে তবেই তা আয়ত্ত করতে হয় এবং এইভাবে লব্ধ জ্ঞান সসীম। কিন্তু ভগবানকে এভাবে জ্ঞান সংগ্রহ করতে হয় না। তিনি সর্বজ্ঞ। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জ্ঞানই তাঁর মধ্যে সঞ্চিত। কাজেই তাঁর নিজের সম্পর্কে সমস্ত কিছু একমাত্র তিনিই জানেন।।১৫।।

বক্তুম্ অর্হসি অশেষেণ # দিব্যাঃ হি আত্ম-বিভূতয়ঃ।
যাভিঃ বিভূতিভিঃ লোকান্ # ইমান্ ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি।।১৬।।

বক্তুম্ = বলতে; অর্হসি = সক্ষম; অশেষেণ = সম্পূর্ণরূপে; দিব্যাঃ হি আত্ম-বিভূতয়ঃ = নিজের দিব্য আত্ম-বিভূতিসমূহ; যাভিঃ বিভূতিভিঃ = যে যে বিভূতি দ্বারা; লোকান্ ইমান্ = এই লোক সমূহ; ত্বং = আপনি; ব্যাপ্য = পরিব্যাপ্ত হয়ে; তিষ্ঠসি = অবস্থান করছেন।।১৬।।

অনুবাদ :- আপনি যে যে বিভূতির দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন সে বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমাত্র আপনিই বলতে পারেন। আপনি সেই বিষয়ে আমাকে বলুন।।১৬।।

কথং বিদ্যাম্ অহং যোগিন্ # ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু # চিন্ত্যঃ অসি ভগবন্ ময়া।।১৭।।

কথং = কিভাবে; বিদ্যাম্ = জানব; অহং = আমি; ত্বাং = আপনাকে; পরিচিন্তয়ন্ = চিন্তা ক'রে; কেষু কেষু চ = এবং কোন কোন; ভাবেষু = ভাব সমূহে; চিন্ত্যঃ = চিন্তার যোগ্য; অসি = হবেন; ময়া = আমার দ্বারা।।১৭।।

অনুবাদ :- হে যোগেশ্বর! সদা সর্বদা কিরূপে আপনার চিন্তায় মগ্ন থেকে আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারব এবং হে ভগবন্! কোন কোন ভাবে আমি আপনার চিন্তা করতে পারি? ।। ১৭।।

বিস্তরেণ আত্মনো যোগং # বিভূতিং চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিঃ হি # শৃণ্বন্তো নাস্তি মে অমৃতম্।।১৮।।

বিস্তরেণ = সবিস্তারে; আত্মনঃ = নিজের; ভূয়ঃ = আবার; কথয় = বলুন; শৃণ্বন্তঃ = শুনেও।। ১৮।।

অনুবাদ :- হে জনার্দন! আপনি আপনার যোগৈশ্বর্য ও বিভূতি সমূহের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আবার বলুন। এ বিষয়ে আপনার অমৃততুল্য বাণী শুনেও আমার তৃপ্তি হচ্ছে না।।১৮।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি # দিব্যা হি আত্ম-বিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ # নাস্তি অন্তঃ বিস্তরস্য মে।।১৯।।

হন্ত = ঠিক আছে; তে = তোমাকে; কথয়িষ্যামি = বলব; দিব্যা হি আত্ম-বিভূতয়ঃ = আমার দিব্য বিভূতি সকল; প্রাধান্যতঃ = প্রধানভাবে; নাস্তি অন্তঃ = শেষ নাই; বিস্তরস্য মে = আমার বিস্তৃতির।।১৯।।

অনুবাদ :- ভগবান্ বললেন — হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ঠিক আছে, আমি তোমাকে আমার বিভূতি সমূহের মধ্য থেকে প্রধান প্রধানগুলি বলছি কারণ আমার বিভূতিসমূহ এতই বিশাল ও সুগভীর যে সেগুলি সবিস্তারে বলতে গেলে তার শেষ হবে না।।১৯।।

অহম্ আত্মা গুড়াকেশ # সর্বভূত-আশয়-স্থিতঃ।
অহম্ আদিশ্চ মধ্যং চ # ভূতানাম্ অন্ত এব চ।। ২০।।

সর্বভূত = সকল জীবের; আশয় = হৃদয়; স্থিতঃ; আদিঃ = উৎপত্তি; মধ্যং = স্থিতি; ভূতানাম্ = জীব সকলের; অন্তঃ = লয়।।২০।।

অনুবাদ :- হে গুড়াকেশ! আমি আত্মারূপে সকল জীবের হৃদয়ে বাস করি। আমার দ্বারাই সর্বজীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়ে থাকে।। ২০।।

ব্যাখ্যা :- আত্মা কাকে বলা হয় এবং তাঁর স্বরূপ কি সেই বিষয়ে রামানুজাচার্য বলেছেন —"আত্মা হি নাম শরীরস্য সর্বাত্মন। আচারো নিয়ন্তা শেষী চ।" অর্থাৎ সর্ব প্রকারে যিনি শরীরের আধার, নিয়ন্তা এবং 'শেষী' অর্থাৎ স্বামী তিনিই হলেন আত্মা। অনুরূপভাবে বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৩। ৭। ১৫ মন্ত্রে বলা হয়েছে — "যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যো অন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ, যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।" অর্থাৎ যিনি সর্বভূতে অর্থাৎ সর্বভূতদেবতার অন্তরবর্তী রূপে থাকেন, সর্বভূতদেবতা যাঁহাকে জানেন না, সর্বভূত যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরবর্তী রূপে অবস্থান ক'রে সর্বভূতের দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই হলেন অমৃতময় অন্তর্যামী আত্মা।।২০।।

আদিত্যানাম্ অহং বিষ্ণুঃ # জ্যোতিষাং রবিঃ অংশুমান্
মরীচিঃ মরুতাম্ অস্মি # নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী।।২১।।

আদিত্যানাম্ = আদিত্যগণের মধ্যে; জ্যোতিষাং = জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে; রবিঃ = সূর্য; অংশুমান্ = কিরণশালী; মরুতাম্ = বায়ুগণের মধ্যে; শশী = চন্দ্র।।২১।।

অনুবাদ :- আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আমি অংশুমান সূর্য, বায়ুগণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র।।২১।।

বেদানাং সামবেদঃ অস্মি # দেবানাম্ অস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনঃ চ অস্মি # ভূতানাম্ অস্মি চেতনা।। ২২।।

বেদানাং = বেদসমূহের মধ্যে; সামবেদঃ অস্মি = আমি সামবেদ; দেবানাম্ = দেবতাদের মধ্যে; অস্মি বাসবঃ = আমি ইন্দ্র; ইন্দ্রিয়াণাং = ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে; মনঃ চ অস্মি = আমি মন; ভূতানাম্ = জীবসমূহের মধ্যে; অস্মি চেতনা = আমি চেতনা।।২২।।

অনুবাদ :- বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে আমি মন, আমি জীবসমূহের চেতনা অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি।। ২২।।

রুদ্রাণাং শঙ্করঃ চ অস্মি # বিত্তেশো যক্ষ-রক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকঃ চ অস্মি # মেরুঃ শিখরিণাম্ অহম্।। ২৩।।

রুদ্রাণাং শঙ্করঃ = রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর; বিত্তেশঃ = কুবের; যক্ষ-রক্ষসাম্ = যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে; বসূনাং = বসুগণের মধ্যে; পাবকঃ = অগ্নি; মেরুঃ = সুমেরু; শিখরিণাম্ = পর্বত সমূহের মধ্যে।।২৩।।

অনুবাদ :- রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে আমি কুবের, বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি, শিখরযুক্ত পর্বত সমূহের মধ্যে আমি সুমেরু।।২৩।।

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং # বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনাম্ অহং স্কন্দঃ # সরসাম্ অস্মি সাগরঃ।। ২৪।।

পুরোধসাং = পুরোহিতদের মধ্যে; মুখ্যং = প্রধান; মাং = আমাকে; বিদ্ধি = জানবে; সেনানীনাম্ = সেনাপতিদের মধ্যে; স্কন্দঃ = কার্তিকেয়; সরসাম্ = জলাশয়ের মধ্যে।।২৪।।

অনুবাদ :- পুরোহিতদের মধ্যে আমি প্রধান বৃহস্পতি, সেনাপতিদের মধ্যে আমি কার্তিকেয়, জলাশয়ের মধ্যে আমি সমুদ্র।।২৪।।

মহর্ষীণাং ভৃগুঃ অহং # গিরাম্ অস্মি একম্ অক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞঃ অস্মি # স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।।২৫।।

মহর্ষীণাং = মহর্ষিগণের মধ্যে; ভৃগুঃ অহং = আমি ভৃগু; গিরাম্ = বাক্যের মধ্যে আমি ওঁকার; একম্ অক্ষরম্ = একাক্ষর; যজ্ঞানাং = যজ্ঞসকলের মধ্যে; জপযজ্ঞঃ = আমি জপযজ্ঞ; স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ = আমি স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়।।২৫।।

অনুবাদ:- মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যের মধ্যে আমি একাক্ষর ওঁকার, যজ্ঞসকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয়।।২৫।।

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং # দেবর্ষীণাং চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ # সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।।২৬।।

সর্ববৃক্ষাণাং = সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে; দেবর্ষীণাং = দেবর্ষিগণের মধ্যে; গন্ধর্বাণাং = গন্ধর্বগণের মধ্যে; সিদ্ধানাং = সিদ্ধগণের মধ্যে।।২৬।।

অনুবাদ :- সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি।।২৬।।

উচ্চৈঃশ্রবসম্ অশ্বানাং # বিদ্ধি মাম্ অমৃত-উদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং # নরাণাং চ নরাধিপম্।।২৭।।

উচ্চৈঃশ্রবসম্ অশ্বানাং = অশ্বদের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা; অমৃত-উদ্ভবম্ = অমৃতমন্থনকালে; গজেন্দ্রাণাং = হস্তিদের মধ্যে; নরাণাং চ নরাধিপম্ = মানুষের মধ্যে নৃপতি।।২৭।।

অনুবাদ :- অশ্বদের মধ্যে আমি অমৃতমন্থনকালে সমুদ্র থেকে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবাঃ, হস্তীদের মধ্যে আমি ঐরাবত এবং মনুষ্যদের মধ্যে আমি নৃপতি।।২৭।।

আয়ুধানাম্ অহং বজ্রং # ধেনূনাম্ অস্মি কামধুক্।
প্রজনঃ চ অস্মি কন্দর্পঃ # সর্পাণাম্ অস্মি বাসুকিঃ।। ২৮।।

আয়ুধানাম্ = অস্ত্রসমূহের মধ্যে; অহং বজ্রং = আমি বজ্র; প্রজনঃ = সন্তান-সন্ততিদের জনকের মধ্যে; সর্পাণাম্ = সাপদের মধ্যে।।২৮।।

অনুবাদ :- আমি অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু, সন্তান-সন্ততিদের জনকের মধ্যে আমি কন্দর্প, সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি।।২৮।।

অনন্তঃ চ অস্মি নাগানাং # বরুণো যাদসাম্ অহম্।
পিতৃণাম্ অর্যমা চ অস্মি # যমঃ সংযমতাম্ অহম্।।২৯।।

নাগানাং = নাগগণের মধ্যে; যাদসাম্ = জলচরদের মধ্যে; পিতৃণাম্ = পিতৃগণের মধ্যে; সংযমতাম্ = শাসনকর্তার মধ্যে।।২৯।।

অনুবাদ :- আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, আমি জলচরদের অধিপতি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্যমা, শাসনকর্তার মধ্যে আমি যমরাজ।।২৯।।

প্রহ্লাদঃ চ অস্মি দৈত্যানাং # কালঃ কলয়তাম্ অহম্।
মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রঃ অহং # বৈনতেয়ঃ চ পক্ষিণাম্।।৩০।।

দৈত্যানাং = দৈত্যদের মধ্যে; কলয়তাম্ = ঘটনাসমূহের নির্দেশকারীদের মধ্যে; মৃগাণাং = পশুদের মধ্যে; মৃগেন্দ্র = পশুরাজ সিংহ; বৈনতেয়ঃ = গরুড়; পক্ষিণাম্ = পক্ষিগণের মধ্যে।। ৩০।।

অনুবাদ :- আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, ঘটনাসমূহের নির্দেশকারীদের মধ্যে কাল, পশুদের মধ্যে পশুরাজ সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়।।৩০।।

পবনঃ পবতাম্ অস্মি # রামঃ শস্ত্রভৃতাম্ অহম্।
ঝষাণাং মকরঃ চ অস্মি # স্রোতসাম্ অস্মি জাহ্নবী।। ৩১।।

পবনঃ = বায়ু; পবতাম্ = পবিত্রকারী বা গমনশীলদের মধ্যে; শস্ত্রভৃতাম্ = শস্ত্রধারিগণের মধ্যে; ঝষাণাং = মৎস্যদের মধ্যে; স্রোতসাম্ = নদীসমূহের মধ্যে; জাহ্নবী = গঙ্গা।।৩১।।

অনুবাদ :- আমি পবিত্রকারী বা গমনশীলদের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে দশরথপুত্র রাম, মৎস্যদের মধ্যে কুমীর, নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা।। ৩১।।

সর্গাণাম্ আদিঃ অন্তশ্চ # মধ্যং চ এব অহম্ অর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং # বাদঃ প্রবদতাম্ অহম্।। ৩২।।

সর্গাণাম্ = যে সমস্ত বস্তু সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে; আদিঃ = উৎপত্তি; অন্তশ্চ = বিনাশ; মধ্যং = স্থিতি; অহম্ চ এব = আমিই; বিদ্যানাং = বিদ্যাসমূহের মধ্যে; বাদঃ = অর্থনির্ণয়; প্রবদতাম্ = বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা নামক তিন প্রকার তর্ক।। ৩২।।

অনুবাদ :- এই জগতে যত বস্তু সৃষ্টি হয়েছে আমিই তাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকারী এবং সংহারকারী। সকল বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা, তর্কশাস্ত্রের তিন প্রকার তর্কের মধ্যে আমি ‘বাদ’।।৩২।।

ব্যাখ্যা :- ‘বাদ’ হল একপ্রকার তর্ক। কোন বিষয়ে সন্দেহ সমাধানের জন্য পরস্পরের মধ্যে তিন প্রকারে তর্ক হয়ে থাকে যথা বাদ, বিতণ্ডা ও জল্প। ‘বাদ’ হল সেই প্রকারের তর্ক যেখানে সত্য নির্ণয়ের জন্য সৎ উদ্দেশ্যে সর্ব বিষয়ে

আসক্তিশূন্য দুই পুরুষ অথবা গুরু-শিষ্য অথবা যে কোন দুই ব্যক্তি পরস্পর তর্কে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু উচিত ও অনুচিতের কথা চিন্তা না ক'রে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অপর পক্ষের মতকে যে কোন প্রকারে খণ্ডন করার জন্য যে বিবাদ করা হয় তাকে 'জল্প' বলা হয়। আর কেবলমাত্র অপর পক্ষের মতকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যেই যে বিবাদ করা হয় তখন তাকে 'বিতণ্ডা' বলা হয়। 'জল্প' ও 'বিতণ্ডা' সর্বথা পরিত্যাজ্য কারণ এই দুই প্রকার তর্কের মধ্যে হিংসা, ক্রোধ, অহঙ্কার, অসৎ উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু 'বাদ' প্রশংসনীয় কারণ এর উদ্দেশ্য মহৎ এবং সত্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কল্যাণকরভাবে সাহায্যকারী। সেইজন্য ভগবান্ 'বাদ'কে নিজের বিভূতি হিসাবে স্বীকার করেছেন।। ৩২।।

অক্ষরাণাম্ অকারঃ অস্মি # দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালো # ধাতা অহং বিশ্বতোমুখঃ।।৩৩।।

অক্ষরাণাম্ = অক্ষরসমূহের মধ্যে; সামাসিকস্য = সমাসের মধ্যে; ধাতা = যিনি সর্বকর্মের ফল দান করেন অর্থাৎ ব্রহ্মা; বিশ্বতোমুখঃ = সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট।। ৩৩।।

অনুবাদ :- আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে অ-কার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, সংহারকর্তাদের মধ্যে অক্ষয় কাল অর্থাৎ রুদ্র, আমিই সকল কর্মের ফল বিধানকারী সকল দিকে মুখ বিশিষ্ট পরমাত্মা।।৩৩।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে অক্ষরসমূহের মধ্যে অ-কারকে নিজের বিভূতি হিসাবে স্বীকার করেছেন। আদিকালে যেমন মনুষ্য সমাজে চারটি বর্ণের প্রচলন ছিল তেমনই অক্ষরসমূহের মধ্যেও চারটি বিভাগ আছে— স্বরবর্ণ, স্পর্শবর্ণ, অন্তস্থ বর্ণ ও উষ্মবর্ণ। চতুর্বর্ণের মধ্যে প্রথমে যার অবস্থান সেই ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে গণ্য করা হয়। তেমনই অক্ষরসমূহের মধ্যে যার অবস্থান প্রথমে সেই অ-কারকে সকল অক্ষরের শ্রেষ্ঠ হিসাবে গণ্য করা হয়। অ-কারের সাহায্য ব্যতীত অন্য কোন অক্ষরকেই ভাষায় ব্যবহার করা যায় না। ভগবান্ যেমন সৃষ্টির সর্ব বিষয়ে ছড়িয়ে আছেন তেমনই অ-কারও অন্যান্য সকল অক্ষরের মধ্যে সংলগ্ন হয়ে থাকে। সেইজন্য ভগবান্ অক্ষরসমূহের মধ্যে অ-কারকে নিজের বিভূতি হিসাবে স্বীকার করেছেন।

সমাসের মধ্যে ভগবান্ দ্বন্দ্ব সমাসকে তাঁর বিভূতি ব'লে গণ্য করেছেন। সমাস চার প্রকার— তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, অব্যয়ীভাব ও দ্বন্দ্ব। এদের মধ্যে অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্ব পদের অর্থ প্রধান থাকে, তৎপুরুষ সমাসে উত্তর পদের অর্থ প্রধান থাকে, বহুব্রীহি সমাসে কোন পদের অর্থের প্রাধান্য না থেকে এক ভিন্ন পদের অর্থ প্রধান থাকে। কিন্তু দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদের অর্থ প্রধান থাকে। সেইজন্য ভগবান্ সমাসসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্বকে নিজের বিভূতি হিসাবে স্বীকার করেছেন।

ভগবান্ বলেছেন যে তিনি সংহারকর্তাদের মধ্যে চির অক্ষয় কাল অর্থাৎ রুদ্র। সুতরাং তিনি সেই কাল যিনি চির অক্ষয়। তিনি এই অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে নিজেকে কাল ব'লে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু সে কাল হল গণনা করার নিমিত্ত কাল বা সময়। কিন্তু সেই কাল নশ্বর, মুহূর্তমাত্র। কিন্তু অক্ষয় প্রবাহরূপ আর একটি কালও আছে— "অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালঃ" (শ্রীধরাচার্য) যার ক্ষয় নাই, প্রলয়ের পরও সেই কাল বিদ্যমান থাকে। এই অক্ষয় প্রবাহরূপ কাল হল ভগবানের অপর বিভূতি।। ৩৩।।

মৃত্যুঃ সর্বহরঃ চ অহম্ # উদ্ভবঃ চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীঃ বাক্ চ নারীণাং # স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।। ৩৪।।

সর্বহরঃ = সমস্ত কিছুর বিনাশকারী; উদ্ভবঃ ভবিষ্যতাম্ = ভবিষ্যতের প্রাণীদের সৃষ্টিকর্তা; ধৃতিঃ = ধৈর্য।।৩৪।।

অনুবাদ :- আমি সমস্ত কিছুর বিনাশকারী মৃত্যু, ভবিষ্যতের প্রাণীদের সৃষ্টিকর্তা এবং নারীগণের মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, বুদ্ধি, ধৈর্য ও ক্ষমা।। ৩৪।।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং # গায়ত্রী ছন্দসাম্ অহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষঃ অহম্ # ঋতূনাং কুসুমাকরঃ।। ৩৫।।

সাম্নাং = সামবেদের মধ্যে; ছন্দসাম্ = ছন্দের মধ্যে; মাসানাং = মাসের মধ্যে; মার্গশীর্ষঃ = অগ্রহায়ণ; ঋতুনাং = ঋতুগণের মধ্যে; কুসুমাকরঃ = বসন্ত।।৩৫।।

অনুবাদ :- সামবেদের মন্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, বারটি মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং ঋতুদের মধ্যে আমি বসন্ত।। ৩৫।।

ব্যাখ্যা :- বেদের গানকে সাম বলা হয়। ভগবান্ এই অধ্যায়ের ২২তম শ্লোকে বলেছেন যে তিনি বেদসমূহের মধ্যে সামবেদ। এই শ্লোকে তিনি আরও বেশী স্পষ্ট করে বলছেন যে সেই সামবেদের মন্ত্রসমূহের মধ্যে বৃহৎসাম তাঁর বিভূতি অর্থাৎ স্বরূপ। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বলা হয়েছে যে সামবেদের একহাজারটি শাখা আছে—"সহস্রবর্তা সামবেদঃ"। সমগ্র সামবেদ ভগবানের বিভূতি হলেও বৃহৎসামবেদে ভগবানের মাহাত্ম্যের অধিক বর্ণনা থাকায় সামবেদের মধ্যে বৃহৎসাম তাঁর অধিক প্রিয়।

বিভিন্ন শাস্ত্রে গায়ত্রী ছন্দের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। নারায়ণোপনিষদে গায়ত্রীকে সকল বেদের জননী বলা হয়েছে —"গায়ত্রী ছন্দসা মাতেতি"। বৃহদ্‌যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে (১০।১০) বলা হয়েছে যে গঙ্গার তুল্য তীর্থ নাই, কেশবের বড় দেবতা নাই এবং গায়ত্রীর অধিক জপনীয় কোন মন্ত্র নাই এবং হবেও না —

নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং ন দেবঃ কেশবাৎপরঃ।
গায়ত্রাস্তু পরং জপ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।।

এই সমস্ত কারণে ভগবান্ গায়ত্রীকে তাঁর বিভূতি বলেছেন।। ৩৫।।

দ্যূতং ছলয়তাম্ অস্মি # তেজঃ তেজস্বিনাম্ অহম্।
জয়ঃ অস্মি ব্যবসায়ঃ অস্মি # সত্ত্বং সত্ত্ববতাম্ অহম্।। ৩৬।।

দ্যূতং = পাশা; ছলয়তাম্ = ছলনাকারীদের মধ্যে; ব্যবসায়ঃ = উদ্যোগ; সত্ত্বং = সত্ত্বগুণ; সত্ত্ববতাম্ = সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের মধ্যে আমি সত্ত্বগুণ।। ৩৬।।

অনুবাদ :- ছলনাকারীদের মধ্যে আমি পাশা, তেজস্বিগণের আমি তেজ, বিজয়িগণের আমি জয়, উদ্যোগী পুরুষদের আমি ব্যবসায় এবং সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের মধ্যে আমি সত্ত্বগুণ।।৩৬।।

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবঃ অস্মি # পাণ্ডাবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনাম্ অপি অহং ব্যাসঃ # কবীনাম্ উশনা কবিঃ।।৩৭।।

বৃষ্ণীণাং = বৃষ্ণিগণের মধ্যে; মুনীনাম্ = মুনিগণের মধ্যে; কবীনাম্ = কবিগণের মধ্যে; উশনা = শুক্রাচার্য।।৩৭।।

অনুবাদ :- আমি বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে ব্যাসদেব এবং কবিগণের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য।। ৩৭।।

দণ্ডো দময়তাম্ অস্মি # নীতিঃ অস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চ এব অস্মি গুহ্যানাং # জ্ঞানং জ্ঞানবতাম্ অহম্।।৩৮।।

দময়তাম্ = শাসকদের; জিগীষতাম্ = যারা জয় করতে ইচ্ছুক; গুহ্যানাং = গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে; জ্ঞানবতাম্ = জ্ঞান।। ৩৮।।

অনুবাদ :- আমি শাসকদের দণ্ড, যারা জয় করতে ইচ্ছুক তাদের মধ্যে আমি নীতি, গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে আমি মৌন এবং জ্ঞানী পুরুষদের মধ্যে আমি জ্ঞান।। ৩৮।।

যৎ চ অপি সর্বভূতানাং # বীজং তৎ অহম্ অর্জুন।
ন তৎ অস্তি বিনা যৎ স্যাৎ # ময়া ভূতং চরাচরম্।।৩৯।।

যৎ চ অপি = যা কিছুই; সর্বভূতানাং = সর্বজীবের মধ্যে; বীজং = মূল কারণ; তৎ অহম্ = তা আমিই; ন অস্তি = নাই; বিনা ময়া = আমি ব্যতীত; ভূতং = জীব; চরাচরম্ = নিখিল ব্রহ্মাণ্ড।। ৩৯।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! সর্বজীবের মূল কারণ আমি অর্থাৎ সর্বজীব আমার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বিষয় নাই যা আমি ছাড়া হতে পারে।। ৩৯।।

ন অন্তঃ অস্তি মম দিব্যানাং # বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তু উদ্দেশতঃ প্রোক্তো # বিভূতেঃ বিস্তরো ময়া।।৪০।।

ন অন্তঃ অস্তি = শেষ নাই; মম দিব্যানাং বিভূতীনাং = আমার দিব্য বিভূতিসমূহের; এষ তু = এইটুকু; উদ্দেশতঃ = সংক্ষেপে; প্রোক্তঃ = বললাম।।৪০।।

অনুবাদ :- হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতির শেষ নাই। তাই তোমাকে তার সামান্য অংশই বর্ণনা করলাম।।৪০।।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং # শ্রীমৎ উর্জিতম্ এব বা।
তৎ তৎ এব অবগচ্ছ ত্বং # মম তেজঃ অংশ-সম্ভবম্।। ৪১।।

যদ্ যদ্ = যা যা; বিভূতিমৎ = ঐশ্বর্যময়; শ্রীমৎ = কান্তিময়; উর্জিতম্ = শক্তিযুক্ত; অবগচ্ছ = জেনে রাখবে; মম তেজঃ অংশ-সম্ভবম্ = আমার তেজের অংশ সম্ভূত।। ৪১।।

অনুবাদ :- যা যা কিছু ঐশ্বর্যময়, কান্তিময়, শক্তিযুক্ত বস্তু আছে তাদের সমস্তই আমার তেজের অংশ থেকে উৎপন্ন ব'লে জানবে।। ৪১।।

অথবা বহুনা এতেন # কিং জ্ঞাতেন তব অর্জুন।
বিষ্টভ্য অহম্ ইদং কৃৎস্নম্ # একাংশেন স্থিতো জগৎ।। ৪২।।

কিং জ্ঞাতেন = জেনে কি প্রয়োজন; বিষ্টভ্য = ধারণ করে; কৃৎস্নম্ = সমগ্র; স্থিতঃ = অবস্থিত।।৪২।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন তোমার এতশত জেনে লাভ কি? তুমি এইটুকুই জেনে রাখ যে এই সমগ্র জগৎ আমার একটি অংশ জুড়েই বিদ্যমান আছে।।৪২।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ দশম অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে অর্জুনকে এক বিরাট বাস্তব শিক্ষা এবং বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর বর্ণনা করার ন্যায় অতি সংক্ষেপে তাঁর পরমেশ্বরত্বের বিষয়ে অর্জুনকে অবহিত করেছেন। অর্জুন পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত পরমার্থ বিষয়ক বিভিন্ন উপদেশ শ্রবণ ক'রে পারমার্থিক তত্ত্ব আরও অধিক জানার জন্য নিতান্ত কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তাই তিনি অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, অধিভূত এবং অধিদৈব কাকে বলে এই সমস্ত বিষয়ে বিশদে জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুসারে ভগবান্ অর্জুনের কৌতূহল নিরসনের জন্য নবম অধ্যায়ে এবিষয়ে অর্জুনের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং দশম অধ্যায়ে অর্জুনের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁর নিজের বিভূতিসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেন। কিন্তু ভগবানের দিব্য বিভূতিসমূহ তো অসীম, অগণ্য, অনাদি, অনন্ত। সেই অসীম, অগণ্য, অনাদি, অনন্ত বিভূতিসমূহকে কারোরই পক্ষে সম্যক জানা বা সবিস্তারে বর্ণনা করা সম্ভব নয়— 'ন হি ঈশ্বরস্য সর্বাত্মনো দিব্যানাং বিভূতিনাম্ ইয়ত্তা শক্যা বক্তুং জ্ঞাতুং বা কেনচিৎ' (শঙ্করাচার্য ৮।৪০)। একমাত্র তিনিই পারেন এবিষয়ে পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করতে। কিন্তু ভগবান সম্যক উপলব্ধি করেছেন যে অর্জুনের সামনে এখন বিরাট গুরু দায়িত্ব। এই সংকটকালে তিনি যদি এতসব অর্জুনের জ্ঞাতার্থে সবিস্তারে বর্ণনা করতে যান তাহলে কুরুক্ষেত্রের মূল উদ্দেশ্যই বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। সেইজন্য তিনি অর্জুনকে আর অধিক জানার

আগ্রহ থেকে নিরস্ত হওয়ার জন্য তাঁকে বলেছেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্জুনের আর অধিক জানার কোনও প্রয়োজন নাই। তিনি এখন তাঁর বর্ণধর্ম পালন করার জন্য সচেষ্ট হন। তবে ভগবান্ অতি সংক্ষেপে শেষে বললেন যে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তটাই তাঁর অখণ্ড সত্ত্বার একটি অংশমাত্রই জুড়ে আছে। কিন্তু ভগবান্ যত সহজে অর্জুনকে তাঁর তত্ত্ব সম্পর্কে এই কথাটি বলেছেন সেটি বোঝার পক্ষে আদৌ তত সহজ নয়। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তটিই কিভাবে তাঁর সমগ্র সত্ত্বার একটি অংশমাত্র জুড়েই বিদ্যমান সে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলেই শ্রীকৃষ্ণের এই তত্ত্বের বিষয়টি আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমরা এই পৃথিবী, অগণিত গ্রহ, নক্ষত্র, সমুদ্র, অরণ্যানী পরিবেষ্টিত হয়ে যে জগতে বাস করি তাকে বলা হয় সৌরজগৎ আর এই সৌরজগৎ অবস্থান করছে সীমাহীন মহাশূন্যে। সৌরজগতের বিস্তার যত বড়ই হোক না কেন বাস্তবে তা কিন্তু সসীম। কিন্তু মহাশূন্যের বিস্তার ও পরিধি অসীম। ফলে এই সসীম সৌরজগৎ সেই অসীম, অনাদি, অনন্ত মহাশূন্যের একটি অংশমাত্র জুড়েই বিরাজমান। অনুরূপভাবে ভগবানের ঈশ্বরসত্ত্বা অসীম, অনন্ত - তাঁর কোন আদি নাই অন্ত নাই, তাঁর বিস্তার, গভীরতা, উচ্চতা, পরিধি পরিমাপযোগ্য নয়। সুবিশাল সমুদ্রবক্ষে একমুষ্টি বালুকা নিক্ষেপ করলে তা কখনই সমগ্র সমুদ্র জুড়ে ছড়িয়ে পরবে না, সমুদ্রের একটা সংকীর্ণ অংশেই সে অবস্থান করবে। এই চরাচর জগতের বিস্তার ভগবানের নিকট সমুদ্র বক্ষে নিক্ষিপ্ত সেই একমুষ্টি বালুকার ন্যায়। সেইজন্য এই চরাচর নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃত বুদ্ধিতে যত বৃহৎ বলেই পরিগণিত হোক না কেন ঈশ্বরের সামগ্রিক সত্ত্বার নিকট তার বিস্তার কিন্তু নিতান্তই নগণ্য। তাই ভগবান্ বলেছেন যে এই জগৎ তাঁর একটি অংশমাত্র জুড়েই বিদ্যমান। বস্তুত ভগবানের এই একটি কথাই সর্বান্তঃকরণে হৃদয়ে স্থিরভাবে বদ্ধমূল হলে ভগবানের স্বরূপ সম্পর্কে আর কোন কিছুই জানার অবশিষ্ট থাকে না।। ৪২।।

—ঃ দশম অধ্যায় সমাপ্ত ঃ—

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ-দর্শন যোগ

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং # গুহ্যম্ অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়া উক্তং বচঃ তেন # মোহঃ অয়ং বিগতো মম।।১।।

মদনুগ্রহায় = আমাকে অনুগ্রহ করার জন্য; পরমং = অতি; গুহ্যম্ = গোপনীয়; অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্ = অধ্যাত্ম বিষয়ক; মোহঃ = অজ্ঞানতা; বিগতঃ = দূরীভূত হয়েছে।। ১।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন - আমাকে অনুগ্রহ করার জন্য অতি গোপনীয় অধ্যাত্ম বিষয়ক যে উপদেশ আপনি আমাকে দান করলেন তার দ্বারা আমার মনের অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়েছে।।১।।

ব্যাখ্যা :- যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী স্বজনদের দেখে কার্পণ্যদোষ হেতু অর্জুনের অন্তরে তাদের প্রতি অনুকম্পার উদয় হওয়ার কারণে তিনি যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কারণ তাঁর অন্তরে আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি এই সমস্ত স্বজনদের মৃত্যুর কারণ হবেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পুনঃ পুনঃ বিভিন্নভাবে উপদেশ দিয়ে তাঁকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস করলেও তাঁর সেই উপদেশ অর্জুনের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি কারণ অর্জুন ধারণা করতে পারেননি যে তাঁর রথের সারথি একজন সাধারণ মানুষ নন, তিনিই পরমেশ্বর। এই দুটি বিষয়ই অর্জুনের অন্তরের বিরাট অজ্ঞতা। কিন্তু এতক্ষণ পর কৃষ্ণের পরম গোপনীয় উপদেশে তাঁর অন্তরে সত্যের আলোক জ্বলে উঠল। তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে সত্যই আত্মা অবিনাশী এবং শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং পরমেশ্বর। তিনি বুঝতে পারলেন যে কেউ কাউকে হত্যা করে না। যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কর্তা সেই পরমেশ্বর ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণই স্থির করেন যে কখন কার দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটবে ও তাঁর নির্দেশেই জগৎ চলে এবং তখনই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ব'লে উঠলেন যে তাঁর মোহমুক্তি ঘটেছে।।১।।

ভব অপ্যয়ৌ হি ভূতানাং # শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ # মাহাত্ম্যম্ অপি চ অব্যয়ম্।।২।।

ভব = জন্ম; অপ্যয়ঃ = মৃত্যু; ভূতানাং = জীবসমূহের; শ্রুতৌ = শোনা হল; বিস্তরশঃ = বিস্তারিতভাবে; ত্বত্তঃ = আপনার নিকট থেকে; কমলপত্রাক্ষ = কমল অর্থাৎ পদ্ম পত্রের ন্যায় অক্ষি অর্থাৎ নয়ন যার; অব্যয়ম্ = অবিনাশী।। ২।।

অনুবাদ :- হে কমলনয়ন! আপনার নিকট থেকে জীবসমূহের জন্ম ও মৃত্যু উভয় বিষয়ে এবং আপনার অবিনাশী মাহাত্ম্য বিষয়েও আমি বিস্তারিতভাবেই শুনলাম।।২।।

এবম্ এতদ্ যথা আত্থ # ত্বম্ আত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি তে রূপম্ # ঐশ্বরং পুরুষোত্তম।।৩।।

এতৎ এবং = সেটিই ঠিক; যথা = যা; আত্থ = বলেছেন; আত্মানং = আপনার নিজের বিষয়ে; দ্রষ্টুম্ = দর্শন করতে; ইচ্ছামি = ইচ্ছা করি; তে = আপনার; ঐশ্বরং = ঐশ্বরিক; রূপম্ = রূপ;।।৩।।

অনুবাদ :- হে পরমেশ্বর! আপনি আপনার নিজের বিষয়ে যেরূপ বললেন, আপনার রূপ যথার্থই সেই প্রকার। হে পুরুষোত্তম্! আমি আপনার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করতে ইচ্ছা করি।।৩।।

মন্যসে যদি তৎ শক্যং # ময়া দ্রষ্টুম্ ইতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং # দর্শয় আত্মানম্ অব্যয়ম্।।৪।।

মন্যসে = মনে করেন; তৎ যদি = যদি আপনার সেই রূপ; ময়া দ্রষ্টুং শক্যং = আমি দেখতে পারি; ততঃ = তাহলে; মে = আমাকে; ত্বং = আপনি; অব্যয়ম্ = অবিনাশী; আত্মানং = আপনার সেই রূপ; দর্শয় = দেখান।।৪।।

অনুবাদ :- হে প্রভো! যদি আপনি আমাকে আপনার সেই রূপ দেখার উপযুক্ত মনে করেন তাহলে হে যোগেশ্বর! আপনি আমাকে আপনার সেই অবিনাশী রূপ দর্শন করান।।৪।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি # শতশঃ অথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি # নানা-বর্ণ-আকৃতীনি চ।।৫।।

উবাচ = বললেন; পশ্য = দর্শন কর; মে = আমার; রূপাণি = রূপসমূহ; শতশঃ = শত শত; অথ সহস্রশঃ = হাজার হাজার; নানাবিধানি = বহু প্রকার; দিব্যানি = দিব্য; নানা-বর্ণ-আকৃতীনি = বহু বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট।।৫।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন — হে পার্থ! আমার দিব্য এবং বহু প্রকার ও বহু বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট শত শত ও হাজার হাজার রূপসমূহ দর্শন কর।।৫।।

পশ্য আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ # অশ্বিনৌ মরুতঃ তথা।
বহূনি অদৃষ্টপূর্বাণি # পশ্য আশ্চার্যাণি ভারত।। ৬।।

পশ্য = দেখ; আদিত্যান্ = বারো জন আদিত্য; বসুন্ = আটজন বসু; রুদ্রান্ = এগার জন রুদ্র; অশ্বিনৌ = দুইজন অশ্বিনীকুমার; মরুতঃ = বায়ুগণ; তথা = এবং; বহূনি = বহু; অদৃষ্টপূর্বাণি = যা কখনও আগে দেখা যায় নি; আশ্চার্যাণি = আশ্চর্য বস্তুসমূহ।।৬।।

অনুবাদ :- হে ভরত বংশীয় অর্জুন! বারোজন আদিত্য, আটজন বসু, এগার জন রুদ্র, দুইজন অশ্বিনীকুমার এবং বায়ুগণকে দেখ। আর যা কখনও আগে দেখা যায়নি এরূপ বহু আশ্চর্য রূপসমূহ দেখ।। ৬।।

ইহ একস্থং জগৎ কৃৎস্নং # পশ্য অদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ # যৎ চ অন্যদ্ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি।।৭।।

গুড়াকেশ = নিদ্রাজয়ী অর্জুন; ইহ = এই; একস্থং = একত্রে অবস্থিত; জগৎ = মহাবিশ্ব; কৃৎস্নং = সমগ্র; পশ্য = দেখ; অদ্য = এখন; সচরাচরং = সচল ও অচল বস্তুসমূহ সহ; মম = আমার; দেহে = শরীরে; যৎ = যা কিছু; অন্যৎ = অপর; চ = এবং; দ্রষ্টুম্ = দেখতে; ইচ্ছসি = ইচ্ছা কর।।৭।।

অনুবাদ :- হে নিদ্রাজয়ী অর্জুন! আমার এই শরীরে একত্রে অবস্থিত সমগ্র সচল ও অচল বস্তুসমূহ সহ মহাবিশ্ব এবং অপর যা কিছু দেখতে ইচ্ছা কর এখন দেখ।। ৭।।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম্ # অনেন এব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ # পশ্য মে যোগম্ ঐশ্বরম্।। ৮।।

তু = কিন্তু; মাং = আমাকে; ন শক্যসে = পারবে না; দ্রষ্টুম্ = দেখতে; অনেন = এর দ্বারা; এব = অবশ্যই; স্বচক্ষুষা = তোমার নিজের চোখদ্বারা; দিব্যং = দিব্য; দদামি = দান করছি; তে = তোমাকে; চক্ষুঃ = দৃষ্টি; পশ্য = দর্শন কর; মে = আমার; যোগং = যোগ শক্তি; ঐশ্বরং = ঐশ্বরিক।। ৮।।

অনুবাদ :- কিন্তু তোমার নিজের চোখ দ্বারা তুমি আমার এই রূপ দেখতে পারবে না। সেইজন্য আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দান করছি, তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগ শক্তি দর্শন কর।।৮।।

সঞ্জয় উবাচ

এবম্ উক্ত্বা ততো রাজন্ # মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় # পরমং রূপম্ ঐশ্বরম্।।৯।।

উবাচ = বললেন; এবম্ = এইরূপ; উক্ত্বা = ব'লে; ততঃ = তারপর; দর্শয়ামাস = দেখালেন; পার্থায় = অর্জুনকে; পরমম্ ঐশ্বরং রূপম্ = পরম ঐশ্বরিক রূপ।।৯।।

অনুবাদ :- সঞ্জয় বললেন — হে রাজন! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ ব'লে তারপর অর্জুনকে তাঁর পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখালেন।।৯।।

অনেক-বক্ত্র-নয়নম্ # অনেক-অদ্ভুত-দর্শনম্।
অনেক-দিব্য-আভরণং # দিব্য অনেক উদ্যত আয়ুধম্।। ১০।।

অনেক = বহু; বক্ত্র = মুখ; নয়নম্ = বহু চোখ; দর্শনম্ = দর্শনীয়; দিব্য-আভরণং = দিব্য অলঙ্কার; দিব্য অনেক উদ্যত আয়ুধম্ = অনেক উদ্যত দিব্য অস্ত্র।।১০।।

অনুবাদ :- সেই বিরাট্ দিব্য রূপ বহু মুখ, বহু চোখ সমন্বিত, বহু বিচিত্র দর্শনীয় বহু দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত অনেক উদ্যত দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত।।১০।।

দিব্যমাল্য-অম্বরধরং # দিব্যগন্ধ-অনুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবম্ # অনন্তং বিশ্বতোমুখম্।। ১১।।

দিব্যমাল্য-অম্বরধরম্ = দিব্যমাল্য ও দিব্য বস্ত্রপরিহিত; দিব্যগন্ধ-অনুলেপনম্

= দিব্য গন্ধের দ্বারা অনুলিপ্ত; সর্বাশ্চর্যময়ং দেবম্ = মহা আশ্চর্যজনক দ্যুতি সম্পন্ন; অনন্তং = সীমাহীন; বিশ্বতোমুখম্ = সর্বত্র পরিব্যাপ্ত মুখবিশিষ্ট।।১১।।

অনুবাদ :- সেই বিরাট্ শরীর দিব্যমাল্য ও দিব্য বস্ত্র পরিহিত, সেই অঙ্গ দিব্য গন্ধের দ্বারা অনুলিপ্ত। সেখান থেকে মহা আশ্চর্যজনক দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, এবং সেই শরীর সীমাহীন, সর্বত্র মুখ বিশিষ্ট।।১১।।

দিবি সূর্যসহস্রস্য # ভবেৎ যুগপৎ উত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ # ভাসঃ তস্য মহাত্মনঃ।।১২।।

দিবি = গগনে; সূর্যসহস্রস্য = সহস্র সূর্যের; ভবেৎ = হয়; যুগপৎ = একই সঙ্গে; উত্থিতা = আবির্ভাব; ভাঃ = প্রভা; সদৃশী = তুল্য; সা = সেই সম্মিলিত প্রভা; স্যাৎ = হবে; ভাসঃ = প্রভা; তস্য = সেই; মহাত্মনঃ = মহাত্মার।।১২।।

অনুবাদ :- যদি গগনে একই সঙ্গে সহস্র সূর্যের প্রভার আবির্ভাব ঘটে তাহলে সেই সম্মিলিত প্রভাকে সেই মহাত্মার প্রভার সঙ্গে তুলনা করা যায়।।১২।।

তত্র একস্থং জগৎ কৃৎস্নং # প্রবিভক্তম্ অনেকধা।
অপশ্যৎ দেবদেবস্য # শরীরে পাণ্ডবঃ তদা।।১৩।।

তদা = তখন; একস্থম্ = একস্থানে; জগৎ = বিশ্বসংসার; কৃৎস্নং = সমগ্র; প্রবিভক্তং = বিভক্ত; অনেকধা = বিভিন্ন প্রকারে; অপশ্যৎ = দর্শন করলেন; দেবদেবস্য = দেবদেবের; পাণ্ডবঃ = তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন।।১৩।।

অনুবাদ :- তখন অর্জুন দেবদেবের সেই শরীরে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত সমগ্র বিশ্বসংসার একস্থানে দর্শন করলেন।।১৩।।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো # হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং # কৃতাঞ্জলিঃ অভাষত।।১৪।।

ততঃ = তখন; বিস্ময়াবিষ্টঃ = পরম বিস্মিত; হৃষ্টরোমা = রোমাঞ্চিত; প্রণম্য = প্রণাম জানিয়ে; শিরসা = অবনত মস্তকে; দেবং = বিশ্বরূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে; কৃতাঞ্জলিঃ = করজোড়ে; অভাষত = বলতে আরম্ভ করলেন।।১৪।।

অনুবাদ :- তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখে যার পর নাই বিস্মিত হলেন। তাঁর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিল। তখন তিনি বিশ্বরূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে

অবনত মস্তকে প্রণাম জানালেন এবং করজোড়ে তাঁকে বলতে আরম্ভ করলেন।।১৪।।

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবান্ তব দেব দেহে # সর্বান্ তথা ভূত-বিশেষ-সঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণম্ ঈশং কমল-আসনস্থম্ # ঋষীন্ চ সর্বান্ উরগান্ চ দিব্যান্।।১৫।।

উবাচ = বললেন; দেব = হে প্রভু; পশ্যামি = দেখতে পাচ্ছি; তব = আপনার; দেহে = শরীরে; সর্বান্ = সমস্ত; দেবান্ = দেবতাগণকে; তথা = এবং; ভূত = জীবসমূহের; বিশেষ-সঙ্ঘান্ = বিশেষ সমাবেশ; ব্রহ্মাণম্ = ব্রহ্মাকে; ঈশং = প্রভু; কমল = পদ্ম; আসনস্থম্ = আসনে উপবিষ্ট; ঋষীন্ = ঋষিগণকে; সর্বান্ = সমস্ত; উরগান্ = সর্পসকলকে; দিব্যান্ = দিব্য।।১৫।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন— হে প্রভু ! আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার শরীরে সমস্ত দেবতাগণ তথা জীবসমূহের বিশেষ সমাবেশ ঘটেছে। আমি আপনার শরীরে আরও দেখতে পাচ্ছি পদ্মাসনে উপবিষ্ট প্রভু ব্রহ্মাকে, সমস্ত দিব্য ঋষিগণ এবং সর্পসকলকে।।১৫।।

অনেক-বাহু-উদর-বক্ত্র-নেত্রং # পশ্যামি ত্বাং সর্বতঃ অনন্ত-রূপম্।
ন অন্তং ন মধ্যং ন পুনঃ তব আদিং # পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।। ১৬।।

অনন্ত-রূপম্ = অনন্তরূপধারী; পশ্যামি = দেখতে পাচ্ছি; ত্বাং = আপনাকে; সর্বতঃ = সর্বত্র; পুনঃ = পুনরায়; তব = আপনার।। ১৬।।

অনুবাদ :- হে বিশ্বেশ্বর ! আপনার অনন্তরূপের মধ্যে আমি অগণিত বাহু, উদর, মুখ, চোখ দেখতে পাচ্ছি। হে বিশ্বরূপ ! আপনাকে সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কোথায় আপনার শেষ, কোথায় আপনার মধ্যভাগ বা কোথায় আপনার শুরু তার কিছুই দেখা যাচ্ছে না।।১৬।।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ # তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ # দীপ্ত-অনল-অর্ক-দ্যুতিম্ অপ্রমেয়ম্।।১৭।।

কিরীটিনং = কিরীটধারী; গদিনং = গদাহস্ত; চক্রিণং = চক্রধারী; চ = এবং; তেজোরাশিং = তেজঃপুঞ্জ; সর্বতঃ = সর্বত্র; দীপ্তিমন্তম্ = দীপ্যমান; ত্বাং =

আপনাকে; পশ্যামি = দেখতে পাচ্ছি; দুর্নিরীক্ষ্যং = যাকে দেখা দুঃসাধ্যজনক; সমন্তাৎ = সর্বদিকে; দীপ্ত = প্রজ্বলিত; অনল = অগ্নি; অর্ক = সূর্য; দ্যুতিম্ = দীপ্তি; অপ্রমেয়ম্ = সীমাহীন।।১৭।।

অনুবাদ :- হে কিরীটধারী! হে গদাহস্ত! হে চক্রধারী! প্রজ্বলিত অগ্নি ও সূর্যের সীমাহীন উজ্জ্বলতার ন্যায় আপনার দীপ্যমান দুর্নিরীক্ষ্য অপ্রমেয় তেজঃ পুঞ্জ সমৃদ্ধ অবয়ব সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছি।।১৭।।

ত্বম্ অক্ষরম্ পরমং বেদিতব্যং # ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বম্ অব্যয়ঃ শাশ্বত-ধর্মগোপ্তা # সনাতনঃ ত্বং পুরুষো মতো মে।।১৮।।

ত্বম্ = আপনি; অক্ষরম্ = অবিনাশী; পরং = পরব্রহ্ম; বেদিতব্যং = জানার যোগ্য; অস্য = এই; বিশ্বস্য = বিশ্বের; পরং = সর্বশ্রেষ্ঠ; নিধানম্ = আশ্রয়; অব্যয়ঃ = নিত্য; শাশ্বত-ধর্মগোপ্তা = সনাতন ধর্মের রক্ষক; সনাতনঃ = চিরস্থায়ী; মে = আমার; মতঃ = অভিমত।।১৮।।

অনুবাদ :- আপনি জানার যোগ্য পরব্রহ্ম। আপনিই বিশ্বের পরম আশ্রয়, আপনি চির অবিনাশী, শাশ্বত ধর্মের রক্ষাকর্তা এবং সনাতন। আমি আপনাকে এই প্রকারে উপলব্ধি করতে পেরেছি।।১৮।।

অনাদি-মধ্য-অন্তম্ অনন্ত-বীর্যম্ # অনন্ত-বাহুং শশি-সূর্য-নেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্ত-হুতাশ-বক্ত্রং # স্বতেজসা বিশ্বম্ ইদং তপন্তম্।১৯।।

অনাদি-মধ্য-অন্তম্ = সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়বিহীন; অনন্ত-বীর্যম্ = অন্তহীন শক্তিসম্পন্ন; অনন্ত-বাহুং = অগণিত বাহুসম্পন্ন; শশি-সূর্য-নেত্রম্ = দুইটি চোখ হল চন্দ্র ও সূর্য; পশ্যামি = দেখতে পাচ্ছি; ত্বাং = আপনাকে; দীপ্ত = প্রজ্বলিত; হুতাশ = অগ্নি; বক্ত্রং = মুখ; স্বতেজসা = নিজের তেজের দ্বারা; বিশ্বম্ = বিশ্বকে; ইদং = এই; তপন্তম্ = উষ্ণতা দান করছেন।। ১৯।।

অনুবাদ :- আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার সৃষ্টিও নাই, স্থিতিও নাই এবং বিনাশও নাই, আপনি অন্তহীন শক্তিসম্পন্ন, আপনার অগণিত বাহু, আপনার দুইটি চোখ চন্দ্র ও সূর্যের সমান, আপনার মুখ প্রজ্বলিত অগ্নির সমান, আপনি আপনার নিজের তেজের দ্বারা এই বিশ্বকে উষ্ণতা দান করছেন।।১৯।।

দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরং হি # ব্যাপ্তং ত্বয়া একেন দিশঃ চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বা অদ্ভুতং রূপম্ উগ্রং তব ইদং # লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্।।২০।।

দ্যাবাপৃথিব্যোঃ = দ্যো অর্থাৎ স্বর্গ ও পৃথিবীর; ইদম্ = এই; অন্তরম্= মাঝখানে; ব্যাপ্তং = পরিব্যাপ্ত; ত্বয়া হি = আপনার দ্বারাই; একেন = একমাত্র; দিশঃ = দিক; সর্বাঃ = সকল; দৃষ্ট্বা = দর্শন ক'রে; অদ্ভুতম্ = বিচিত্র; উগ্রং = ভয়ঙ্কর; তব = আপনার; ইদম্ = এই; লোকত্রয়ং = স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল এই ত্রিলোক; প্রব্যথিতং = বিচলিত।।২০।।

অনুবাদ :- হে মহাত্মন ! স্বর্গ ও মর্তের মাঝখান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল অর্থাৎ অন্তরিক্ষ পর্যন্ত এবং দশদিক একমাত্র আপনার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। তদুপরি আপনার বিচিত্র এই ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন ক'রে স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল এই ত্রিলোক বিচলিত বোধ করছে।।২০।।

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি # কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তি ইতি উক্ত্বা মহর্ষি-সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ # স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ।।২১।।

অমী = ঐ; সুরসঙ্ঘাঃ = সুর অর্থাৎ দেবতা এবং সঙ্ঘ অর্থাৎ সমূহ; ত্বাং হি = আপনার মধ্যেই; বিশন্তি = প্রবেশ করছে; কেচিৎ = কেউ কেউ; ভীতাঃ = ভয়ে ভীত হয়ে; প্রাঞ্জলয়ো = জোড়হাতে; গৃণন্তি = স্তব করছে; স্বস্তি = স্বস্তিবাক্য; ইতি উক্ত্বা = উচ্চারণ ক'রে; মহর্ষি = মহান ঋষি; সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ = সিদ্ধগণ; স্তুবন্তি = স্তব করছে; ত্বাং = আপনার; স্তুতিভিঃ = স্তুতির দ্বারা; পুষ্কলাভিঃ = উত্তম।। ২১।।

অনুবাদ :- ঐ দেবতাগণ আপনার মধ্যেই প্রবেশ করছে, কেউ কেউ ভয়ে ভীত হয়ে জোড়হাতে আপনার প্রার্থনা করছে। মহান ঋষি ও সিদ্ধগণ স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ ক'রে বেদোক্ত উত্তম স্তুতির দ্বারা আপনার স্তব করছে।। ২১।।

রুদ্র-আদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা # বিশ্বে অশ্বিনৌ মরুতঃ চ উষ্মপাঃ চ।
গন্ধর্ব-যক্ষ-অসুর-সিদ্ধ-সঙ্ঘা # বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাঃ চ এব সর্বে।।২২।।

রুদ্র = একাদশজন রুদ্র; আদিত্যাঃ = দ্বাদশজন আদিত্য; বসবঃ = আটজন বসু; যে = যে সকল; চ = এবং; সাধ্যাঃ = সাধ্যগণ; বিশ্বে = বিশ্বদেবতাগণ; অশ্বিনৌ = দুইজন অশ্বিনীকুমার; মরুতঃ = বায়ুগণ; উষ্মপাঃ = পিতৃগণ;

গন্ধর্ব-যক্ষ-অসুর-সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ = গন্ধর্ব-যক্ষ-অসুর-সিদ্ধগণ; সর্বে এব = সকলেই; বিস্মিতাঃ = পরম বিস্মিত হয়ে; ত্বাং = আপনাকে; বীক্ষন্তে = দর্শন করছেন।।২২।

অনুবাদ :- একাদশজন রুদ্র, দ্বাদশজন আদিত্য, আটজন বসু, এবং সকল সাধ্যগণ, বিশ্বদেবতাগণ, দুইজন অশ্বিনীকুমার, বায়ুগণ, পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব-যক্ষ-অসুর-সিদ্ধগণ সকলেই পরম বিস্মিত হয়ে আপনাকে দর্শন করছেন।।২২।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে তেত্রিশ কোটি দেবতাদের পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণের মনে সনাতন ধর্মের দেবতাদের সংখ্যার বিষয়ে একটি ভুল ধারণা আছে। সাধারণভাবে সকলে 'কোটি' শব্দের অর্থ শতলক্ষ বুঝে থাকেন। সংস্কৃতে 'কোটি' শব্দের আর একটি অর্থ আছে— শ্রেণী, বর্গ প্রভৃতি। সেইজন্য সনাতন ধর্মের দেবতাদের সংখ্যা তেত্রিশ শত লক্ষ নয়, সনাতন ধর্মে দেবতাদের সংখ্যাটি হল তেত্রিশ জন। ঋগ্বেদের ৮।২৮।১ মন্ত্রে তেত্রিশ জন দেবতার কথাই বলা হয়েছে— "যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাংসো বর্হিঃ আসদন্" ইতি। কিন্তু বেদে এই তেত্রিশজন দেবতার পরিচয় দেওয়া হয়নি। তবে শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৩।৯।২ মন্ত্রেও তেত্রিশ কোটি নয়, তেত্রিশজন দেবতাকেই স্বীকার করা হয়েছে— "ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু এব দেবাঃ"। সুতরাং সাধারণ সমাজে যে দেবতাদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি অর্থাৎ তেত্রিশ শত লক্ষ মনে করা হয় তা সম্পূর্ণ ভুল, এখানে কোটি মানে শ্রেণী অর্থাৎ দেবতাদের সংখ্যা তেত্রিশজন। এই মন্ত্রেই এই তেত্রিশজন দেবতা কারা সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তাঁরা হলেন আটজন বসু, একাদশজন রুদ্র, দ্বাদশজন আদিত্য এই নিয়ে একত্রিশজন এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই দুইজনকে নিয়ে মোট তেত্রিশজন — "ত্রয়স্ত্রিংশৎ অষ্টৌ বসবঃ একাদশ রুদ্রাঃ দ্বাদশ আদিত্যাঃ তে একত্রিংশৎ ইন্দ্রঃ চ এব প্রজাপতিঃ চ ত্রয়স্ত্রিংশৌ ইতি।" যাঁরা কৌতূহলী তাঁদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে অন্যান্য যাঁদেরকে আমরা দেবতা হিসাবে জানি তাঁরা কে? এই মন্ত্রেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে তাঁরা হলেন ঈশ্বরের বিভূতি--- মহিমান এবৈষামেতে"। 'মহিমানঃ' পদের অর্থ বিভূতি। এখন, যাঁরা কৌতূহলী তাঁদের মনে এই আটজন বসু, একাদশজন রুদ্র, দ্বাদশজন আদিত্য কারা তা জানার ইচ্ছা

জাগতে পারে। সেই জন্য এই বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি। হরিবংশে বলা হয়েছে —

হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ।
বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দী রৈবস্তথা।।
মৃগব্যাধশ্চ সর্পশ্চ কপালী চ বিশাম্পতে।
একাদশৈতে কথিতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ।। (১।৩।৫১-৫২)

অর্থাৎ হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, সর্প এবং কপালী এই এগারজন হলেন রুদ্র। এঁদের মধ্যে শম্ভু সকলের অধীশ্বর।

এইখানেই দ্বাদশ আদিত্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—

অর্যমা চৈব ধাতা চ ত্বষ্টা পুষা চ ভারত।।
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্য দ্বাদশা স্মৃতাঃ।
(১।৩।৬০-৬১)

অর্থাৎ হরিবংশ অনুযায়ী বারোজন আদিত্য হলেন— অর্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পুষা, বিবস্বান্ সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ এবং পরম তেজস্বী ভগ।

সুতরাং এই তথ্য পাঠ করার পর কারোরই মনে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি অর্থাৎ ৩৩,০০,০০,০০০ জন না মোট তেত্রিশ জন সে বিষয়ে আর সংশয় থাকা সমীচীন নয়।। ২২।।

রূপং মহৎ তে বহু-বক্ত্র-নেত্রং # মহাবাহো বহু-বাহু-উরু-পাদম্।
বহু-উদরং বহু-দংষ্ট্রা-করালং # দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ তথা অহম্।।২৩।।

তে = আপনার; বক্ত্র = মুখ; পাদম্ = পা; বহু = অনেক; উদরং = পেট; দংষ্ট্রা = দাঁত; করালং = ভয়ানক; মহৎ = বিশাল; দৃষ্ট্বা = দেখে; লোকাঃ = ত্রিলোক; প্রব্যথিতাঃ = ভয়ার্ত হয়ে পড়েছে; তথা অহম্ = এবং আমিও।।২৩।।

অনুবাদ :- হে মহাবাহো ! আপনার অনেক মুখ, চোখ, অগণিত হাত, উরু, পা, অসংখ্য পেট, অনেক দাঁতবিশিষ্ট ভয়ানক বিশাল রূপ দেখে ত্রিলোকসহ আমিও ভীষণভাবে ভয়ার্ত হয়ে পড়েছি।।২৩।।

নভঃ-স্পৃশং দীপ্তম্ অনেক-বর্ণং # ব্যাত্ত-আননং দীপ্ত-বিশাল-নেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিত-অন্তরাত্মা # ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো।। ২৪।।

নভঃ = আকাশ; স্পৃশং = স্পর্শকারী; দীপ্তম্ = মহা উজ্জ্বল; ব্যাত্ত = উন্মুক্ত; আননং = মুখ; দীপ্ত = অতি উজ্জ্বল; দৃষ্ট্বা = দেখেই; ত্বাং = আপনাকে; হি প্রব্যথিত = ভীত; ধৃতিং = ধৈর্য; ন বিন্দামি = লাভ করতে পারছি; শমং = শান্তি।।২৪।।

অনুবাদ :- হে বিষ্ণো ! আপনার ঐ গগন স্পর্শকারী মহা উজ্জ্বল বহু রঙবিশিষ্ট উন্মুক্ত মুখ, অতি উজ্জ্বল বিরাট চোখ দেখেই আমার অন্তরাত্মা অতীব ভীত হয়ে পড়েছে। আমি আর ধৈর্য রাখতে এবং শান্তিলাভ করতে পারছি না।।২৪।।

দংষ্ট্রা-করালানি চ তে মুখানি # দৃষ্ট্বা এব কাল-অনল-সন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম # প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।২৫।।

দংষ্ট্রা = দাঁত; করালানি = ভয়াবহ; কাল = মৃত্যু; অনল = আগুন; সন্নিভানি = তুল্য; তে = আপনার; মুখানি = মুখ; দৃষ্ট্বা এব = দেখেই; দিশঃ ন জানে = দিশাহারা হয়ে পড়েছি; ন লভে = লাভ করতে পারছি না; শর্ম = শান্তি; প্রসীদ = শান্ত হন; দেবেশ = প্রভু; জগন্নিবাস = জগতের আশ্রয়।। ২৫।।

অনুবাদ :- আপনার ভয়াবহ দাঁত ও কালাগ্নির মত আপনার মুখসমূহ দেখেই আমি দিশাহারা হয়ে পড়েছি এবং শান্তি লাভ করতে পারছি না। হে প্রভু ! হে জগতের আশ্রয়! আপনি শান্ত হন।।২৫।।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ # সর্বে সহ এব অবনিপাল-সঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রঃ তথা অসৌ # সহ অস্মদীয়ৈঃ অপি যোধমুখ্যৈঃ।।২৬।।

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি # দংষ্ট্রা-করালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্ বিলগ্না দশন-অন্তরেষু # সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈঃ উত্তম-অঙ্গৈঃ।।২৭।।

অমী = ঐ; সহ = সহিত; এব পুত্রাঃ = পুত্রগণই; অবনিপাল = রাজা; সঙ্ঘৈঃ = সমূহ; তথা = তৎসহ; অসৌ = ঐ; অস্মদীয়ৈঃ = আমাদের পক্ষের; যোধমুখ্যৈঃ সহ = মুখ্য অর্থাৎ প্রধান যোদ্ধগণ সহ; অপি = ও; ত্বাং = আপনার; বক্ত্রাণি = মুখসমূহ; তে = আপনার; ত্বরমাণাঃ = সজোরে ধাবিত হয়ে; বিশন্তি

= প্রবেশ করছে; দংষ্ট্রা-করালানি = ভয়ঙ্কর দাঁতবিশিষ্ট; ভয়ানকানি = বিভীষিকাময়; কেচিৎ = কেউ কেউ; বিলগ্নাঃ = আটকে আছে; দশন = দাঁত; অন্তরেষু = মাঝখানে; সংদৃশ্যন্তে = দেখা যাচ্ছে; চূর্ণিতৈঃ = চূর্ণ-বিচূর্ণ; উত্তম-অঙ্গৈঃ = সর্বাপেক্ষা ভাল অঙ্গ অর্থাৎ মাথা;।।২৬-২৭।।

অনুবাদ :- ধৃতরাষ্ট্রের ঐ সকল পুত্রগণ অন্যান্য রাজাগণ তৎসহ ভীষ্ম ও দ্রোণ, ঐ সূতপুত্র কর্ণ এবং আমাদের পক্ষের মুখ্য অর্থাৎ প্রধান যোদ্ধগণ আপনার দিকে সজোরে ধাবিত হয়ে আপনার ভয়ঙ্কর দাঁতবিশিষ্ট বিভীষিকাময় মুখসমূহে প্রবেশ করছে। কারও কারও আবার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং তাদেরকে সেই অবস্থাতেই আপনার দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকতে দেখা যাচ্ছে।।২৬-২৭।।

যথা নদীনাং বহবঃ অম্বু-বেগাঃ # সমুদ্রম্ এব অভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তব অমী নরলোক-বীরাঃ # বিশন্তি বক্ত্রাণি অভি-বিজ্বলন্তি।।২৮।।

যথা = যেরূপ; নদীনাং = নদীসমূহের; বহবঃ = বহু; অম্বু-বেগাঃ = জল রাশি; দ্রবন্তি = প্রবেশ করে; নরলোক-বীরাঃ = বীর পুরুষগণ; বিশন্তি = প্রবেশ করছে; বক্ত্রাণি = মুখ সমূহে; অভি-বিজ্বলন্তি = জ্বলন্ত।।২৮।।

অনুবাদ = যেমন নদীবাহিত বিপুল জলরাশি চারিদিক থেকে তীব্র বেগে ধাবিত হয়ে উত্তাল সমুদ্রে প্রবেশ করে তেমনই এই সমস্ত বীর পুরুষগণ আপনার অতি জ্বলন্ত মুখের মধ্যে সবেগে প্রবেশ করছে।।২৮।।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা # বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথা এব নাশায় বিশন্তি লোকাঃ # তব অপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধ-বেগাঃ।।২৯।।

যথা = যেরূপ; প্রদীপ্তং = জ্বলন্ত; জ্বলনং = অগ্নিতে; বিশন্তি = প্রবেশ করে; নাশায় = মরার জন্য; সমৃদ্ধবেগাঃ = প্রচণ্ড বেগে; তথা এব = সেই রকমই; লোকাঃ = মানুষেরা; তব = আপনার; অপি = ও; বক্ত্রাণি = মুখে।।২৯।।

অনুবাদ :- যেমন পতঙ্গরা মরার জন্যই প্রচণ্ড বেগে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে তেমনই এই সমস্ত লোকেরা মরার জন্যই প্রচণ্ড বেগে আপনার জ্বলন্ত মুখের মধ্যে প্রবেশ করছে।।২৯।।

ব্যাখ্যা :- উপর্যুক্ত পরপর দুটি শ্লোকে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সমস্ত যোদ্ধৃগণকে সবেগে ধাবিত হয়ে ভগবানের জ্বলন্ত মুখে প্রবেশ করতে দেখছেন। এখানে সমস্ত যোদ্ধৃগণকে তিনি দুইভাগে ভাগ করেছেন এবং তাঁদের জন্য দুইপ্রকার উপমা ব্যবহার করেছেন। এক প্রকার যোদ্ধা সমুদ্রে প্রবেশকারী নদীবাহিত বিপুল জলরাশির ন্যায় ভগবানের মুখগহ্বরে প্রবেশ করছেন এবং অন্য প্রকার যোদ্ধৃগণ পতঙ্গ যেমন জ্বলন্ত আগুনের রূপে আকৃষ্ট হয়ে অগ্নিতে ঝাঁপ দেয় সেই রকম তাঁরাও দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ভগবানের জ্বলন্ত মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে। প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধৃগণ হলেন যথার্থ শূরবীর। তাঁরা মনে-প্রাণে যুদ্ধকে সমর্থন করেন না। তাঁরা জীবনের অন্তে পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়াকে তাঁদের পরম সৌভাগ্য ভেবেছিলেন। নদীর যেমন একমাত্র লক্ষ্য হল সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে তারই বুকে চিরদিনের জন্য বিলীন হয়ে যাওয়া, তাতেই নদীর জীবনের পরম সার্থকতা, তাতেই তার পরম সুখ, এই মিলনই তার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। ঠিক তেমনই ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব পক্ষের যোদ্ধৃগণ যুদ্ধে বীরগতিপ্রাপ্ত হয়ে জীবনের অন্তিম গতি পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অপর অনেক যোদ্ধা কীট-পতঙ্গদের মত। কীট-পতঙ্গগুলি আগুনের লেলিহান শিখার বর্ণে মোহিত হয়ে তার দিকে ছুটে গিয়ে প্রাণ দেয়। ঠিক তেমনই ঐ সমস্ত যোদ্ধারা কোন রকম আদর্শ ছাড়াই অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যক্তিস্বার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়ে বসে। তাদের প্রাণ উৎসর্গের মধ্যে কোন সার্থকতা থাকে না। তাই তাদেরকে পতঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু ভীষ্ম-দ্রোণাদি যথার্থ শূরবীরগণকে সমুদ্রাভিমুখী নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কারণ নদীপ্রবাহের সার্থকতা যেমন সমুদ্রের সঙ্গে মিলনে তেমনই এই সমস্ত শূরবীরেদের পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলনেই জীবনের পরম ঈপ্সিত মোক্ষলাভ।।২৯।।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ # লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈঃ জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিঃ আপূর্য জগৎ সমগ্রং # ভাসঃ তব উগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।।৩০।।

লেলিহ্যসে = জিভদ্বারা স্বাদ গ্রহণ ক'রে; গ্রসমানঃ = গ্রাস করতে করতে; সমন্তাৎ = সর্বত্র; লোকান্ = লোকসমূহকে; সমগ্রান্ = সমস্ত; বদনৈঃ = মুখসমূহের

দ্বারা; জ্বলদ্ভিঃ = জ্বলন্ত; তেজোভিঃ = তেজোরাশিদ্বারা; আপূর্য = পূর্ণ ক'রে; জগৎ = সংসার; ভাসঃ = কিরণ; তব = আপনার; উগ্রাঃ = তীব্র; প্রতপন্তি = দগ্ধ করছে।।৩০।।

অনুবাদ :- হে বিষ্ণো! আপনি নিজের জ্বলন্ত মুখসমূহের দ্বারা সমস্ত লোকসমূহকে গ্রাস করতে করতে সর্বত্র জিভদ্বারা স্বাদ গ্রহণ ক'রে সমস্ত সংসারকে আপনার তীব্র কিরণের তেজোরাশিদ্বারা পূর্ণ ক'রে তাকে দগ্ধ করছেন।।৩০।।

আখ্যাহি মে কো ভবান্ উগ্ররূপো # নমঃ অস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি ভবন্তম্ আদ্যং # ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্।।৩১।।

উগ্ররূপঃ = উগ্ররূপধারী; ভবান্ = আপনি; কঃ = কে; মে = আমাকে; আখ্যাহি = বলুন; তে = আপনাকে; নমঃ অস্তু = প্রণাম; দেববর = হে দেবশ্রেষ্ঠ; প্রসীদ = প্রসন্ন হন; আদ্যং = আদিপুরুষ; ভবন্তং = আপনাকে; বিজ্ঞাতুম্ = জানতে; ইচ্ছামি = ইচ্ছা করি; হি = অবশ্যই; তব = আপনার; প্রবৃত্তিং = লীলা; ন প্রজানামি = জানিনা।।৩১।।

অনুবাদ :- হে উগ্ররূপ! আমাকে বলুন আপনি কে। হে দেববর আপনাকে প্রণাম, আপনি আমার উপর তুষ্ট হন। হে আদিপুরুষ! আপনাকে জানতে চাই। আপনি এখন কোন কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন তা বুঝতে পারছি না।।৩১।।

ব্যাখ্যা :- অর্জুন তাঁর শৈশব থেকেই শ্রীকৃষ্ণের মোহন মুরতি, পরম সৌম্য দিব্যদর্শন রূপকে দেখতেই অভ্যস্ত। তিনি তাঁর সর্ব কার্যের নিত্য সঙ্গী ছিলেন। পরিচিত আর পাঁচটা মানুষের মতই শরীর সম্পন্ন এই অপূর্ব দেবদর্শন সখা। কিন্তু আজ তাঁর সেই আপাত নিরীহ-দর্শন সখার এহেন বিকট, বর্ণনাতীতভাবে ভয়ঙ্কর রূপের প্রকাশ দেখে অর্জুন পরম হতচকিত, বিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে তিনি চেয়ে আছেন ভয়ঙ্কর দেহী সেই বিরাট্ পুরুষের প্রতি। এই বিকট দেহী পুরুষ যে তাঁরই সেই সখা শ্রীকৃষ্ণই তাতে তাঁর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ যে তাঁর নিতান্তই অচেনা, অজানা! দীর্ঘদিন পদে পদে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ তাঁর নিকট তো অমূল্য রত্ন ছিল। কিন্তু আজ সহসা তাঁর এই ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে তিনি যেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পরেছেন। তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁর সেই সখা শ্রীকৃষ্ণ আজকের এই বিকট দর্শন পুরুষের রূপ ধারণ ক'রে কি করতে চাইছেন। তাই তিনি সভয়ে

শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে সবিনয়ে জানতে চাইলেন তিনি এই করাল রূপ ধারণ ক’রে কোন কাজে প্রবৃত্ত হতে চাইছেন।।৩১।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

কালঃ অস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো # লোকান্ সমাহর্তুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতে অপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে # যে অবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।।৩২।।

কালঃ = কাল; অস্মি = হই; লোকক্ষয়কৃতং = লোকহননকারী; প্রবৃদ্ধঃ = ভয়ানক; লোকান্ = লোকসমূহকে; সমাহর্তুম্ = সংহার করার জন্য; ইহ = এখানে; প্রবৃত্তঃ = রত হয়েছি; ঋতে অপি = ছাড়াও; ত্বাং = আপনি; ন ভবিষ্যন্তি = বেঁচে থাকবে না; অবস্থিতাঃ = আছে; প্রত্যনীকেষু = বিপক্ষদলের মধ্যে; যোধাঃ = যে সব যোদ্ধা; সর্বে = সকলেই।।৩২।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন— আমি লোকহননকারী ভয়ানক কাল। লোকসমূহকে সংহার করার কাজে এখন প্রবৃত্ত হয়েছি। বিপক্ষদলের মধ্যে যে সব যোদ্ধা আছে তারা সকলেই, তুমি যুদ্ধ না করলেও, নিহত হবে।। ৩২।।

তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব # জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়া এব এতে নিহতাঃ পূর্বম্ এব # নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।। ৩৩।।

তস্মাৎ = সেইজন্য; ত্বম্ = তুমি; উত্তিষ্ঠ = ওঠ; লভস্ব = অর্জন কর; জিত্বা = জয় ক’রে; শত্রূন্ = শত্রুদেরকে; ভুঙ্‌ক্ষ্ব = ভোগ কর; ময়া এব = আমার দ্বারাই; এতে = এরা; পূর্বম্ এব = পূর্বেই; নিহতাঃ = নিহত হয়েছে; ভব = হও।।৩৩।।

অনুবাদ :- সেইজন্য তুমি ওঠ, শত্রুদেরকে জয় ক’রে যশ অর্জন কর এবং সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। হে অর্জুন! আমি এদেরকে পূর্বেই নিহত ক’রে রেখেছি। এখন তুমি (যুদ্ধে এদেরকে হত্যা ক’রে) নিমিত্তমাত্র হও।।৩৩।।

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ # কর্ণং তথা অন্যান্ অপি যোধবীরান্।
ময়া হতান্ ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা # যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্।।৩৪।।

যোধবীরান্ = বীর যোদ্ধগণকে; ময়া = আমার দ্বারা; হতান্ = নিহত হয়েছে; ত্বং = তুমি; জহি = হত্যা কর; মা ব্যথিষ্ঠা = ব্যথিত হবে না; যুধ্যস্ব = যুদ্ধ কর; জেতাসি = পরাজিত করতে পারবে; রণে = যুদ্ধে; সপত্নান্ = বিপক্ষদেরকে।। ৩৪।।

অনুবাদ :- আমি পূর্বেই দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধগণকেও হত্যা ক'রে রেখেছি। তুমি তোমার মৃত শত্রুদের পুনরায় যুদ্ধে নিহত কর, মনে ব্যথা পেয়ো না, তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করবে। তুমি যুদ্ধ কর।।৩৪।।

সঞ্জয় উবাচ

এতৎ শ্রুত্বা বচনং কেশবস্য # কৃতাঞ্জলিঃ বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এব আহ কৃষ্ণং # সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য।।৩৫।।

এতৎ = এই; শ্রুত্বা = শুনে; বচনং = কথা; কিরীটী = অর্জুন; কৃতাঞ্জলিঃ = হাত জোড় ক'রে; বেপমানঃ = কম্পমান; নমস্কৃত্বা = নমস্কার ক'রে; ভূয়ঃ এব = পুনরায়ই; আহ = বললেন; সগদ্গদং = গদগদ কণ্ঠে; ভীতভীতঃ = ভীত সন্ত্রস্তভাবে; প্রণম্য = প্রণাম ক'রে।। ৩৫।।

অনুবাদ :- সঞ্জয় বললেন— কেশবের এই কথা শুনে অর্জুন কম্পিত দেহে হাত জোড় ক'রে কৃষ্ণকে ভীত সন্ত্রস্তভাবে প্রণাম ক'রে পুনরায়ই গদগদ কণ্ঠে বললেন।। ৩৫।।

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষিকেশ তব প্রকীর্ত্যা # জগৎ প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি # সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ।।৩৬।।

উবাচ = বললেন; স্থানে = যুক্তিসঙ্গতভাবেই; প্রকীর্ত্যা = মহিমা কীর্তন শুনে; প্রহৃষ্যতি = আনন্দলাভ করে; অনুরজ্যতে = অনুরক্ত হয়; রক্ষাংসি = রাক্ষসেরা; ভীতানি = ভয়ে; দিশঃ = দূর-দূরান্তে; দ্রবন্তি = পালিয়ে যায়; সিদ্ধসঙ্ঘাঃ = সিদ্ধগণ; নমস্যন্তি = নমস্কার করেন।। ৩৬।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন - হে হৃষীকেশ ! অতি যুক্তিসঙ্গতভাবেই আপনার মহিমা কীর্তন শুনে বিশ্বসংসার আনন্দলাভ করে ও আপনার প্রতি অনুরক্ত হয় আর রাক্ষসেরা ভয়ে দূর-দূরান্তে পালিয়ে যায় এবং সকল সিদ্ধগণ আপনাকে নমস্কার করেন।।৩৬।।

কস্মাৎ চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ # গরীয়সে ব্রহ্মণঃ অপি আদি-কর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস # ত্বম্ অক্ষরং সৎ-অসৎ তৎ পরং যৎ।।৩৭।।

ব্রহ্মণঃ অপি = ব্রহ্মার অপেক্ষাও; গরীয়সে = অধিকতর পূজ্য; আদি-কর্ত্রে

= আদিকর্তা; কস্মাৎ = কি কারণে; তে = তাঁরা; ন নমেরন্ = প্রণাম করবেন না; ত্বম্ = আপনি; যৎ = যা; অক্ষরং = অবিনাশী পরব্রহ্ম; সৎ-অসৎ চ = ব্যক্ত জগৎ ও অব্যক্ত প্রকৃতি; তৎ = তারও; পরং = ঊর্ধ্বে।।৩৭।।

অনুবাদ :- হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস (জগতের নিবাস অর্থাৎ আশ্রয়)! আপনি ব্রহ্মার অপেক্ষাও অধিকতর পূজ্য, আপনিই আদিকর্তা। তাঁরা কোন কারণে আপনাকে প্রণাম করবে না? আপনি হলেন সেই অবিনাশী পরব্রহ্ম যিনি ব্যক্ত জগৎ ও অব্যক্ত প্রকৃতির ঊর্ধ্বে।।৩৭।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে অর্জুন বলেছেন যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অক্ষর অর্থাৎ তাঁর কোনদিন ক্ষয় অর্থাৎ বিনাশ হয় না এবং তিনি কূটস্থ অর্থাৎ চির অপরিবর্তনশীল, চির অবিনশ্বর এবং তিনি সৎ অর্থাৎ প্রকাশিত এই জড়জগৎ যাকে প্রকৃতির কার্য বলা হয় এবং অসৎ অর্থাৎ অপ্রকাশিত প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকাশিত জড়জগতের কারণ এবং সৎ ও অসৎ এই উভয়প্রকার কার্য ও কারণের অনন্ত ঊর্ধ্বে। সৎ ও অসৎ কাকে বলে সে বিষয়ে শঙ্করাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন— "কিং তৎ, সদ্ অসদ্ বিদ্যমানম্ অসৎ চ যত্র নাস্তি ইতি বুদ্ধিঃ"। অর্থাৎ যার বিদ্যমানতা আছে, সেই বস্তু হল সৎ এবং যার বিদ্যমানতা নাই তাই হল অসৎ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতার অনেক স্থলেই বলেছেন যে তিনি অব্যক্তা প্রকৃতির গর্ভে জীবসৃষ্টির বীজ রোপণ করেন যার ফলে এই জড়জগতের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু তাঁর অন্তরে কোন কর্তৃত্ববোধ না থাকায় এই জড়জগতের সঙ্গে তাঁর কোন বন্ধন সৃষ্টি হয় না। তাই তিনি এই জড়জগতের স্রষ্টা হলেও তার থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। আবার তিনি তাঁর যে পরা শক্তি অর্থাৎ জীবজগতের সৃষ্টির জন্য তাঁর অপরা শক্তি অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতির গর্ভে জীব সৃষ্টির বীজ স্থাপন করেন যার ফলে এই ব্যক্ত জীবজগতের উত্থান ঘটে সেই অব্যক্তা প্রকৃতির থেকেও তিনি বহু ঊর্ধ্বে। জীবের সঙ্গে পরমাত্মার পার্থক্য এইখানেই। জীব কোন কিছুর জন্য একটু কিছু করলেই তার সঙ্গে সে নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে পরে এবং তার মধ্যে এক বিরাট অহং বোধ ক্রিয়া করতে শুরু করে। জীব জন্মের পূর্বে অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত অর্থাৎ অপ্রকাশিত অর্থাৎ আকার বিহীন অবস্থায় থাকে এবং জন্মের ফলে সৎ অর্থাৎ ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশিত অর্থাৎ আকারযুক্ত হয় আবার মৃত্যুর পর পুনরায় অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত অর্থাৎ অপ্রকাশিত অর্থাৎ আকার বিহীন

হয়ে যায়। সেই কারণে জীবকে অসৎ বলা হয়। পরমেশ্বর কিন্তু সে রকম নন। তাঁকে জীবের মত সৎ অর্থাৎ ব্যক্ত অর্থাৎ অবয়বযুক্ত অর্থাৎ সাকার এবং অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত অর্থাৎ অবয়বহীন অর্থাৎ নিরাকার অথবা জীবের মত সাকার-নিরাকার উভয়ই এই বিশেষণে ভূষিত করা যাবে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে তিনি অজ অর্থাৎ তাঁর জন্ম হয় না। বলা হয়েছে যে তিনি আদিপুরুষ অর্থাৎ প্রথম আত্মা। তাঁর পূর্বে অপর কেউ ছিলেন না। বস্তুত এই ব্রহ্মাণ্ডই সৃষ্টি হয়েছে তাঁর পরে অর্থাৎ তাঁর দ্বারাই এই জগতের সৃষ্টি ও বিকাশ। জীবের মত তাঁর জন্মই হয়নি। প্রকৃতপক্ষে জীব জন্মের দ্বারাই আকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যাঁর জন্মই হয়নি তিনি সাকার হবেন কিভাবে? সুতরাং তিনি সাকার নন। আবার গীতায় বলা হয়েছে যে জীবগণ জন্মের আগে অব্যক্ত অর্থাৎ নিরাকার অবস্থায় থাকে এবং জন্মের পর ব্যক্ত অর্থাৎ সাকার অবস্থা লাভ করে এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে পুনরায় অব্যক্ত অর্থাৎ নিরাকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরমেশ্বর পরমপুরুষ শ্রীভগবানের তো জীবের ন্যায় কখনই নাশ হন না। তাহলে যাঁর নাশই নাই অর্থাৎ যিনি অবিনাশী তিনি কিভাবে তাঁর সৎ অর্থাৎ সাকার অবস্থা হারিয়ে অসৎ নিরাকার অবস্থা লাভ করবেন? সুতরাং তিনি সৎ, অসৎ বা সদসৎ এই সমস্ত বিষয়ের একেবারে ঊর্ধ্বে। মানুষের চেতনায় তিনি সৎ অর্থাৎ সাকার, মানুষের চেতনায় তিনি অসৎ অর্থাৎ নিরাকার। কিন্তু বস্তুতপক্ষে তিনি সাকার, নিরাকার বা সাকার-নিরাকার কোনটিই নন, তিনি এই সমস্ত উপাধি অপেক্ষা 'পর' অর্থাৎ অনেক উপরে।

তবে এই কথা বললে অবশ্য একটা প্রশ্ন মনে উদয় হতে পারে। মনে হতে পারে যে তিনি শ্রীগীতায় বলেছেন যে ধরার বুকে অধর্ম, অন্যায়ের উদ্ভব ও ধর্মের হানি ঘটলে তিনি পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হন। বস্তুত আমরা তাঁকে কংসের কারাগারে জন্ম নিতে, ননী চুরি করতে, বৃন্দাবনের গোঠে গোঠে গোবৎসের পিছনে পিছনে বেণুহাতে বিচরণ করতে দেখেছি, কংস, শিশুপালের মত অত্যাচারী রাজাদের পাপের শাস্তি প্রদান করতে দেখেছি, আবার পরম পবিত্র ব্রজগোপিনীদের সঙ্গে তাঁকে পরম পবিত্র রাসলীলায় নিমগ্ন হতে দেখেছি। সেক্ষেত্রে তাঁকে তো সাকার রূপ ধারণ করেই আসতে হয়েছে আবার কর্ম অন্তে তাঁকে জীবেরই মত মৃত্যু বরণ করতে অর্থাৎ নাশপ্রাপ্ত হতে দেখেছি যেমন আমরা শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণে তাঁকে ব্যাধের দ্বারা শরবিদ্ধ হয়ে দেহান্তরপ্রাপ্ত

হতে দেখেছি। তাহলে আমরা তাঁর জন্ম, মৃত্যু, সাকার, নিরাকার সমস্তপ্রকার অবস্থা চর্মচক্ষু দ্বারা দেখেছি। তাহলে কিভাবে বলা যাবে তিনি সৎ বা সাকার অথবা অসৎ অর্থাৎ নিরাকার কোনটিই নন? বস্তুত এই হল বাজীগরের খেলা, আমাদের মায়াবদ্ধ চোখে মরীচিকার ন্যায় ভ্রম দর্শন। তিনি মহাকাশের বুকে ভেসে বেড়ানো অনন্ত বাষ্পকণার মত। এই অনন্ত বাষ্পকণা মহাকাশে অবাধে বিচরণ করে। তখন তার কোন আকার থাকে না। কিন্তু যখনই পৃথিবীর প্রয়োজন পরে তখন সেই আকারবিহীন বাষ্প বারিধারার রূপ পরিগ্রহ ক'রে অবতরণ করে এই ধরিত্রীর বুকে আর যখন ধরিত্রীর তৃষ্ণা নিবারণ হয়ে যায় তখন পুনরায় সে সেই বাষ্পের আকার ধারণ ক'রে ফিরে যায় সেই মহাশূন্যে। জলের কখনও জন্ম হয় না আবার তার বিনাশও নাই। সে বাষ্পরূপে বিদ্যমান ছিলই আবার পৃথিবীর প্রয়োজন সমাপ্ত হলেই সে পুনরায় তার পূর্বের রূপ ধারণ ক'রে ফিরে যায় মহাকাশের বুকে। জলের আকার তার আসল রূপ নয়, তার আসল রূপ হল তার অদৃশ্য বাষ্পের আকার। যে বৃক্ষ-তরুলতাকে সে জীবনদান করেছিল সেই বৃক্ষ-তরুলতা একদিন নাশপ্রাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু জলের ক্ষয় নাই, লয় নাই। কেবল রূপ পাল্টায় মাত্র। জলকে উত্তপ্ত করলে, ধূলি চাপা দিলে জলকে নাশ করা যায় না, এর ফলে সে তার জলদেহ পরিত্যাগ ক'রে বাষ্পরূপে থেকে যায় অনন্ত কাল পর্যন্ত। বাষ্প যে জলের আকার ধারণ ক'রে নেমে এল এ তার নূতন জন্ম নয় আবার সে যে শুকিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল এ তার মৃত্যু নয়। ভগবানের জন্ম-মৃত্যুর বিষয়টিও এই একই প্রকার। তিনি পরমাত্মারূপে সৃষ্টির পূর্ব থেকেই বিদ্যমান আছেন। যুগে যুগে তিনি পৃথিবীর প্রয়োজনে কখনও মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, কখনও রাম, কখনও বুদ্ধ, কখনও বৃন্দাবনের যমুনার একুল ওকুল স্বীয় প্রভায় উদ্ভাসিত করে ব্রজদুলালরূপে অবতীর্ণ হন পৃথিবীর বুকে। আবার কর্ম অন্তে সেই পরমপুরুষের রূপ ধারণ ক'রে ফিরে যান তাঁর বৈকুণ্ঠধামে আর যাবার পূর্বে তাঁর মায়ার দ্বারা মনুষ্য দেহসুলভ কিছু লীলা দেখিয়ে যান এই মাটির পৃথিবীকে।। ৩৭।।

ত্বম্ আদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ # ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তা অসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম # ত্বয়া ততং বিশ্বম্ অনন্তরূপ।।৩৮।।

ত্বম্ = আপনি; আদিদেবঃ = আদিদেব; পুরাণঃ = সনাতন; অস্য = এই;

বিশ্বস্য = বিশ্বের; পরং = অন্তিম; নিধানম্ = আশ্রয়; বেত্তা = সর্বজ্ঞ; বেদ্যং = জানার যোগ্য; পরং = শ্রেষ্ঠ; ধাম = গৃহ; অসি = হন; ত্বয়া = আপনার দ্বারা; ততং = পরিব্যাপ্ত।।৩৮।।

অনুবাদ :- আপনি আদিদেব এবং সনাতন পুরুষ। আপনি এই বিশ্বের অন্তিম আশ্রয়, আপনি সর্বজ্ঞ, আপনি সকলের জানার যোগ্য এবং আপনিই সকলের শ্রেষ্ঠ অন্তিম আশ্রয়। হে অনন্তরূপ! আপনি সমগ্র বিশ্ব সংসার পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন।।৩৮।।

বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ শশাঙ্কঃ # প্রজাপতিঃ ত্বং প্রপিতামহঃ চ।
নমো নমস্তে অস্তু সহস্রকৃত্বঃ # পুনশ্চ ভূয়ঃ অপি নমো নমস্তে।।৩৯।।

ত্বং = আপনি; শশাঙ্কঃ = চন্দ্র; প্রজাপতিঃ = পিতামহ ব্রহ্মা; প্রপিতামহঃ = ব্রহ্মারও পিতা; তে = আপনাকে; সহস্রকৃতঃ = হাজারবার; ভূয়ঃ = আবার; অপি = ও।।৩৯।।

অনুবাদ :- আপনিই একাধারে বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ ও চন্দ্র। আপনিই প্রজাপতি, আপনি পিতামহ ব্রহ্মা, আপনাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় নমস্কার, আবারও নমস্কার।।৩৯।।

নমঃ পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতঃ তে # নমঃ অস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্ত-বীর্য অমিত-বিত্রমঃ ত্বং # সর্বং সমাপ্নোষি ততঃ অসি সর্বঃ।। ৪০।।

পুরস্তাৎ = অগ্রে; পৃষ্ঠতঃ = পশ্চাতে; তে = আপনাকে; অথ = এবং; নমঃ = নমস্কার; তে = আপনার; সর্বতঃ এব = সর্বদিকেই; নমঃ অস্তু = নমস্কার; অনন্ত-বীর্য = সীমাহীন শক্তিধর; অমিত-বিত্রমঃ = অসীম পরাক্রমশালী; ত্বং = আপনি; সর্বং = সমস্ত কিছুর মধ্যে; সমাপ্নোষি = পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন; ততঃ = সেইজন্য; সর্বঃ অসি = সকলই আপনি।।৪০।।

অনুবাদ :- আপনার অগ্রে নমস্কার, আপনার পশ্চাতে নমস্কার, আপনার সর্বদিকেই নমস্কার। আপনার শক্তি সীমাহীন, আপনার পরাক্রমও অসীম। আপনি সমস্ত কিছুর মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। সেইজন্য আপনিই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু।।৪০।।

সখা ইতি মত্বা প্রসভং যৎ উক্তং # হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখা ইতি।
অজানতা মহিমানং তব ইদং # ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি।।৪১।।

* (যুগ্ম শ্লোক হওয়ার কারণে এই শ্লোকটির অর্থ প্রকাশের জন্য পরবর্তী শ্লোকটি থেকে 'তৎ ক্ষাময়ে' পদটি গ্রহণ করা হয়েছে)

তব = আপনার; ইদং = এইরূপ; মহিমানং = মহিমার বিষয়ে; অজানতা = না জানার কারণে; ময়া = আমার দ্বারা; প্রমাদাৎ = মূঢ়তা বশতঃ; প্রণয়েন অপি = ভালোবাসার কারণেও; মত্বা = মনে ক'রে; প্রসভং = ঔদ্ধত্য সহকারে; যৎ = যা কিছু; উক্তং = বলেছি; (তৎ ক্ষাময়ে = তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করুন)।।৪১।।

অনুবাদ :- আপনার এইরূপ মহিমার বিষয়ে না জানার কারণে আমি আপনাকে মূঢ়তা বশতঃ অথবা ভালোবাসার কারণেও সখা মনে ক'রে 'হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখা !' এই সব ঔদ্ধত্য সহকারে যা কিছু বলেছি; (তার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন)।। ৪১।।

যৎ চ অবহাসার্থম্ অসৎকৃতঃ অসি # বিহার-শয্যা-আসন-ভোজনেষু।
একঃ অথবা অপি অচ্যুত তৎ সমক্ষং # তৎ ক্ষাময়ে ত্বাম্ অহম্ অপ্রমেয়ম্।।৪২।।

অবহাসার্থম্ = পরিহাসছলে; অসৎকৃতঃ = অসম্মানিত; বিহার = প্রমোদ; অসি = হয়েছেন; অপ্রমেয়ং = অপ্রমেয় বিরাট্ পুরুষ; ত্বাং = আপনাকে; তৎ = তার জন্য; অহং = আমি; ক্ষাময়ে = ক্ষমা প্রার্থনা করছি।। ৪২।।

অনুবাদ :- হে অচ্যুত! প্রমোদ, শয়ন, আসন এবং আহারাদির সময় পরিহাসছলে একাকী অথবা পরিজন সকলের সামনেও আমার দ্বারা আপনি যেভাবে অসম্মানিত হয়েছেন তার জন্য হে অপ্রমেয় বিরাট্ পুরুষ আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।। ৪২।।

পিতা অসি লোকস্য চরাচরস্য # ত্বম্ অস্য পূজ্যশ্চ গুরুঃ গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমঃ অস্তি অভ্যধিকঃ কুতঃ অন্যঃ # লোকত্রয়ে অপি অপ্রতিমপ্রভাব।।৪৩।।

অসি = হন; লোকস্য = সকল লোকের; চরাচরস্য = নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের; ত্বম্ = আপনি; অস্য = এই; গরীয়ান্ = গুরুশ্রেষ্ঠ; ত্বৎসমঃ = আপনার সমান; ন অস্তি = নাই; অভ্যধিকঃ = অধিক; অন্যঃ = অপর কেউ; কুতঃ = কোথায়;

লোকত্রয়ে = ত্রিলোকে; অপি = ও; অপ্রতিমপ্রভাব = হে অতুলনীয় প্রভাবশালী।।৪৩।।

অনুবাদ :- হে অতুলনীয় প্রভাবশালী! আপনি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকল লোকের পিতা এবং পরম পূজনীয়, আপনি গুরু এবং গুরুশ্রেষ্ঠ। ত্রিলোকে আপনার সমান কেউ নাই, আপনার অধিক অপর কেউ কোথায় থাকবে? ।। ৪৩।।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং # প্রসাদয়ে ত্বাম্ অহম্ ঈশম্ ঈড্যম্।
পিতা ইব পুত্রস্য সখা ইব সখ্যুঃ # প্রিয়ঃ প্রিয়ায় অর্হসি দেব সোঢুম্।।৪৪।।

তস্মাৎ = সেই জন্য; প্রণম্য = প্রণাম ক'রে; প্রণিধায় = দণ্ডবৎ; কায়ং = সাষ্টাঙ্গ; প্রসাদয়ে = প্রসন্ন করার জন্য প্রার্থনা করছি; অহং = আমি; ঈশং = ঈশ্বর; ঈড্যম্ = স্তুতি-যোগ্য; ত্বাম্ = আপনাকে; পিতা ইব = পিতার মত; পুত্রস্য = পুত্রের; সখা ইব = সখার মত; সখ্যুঃ = সখার; প্রিয়ঃ = ভগবান্ , প্রিয়ায় = ভক্তের; অর্হসি = পারেন; সোঢুম্ = ক্ষমা করতে।।৪৪।।

অনুবাদ :- হে দেব ! আপনি স্তুতি-যোগ্য ঈশ্বর। সেই জন্য আমি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি যে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন। পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ, সখা যেমন সখার অপরাধ, ভগবান্ যেমন ভক্তের অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন তেমনিই আপনিও আমার অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন।।৪৪।।

ব্যাখ্যা :- মূল শ্লোকে ব্যবহৃত 'প্রিয়ায়ার্হসি' এই পদটির সন্ধিবিচ্ছেদ এবং অর্থ নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিস্তর মতভেদ আছে। এক শ্রেণীর পণ্ডিত পদটির সন্ধিবিচ্ছেদ করেছেন 'প্রিয়ায়াঃ অর্হসি'এবং অপর শ্রেণীর পণ্ডিত পদটির সন্ধিবিচ্ছেদ করতে চান 'প্রিয়ায় অর্হসি'। এখন 'প্রিয়ায়ার্হসি' পদটির সন্ধিবিচ্ছেদ ক'রে 'প্রিয়ায়াঃ অর্হসি' লিখলে প্রথমত, সেটি ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করবে। দ্বিতীয়ত, 'প্রিয়ায়াঃ' শব্দটি 'প্রিয়া' শব্দের ষষ্ঠীর একবচন যার অর্থ হল - স্ত্রীর। তাহলে শ্লোকে 'প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ অর্হসি' এই বক্তব্যের অর্থ হবে স্বামী যেমন স্ত্রীর অপরাধ ক্ষমা করতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মত পবিত্র গ্রন্থের ক্ষেত্রে এই ধরণের ব্যাখ্যা সঠিক নয়। প্রথমত, সেক্ষেত্রে উপমার উৎকর্ষতার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় কারণ ব্যাসদেব পরপর পিতা-পুত্র, দুই সখা প্রভৃতির

মত দুটি প্রকৃষ্ট উপমা দেওয়ার পরে পরেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মত উপমা দিয়ে দেবেন সেটি গ্রহণযোগ্য হয় না। দ্বিতীয়ত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সর্বত্রই 'প্রিয়' শব্দ ভগবানের ভক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যথা ১২।১৪, ৭।১৭, ১৮।৬৫ শ্লোকসমূহ। সেইজন্য এখানে 'প্রিয়ায়ার্হসি' পদটির যথার্থ সন্ধিবিচ্ছেদ হবে 'প্রিয়ায় অর্হসি' যার অর্থ হবে — 'যেমন ভগবান্ ভক্তের অপরাধ ক্ষমা করেন' ইত্যাদি। অর্জুন সচেতনভাবেই 'প্রিয়' পদের দ্বারা নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। শ্রদ্ধেয় বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয়ও 'প্রিয়ায়ার্হসি' পদের এই ব্যাখ্যাই করেছেন।।৪৪।।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতঃ অস্মি দৃষ্ট্বা # ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তৎ এব মে দর্শয় দেব রূপং # প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।৪৫।।

অদৃষ্টপূর্বং = যা আগে কখনও দেখা হয় নি; হৃষিতঃ = আনন্দিত; অস্মি = হয়েছি; দৃষ্ট্বা = দেখে; ভয়েন = ভয়ে; প্রব্যথিতং = বিহ্বল হয়ে উঠেছে; মনঃ = অন্তর; মে = আমার; তৎ এব = সেই পূর্বের; মে = আমাকে; দর্শয় = দেখাও; রূপং = রূপটিই; প্রসীদ = প্রসন্ন হন; দেবেশ = দেব অর্থাৎ দেবতাদের ঈশ অর্থাৎ প্রভু; জগন্নিবাস = বিশ্বসংসারের আশ্রয়স্থল।।৪৫।।

অনুবাদ :- হে দেব ! আজ আমি যা দেখলাম তা আমি পূর্বে কখনও দেখিনি। আপনার এই অত্যাশ্চর্য রূপ দেখে আমার অন্তর পুলকিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মন নিবিড় ভয়ে বিহ্বল হয়ে উঠেছে। সেইজন্য হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! আপনি আপনার সেই পূর্বের রূপটিই আমাকে দেখান, আপনি প্রসন্ন হন।।৪৫।।

ব্যাখ্যা :- এই ধরণের প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই নিয়ে দ্বিতীয়বার করা হল। শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই একই প্রার্থনা করেছিলেন কংসের কারাগারে তাঁর জন্মমুহূর্তে তাঁর পিতা বসুদেব। কারাগারে দিব্যদেহী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত জ্যোতিঃ সম্পন্ন চতুর্ভুজরূপে নিম্ন দক্ষিণ হস্তে গদা, ঊর্ধ্ব দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ, ঊর্ধ্ব বামহস্তে চক্র এবং নিম্ন বাম হস্তে পদ্ম ("বাসুদেবো গদাশঙ্খচক্রপদ্মধরো মতঃ" — সিদ্ধার্থসংহিতা) ধারণ ক'রে যখন ধরায় আবির্ভূত হলেন তখন তাঁর সেই অপরূপ রূপ দর্শন ক'রে পিতা বসুদেব একদিকে যেমন পরমানন্দে পুলকিত

হলেন, তেমনই তিনি ভীতও হলেন। সেইজন্য তিনি পুত্রের নিকট প্রার্থনা করলেন তাঁর সেই অপার্থিব রূপ সম্বরণ করে সাধারণ মানব শিশুর রূপ ধারণ করার জন্য।।৪৫।।

কিরীটিনং গদিনং চক্র-হস্তম্ # ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুম্ অহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন # সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে।।৪৬।।

কিরীটিনং = মুকুটধারী; গদিনং = গদাধারী; চক্র-হস্তং = সুদর্শন চক্রধারী; ইচ্ছামি = ইচ্ছা করি; ত্বাং = আপনাকে; দ্রষ্টুম্ = দেখতে; অহং = আমি; তথা এব = সেই রকমই; তেন এব রূপেণ = সেই মূর্তিতেই; সহস্রবাহো = হে সহস্রবাহো অর্থাৎ অনন্ত হাত বিশিষ্ট; ভব = প্রকাশিত হন; বিশ্বমূর্তে = হে বিশ্বরূপ।।৪৬।।

অনুবাদ :- আমি আপনাকে সেই রকমই মুকুটধারী, গদাধারী, সুদর্শন চক্রধারী মূর্তিতেই দেখতে চাই। হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বরূপ! আপনি পূর্বের মতই আপনার সেই চতুর্ভুজ মূর্তিতেই প্রকাশিত হন।।৪৬।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময়া প্রসন্নেন তব অর্জুন ইদং # রূপং পরং দর্শিতম্ আত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বম্ অনন্তম্ আদ্যং # যৎ মে ত্বৎ অন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্।। ৪৭।।

ময়া = আমার দ্বারা; প্রসন্নেন = তোমার উপর প্রসন্ন হয়ে; তব = তোমাকে; ইদং = এই; বিশ্বং রূপং = বিশ্বরূপ; পরং = শ্রেষ্ঠ; দর্শিতম্ = দেখালাম; আত্মযোগাৎ = আমার নিজ যোগমায়া শক্তির প্রভাবে; তেজোময়ং = তেজোময়; অনন্তম্ = সীমাহীন; আদ্যং = সকলের আদিস্বরূপ; যৎ = যা; মে = আমার; ত্বৎ অন্যেন = তুমি ছাড়া অন্য কেউ; ন দৃষ্টপূর্বম্ = এর আগে দেখেনি।।৪৭।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন—হে অর্জুন ! তোমার উপর প্রসন্ন হয়ে আমি আমার নিজ যোগমায়া শক্তির প্রভাবে তোমাকে আমার এই তেজোময়, সীমাহীন, সকলের আদিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ দেখালাম যা তুমি ছাড়া অন্য কেউ এর আগে দেখেনি।।৪৭।।

ন বেদ-যজ্ঞ-অধ্যয়নৈঃ ন দানৈঃ # ন চ ক্রিয়াভিঃ ন তপোভিঃ উগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে # দ্রষ্টুং ত্বৎ অন্যেন কুরুপ্রবীর।। ৪৮।।

এবং = এই; রূপঃ = বিশ্বরূপ; শক্যঃ = সমর্থ; অহং = আমি; নৃলোকে =

মনুষ্যলোকে; দ্রষ্টুং = দেখতে; অন্যেন = অপর কেউ; কুরুপ্রবীর = হে কুরুকুল শ্রেষ্ঠ।।৪৮।।

অনুবাদ :- হে কুরুকুল শ্রেষ্ঠ ! বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, ক্রিয়া, উগ্র তপস্যা প্রভৃতির সহায়তা ব্যতীতই যেমন তুমি আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করলে সেরকম কিন্তু এই মনুষ্যলোকে আর অপর কেউ আমার সেই রূপ দেখতে পারে না।। ৪৮।।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো # দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরম্ ঈদৃক্ মম ইদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনঃ ত্বং # তৎ এব মে রূপম্ ইদং প্রপশ্য।।৪৯।।

মা = না; তে = তোমার; ব্যথা = ভয়; চ বিমূঢ়ভাবঃ = বিহ্বলতা; দৃষ্ট্বা = দর্শন ক'রে; ঘোরং = ভয়ঙ্কর; ইদম্ = এই; ঈদৃক = এই রকম; ব্যপেতভীঃ = ভয়শূন্য; প্রীতমনাঃ = খুশীমনে; ত্বং = তুমি; তৎ এব = সেই এক রকমই; মে = আমার; রূপম্ = রূপ; ইদং = সেই; প্রপশ্য = দর্শন কর।।৪৯।।

অনুবাদ :- আমার এই রকম এই ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন ক'রে যেন তোমার অন্তরে কোন প্রকার ভয় বা বিহ্বলতা না আসে। তুমি ভয়শূন্য ও খুশীমনে পুনরায় আমার একই রকম পূর্বের সেই রূপ দর্শন কর।।৪৯।।

সঞ্জয় উবাচ

ইতি অর্জুনং বাসুদেবঃ তথা উক্তা # স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতম্ এনং # ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুঃ মহাত্মা।। ৫০।।

উবাচ = বললেন; তথা উক্ত্বা = এই কথা ব'লে; তথা = পূর্বের; স্বকং = নিজস্ব; রূপং = রূপ; দর্শয়ামাস = দেখালেন; ভূয়ঃ = পুনরায়; আশ্বাসয়ামাস চ = আশ্বস্ত করলেন; ভীতম্ = সন্ত্রস্ত; এনং = এই অর্জুনকে; ভূত্বা = ধারণ ক'রে; পুনঃ = পুনরায়; সৌম্যবপুঃ = মোহন মূর্তি; মহাত্মা = মহান আত্মা শ্রীকৃষ্ণ।। ৫০।।

অনুবাদ :- সঞ্জয় বললেন - বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা ব'লে পুনরায় পূর্বের নিজস্ব চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন এবং তারপর মহান আত্মা শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় দ্বিভুজ সৌম্য মোহন মূর্তি ধারণ ক'রে সন্ত্রস্ত অর্জুনকে পুনরায়,আশ্বস্ত করলেন।।৫০।।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বা ইদং মানুষং রূপং # তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীম্ অস্মি সংবৃত্তঃ # সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।। ৫১।।

উবাচ = বললেন; দৃষ্ট্বা = দেখে; ইদং = এই প্রকার; মানুষং = মানুষ; রূপং = মুরতি; তব = আপনার; সৌম্যং = নয়নলোভন; ইদানীং = এখন; অস্মি = হলাম; সংবৃত্তঃ = হলাম; সচেতাঃ = স্থিরচিত্ত; প্রকৃতিং গতঃ = প্রকৃতিস্থ।। ৫১।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন - হে জনার্দন! আপনার এই প্রকার মানুষের ন্যায় আকার বিশিষ্ট এই নয়নলোভন মুরতি দেখে এখন আমার চিত্তের স্থিরতা ফিরে পেলাম এবং প্রকৃতিস্থ হলাম।।৫১।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

সুদুর্দর্শম্ ইদং রূপং # দৃষ্টবান্ অসি যৎ মম।
দেবা অপি অস্য রূপস্য # নিত্যং দর্শন-কাঙ্ক্ষিণঃ।। ৫২।।

শ্রীভগবান্ উবাচ = শ্রীভগবান্ বললেন; সুদুর্দর্শং = দুর্লভ-দর্শন; ইদং রূপং = এই রূপ; দৃষ্টবান্ অসি = প্রত্যক্ষ করলে; যৎ = যে; মম = আমার; দেবাঃ অপি = দেবতাগণও; অস্য = ওই; রূপস্য = রূপের; নিত্যং = সদা; দর্শন-কাঙ্ক্ষিণঃ = দর্শন প্রত্যাশী।।৫২।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন - আমার এই প্রকার দুর্লভ-দর্শন যে রূপ তুমি প্রত্যক্ষ করলে দেবতাগণও ওই রূপ দর্শনের সদা আকাঙ্ক্ষা করে।।৫২।।

ন অহং বেদৈঃ ন তপসা # ন দানেন ন চ ইজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং # দৃষ্টবান্ অসি মাং যথা।। ৫৩।।

অহং = আমি; ন বেদৈঃ ন তপসা ন দানেন = বেদপাঠের দ্বারাও নয়, তপস্যার দ্বারাও নয়, দানের দ্বারাও নয়; ন চ ইজ্যয়া = যজ্ঞের দ্বারাও নয়; শক্যঃ = সক্ষম হয়; এবংবিধঃ = এই রকম রূপে; দ্রষ্টুং = দেখতে; দৃষ্টবান্ অসি = দেখতে পেলে; মাং = আমাকে; যথা = যে রকম।। ৫৩।।

অনুবাদ :- আজ তুমি আমাকে যে রূপে দেখলে আমার সেই রূপ আর কেউ বেদপাঠের সাহায্যে অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা, বা তপস্যা বা দান বা যজ্ঞের দ্বারা প্রভৃতি কোন ভাবেই দেখতে সক্ষম হয় না।।৫৩।।

ভক্ত্যা তু অনন্বয়া শক্য # অহম্ এবংবিধঃ অর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন # প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।। ৫৪।।

ভক্ত্যা = ভক্তির দ্বারা; তু = কিন্তু; অনন্বয়া = অনন্য; শক্যঃ = সমর্থ; অহং = আমি; এবংবিধঃ = এই প্রকার; জ্ঞাতুং = জানতে; দ্রষ্টুং = দেখতে; চ = এবং; তত্ত্বেন = তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা; প্রবেষ্টুং = প্রবেশ করতে; পরন্তপ অর্জুন = হে শত্রুনিধনকারী অর্জুন।।৫৪।।

অনুবাদ :- হে পরন্তপ অর্জুন ! কিন্তু অনন্য ভক্তির দ্বারা আমার এই প্রকার রূপ জানতে, দেখতে এবং আমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারা যায়।।৫৪।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ যে এইমাত্র অর্জুনকে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ দিব্য বিশ্বরূপ দেখালেন তা অতীব দুর্লভ। মনুষ্য দেহধারণকারীদের মধ্যে খুব নগণ্য সংখ্যকই তাঁর সেই রূপ দেখতে সক্ষম হয়েছেন। ভগবান্ এখানে বলছেন যে তাঁর সুদুর্লভ রূপ দর্শন করতে হলে মানুষের প্রয়োজন তাঁর প্রতি অনন্য ভক্তি। মানুষ যতই শাস্ত্রবিহিত বেদপাঠের সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করুক না কেন বা তপস্যা, দান-ধ্যান, যাগ-যজ্ঞ করুক না কেন তাঁর অন্তরে যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য ভক্তি না থাকে তাহলে কখনই তাঁর পক্ষে ভগবানের সেই স্বরূপের দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তি কাকে বলা হয়? ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তি হল সেই ভক্তি যেখানে ভক্তের অন্তরে ভগবান্ ব্যতীত অপর কোন প্রকার বিষয়ের চিন্তা স্থান পায় না এবং ভক্তের অন্তরে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একমাত্র পরমাত্মা বাসুদেব ব্যতীত অন্য কারোরই উপলব্ধি জাগে না, তাকেই ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তি বলা হয়। ভগবানের সেই ঐশ্বরিক বিশ্বরূপ দর্শন ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। কঠোপনিষদেও এই কথা বলা হয়েছে —

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।
১।২।২৩

অর্থাৎ এই আত্মাকে বহু বেদ আয়ত্ত করার দ্বারা বা মেধাশক্তির সাহায্যে বা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। একমাত্র তিনি যাকে অনুগ্রহ করেন তিনিই তাঁকে দেখতে সক্ষম হন।

কিন্তু ভগবান্ ভক্তকে এই রকম অনুগ্রহ কখন করেন? একমাত্র ভক্ত যখন তাঁর প্রতি একনিষ্ঠভাবে অনন্যচিত্তে তাঁর অন্তরের সমস্ত ভক্তি নিঃশেষে উজাড় ক'রে দিয়ে জীবনের পরম আশ্রয় তাঁর অভয় চরণে শরণ গ্রহণ করে তখন ভগবান্ সেই অনন্যচিত্ত ভক্তকে অনুগ্রহ করেন এবং তখন ভগবান্ তাঁর প্রকৃত দিব্য স্বরূপ তার সামনে প্রকাশ করেন। কাজেই ভগবানকে লাভ করতে হলে একমাত্র প্রয়োজন তাঁর প্রতি অনন্য ভক্তি।।৫৪।।

মৎ-কর্মকৃৎ মৎ-পরমো # মদ্‌ভক্তঃ সঙ্গ-বর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু # যঃ স মাম্ এতি পাণ্ডব।। ৫৫।।

মৎ-কর্মকৃৎ = আমার নিমিত্ত কর্ম করেন; মৎ-পরমঃ = আমার প্রতি নিবেদিত চিত্ত; মদ্‌ভক্তঃ = আমার ভক্ত; সঙ্গ = আসক্তি; বর্জিতঃ = শূন্য; নির্বৈরঃ = শত্রুভাবরহিত; সর্বভূতেষু = সকল জীবের প্রতি; যঃ = যিনি; মাম্ = আমাকে; এতি = লাভ করেন।।৫৫।।

অনুবাদ :- হে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন! যিনি আমার নিমিত্তই কর্ম করেন, আমার প্রতি নিবেদিত চিত্ত, আমার ভক্ত, সর্ব বিষয়ে আসক্তি শূন্য এবং কোন জীবের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নন একমাত্র তিনিই আমাকে লাভ করেন।। ৫৫।।

—ঃ একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ঃ—

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

অর্জুন উবাচ

এবং সতত-যুক্তা যে # ভক্তাঃ ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চ অপি অক্ষরম্ অব্যক্তং # তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।।১।।

অর্জুন উবাচ = অর্জুন বললেন; এবং = এইভাবে; সতত = সদা সর্বদা; যুক্তাঃ = নিষ্ঠা সহকারে আপনার মধ্যেই অর্পিত চিত্ত; যে = যে সকল; ভক্তাঃ = ভক্তগণ; ত্বাং = আপনাকে; পর্যুপাসতে = উপাসনা করে; যে চ অপি = আবার যারা; অক্ষরম্ = অবিনাশী; অব্যক্তং = অপ্রকাশিত, অবয়ব রহিত, নিরাকার ব্রহ্ম; তেষাং কে = তাদের মধ্যে কে; যোগবিত্তমাঃ = উত্তম যোগী।।১।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন— এইভাবে সদা সর্বদা নিষ্ঠা সহকারে আপনার মধ্যেই অর্পিত চিত্ত হয়ে যে সমস্ত ভক্তগণ মোহন মুরতিধারী শ্যামসুন্দর সাকার আপনার উপাসনা করে আর যারা অবিনাশী নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করে এদের মধ্যে কে উত্তম যোগী।।১।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময়ি আবেশ্য মনো যে মাং # নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়া উপেতাঃ # তে মে যুক্ততমা মতাঃ।।২।।

শ্রীভগবান্ উবাচ = শ্রীভগবান্ বললেন; ময়ি = আমাতে; আবেশ্য = আবিষ্ট অর্থাৎ স্থির ক'রে; যে = যারা; মনঃ = মন; মাং = আমাকে; নিত্যযুক্তাঃ = সদা সর্বদা আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে; উপাসতে = অর্চনা করে; শ্রদ্ধয়া = শ্রদ্ধার সঙ্গে; পরয়া = পরম; উপেতাঃ = যুক্ত হয়ে; তে = তাঁরা; মে = আমার; যুক্ততমাঃ = আমার সঙ্গে উত্তমরূপে যুক্ত আছেন অর্থাৎ তাঁরাই আমার উত্তম ভক্ত; মতাঃ = অভিমতে।।।২।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন — আমাতে মন আবিষ্ট অর্থাৎ স্থির ক'রে সদা সর্বদা আমার সঙ্গে পরম শ্রদ্ধা সহকারে সংযুক্ত হয়ে যাঁরা আমাকে অর্চনা করেন তাঁরা আমার সঙ্গে উত্তমরূপে যুক্ত আছেন অর্থাৎ তাঁরাই আমার উত্তম ভক্ত।।২।।

যে তু অক্ষরম্ অনির্দেশ্যম্ # অব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগম্ অচিন্ত্যং চ # কূটস্থম্ অচলং ধ্রুবম্।।৩।।
সংনিয়ম্য ইন্দ্রিয়গ্রামং # সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মাম্ এব # সর্বভূতহিতে রতাঃ।।৪।।

যে = যারা; তু = কিন্তু; অক্ষরং = অবিনাশী এবং অপরিণামী, নীরব, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম; অনির্দেশ্যম্ = যার জাতি, গুণ, ক্রিয়াদি নির্ধারণ করা যায় না; অব্যক্তং = যিনি অবয়ববিহীন; পর্যুপাসতে = উপাসনা করেন; সর্বত্রগম্ = যিনি সর্বত্রই বিরাজ করেন; অচিন্ত্যং = যাকে চিন্তার দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না; কূটস্থম্ = নিত্য একরূপ অর্থাৎ যার বার্ধক্যাদি পরিবর্তন হয় না; অচলং = স্থির; ধ্রুবং = নিত্য; সংনিয়ম্য = সংযত ক'রে; ইন্দ্রিয়গ্রামং = ইন্দ্রিয়সমূহকে; সর্বত্র = সকলক্ষেত্রে; সমবুদ্ধয়ঃ = যিনি শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু, শত্রু, উদাসীন বিদ্বেষী, স্বজন, সাধু, পাপী প্রভৃতি সকলের প্রতি সমবুদ্ধি অর্থাৎ সকলকে সমানভাবে দেখেন; তে = তাঁরা; প্রাপ্নুবন্তি = লাভ করেন; মাম্ = আমাকে; এব = অবশ্যই; সর্বভূতহিতে = সকল জীবের কল্যাণে; রতাঃ = নিয়োজিত।। ৩-৪।।

অনুবাদ :- কিন্তু যাঁরা ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত ক'রে সকলক্ষেত্রে সমবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু, শত্রু, উদাসীন, বিদ্বেষী, স্বজন, সাধু, পাপী নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমবুদ্ধি হয়ে সকলকে সমানভাবে দেখেন এবং সকল জীবের কল্যাণে নিয়োজিত হয়ে, যিনি অনির্দেশ্য অর্থাৎ যাঁর জাতি, গুণ, ক্রিয়াদি নির্ধারণ করা যায় না, অব্যক্ত অর্থাৎ যিনি অবয়ববিহীন, সর্বত্রগামী অর্থাৎ যিনি সর্বত্রই বিরাজ করেন, অচিন্ত্য অর্থাৎ যাকে চিন্তার দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, কূটস্থ অর্থাৎ নিত্য একরূপ অর্থাৎ যার বার্ধক্যাদি পরিবর্তন হয় না, অচল অর্থাৎ স্থির, নিত্য, অক্ষর অর্থাৎ চির অপরিবর্তনশীল অপরিণামী, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় সেই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁরাও অবশ্যই আমাকে লাভ করেন।।৩-৪।।

ক্লেশঃ অধিকতরঃ তেষাম্ # অব্যক্ত-আসক্ত-চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতিঃ দুঃখং # দেহবদ্ভিঃ অবাপ্যতে।।৫।।

ক্লেশঃ = কষ্টকর; অধিকতরঃ = অনেক বেশী; তেষাম্ = সেই সমস্ত; অব্যক্ত = অবয়বহীন; আসক্ত-চেতসাম্ = আসক্তচিত্ত; অব্যক্তা = অবয়বহীন ব্রহ্মের প্রতি; গতিঃ = নিষ্ঠা; দুঃখং = দুঃখ; দেহবদ্ভিঃ = দেহাত্মাভিমানী অর্থাৎ দেহধারী; অবাপ্যতে = পেয়ে থাকেন।। ৫।।

অনুবাদ :- যারা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ক'রে থাকেন তাঁদের সিদ্ধিলাভ করতে বেশী কষ্ট হয় কারণ দেহাত্মভিমানী অর্থাৎ যার অবয়ব অর্থাৎ দেহ আছে তার পক্ষে অবয়বহীন নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় সিদ্ধিলাভ অনেক বেশী কষ্টেই হয়ে থাকে।।৫।।

যে তু সর্বাণি কর্মাণি # ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেন এব যোগেন # মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।৬।।
তেষাম্ অহং সমুদ্ধর্তা # মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ # ময়ি আবেশিত-চেতসাম্।। ৭।।

যে = যারা; তু = কিন্তু; সর্বাণি = সমস্তপ্রকার; কর্মাণি = কর্মসমূহ; ময়ি = আমাতে; সংন্যস্য = সমর্পণ ক'রে; মৎপরাঃ = আমাকেই জীবনের ত্রাণকর্তা ভেবে; অনন্যেন এব = অনন্যচিত্তেই; যোগেন = যোগযুক্ত হয়ে; মাং = আমার; ধ্যায়ন্ত = ধ্যান করতে করতে; উপাসতে = উপাসনা করে; তেষাম্ = তাদেরকে; অহং = আমি; সমুদ্ধর্তা = উদ্ধারের কর্তা; মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ = মৃত্যুরূপ সংসারসাগর থেকে; ভবামি = হয়ে থাকি; ন চিরাৎ = অচিরেই; ময়ি = আমাতে; আবেশিত = সমর্পিত; চেতসাম্ = চিত্ত।। ৬-৭।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! কিন্তু যারা সমস্তপ্রকার কর্মসমূহ আমাতে সমর্পণ ক'রে আমাকেই জীবনের ত্রাণকর্তা ভেবে অনন্যচিত্তেই আমার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে আমার ধ্যান করতে করতে আমার উপাসনা করে, আমাতে সমর্পিতচিত্ত সেই ভক্তগণকে মৃত্যুরূপ সংসারসাগর থেকে আমি অচিরেই উদ্ধার ক'রে থাকি।।৬-৭।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে সপ্তম শ্লোকে আমাদের মাটির পার্থিব সংসারকে সাগরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিসের সেই সাগর? সেই সাগর মৃত্যুর সাগর। সাগরে যেমন সর্বত্রই জল — যেদিকেই তাকানো যায় সর্বদিকেই কেবল অনন্ত জলরাশি। আমাদের মাটির পার্থিব সংসারেরও তেমনই সর্বদিকে মৃত্যুর ভেরী নিনাদ — নয়ন উন্মীলিত করলেই দৃষ্টিগোচর হয় কোন না কোন জীবের অসহায় মৃত্যুর আর্তনাদ। বাস্তব জগতে অগাধ সমুদ্র জলের মধ্যে পতিত হলে কোন ভালো সাঁতারু গিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনতে পারে। কিন্তু মৃত্যুরূপ অদৃশ্য অন্তহীন পারাবার থেকে উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র পরম করুণাময় সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। এর জন্য প্রয়োজন তাঁর প্রতি ভক্তের একাগ্রচিত্তে অনন্য ভক্তি।

এখানে আর একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি যে ভগবান্ ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে বলেছেন যে, ভক্তের প্রতি উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

'উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানম অর্থাৎ ভক্তকে তার নিজের উদ্ধার নিজেকেই করতে হবে। কিন্তু এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভগবান্ বলছেন যে তিনি ভক্তকে মৃত্যুরূপ সাগর থেকে উদ্ধার করেন — 'তেষাম্ অহং সমুদ্ধর্তা'। এখানে সাধারণ বিচারে মানুষের মনে হতে পারে যে ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলছেন। কিন্তু বিষয়টি সেরূপ নয়। আমাদের ভগবানের উপদেশের গূঢ় অর্থ বোঝার চেষ্টা করতে হবে। ভগবান্ বলতে চেয়েছেন যে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য জীবকে প্রথমে নিজের দিক থেকে উপযুক্ত সাধন বা প্রচেষ্টা শুরু করতে হবে। ভগবান্ পূর্বেই বলেছেন যে মানুষের সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ সংসার বন্ধন অতিক্রমের নিমিত্ত দুইটি নিষ্ঠা বা সাধন আছে — একটি হল নিষ্কাম কর্ম-সাধন আর একটি হল জ্ঞান-সাধন। ভগবানের উপদেশের প্রকৃত অর্থ হল ভক্ত তার সর্ব কর্ম ভগবানে নিঃশেষে সমর্পণ ক'রে এই নিষ্কাম কর্ম-সাধন বা জ্ঞানসাধনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা শুরু করলে উপযুক্ত মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হলেই ভগবান্ আপনিই অগ্রসর হয়ে ভক্তকে উদ্ধার করার জন্য ভক্তের প্রতি তাঁর হস্ত প্রসারিত করবেন যেমন কেউ নৌকায় করে নদী পার হওয়ার উদ্দেশ্যে এক পাড় থেকে অপর পাড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে সে যখন অপর পাড়ের কাছাকাছি পৌঁছায় তখন পাড় থেকে অপর একজন তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার হাতটি ধ'রে নেয় যাতে সেই ব্যক্তি পাড়ের পঙ্কের মধ্যে পা হড়কে প'ড়ে না যায়। কাজেই ভক্তকে সংসাররূপী মৃত্যুসাগর থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে তাকে তার সাধ্যমত ভগবান্ নির্দেশিত দুটি সাধনের মধ্যে যে কোন একটিতে অগ্রসর হতে হবে যাতে ক'রে ভগবানের প্রতি তার পক্ষ থেকে বার্তা যায় — প্রভু! আমি আসছি। তুমি আমাকে উদ্ধার কর। তাহলেই ভগবান্ তাকে নিশ্চিতভাবেই উদ্ধার করার জন্য তাঁর চির অভয় হাত ভক্তের দিকে বাড়িয়ে দেবেন।।৬-৭।।

ময়ি এব মন আধৎস্ব # ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময়ি এব # অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ।।৮।।

ময়ি এব = আমাতেই; মনঃ = মন; আধৎস্ব = স্থির কর; ময়ি = আমাতে; বুদ্ধিং = বুদ্ধি; নিবেশয় = স্থাপন কর; নিবসিষ্যসি = নিবাস করবে; ময়ি = আমাতে; এব = নিশ্চিতভাবে; অতঃ = এর পর; ঊর্ধ্বং = পরলোকে; ন সংশয়ঃ = সংশয় নাই।।৮।।

অনুবাদ :- আমাতেই মন স্থির কর, আমাতে বুদ্ধি স্থাপন কর। এর ফলে পরলোকে নিশ্চিতভাবে আমার মধ্যেই স্থান লাভ করবে। এতে কোন সংশয় নাই।।।৮।।

অথ চিত্তং সমাধাতুং # ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।

অভ্যাসযোগেন ততো # মাম্ ইচ্ছ আপ্তুং ধনঞ্জয়।। ৯।।

অথ = সেইজন্য; চিত্তং = মন; সমাধাতুং = স্থাপন করতে; ন শক্নোষি = না পার; ময়ি = আমাতে; স্থিরম্ = দৃঢ়ভাবে; অভ্যাসযোগেন = অভ্যাসের দ্বারা; ততঃ = তাহলে; মাম্ = আমাকে; ইচ্ছ = চেষ্টা কর; আপ্তুম্ = লাভ করার।। ৯।।

অনুবাদ :- হে ধনঞ্জয়! সেইজন্য তুমি যদি আমাতে মন দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে না পার তাহলে অভ্যাস অর্থাৎ ক্রমাগত চেষ্টার দ্বারা অর্থাৎ অন্য সমস্ত বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে এনে ক্রমাগত একমাত্র আমার মধ্যে মনোনিবেশ করার অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে লাভ করার প্রয়াস কর।।৯।।

অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি # মৎ-কর্মপরমো ভব।

মদর্থম্ অপি কর্মাণি # কুর্বন্ সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি।। ১০।।

অভ্যাসে অপি = অভ্যাসের দ্বারাও; অসমর্থঃ = অসফল; অসি = হও; মৎ কর্মপরমঃ = আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কর্ম যথা আমার মন্দির নির্মাণ, তুলসীমঞ্চ স্থাপন, আমার কথা শ্রবণ, কীর্তন, বন্দন, আত্মনিবেদন প্রভৃতি; ভব = (আচরণে ব্রতী) হও, মৎ = আমার; অর্থম্ = প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত; অপি = ও; কর্মাণি = কর্মসমূহ; কুর্বন্ = করলেও; সিদ্ধিম্ = সফলতা; অবাপ্স্যসি = লাভ করবে।।১০।।

অনুবাদ :- আর যদি অভ্যাসের দ্বারাও আমাকে লাভ করতে না পার, তাহলে আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত যে সমস্ত কাজ যথা আমার মন্দির নির্মাণ, তুলসীমঞ্চ স্থাপন, আমার কথা শ্রবণ, কীর্তন, বন্দন, আত্মনিবেদন প্রভৃতি আচরণ কর। আমার আনন্দের জন্য অনুষ্ঠিত কর্মসমূহ করলেও তুমি সফলতা লাভ করবে অর্থাৎ আমাকে পাবে।।১০।।

অথ এতৎ অপি অশক্তঃ অসি # কর্তুং মদ্‌যোগম্ আশ্রিতঃ।

সর্ব-কর্মফল-ত্যাগং # ততঃ কুরু যত-আত্মবান্।।১১।।

অথ = তথাপি যদি; এতৎ = এইটি; অপি = ও; অশক্তঃ = অপারগ; অসি

= হও; কর্তুং = করতে; মৎ = আমাতে; যোগম্ = নিজেকে পরিপূর্ণ সমর্পণ; আশ্রিতঃ = অবলম্বন ক'রে; সর্বকর্মফলত্যাগং = সকলপ্রকার কর্মের ফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ; ততঃ = তাহলে; কুরু = কর; যত-আত্মবান্ = সংযতচিত্ত হয়ে।।১১।।

অনুবাদ :- তথাপি যদি এইটিও করতে অর্থাৎ আমার প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম করতে অপারগ হও তাহলে আমার মধ্যে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ ক'রে চিত্তকে সংযত ক'রে সকলপ্রকার কর্মের ফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ কর অর্থাৎ ঈশ্বর অর্থাৎ আমার আজ্ঞা অনুসারে যথাশক্তি কাজ করে যাও এবং এইভাবে সেই কর্মের দৃষ্ট বা অদৃষ্ট সমস্ত ফল পরমেশ্বরের অধীন এই কথা মনে রেখে সর্ব কর্মের ভার আমার উপর ছেড়ে দিয়ে সর্ব প্রকার আসক্তি ত্যাগ ক'রে কর্ম করতে পারলে তুমি আমার অশেষ করুণা লাভ ক'রে আমাকে লাভ করতে পারবে।।১১।।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানম্ অভ্যাসাৎ # জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে।

ধ্যানাৎ কর্ম-ফল-ত্যাগঃ # ত্যাগাৎ শান্তিঃ অনন্তরম্।১২।।

শ্রেয়ঃ = শ্রেষ্ঠ; হি = নিশ্চিতভাবে; জ্ঞানং = জ্ঞান; অভ্যাসাৎ = অভ্যাস থেকে; জ্ঞানাৎ = জ্ঞানের থেকে; ধ্যানং = ধ্যান; বিশিষ্যতে = শ্রেষ্ঠ; ধ্যানাৎ = ধ্যানের চাইতে; কর্ম-ফল-ত্যাগঃ = কর্মের ফলের প্রতি আসক্তিত্যাগ; ত্যাগাৎ = ত্যাগের ফলে; শান্তিঃ = শান্তিলাভ; অনন্তরং = তারপর।। ১২।।

অনুবাদ :- অভ্যাসের থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানের থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যানের চাইতে কর্মের ফলের প্রতি আসক্তিত্যাগ শ্রেষ্ঠ এবং নিশ্চিতভাবে ত্যাগের পরই শান্তি লাভ হয়।।১২।।

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং # মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ # সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।। ১৩।।
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী # যত-আত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময়ি অর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ # যঃ মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।। ১৪।।

অদ্বেষ্টা, = কোন দ্বেষ নাই; সর্বভূতানাং = সকল জীবের প্রতি; মৈত্রঃ = মিত্রতা পূর্ণ; করুণ = করুণাময়; চ = এবং; এব নির্মমঃ = মমতাশূন্য

অর্থাৎ যার 'আমার-আমার' বোধ নাই; নিরহঙ্কারঃ = অহঙ্কারহীন; সমদুঃখসুখঃ = সুখ ও দুঃখকে যিনি সমান চোখে দেখেন; ক্ষমী = ক্ষমাশীল; সততং = সদা সর্বদা; সন্তুষ্টঃ = আত্মতুষ্ট; যোগী = আমার প্রতি ভক্তিতে সদা সমাহিত; যত = সংযত; আত্মা = ইন্দ্রিয়; দৃঢ়নিশ্চয়ঃ = দৃঢ় শ্রদ্ধাবান; ময়ি = আমার প্রতি; অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ = মন ও বুদ্ধি অর্পণ করেছেন; যঃ = যে; মদ্ভক্তঃ = আমার ভক্ত; সঃ = সে; মে = আমার; প্রিয়ঃ = ভালবাসার পাত্র।। ১৩-১৪।।

অনুবাদ :- সেই ভক্তই আমার ভালোবাসা লাভ ক'রে থাকেন যিনি সকল জীবের প্রতি দ্বেষবিহীন, মিত্রতা পূর্ণ, করুণাময় এবং সর্ববিষয়ের প্রতি মমতাশূন্য অর্থাৎ যার অন্তরে 'আমার-আমার' বোধ নাই, অহঙ্কার নাই, সুখ ও দুঃখকে যিনি সমান চোখে দেখেন, যিনি ক্ষমাশীল, সদা সর্বদা আত্মতুষ্ট, আমার প্রতি ভক্তিতে সদা সমাহিত চিত্ত, যার ইন্দ্রিয় সংযত, আমার প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাবান এবং যিনি আমার প্রতি তাঁর সমস্ত মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করেছেন।।১৩-১৪।।

যস্মাৎ ন উদ্বিজতে লোকো # লোকাৎ ন উদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষ-অমর্ষ-ভয়-উদ্বেগৈঃ # মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।। ১৫।।

যস্মাৎ = যার নিকট থেকে; ন উদ্বিজতে = উদ্বেগ লাভ করেন না; লোকঃ = কোন মানুষ; লোকাৎ = কোন মানুষের নিকট থেকে; ন উদ্বিজতে = উদ্বেগ লাভ করেন না; চ যঃ = এবং যিনি; হর্ষ = আনন্দ; অমর্ষ = পরশ্রীকাতরতা; উদ্বেগৈঃ = উদ্বেগ থেকে; যঃ; = যিনি; সঃ = তিনি; মে = আমার; প্রিয়ঃ = প্রিয় ভক্ত।।১৫।।

অনুবাদ :- যিনি কোন মানুষের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ান না আবার অন্য কোন মানুষের নিকট থেকে তিনি নিজেও উদ্বেগ লাভ করেন না, এবং যিনি আনন্দ, পরশ্রীকাতরতা, ভয়, উদ্বেগ প্রভৃতি থেকে মুক্ত তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত।।১৫।।

অনপেক্ষঃ শুচিঃ দক্ষ # উদাসীনো গত-ব্যথঃ।
সর্ব-আরম্ভ-পরিত্যাগী # যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৬।।

অনপেক্ষঃ = যিনি অপেক্ষা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা রহিত; শুচিঃ = যার দেহ ও মন সবই পবিত্র; দক্ষঃ = যিনি কর্তব্য পালনে নিপুণ; উদাসীনঃ = যিনি লাভ-অলাভ, সুখ-দুঃখ, শত্রু-মিত্রাদি সকল বিষয়ে আগ্রহহীন; গত-ব্যথঃ = যিনি কখনও কোন বিষয়ে ব্যথা অর্থাৎ মনের কষ্ট অনুভব করেন না; সর্ব-আরম্ভ-পরিত্যাগী = যিনি ঐহিক বা পারত্রিক কোন বিষয়ে ফল কামনা না ক'রে সদা নিষ্কামভাবে কর্ম করেন; যঃ = যিনি; মৎ ভক্তঃ = আমার ভক্ত; সঃ = তিনি; মে = আমার।।১৬।।

অনুবাদ :- যিনি অপেক্ষা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা রহিত, যার দেহ ও মন সবই পবিত্র, যিনি কর্তব্য পালনে নিপুণ, যিনি লাভ-অলাভ, সুখ-দুঃখ, শত্রু-মিত্রাদি কোন বিষয়ের পক্ষ অবলম্বনে আগ্রহহীন, যিনি কখনও কোন বিষয়ে অন্তরে ব্যথা অনুভব করেন না, যিনি ঐহিক বা পারত্রিক কোন বিষয়ে ফল কামনা না ক'রে সদা নিষ্কামভাবে কর্ম করেন সেইরূপ ভক্তই আমার প্রিয়।।১৬।।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি # ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভ-অশুভ-পরিত্যাগী # ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ।। ১৭।।

যঃ = যিনি; ন হৃষ্যতি = যিনি কোন কিছু লাভ ক'রে আনন্দে উৎফুল্ল হন না; ন দ্বেষ্টি = যিনি কাউকে ঈর্ষা করেন না; ন শোচতি = যিনি কখনও দুঃখ করেন না; ন কাঙ্ক্ষতি = কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না; শুভ-অশুভ-পরিত্যাগী = যিনি কাজ করতে গিয়ে শুভ অর্থাৎ পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা বা অশুভ বা পাপের ভয় করেন না; ভক্তিমান্ = আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান; যঃ = যিনি; সঃ = তিনি; মে = আমার; প্রিয়ঃ = প্রিয়।। ১৭।।

অনুবাদ :- যিনি কোন প্রিয় বস্তু লাভ ক'রে আনন্দে উৎফুল্ল হন না, যিনি কাউকে ঈর্ষা করেন না, যিনি কখনও অপ্রিয় বস্তু লাভ ক'রে দুঃখ করেন না, কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি কাজ করতে গিয়ে শুভ অর্থাৎ পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা বা অশুভ অর্থাৎ পাপের ভয় আদি সমস্ত বিষয়কে পরিত্যাগ করেছেন, যিনি আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত।।১৭।।

ব্যাখ্যা :- এখানে যে প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুর কথা বলা হয়েছে সেগুলির সমস্তই পার্থিব বিষয়ক। ভগবান্ এখানে বলছেন যে পার্থিব বস্তু যথা স্ত্রী-সন্তান-পরিবার-সম্পদ সবই অনিত্য, দুঃখদায়ী ও কর্মবন্ধনের হেতু। সেই জন্য এই সমস্ত বস্তু লাভ ক'রে বা না পেলে প্রকৃত ভক্তের অন্তরে কোন আনন্দ বা দুঃখ হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে যথার্থ ভক্তের নিকট সর্বব্যাপী সর্বাধার ভগবানই হলেন একমাত্র প্রিয় বস্তু এবং ভগবানের সঙ্গে ভক্তের কখনই বিচ্ছেদ হয় না। সেইজন্য লোকদৃষ্টিতে প্রিয় সাংসারিক বস্তুসমূহের প্রাপ্তি বা বিয়োগ তাঁকে আনন্দিত বা বিচলিত করতে পারে না। যথার্থ ভক্ত একমাত্র যে বস্তুকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করেন তা হল একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান্। ভগবানকে লাভ করার পর তাঁর অন্তরে পরম শান্তি বিরাজ করে। সেইজন্য তুচ্ছ নশ্বর প্রাকৃত বস্তুর প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে আর স্থান পায় না। তিনি যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি সমস্ত জীবিকা এবং শরীরযাত্রা নির্বাহ করার জন্য শাস্ত্রবিহিত

শুভ কর্ম এবং মিথ্যাচার, কপটতা, হিংসা, চুরি, ব্যভিচার প্রভৃতি পাপকর্ম পরিত্যাগ করেন কারণ তিনি তো সমস্ত কর্ম শুদ্ধচিত্তে ভগবানে সমর্পণ করেছেন। ফলে আপাতদৃষ্টিতে তিনি কর্ম করছেন মনে হলেও তাতে তাঁর কোন পাপ বা কর্মবন্ধন হয় না। আমারা বহুবার পূর্বে আলোচনা করেছি যে শ্রীশ্রীগীতা মানবের কল্যাণে, মানবের জীবনকে শতভাগ পরিশুদ্ধ, পরিশীলিত করার জন্য তাঁর ছত্রে ছত্রে মহামূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। এই শ্লোকে তিনি বলেছেন মানব তার মন থেকে শুভ অর্থাৎ পুণ্যকর্মের কারণে অন্তরে আসক্তি, অহংবোধ ত্যাগ করলে এবং সর্বপ্রকার অশুভ বা পাপকর্ম থেকে মনেপ্রাণে বিরত হলে তবেই সচ্চিদানন্দঘন পরমপুরুষের করুণা লাভ করবেন। কারণ মানুষের জীবনের পরম লক্ষ্য হল মোক্ষলাভ কিন্তু পুণ্যকর্ম ক'রে সেই কাজের জন্য অন্তরে তার প্রতি আসক্তি জন্মালে তার কর্মবন্ধন তৈরি হবে এবং ফলে তাকে আবার মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে কারণ অন্তরের সমস্ত আসক্তি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জীবের মুক্তি নাই। আবার, পাপকর্ম করলেও মৃত্যুর পর পাপীর রেহাই নাই কারণ পাপও কর্মবন্ধন সৃষ্টি করে। তাই পাপীকেও মৃত্যুর পর কোন না কোন শরীর ধারণ ক'রে তাকে তার পাপের ক্ষয়ের জন্য এই সংসারে ফিরে আসতে হবে কারণ সমস্ত পাপের ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত তার মুক্তি হবে না। তাই উভয়ই সর্বথা পরিত্যজ্য --- "পাপবৎ পুণ্যস্য অপি বন্ধনহেতুত্বাবিশেষাদ্ উভয়পরিত্যাগী" ইতি (রামানুজাচার্য)। ভগবান্ এখানে পুণ্য-পাপ উভয়ই পরিত্যাগ করা অর্থে উভয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগের কথাই বলেছেন। তিনি মানবের উদ্দেশ্যে বলেছেন — তোমরা সবসময় পুণ্যকাজে ব্রতী হও কিন্তু সেই পুণ্যকর্ম করার জন্য অন্তরে যেন কদাপি গর্ব অনুভব করবে না এবং পাপকর্ম থেকে সর্বদা দূরে থাকবে। গীতার এ এক মহান শিক্ষা।।১৭।।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ # তথা মান-অপমানয়োঃ।
শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু # সমঃ সঙ্গ-বিবর্জিতঃ।।১৮।।
তুল্য-নিন্দা-স্তুতিঃ মৌনী # সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ # ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।। ১৯।।

সমঃ = সমান; শত্রৌ = শত্রু; চ = এবং; তথা = সেইরূপ; মান-অপমানয়োঃ = মান ও অপমানে; সমঃ = সমান; শীতঃ-উষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু = শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখে; সঙ্গ = আসক্তি; বিবর্জিতঃ = হীন; তুল্য = সমরূপ; নিন্দা-স্তুতিঃ = নিন্দা ও প্রশংসা; মৌনী = স্বল্পভাষী; যেন কেনচিৎ = যেটুকুই লাভ করেন তাতেই; সন্তুষ্টঃ = পরিতৃপ্ত; অনিকেতঃ = যিনি গৃহাদিতে আসক্তিহীন; স্থিরমতিঃ = যার মতি অচঞ্চল; ভক্তিমান্ = শ্রদ্ধাবান; নরঃ = মানুষ; মে = আমার; প্রিয়ঃ = প্রিয়।।১৮-১৯।।

অনুবাদ :- যিনি শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখকে সমানচোখে দেখেন, যিনি সর্ব বিষয়ে আসক্তিহীন, মৌনী, যিনি নিন্দা ও প্রশংসাকে সমান জ্ঞান করেন, যিনি স্বল্পভাষী, যিনি যেটুকুই লাভ করেন তাতেই পরিতৃপ্ত, যিনি গৃহাদিতে আসক্তিহীন, যাঁর মতি অচঞ্চল এবং যিনি শ্রদ্ধাবান সেইরকম মানুষই আমার প্রিয়।।১৮-১৯।।

যে তু ধর্ম-অমৃতম্ ইদং # যথা উক্তং পর্যুপাসতে।

শ্রদ্দধানা মৎ-পরমা # ভক্তাঃ তে অতীব মে প্রিয়াঃ।।২০।।

যে = যারা; তু = কিন্তু; ধর্ম-অমৃতম্ = ধর্মরূপ অমৃত; ইদং = এই; যথা = যা; উক্তম্ = বলা হয়েছে; পর্যুপাসতে = উপাসনা করে; শ্রদ্দধানাঃ = শ্রদ্ধাশীল; মৎ-পরমাঃ = আমাকে তাঁর পরম আশ্রয় ভাবে; তে = সেই সমস্ত; ভক্তাঃ = ভক্তগণ; মে = আমার; অতীব প্রিয়াঃ = অতীব প্রিয়।।২০।।

অনুবাদ :- কিন্তু যারা যেভাবে বলা হল সেইভাবে এই ধর্মরূপ অমৃতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আমাকেই তাঁর পরম আশ্রয় ভেবে উপাসনা করে সেই সমস্ত ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয়।। ২০।।

—: দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত :—

ত্রয়োদশ অধ্যায়
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ

অর্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব # ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞম্ এব চ।
এতদ্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি # জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব।।

বেদিতুম্ = জানতে; ইচ্ছামি = ইচ্ছা করি; জ্ঞেয়ং = জানার যোগ্য।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন — হে কেশব! আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এইগুলি সম্পর্কে সম্যক জানতে ইচ্ছা করি।।

ব্যাখ্যা :- উপরুক্ত শ্লোকটি সম্পর্কে একটি বিশেষ আলোচনা করা আবশ্যক। শ্রীমদশঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, শ্রীধরাচার্য প্রমুখ টীকাকারগণ তাঁদের টীকার মধ্যে এই শ্লোকটি অন্তর্ভুক্ত করেননি। এর থেকে মনে হয় এই শ্লোকটি মূল গীতার অন্তর্গত ছিল না। সম্ভবত পরবর্তীকালে এই শ্লোকটি পূর্বের ও পরের অধ্যায় সমূহের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে গীতার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল। তবে গীতার টীকাকার গীতাশাস্ত্রী পূজ্য শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে এই শ্লোকটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পূজনীয় বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয়ও তাঁর ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রহস্য’ বা ‘কর্মযোগ শাস্ত্র’ গ্রন্থে এই শ্লোকটিকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই এই শ্লোকটিকে গীতার ৭০০ শ্লোকের সঙ্গে যুক্ত করেননি। কিন্তু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রী হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁর সম্পাদিত ‘মহাভারত’ গ্রন্থের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম শ্লোক হিসাবে ক্রমিক সংখ্যা সহ এই শ্লোকটিকে উপস্থাপিত করেছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে যে জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা শুরু করেছিলেন তার পরিসমাপ্তি প্রকৃত পক্ষে সেই অধ্যায়েই ঘটেনি। বাস্তবিক পক্ষে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি ও পুরুষ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সমস্ত তত্ত্বের সম্যক জ্ঞান ব্যতিরেকে পরমেশ্বর পরমপুরুষ ভগবানের পূর্ণ স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। আমরা দেখেছি যে ভগবান্ দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জুনকে বলেছিলেন যে মনুষ্য সকল কর্মের প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হলে

তবেই মোক্ষ প্রাপ্ত করতে সক্ষম হবে। তিনি অর্জুনকে আরও বলেছিলেন যে ভগবদ্ভক্তির সাহায্যেও মোক্ষলাভ হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অর্জুনের অন্তরে এক সংশয় উৎপন্ন হয়েছিল যে জ্ঞানলাভ ব্যতিরেকেই কি মোক্ষলাভ হতে পারে? কারণ এত দীর্ঘ সময়ব্যাপী ভগবানশ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত উপদেশসমূহ শ্রবণ করার ফলস্বরূপ অর্জুনের অন্তরে কিঞ্চিত হলেও পারমার্থিক জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত হয়েছিল। পরন্তু আমারা পূর্বেই দেখেছি যে ভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কোথাও কখনও স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে অর্জুনকে কোন উপদেশ দান করেননি। ভগবান্ অর্জুনকে কেবলমাত্র সেই সেই বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করেছেন যে যে বিষয়ে জানার জন্য শিষ্য অর্জুন তাঁর নিকট আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এখন, অর্জুন এখনও পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে যে যে বিষয় জানতে চেয়েছিলেন সেই সমস্ত বিষয়ের উত্তর তিনি অর্জুনকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত যথাযথভাবে দিয়েছেন। তথাপি অর্জুনের হৃদয় পারমার্থিক জ্ঞানের আলোকে পরিপূর্ণরূপে আলোকিত হয়ে উঠতে পারেনি। সুতরাং অর্জুন নিজের হৃদয়ের গহনে উৎপন্ন প্রশ্ন ভগবানের সম্মুখে প্রকটিত না করলে ভগবানত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত অর্জুনকে যে অমূল্য উপদেশ সমূহ প্রদান করেছিলেন তার প্রবাহ নিশ্চিতভাবেই ব্যাহত হতো। সেইজন্য আমি এই গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকটিকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে সন্নিবেশিত করাই সমীচীন মনে করছি। এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয় বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয় অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমস্ত সংস্করণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে এই শ্লোকটিকে সংযোজিত করা আবশ্যক — "In every edition of the Gita– the following stanza (অর্থাৎ 'প্রকৃতিং প্রকৃতিং পুরুষং চৈব' ইত্যাদি) is to be found in the beginning of Chapter XIII". এইজন্য আমিও এই শ্লোকটিকে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শুরুতেই উপস্থাপিত করেছি। তবে এই শ্লোকটির কোন ক্রমিক সংখ্যা প্রদান করিনি কারণ যে বহুল প্রচারিত দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মোট শ্লোক সংখ্যা সাতশতটি বলে মনে করা হয় সেই ধারণাকে আমি প্রভাবিত করতে চাইনি

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় # ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ # ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ।।১।।

অভিধীয়তে = বলা হয়; বেত্তি = জানেন; তং = তাকে; প্রাহুঃ = বলেন; তদ্‌বিদঃ = ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ববিৎগণ।। ১।।

অনুবাদ :- হে কৌন্তেয়! এই দেহকেই ক্ষেত্র বলা হয় এবং যিনি দেহকে এই রূপে জানেন তাঁকে তত্ত্ববিৎগণ ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত ক'রে থাকেন।।১।।

ব্যাখ্যা :- এখানে 'ক্ষেত্র' শব্দের অর্থ হল দেহ এবং 'ক্ষেত্রজ্ঞ' হলেন সেই তিনি যিনি এই দেহে বাস করেন অর্থাৎ জীবাত্মা। যেমন যিনি উত্তমরূপে সংগীত শাস্ত্র জানেন তাঁকে সঙ্গীতজ্ঞ বলা হয় তেমনই যিনি দেহরূপ ক্ষেত্রকে উত্তমরূপে জানেন তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। আত্মা দেহকে হস্ত-পদাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে এবং দেহকে সামগ্রিকভাবে উত্তমরূপে জানেন তাই তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। দেহকে যে ক্ষেত্র বলা হয় তার সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়েছেন সাধক রামপ্রসাদ তাঁর গানে — 'মনরে কৃষিকাজ জান না/এমন মানব জমিন রইল পতিত' ইত্যাদি। বস্তুত আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোন ভেদ নাই। এখানে ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞ বলতে স্বয়ং নিজেকেই বুঝিয়েছেন। ব্রহ্মা থেকে স্তম্ভ পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরে যে চেতন আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থান করেন তাঁদের সকলে ভগবানেরই অংশ। সেইজন্য তাঁরা তাঁর থেকে ভিন্ন নন। পরমাত্মা ভগবানই জীবাত্মারূপে বিভিন্ন প্রকারে বোধগম্য হন।। ১।।

ক্ষেত্রজ্ঞং চ অপি মাং বিদ্ধি # সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ জ্ঞানং # যৎ তৎ জ্ঞানং মতং মম।। ২।।

অনুবাদ :- হে ভারত! ব্রহ্মাণ্ডে যত ক্ষেত্র অর্থাৎ ব্রহ্মা থেকে স্তম্ভ পর্যন্ত যত শরীর আছে তাদের সকলেরই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ ঈশ্বর হিসাবে আমাকেই জেনে রাখবে। আমার অভিমত হল যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান সেই জ্ঞানই হল উত্তম জ্ঞান।।২।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের অভিপ্রায় হল যে আত্মা ও পরমাত্মা এক এবং অভিন্ন। তাঁদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। প্রকৃতির সংসর্গের কারণে তাদের মধ্যে ভেদ প্রতীত হয়। তিনি অর্জুনকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, সমস্ত ক্ষেত্র শরীরে যে চেতন আত্মা বিরাজ করেন তা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অংশ। ফলে বিভিন্ন দেহে বিদ্যমান চেতন ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। এক পরমাত্মা তিনিই জীবাত্মারূপে বিভিন্ন ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরে বিভিন্ন প্রকারে দৃশ্যমান হন।

এই শ্লোকে ভগবান্ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হিসাবে বর্ণনা করেছেন কারণ ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীর হল জড়, অনিত্য, নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তন, উৎপত্তি ও বিনাশশীল। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মা অবিনশ্বর, নিত্য, চেতন, শুদ্ধ,

নির্বিকার, চির অপরিবর্তনশীল। সুতরাং ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীর এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মা অভিন্ন নয়। কিন্তু অবিদ্যার কারণে মানুষ শরীর ও আত্মাকে এক ও অভিন্ন ব'লে ভাবে এবং শরীরের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং আত্মাকে জানার কোন প্রয়াস করে না। সেইজন্য মানুষের ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীর ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ সম্যক জানা প্রয়োজন। এই জ্ঞান সম্যকরূপে অর্জিত হলে মানুষের অন্তর হতে অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয়ে চিত্ত সত্যের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠবে এবং তখন আর মানুষ এই নশ্বর দেহটির কথা ভেবে কাতর হবে না। সেইজন্য ভগবান্ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানকে উত্তম জ্ঞান হিসাবে অভিহিত করেছেন। এখানে ভগবানের অভিপ্রায় হল অর্জুনের অন্তরে এই সত্যের আলোকের উন্মেষ ঘটানো যাতে অর্জুন সৃষ্টির প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি ক'রে সম্মুখে দণ্ডায়মান স্বজনদের নশ্বর শরীর নাশের চিন্তায় কাতর হয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগের কথা না ভাবেন।। ২।।

তৎ ক্ষেত্রং যৎ চ যাদৃক্ চ # যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ # তৎ সমাসেন মে শৃণু।।৩।।

যাদৃক = যেরূপ; যদ্বিকারি = যেরূপ বিকারযুক্ত; যৎপ্রভাবশ্চ = যেরূপ প্রভাববিশিষ্ট; সমাসেন = সংক্ষেপে; মে = আমার নিকট থেকে; শৃণু = শোন।।৩।।

অনুবাদ :- সেই ক্ষেত্র কি, তা কি প্রকার, তার বিকার কিরূপ, সে কোথায় থেকে উৎপন্ন হয় এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ কি রকম প্রভাব সম্পন্ন সে বিষয়ে আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলছি, তুমি শোন।।৩।।

ঋষিভিঃ বহুধা গীতং # ছন্দোভিঃ বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ চৈব # হেতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ।।৪।।

বহুধা = বহুপ্রকারে; ছন্দোভিঃ = বেদাদি গ্রন্থে; হেতুমদ্ভিঃ = যুক্তিপূর্ণভাবে; বিনিশ্চিতৈঃ = সংশয়শূন্যভাবে।।৪।।

অনুবাদ :- ঋষিগণ বহুভাবে সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। বিভিন্ন বেদাদি গ্রন্থেও সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ব্রহ্মসূত্রপদেও এই 'ক্ষেত্র' এবং 'ক্ষেত্রজ্ঞ' তত্ত্বের সংশয়শূন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।।৪।।

ব্যাখ্যা :- ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা ক'রে ঋষি পরাশর বিষ্ণুপুরাণে বলেছেন —

অহং ত্বঞ্চ তথান্যে চ ভূতৈরুহ্যাম পার্থিব।
গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোহপি যাত্যয়ম্।

কর্মবশ্যা গুণাশ্চৈতে সত্ত্বাদ্যাঃ পৃথিবীপতে।
অবিদ্যাসঞ্চিতং কর্ম তচ্চাশেষেষু জন্তুষু।।
আত্মা শুদ্ধঃ অক্ষরঃ শান্তো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ
প্রবৃদ্ধ্যপচয়ৌ ন অস্য একস্যাখিলজন্তুষু।।
—(বিষ্ণুপুরাণ ২।১৩। ৬৪-৬৬)

অর্থাৎ, হে রাজন্ তুমি, আমি ও অন্য সকল জীবকেই পঞ্চভূতগণ বহন করছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের প্রবাহে পতিত হয়ে কালসাগরে ভেসে যাচ্ছে। এই সত্ত্বাদি গুণত্রয়ও কর্মের অধীন। সেই কর্ম অবিদ্যা সঞ্চিত এবং সকল জীবেই বিদ্যমান। আত্মা এক, বিশুদ্ধ, অক্ষয়, শান্তিময়, গুণহীন এবং প্রকৃতির উপরে। তিনি জগতের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বাস করেন, তাঁর বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই।

বিষ্ণুপুরাণে আরও বলা হয়েছে যে এই যে হাত, পা, মুণ্ডসহ আমাদের এই শরীর যাকে ক্ষেত্র বলা হয় তার থেকে জীবাত্মা অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ ভিন্ন — "পিণ্ড পৃথগ্ যতঃ পুংসঃ পাদপাণ্যাদিলক্ষণঃ" (২।১৩।৮৪) সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ঋষিগণ দেহ অর্থাৎ ক্ষেত্র এবং জীবাত্মা অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। বিভিন্ন বেদ, উপনিষদেও দেহ এবং জীবাত্মার স্বরূপ ভিন্ন ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২।৪ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে এই মনোময় শরীরের অভ্যন্তরে যে জীবাত্মা বাস করেন তিনি বিজ্ঞানময় এবং তিনি শরীর অর্থাৎ ক্ষেত্র থেকে ভিন্ন— "তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ।" ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে দেহ ও আত্মা বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা করা হয়েছে যথা--- "ন বিয়দশ্রুতেঃ" (২।৩।১), "নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ (২।৩।১৭), "জ্ঞোঽত এব" (২।৩।১৯), "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ (২।৩।৪১) প্রভৃতি ।।৪।।

মহাভূতানি অহঙ্কারো # বুদ্ধিঃ অব্যক্তম্ এব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশ একং চ # পঞ্চ চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ।। ৫।।
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং # সংঘাতঃ চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন # সবিকারম্ উদাহৃতম্।। ৬।।

মহাভূতানি = পঞ্চমহাভূত; সংঘাত = সমষ্টি; সমাসেন = সংক্ষেপে।

অনুবাদ :- মহাভূত সকল, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত প্রকৃতি, এগারটি ইন্দ্রিয়,

পঞ্চ তন্মাত্র, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত অর্থাৎ পঞ্চমহাভুতের সমষ্টিস্বরূপ দেহ, চেতনা, ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য এই সমস্তকে সংক্ষেপে ক্ষেত্র বলা হয়।।৫-৬।।

ব্যাখ্যা :- পাঁচটি মহাভূত হল — ক্ষিতি, অপ তেজ, বায়ু ও আকাশ। এগারোটি ইন্দ্রিয় হল বাক, হাত, পা, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন একটি ইন্দ্রিয় মোট এগারোটি ইন্দ্রিয়। রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ ও শব্দ এই পাঁচটি হল পঞ্চ তন্মাত্র। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞান ও ধৈর্য এইগুলি হল দেহরূপ ক্ষেত্রের বিকার, আত্মার ধর্ম।। ৫-৬।।

অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বম্ # অহিংসা ক্ষান্তিঃ আর্জবম্।
আচার্য-উপাসনং শৌচং # স্থৈর্যম্ আত্মবিনিগ্রহঃ।।৭।।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ # অনহঙ্কার এব চ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি # দুঃখ-দোষ-অনুদর্শনম্।।৮।।
অসক্তিঃ অনভিষ্বঙ্গঃ # পুত্র-দার-গৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বম্ # ইষ্ট-অনিষ্ট-উপপত্তিষু।।৯।।
ময়ি চ অনন্যযোগেন # ভক্তিঃ অব্যভিচারিণী।
বিবিক্ত-দেশ-সেবিত্বম্ # অরতিঃ জনসংসদি।।১০।।
অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্বং # তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ-দর্শনম্।
এতৎ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্ # অজ্ঞানং যৎ অতঃ অন্যথা।।১১।।

অমানিত্বম্ = নিজের মানের বড়াই না করা; অদম্ভিত্বম্ = নিজের ধন, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির দম্ভ না করা; ক্ষান্তিঃ = ক্ষমা; আর্জবম্ = মন, বাণী ও শরীরের সরলতা; আচার্য-উপাসনং = সদগুরু সেবা; শৌচং = অন্তর ও বাহিরের শুদ্ধি; স্থৈর্যম্ = চিত্তের স্থিরতা; আত্মবিনিগ্রহঃ = দেহের ইন্দ্রিয়ের সংযম; ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ = ইহলোক ও পরলোকের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সমূহে বৈরাগ্য; অনহঙ্কার = মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরের যাবতীয় অহং বোধ পরিত্যাগ; জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি দুঃখ-দোষ-অনুদর্শনম্ = জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি দুঃখরূপ দোষকে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা; অসক্তিঃ = নিরাসক্তি; অনভিষ্বঙ্গঃ = দারা, পুত্র, পরিবার, ধন-সম্পদ প্রভৃতি কোন বিষয়ে লিপ্ত না হওয়া; নিত্যং চ সমাচিত্তত্বম্ = সর্বদা সমচিত্তবিশিষ্ট; ইষ্ট-অনিষ্ট-উপপত্তিষু = কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভে; ময়ি = আমাতে; অনন্যযোগেন ভক্তিঃ = অনন্যভক্তি; অব্যভিচারিণী = পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেউ নাই এই রকম একনিষ্ঠভাবে ভগবানে চিত্ত সমর্পণ; বিবিক্ত = নির্জন; দেশ

= স্থান; সেবিত্বম্ = প্রিয়তা; অরতিঃ = অরুচি; জনসংসদি = বহু লোকের সমাগম স্থলে; অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্বং = অধ্যাত্মজ্ঞানলাভের জন্য সদা নিষ্ঠা; তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ-দর্শনম্ = তত্ত্ব-জ্ঞানের অনুসন্ধান; এতৎ জ্ঞানম্ = এইগুলি হল জ্ঞান; প্রোক্তম্ = বলা হয়; অজ্ঞানং যৎ অতঃ অন্যথা = অন্য সবকে অজ্ঞান বলা হয়।। ৭-১১।।

অনুবাদ :- নিজের মানের বড়াই না করা, নিজের ধন, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির দম্ভ না করা, অহিংসা, ক্ষমা, মন, বাণী ও শরীরের সরলতা, সদগুরু সেবা, অন্তর ও বাহিরের শুদ্ধি, চিত্তের স্থিরতা, দেহের ইন্দ্রিয়ের সংযম (৭), ইহলোক ও পরলোকের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সমূহে বৈরাগ্য, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরের যাবতীয় অহং বোধ পরিত্যাগ, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি দুঃখরূপ দোষকে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা (৮), অনাসক্তি, দারা, পুত্র, পরিবার, ধন-সম্পদ প্রভৃতি কোন বিষয়ে লিপ্ত না হওয়া, কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভে সর্বদা চিত্তের সমতা বজায় রাখা (৯), আমাতে অনন্যভক্তি ও পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেউ নাই এই রকম একনিষ্ঠভাবে আমাতে চিত্ত সমর্পণ, নির্জন স্থানে অবস্থান-প্রিয়তা, বহু লোকের সমাগম স্থলের প্রতি অরুচি (১০), অধ্যাত্মজ্ঞান লাভের জন্য সদা নিষ্ঠা, তত্ত্ব-জ্ঞানের অনুসন্ধান এইগুলি হল জ্ঞান। এর বিপরীত যা কিছু আছে সেগুলির সবই হল অজ্ঞান।। ৭-১১।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে বলেছেন যে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি দুঃখরূপ দোষকে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা হল জ্ঞানের পরিচয়। ভগবানের এই বক্তব্যের মর্মার্থ অনুধাবন করা প্রয়োজন। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি হল পাপের পরিণাম। যে মানুষ সৎ কর্মে নিযুক্ত থেকে পুণ্য অর্জন করেন তিনি পরমেশ্বরের ধামে গমন করেন, তাঁকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। জন্ম হল রোগ-ব্যাধির আগার। যতবার জন্ম হবে ততবারই তাকে জীবনে বিভিন্নভাবে নিদারুণ, দুঃখ, যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। সেইজন্য জ্ঞানী মানুষ সর্বদা জীবনকে আনন্দের স্থান নয়, রোগ-ব্যাধিরূপ দোষের আধার ব'লে মনে করেন।। ৭-১১।।

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি # যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম # ন সৎ তৎ ন অসৎ উচ্যতে।।১২।।

জ্ঞেয়ং = জ্ঞাতব্য বিষয়; প্রবক্ষ্যামি = বলব; যৎ = যা; জ্ঞাত্বা = জেনে; অমৃতম্ = মোক্ষ; অশ্নুতে = লাভ হয়; মৎপরং = আমার আশ্রিত; উচ্যতে = বলা হয়।।১২।।

অনুবাদ :- এখন আমি তোমাকে যে বিষয়টি বলব সেটি জানা উচিত। এই বিষয়টি জানতে পারলে মোক্ষলাভ হবে। সেই বস্তুর কোন শুরু নাই, শেষ নাই অর্থাৎ তার উৎপত্তি বা জন্মও নাই আবার সমাপ্তি বা মৃত্যুও নাই, সেই বস্তু হল আমার আশ্রিত ব্রহ্মতত্ত্ব যা সৎও নয় আবার অসৎও নয়, সেটি সৎ এবং অসতের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ কার্য ও কারণের অতীত।।১২।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে ব্রহ্ম হলেন অনাদি এবং সৎ ও অসতের ঊর্ধ্বে। ভগবান্ এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন যে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বেদাদি গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রজ্ঞই হলেন সেই ব্রহ্ম। আমরা দেখতে পাই কঠোপনিষদের ১।২।১৮ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে তিনি 'বিপশ্চিৎ' অর্থাৎ অবিলুপ্ত চৈতন্য, সর্বজ্ঞ। তাঁর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই — "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ ন অয়ং" ইতি। এই কারণেই যেহেতু তাঁর আদি অর্থাৎ উৎপত্তি নাই সেইজন্য তিনি অনাদি — "আদির্যস্য ন বিদ্যতে তদ্ অনাদি" (রামানুজাচার্য, গীতাভাষ্য ১৩।১২)।

ভগবান্ বলেছেন যে ব্রহ্ম সৎ বা অসৎ কোনটিই নন। শাস্ত্রে সৎ ও অসৎ শব্দের বিবিধ ব্যাখ্যা আছে। তবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, যে বস্তুর সৃষ্টি হয় এবং যার বিনাশ হয় তাদেরকে বলা হয় অসৎ অর্থাৎ অস্তিত্ব আছে এবং বিনাশশীল এবং যার সৃষ্টি নাই, ক্ষয় নাই, লয় নাই, চির অবিনশ্বর অবিনাশী সেই পরব্রহ্মকে সৎ বলা হয়। প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন যে 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দ দুটিকে গীতায় যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে উপনিষদে শব্দ দুটিকে তার বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের সামনে দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চের যা কিছু আমরা দেখতে পাই সেগুলির সবই অসৎ বস্তু। কিন্তু যে বস্তু সৃষ্টির পূর্বেও ছিল এবং প্রলয়ের পরেও লোপ পাবে না তাকে সৎ বা অসৎ কোনটিই বলা যাবে না — "ন সৎ তৎ ন অসৎ উচ্যতে" (শ্রুতি)।

শঙ্করাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যে যুক্তিসহকারে বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে আমরা কোন বস্তুকে জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও সম্বন্ধ চারটি বিষয়ের মাধ্যমে বুঝতে পারি। যেমন গরুকে জানা যায় তার গরু জাতি, সাদা-কালো রঙ প্রভৃতি গুণ, ঘাস খাওয়া, দুধ দেওয়া প্রভৃতি কার্য, গোয়ালা প্রভৃতি সম্বন্ধের মাধ্যমে। এছাড়া অন্য কোন বিষয়ের মাধ্যমে গরু, ঘোড়া প্রভৃতিকে জানা যায় না। কিন্তু ব্রহ্মকে এইভাবে জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও সম্বন্ধ চারটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। সেইজন্য তাঁকে সৎ বা অসৎ কোনটিই বলা যায় না।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৬।১৯ মন্ত্রে ব্রহ্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে — "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" ইতি। অর্থাৎ ব্রহ্ম অবয়ববিহীন, ক্রিয়াহীন, নির্বিকার। এই নিরিখে যেমন বলা যায় গোজাতি, হস্তিজাতি, সর্পজাতি প্রভৃতি, সেরকমভাবে কিন্তু ব্রহ্মকে জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও সম্বন্ধ এই চারটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। সেইজন্য তাঁকে সৎ ইত্যাদি বলা যায় না। আবার ব্রহ্মকে সাদা, কালো ইত্যাদি কোন গুণদ্বারাও বর্ণনা করা যায় না কারণ শাস্ত্রে ব্রহ্মকে অবয়ব বিহীন বলা হয়েছে। তাঁকে কোন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা যায় না কারণ শাস্ত্রে তাঁকে ক্রিয়াহীন বলা হয়েছে। আবার তিনি কারোরই সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নন কারণ শাস্ত্রে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়--- "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।২।১)। যিনি একা এবং যাঁর স্বজাতীয় কোন ভেদ নেই তাঁকে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলা যায় না। শঙ্করাচার্য বলেছেন যে তিনি এক, অদ্বিতীয়, ইন্দ্রিয়াতীত এবং আত্মরূপ, সেইজন্য ব্রহ্ম কারোরই সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নন, তাঁকে শব্দের দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না — "ন চ সম্বন্ধি একত্বাদ্ অদ্বয়ত্বাদ্ অবিষয়ত্বাদ্ আত্মত্বাদ্ চ ন কেনচিৎ শব্দেন উচ্যতে" (গীতা শঙ্করভাষ্য)।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের ২।৭ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে তিনি সৃষ্টির পূর্বে অসৎ অর্থাৎ অব্যক্তই ছিলেন এবং সৃষ্টির পরে তিনি ব্যক্ত অর্থাৎ সৎ হন — "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত"। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তাঁকে অসৎ বা সৎ কোন নামেই অভিহিত করা যাবে না। সৃষ্টির পূর্বের অবস্থাকে কারণ অবস্থা এবং সৃষ্টির পরের অবস্থাকে কার্য অবস্থা বলা হয়। যেমন বাষ্প। এই বাষ্প যখন জল হয়ে ঝরে পড়ার আগে বাষ্পই থাকে তখন সে জলের কারণ। কিন্তু যখন জলরূপে পতিত হয় তখন জল হয় বাষ্পের কার্য। ফলে তৈত্তিরীয়োপনিষদের বক্তব্য অনুযায়ী ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্বে অর্থাৎ কারণ অবস্থা এবং সৃষ্টির পরের অবস্থা অর্থাৎ কার্য অবস্থা এই উভয় অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। কিন্তু রামানুচার্যের অভিমত অনুযায়ী এই সম্বদ্ধ স্থাপিত হয়েছিল কর্মরূপ অবিদ্যার কারণে, বাস্তবিকভাবে এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়নি এবং এই কারণে আত্মাকে সৎ ও অসৎ এই দুই শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না —"কার্যকারণাবস্থাদ্বয়ান্বয়ঃ তু আত্মনঃ কর্মরূপা অবিদ্যাবেষ্টনকৃতঃ ন স্বরূপতঃ ইতি সদসৎ শব্দাভ্যাম্ আত্মস্বরূপং ন উচ্যতে" (গীতাভাষ্য রামানুজ)। তাছাড়া তিনি সৃষ্টির পূর্বে কারণ অবস্থায় অসৎ রূপে বিদ্যমান ছিলেন এই মর্মে শাস্ত্রে বর্ণনা থাকলেও সেখানে এই কারণ অবস্থায় তাঁর শরীরকে নাম-রূপ বিহীন সূক্ষ্ম চেতন ও অচেতন পদার্থের সমষ্টিরূপে

বর্ণনা করা হয়েছে। সেইজন্য কারণ অবস্থায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়কেই অসৎ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু ক্ষেত্রজ্ঞের এই অবস্থা কর্মজনিত ছিল সেইজন্য তাঁর শুদ্ধরূপ সৎ বা অসৎ কোন শব্দের দ্বারা নির্দেশযোগ্য নয়।

এই সমস্ত বিচারে ব্রহ্মকে সৎ বা অসৎ কোনটিই বলা যায় না।। ১২।।

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ # সর্বতঃ অক্ষি-শিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমৎ লোকে # সর্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি।।১৩।।

সর্বতঃ = সর্বত্র; পাণিপাদং = হাত-পা; তৎ = সেই ব্রহ্ম; অক্ষি-শিরোমুখম্ = চোখ, মাথা ও মুখ; শ্রুতিমৎ = কানযুক্ত; লোকে = জগতে; সর্বম্ = সব কিছু; আবৃত্য = পরিব্যাপ্ত ক'রে; তিষ্ঠতি = আছেন।।১৩।।

অনুবাদ :- সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম সর্বত্র হাত,পা, চোখ, মাথা, মুখ ও কানযুক্ত। তিনি জগতের সব কিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন।।১৩।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে বলেছেন যে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্বত্র হাত-পা, চোখ, মাথা, মুখ ও কান। আবার শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৩।১৯ মন্ত্রে বলা হয়েছে তিনি 'অপাণিপাদো' অর্থাৎ তাঁর হাত-পা নেই। সেক্ষেত্রে এই দুটি বক্তব্য পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে। কিন্তু শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের এই মন্ত্রেই এই সন্দেহ নিরসন ক'রে বলা হয়েছে যে তাঁর হাত না থাকলেও তিনি সবকিছু গ্রহণ করেন, পা না থাকলেও তিনি সর্বত্রগামী, চোখ না থাকলেও তিনি সর্বদ্রষ্টা, কান না থাকলেও তিনি সমস্ত কিছু শুনতে পান—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা।
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোতি অকর্ণঃ।।

সুতরাং এই শ্লোকে ভগবানের বক্তব্যের মর্মার্থ হল যে এই নিখিল বিশ্বের যে কোন স্থানেই কোন ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে কোনকিছু অর্পণ করলে তিনি সেখানেই সেই অর্পিত বস্তু গ্রহণ ক'রে ভক্তকে প্রীত করেন। তাঁর হাত সর্বত্র। তাঁর পা সর্বত্র এই কথার অর্থ হল যে ভক্ত যেখানেই তাঁর শ্রীচরণে প্রণতি জানাক না কেন তিনি সেখানেই তাঁর প্রণাম গ্রহণ করেন, ভক্তকে তাঁর পা কোথায় আছে তা খুঁজে বেড়ানোর প্রয়োজন হয় না। তাঁর চোখ সর্বদিকে এই কথার অর্থ হল যে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন স্থান নাই যা তিনি দেখতে পান না। সুতরাং এই সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন স্থানেই যা কিছুই ঘটুক, যেখানেই যে যাই করুক,

সবই তিনি তৎক্ষণাৎ দেখতে পান, তাঁর অগোচরে কোথাও কোন কিছু ঘটা সম্ভব নয়। ফলে কেউ তাঁকে গোপন ক'রে কিছু করব মনে করলে সেটি হবে তার ব্যর্থ প্রয়াস। ভগবানের মস্তক সর্বত্র এই বক্তব্যের মর্মার্থ হল যে ভক্ত ভক্তিভরে তাঁকে অর্চনা করার জন্য যেখানেই তাঁর মস্তক উদ্দেশ্য ক'রে পুষ্প আদি অর্ঘ্য অর্পণ করতে চাইবে ভগবান্ সেখানেই তাঁর মস্তক পেতে ভক্তের সেই শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করেন। তাঁর মুখ সর্বত্র এই কথার অর্থ হল যে ভক্ত ভক্তিভরে ব্রহ্মাণ্ডের যে স্থানেই তাঁকে কোন খাদ্যদ্রব্য অর্পণ করতে চাইবে, ভগবান্ তৎক্ষণাৎ সেখানেই উপস্থিত হয়ে সেই ভোগ গ্রহণ ক'রে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। তাঁর কান সর্বত্র। তাঁর কোন ভক্ত এই মহাবিশ্বের যে কোন স্থানে বসেই তাঁর স্তব-স্তুতি, প্রার্থনা করুক না কেন তিনি তা উপযুক্তরূপে শুনতে পান। তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সেইজন্য তিনি ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। অর্থাৎ সেই জ্ঞেয় বস্তু ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, সর্বদ্রষ্টা, সর্বসাক্ষী, সর্বত্রগামী।

গোস্বামী তুলসীদাস অতি অপূর্ব ভাষা, সুর, তাল, লয় ও ছন্দে তাঁর "রামচরিতমানস" মহাকাব্যে ভগবানের এই স্বরূপটি অতি অপরূপ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন —

বিনুপদ চলই সুনই বিনু কানা। কর বিনু করম করই বিধি নানা।।
আননরহিত সকল-রস ভোগী। বিনু বানী বকতা বড় জোগী।।
তনু বিনু পরস নয়ন বিনু দেখা। গ্রহই ঘ্রান বিনু বাস অসেখা।।
অসি সব ভাঁতি অলৌকিক করনী। মহিমা জাসু জাই নহিঁ বরণী।।

অর্থাৎ তাঁর পা নাই তবুও তিনি সর্বত্র গমন করেন, তাঁর কান নাই তবুও তিনি সব কিছুই শ্রবণ করেন, তাঁর হাত নাই তবুও তিনি কাজ করেন, তাঁর মুখ নাই তবুও তিনি বড় বক্তা, তাঁর শরীর নাই তবুও তিনি সবকিছুর স্পর্শ অনুভব করেন, তাঁর চোখ নাই তবুও তিনি সমস্তকিছুই দেখেন, তাঁর নাক নাই তথাপি তিনি ঘ্রাণ গ্রহণ করেন। তাঁর কার্য বড়ই অলৌকিক। তাঁর মহিমা বর্ণনাতীত।।১৩।।

সর্ব-ইন্দ্রিয়-গুণ-আভাসং # সর্ব-ইন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃৎ চৈব # নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।।১৪।।

আভাসং = প্রকাশকারী; বিবর্জিতম্ = রহিত; অসক্তং = আসক্তিশূন্য; সর্বভৃৎ = সকলের পালনকারী; নির্গুণং = সত্ত্ব, রজঃ তমঃ গুণ রহিত; গুণভোক্তৃ = সকল গুণের ঈশ্বর।।১৪।।

অনুবাদ :- তিনি ইন্দ্রিয়-বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে জানেন কিন্তু তিনি নিজে কোন ইন্দ্রিয়ের বশীভূত নন। তাঁর কোন বিষয়ে আসক্তি নাই, তিনি সকলকে পালন করেন, তিনি সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন প্রাকৃত গুণ রহিত কিন্তু অপ্রাকৃত 'ভগ' শব্দবাচ্য ষড়ৈশ্বর্য গুণের ভোগকর্তা ঈশ্বর।।১৪।।

ব্যাখ্যা:- এই শ্লোকে ভগবান তাঁর স্বরূপের এক চমৎকারী ও বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের দিক উল্লেখ করেছেন। পূর্বে আমরা গীতায় জেনেছি যে ইন্দ্রিয় সমন্বিত সমগ্র জীবকুলের মধ্যে বিরাজমান হলেও তিনি সর্বদা অসঙ্গ অর্থাৎ কোন বিষয়ের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি নাই। কিন্তু এর অর্থ এমন নয় যে তিনি ইন্দ্রিয় সমূহের গুণ সম্পর্কে অবহিত নন। গীতায় বলা হয়েছে যে তিনি সর্বজ্ঞ। এই সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর গতিপ্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর জানা আছে। কাজেই ইন্দ্রিয়বিষয়ে তিনি অজ্ঞ থাকবেন সেটি হতে পারে না। কিন্তু তাঁর স্বরূপের চমৎকারী বৈশিষ্ট্য হল এই যে ইন্দ্রিয়সমূহ যেমন তাদের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা প্রাকৃত জীবকে মোহিত ক'রে অবশ ক'রে দেয়, তারা কিন্তু তার দ্বারা পরমাত্মাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারে না। তিনি ইন্দ্রিয়বিষয়ের সব জেনেও পরিপূর্ণরূপে তাদের প্রতি নিরাসক্ত থাকেন। আবার প্রাকৃত জীব তাদের সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা বা আত্মীয়-পরিজনদের প্রতি আসক্তি থাকার কারণেই তাদের লালন-পালন করে। পরমাত্মাও এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবকে পালন করেন। কিন্তু তাঁর অন্তরে তাদের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না। তিনি সম্পূর্ণ বিনা কারণেই জীবকুলের মঙ্গল করেন। তিনি এ ব্যাপারে সর্ব প্রকার আসক্তি দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এইটিই হল সর্বব্যাপী পরমাত্মার স্বরূপের অলৌকিক, চমৎকারী ও বিচিত্র বৈশিষ্ট্য।।১৪।।

বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্ # অচরম্ চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তৎ অবিজ্ঞেয়ং # দূরস্থং চ অন্তিকে চ তৎ।।১৫।।

বহিঃ = বাইরে; অন্তঃ = ভিতরে; ভূতনাম্ = জীবসমূহের; অচরম্ = স্থাবর, স্থায়ী, গমন ক্ষমতাহীন, অচেতন পদার্থ; চরম্ = জঙ্গম্, গমনশীল, অস্থায়ী, অন্তিকে = নিকটে।।১৫।।

অনুবাদ :- তিনি সর্বজীবের বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন। তিনিই এই চরাচর জগৎ। তিনি অতীব সূক্ষ্ম। সেইজন্য তাঁকে জানা যায় না। তিনি দূরেও আছেন, তিনি নিকটেও আছেন।।১৫।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে বলা হয়েছে জ্ঞেয়রূপ পরমাত্মা সর্বজীবের বাহিরেও আছেন, ভিতরেও আছেন। জলাশয়ের জলে যেমন বাইরের দিকেও জল থাকে তেমনি ভিতরের দিকেও জল থাকে। সোনার গহনায় যেমন বাইরের দিকেও সোনা থাকে তেমনই তার ভিতরের দিকেও সোনাই থাকে। অনুরূপভাবে পরমাত্মাও সর্বজীবের অন্তরে এবং বাহিরে উভয় স্থানেই বিরাজমান। বস্তুত এই চর অর্থাৎ চেতন ও অচর অর্থাৎ জড় পদার্থ সবই তিনি। বিষয়টি ব্যাখ্যা ক'রে বলা যায় যে, যেমন এক খণ্ড বরফের বাইরেও জল, ভিতরেও জল আবার বরফটিও স্বয়ংই জল, অন্য কোন পদার্থ নয়। ঠিক তেমনই এই বিশ্ব চরাচরের সমস্ত চেতন অচেতন পদার্থ সেই পরমাত্মারই স্বরূপ। বলা হয়েছে যে তিনি অতীব সূক্ষ্ম সেইজন্য তিনি বোধগম্যতার অতীত। বিষয়টি কি রকম? বিজ্ঞানের মতে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে জলকণার উপস্থিতি আছে কিন্তু তা এতই ক্ষুদ্র যে তাকে বোঝা যায় না। তেমনই চরাচরের সমস্ত চেতন-অচেতন পদার্থের মধ্যে তিনি এতই ক্ষুদ্ররূপে উপস্থিত আছেন যে তাঁকে বোঝা যায় না। যাদের হৃদয় অবিদ্যা, অজ্ঞানতায় ঢাকা, তারা তাঁর এই সূক্ষ্ম রূপ জানতে পারে না, কিন্তু যাঁদের অন্তরে জ্ঞানের আলোর প্রকাশ ঘটেছে তাঁরা তাঁর সূক্ষ্মরূপকে জানতে পারেন ঠিক যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি বিজ্ঞানের তত্ত্ব না জানার জন্য বায়ুমণ্ডলের মধ্যে জলকণার উপস্থিতি ধারণা করতে পারে না কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞানের আলোকে সমৃদ্ধ বিজ্ঞানী এই বিষয়টি জানতে পারেন। সেইজন্য শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে যাঁরা জ্ঞানী অর্থাৎ আত্মতত্ত্ববিৎ তাঁরা সর্বত্র পরমাত্মাকে দর্শন করেন —"আত্মা এব অধস্তাৎ আত্মা উপবিষ্টাৎ আত্মা পশ্চাৎ আত্মাপুরস্তাৎ আত্মা দক্ষিণত আত্মা উত্তরত"। অর্থাৎ আত্মা নিম্নে, ঊর্ধ্বে, পশ্চাতে, সম্মুখে, দক্ষিণে, উত্তরে সর্বত্রই বিদ্যমান। তাঁরা সর্বত্রই ব্রহ্মের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন---"আত্মৈবেদং সর্বম্" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭।২৫।২), — "ব্রহ্মেদং সর্বম্" (বৃহারণ্যকোপনিষৎ ২।৫।১)। সেইজন্য শঙ্করাচার্য বলেছেন যে সেই জ্ঞেয় বস্তু অজ্ঞাত হওয়ার কারণে এবং হাজার হাজার, কোটি কোটি বৎসরেও তাঁর তত্ত্ব জানতে না পারার কারণে যারা অজ্ঞানী তাদের থেকে তিনি বহুদূরে কিন্তু যাঁরা আত্মজ্ঞানী তাঁদের নিকট তো তিনি আত্মা। অতএব তিনি তাঁদের নিকটেই আছেন— "অবিজ্ঞাততয়া দূরস্থং বর্ষসহস্রকোট্যাপি অবিদুষাম্ অপ্রাপ্যত্বাদ্ অন্তিকে চ তদ্ আত্মত্বাদ্ বিদুষাম্"।।১৫।।

অবিভক্তং চ ভূতেষু # বিভক্তম্ ইব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তৎ জ্ঞেয়ং # গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।।১৬।।

ভূতভর্তৃ = সমস্ত জীবের পালনকর্তা; তৎ = সেই ব্রহ্ম; জ্ঞেয়ং = জেনে রাখ; গ্রসিষ্ণু = সংহারকর্তা; প্রভবিষ্ণু = সৃষ্টিকর্তা।।১৬।।

অনুবাদ :- সেই জ্ঞেয় বস্তু ব্রহ্ম অখণ্ড হলেও সর্বজীবে বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করেন, তিনিই সমস্ত জীবকে পালন করেন, তিনিই সমস্ত জীবকে সংহার করেন আবার তিনিই সমস্ত জীবকে সৃষ্টি করেন।।১৬।।

ব্যাখ্যা :- এখানে ভগবান্ বলেছেন যে তিনি অখণ্ড হলেও সর্বজীবে বিভক্তের ন্যায় দৃশ্যমান হন। এ কথার অর্থ হল যে তিনিই সমগ্র জীবকুলের সৃষ্টি করেন। সুতরাং তিনি সেই সকল জীবসমূহের সৃষ্টির কারণ। সুতরাং সমগ্র জীবের মধ্যে তিনি কারণরূপে এক এবং অভিন্ন। তারপর কারণরূপ তাঁর দ্বারা যখন বিভিন্ন জীবের সৃষ্টি হল সেটি হল কারণরূপী তাঁর কার্য যা চরাচরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেহে দেখা যায় যেমন দেব, মনুষ্য, জীব, জন্তু, পাখি, বৃক্ষ, লতা এক কথায় সমস্ত চর-অচর বস্তু। সুতরাং তিনি বলছেন যখন তিনি কারণরূপে থাকেন তখন তিনি এক ও অভিন্ন, কিন্তু যখন কার্যরূপে অবস্থান করেন তখন তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে মনে হয়। যেমন সমুদ্র থেকে উৎপন্ন ফেনরাশি সমুদ্র থেকে পৃথক মনে হয় কিন্তু বাস্তবে সমুদ্র থেকে সে ভিন্ন নয়। যাঁরা আত্মজ্ঞানী তাঁরা ব্রহ্মা থেকে স্তম্ভ সর্বত্র এক আত্মাকে দর্শন করেন কিন্তু যাঁদের চোখ অবিদ্যার অন্ধকারে পূর্ণ তাঁরা প্রতিটি বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন দেখেন।।১৬।।

জ্যোতিষাম্ অপি তৎ জ্যোতিঃ # তমসঃ পরম্ উচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং # হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্।১৭।।

জ্যোতিষাম্ = জ্যোতির্ময় বস্তুর; অপি = ও; তৎ = তিনি; তমসঃ = অজ্ঞানের; পরম্ = অতীত; উচ্যতে = বলা হয়; জ্ঞানগম্যং = যা জ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায়; হৃদি = হৃদয়ে; সর্বস্য = সকলের; বিষ্ঠিতম্ = অধিষ্ঠিত।।১৭।।

অনুবাদ :- তিনি জ্যোতির্ময় বস্তুসমূহের অর্থাৎ সূর্য প্রভৃতির জ্যোতিঃ, তিনি তম অর্থাৎ অবিদ্যারূপ অন্ধকারের অতীত, তিনিই জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য অর্থাৎ তাঁকে জ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায়, তিনি সকলের হৃদয়ে নিবাস করেন।।১৭।।

ব্যাখ্যা :- পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র বিশ্ব চরাচরের কর্তা। তাঁর অঙ্গুলি হেলনেই জগৎ চলে, চন্দ্র-সূর্য ওঠে, চন্দ্র-সূর্য অস্ত যায়। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি

যে জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত করে তা তারা ভগবানের নিকট থেকেই পেয়ে থাকে। এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় বিভিন্ন শ্রুতিতে যেমন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৬।১৪, মুণ্ডকোপনিষদের ২।২।১০, কঠোপনিষদের ২।২।১৫ প্রভৃতি মন্ত্রসমূহে যেখানে বলা হয়েছে যে সূর্য, চন্দ্র, তারকা, নক্ষত্র, অগ্নি কেউই পরব্রহ্মকে প্রকাশ করতে পারে না। তিনি প্রকাশমান আছেন বলেই তাঁরই জ্যোতিঃতে সকলে দীপ্যমান হয়—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্।
নেমা বিধুতো ভান্তি কুতঃ অয়ম্ অগ্নিঃ।।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং।
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।

সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের যত লোক অর্থাৎ ভুবন আছে, সেখানে যত আলো আছে তাদের সমস্তের একমাত্র উৎস হলেন পরব্রহ্ম। তিনি ব্যতীত অন্য কোন জ্যোতিঃ নাই, অন্য কোন আলো নাই।।১৭।।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং # জ্ঞেয়ং চ উক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্ বিজ্ঞায় # মদ্-ভাবায় উপপদ্যতে।।১৮।।

সমাসতঃ = সংক্ষেপে; মদ্ভক্তঃ = আমার; এতৎ = এই বিষয়; বিজ্ঞায় = জেনে; মদ্ ভাবায় = আমার স্বরূপ লাভে; উপপদ্যতে = যোগ্য হন।।১৮।।

অনুবাদ :- এইভাবে আমি ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সম্পর্কে সংক্ষেপে বললাম। আমার ভক্ত এই বিষয়গুলি ভালোভাবে জানার পর আমার স্বরূপ লাভ করার যোগ্য হয়ে ওঠেন।।১৮।।

প্রকৃতিং পুরুষং চ এব # বিদ্ধি অনাদী উভৌ অপি।
বিকারান্ চ গুণান্ চ এব # বিদ্ধি প্রকৃতি-সম্ভবান্।১৯।।

প্রকৃতিং পুরুষং চ = প্রকৃতি ও পুরুষ; এব = নিশ্চিতভাবে; বিদ্ধি = জানবে; উভৌ = উভয়কে; বিকারান্ = বিকার সমূহ; গুণান্ = গুণসমূহ; প্রকৃতি-সম্ভবান্ = প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন।।১৯।।

অনুবাদ :- প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি ব'লে জানবে। সুখ-দুঃখ, মোহ ইত্যাদি দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বিকার এবং গুণসমূহ প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন হয়।।১৯।।

ব্যাখ্যা :- এখানে ভগবান্ প্রকৃতি ও পুরুষ সম্পর্কে বলেছেন। আমরা স্থূল অর্থে প্রকৃতি বলতে বুঝি নারীদেহ এবং পুরুষ বলতে বুঝি পুরুষ দেহ। কিন্তু

শাস্ত্রে এই শব্দদুটিকে এই অর্থে ব্যবহার করা হয় না। সাংখ্যদর্শনে আত্মাকে পুরুষ বলা হয় এবং জড় জগতের যে মূল উপাদান তাকে প্রকৃতি বলা হয়। শঙ্করাচার্যের মতে বিকারসমূহের কারণরূপা ঈশ্বরের যে ত্রিগুণময়ী মায়াশক্তি তাকেই প্রকৃতি বলা হয় — "প্রকৃতিঃ ঈশ্বরস্য বিকারকারণশক্তিঃ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া"। এখন 'বিকার' ও 'গুণ' কাকে বলে সেটি জানা প্রয়োজন। শরীরের কাজ যথা সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতিকে 'বিকার' বলা হয় এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন বিষয়কে গুণ বলা হয়।। ১৯।।

কার্যকারণকর্তৃত্বে # হেতুঃ প্রকৃতিঃ উচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং # ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে।।২০।।

অনুবাদ :- প্রকৃতিকে কার্য ও কারণের হেতু বলা হয় অর্থাৎ প্রকৃতির দ্বারাই কার্য ও কারণ উৎপন্ন হয়। পুরুষ হল সুখ-দুঃখ ভোগের হেতু।।২০।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ব্যবহৃত "কার্যকারণকর্তৃত্বে" পদটির "কার্যকরণকর্তৃত্বে" এই ভিন্নপাঠও দেখা যায়। বেশীরভাগ ভাষ্যকার যেমন রামানুজাচার্য, শ্রীধরাচার্য, জগদীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ "কার্যকারণকর্তৃত্বে" পদটিই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য ব্যবহার করেছেন "কার্যকরণকর্তৃত্বে। যেহেতু বেশীরভাগ ভাষ্যকার এই শ্লোকে "কার্যকারণকর্তৃত্বে" পদটি ব্যবহার করেছেন সেইজন্য এই পদটির সঙ্গে পাঠক সমাজ সমধিক পরিচিত থাকার সুবাদে এই গ্রন্থেও "কার্যকারণকর্তৃত্বে" পদটিই ব্যবহার করা হল। এখন জানা প্রয়োজন এই শ্লোকে ব্যবহৃত 'কার্য', 'কারণ' ও 'করণ' শব্দগুলির অর্থ কি। এখন যদি 'কার্য' ও 'কারণ' পাঠকে গ্রহণ করা হয় তাহলে বাক, হাত, পা, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন এই মোট এগারোটি ইন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয় — এই ষোলটি বিষয় হল 'কার্য'। এগুলির সবের সমষ্টি হল দেহ বা শরীর। এগুলি অপরের কার্য, এরা স্বতন্ত্রভাবে কারোর কারণ নয়। আমরা চোখের মাধ্যমে একটি ফুলকে দেখি, নাকের মাধ্যমে তার গন্ধ পাই, ত্বকের মাধ্যমে তার স্পর্শ অনুভব করি। এগুলি সবই হল অপরের কাজ। চোখ, নাক, ত্বক এরা এদের কারণ নয়। এই কাজগুলির প্রকৃত কারণ হল ফুলটির বিদ্যমানতা। 'কার্য' শব্দের ব্যাখ্যা দিয়ে রামানুজাচার্য এবং শ্রীধরাচার্য বলেছেন — "কার্য শরীরম্ অর্থাৎ শরীরের নাম কার্য।

আবার, 'কার্য' ও 'কারণ' পাঠকে গ্রহণ করা হলে ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবী, অপ অর্থাৎ জল, তেজ অর্থাৎ অগ্নি, মরুৎ অর্থাৎ বায়ু ও ব্যোম অর্থাৎ আকাশ এই পাঁচটি সূক্ষ্ম মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিন অন্তঃকরণ — এইগুলি হবে কারণ। বুদ্ধি হল অহঙ্কারের কারণ। আবার অহঙ্কার হল মন, ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতের কারণ এবং সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত হল পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় যথা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের কারণ।

এখন, শঙ্করাচার্যাদি ভাষ্যকারদের অনুসরণ ক'রে পাঠটিকে 'কার্যকরণকর্তৃত্বে" হিসাবে গ্রহণ করা হলে 'কার্য' শব্দটি ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবী, অপ অর্থাৎ জল, তেজ অর্থাৎ অগ্নি, মরুৎ অর্থাৎ বায়ু ও ব্যোম অর্থাৎ আকাশ এই পাঁচটি সূক্ষ্ম মহাভূত এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় যথা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই দশটিকে নির্দেশ করবে। সেক্ষেত্রে করণ হবে বাক, হাত, পা, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটি অন্তঃকরণ। এই তেইশ প্রকার তত্ত্ব উৎপন্ন হয় প্রকৃতি থেকে। সেইজন্য প্রকৃতি হল এই তেইশটি তত্ত্ব সমন্বিত কার্য ও করণ উৎপন্ন করার হেতু অর্থাৎ কারণ।

এখানে আর একটি বিষয়েও বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। ভগবান্ এই শ্লোকে পুরুষ অর্থাৎ আত্মাকে সুখ-দুঃখের ভোগকারীরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আত্মা তো শুদ্ধ ও সর্ববিষয়ে নির্লিপ্ত বা উদাসীন এবং সর্বপ্রকার আসক্তিবিহীন, অসঙ্গ। তাহলে তাঁর সুখ-দুঃখের বোধ হবে কিভাবে? এখানে বলা যায় যে প্রকৃতি জড় পদার্থ। সুতরাং তার পক্ষে কোনকিছু ভোগ করা সম্ভব নয়। আবার পুরুষও অসঙ্গ। সুতরাং তারও ভোগ করার কোন বিষয় নাই। প্রকৃতপক্ষে জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগের ফলে পুরুষকে ভোক্তার ন্যায় মনে হয়। প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে চির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। সেই কারণে পুরুষকে সুখ-দুঃখ ভোগের হেতু বলা হয়েছে।।২০।।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি # ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গঃ অস্য # সৎ-অসৎ-যোনি-জন্মসু।।২১।।

অনুবাদ :- পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান ক'রে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন স্বত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ ভোগ করে এবং এই ভোগের ধরণ অনুযায়ী সে নিম্ন বা উচ্চ যোনি অর্থাৎ বংশে বা কুলে বা প্রজাতিতে জন্ম গ্রহণ করে।।২১।।

ব্যাখ্যা :- প্রাকৃত মানুষের নিকট 'যোনি' শব্দের অর্থ জরায়ু, গর্ভাশয় প্রভৃতি। কোন কোন ব্যাখ্যাকর্তা গীতায় বহু ব্যবহৃত 'যোনি' শব্দের ব্যাখ্যা উপর্যুক্ত জরায়ু, গর্ভাশয় প্রভৃতি অর্থেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। শাস্ত্রের গতিপথ কিছুটা ভিন্ন ধরণের। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 'যোনি' শব্দের অর্থ জরায়ু, গর্ভাশয় প্রভৃতি অর্থে কদাপি ব্যবহার করা হয়নি। 'যোনি' শব্দের আরও অনেক অর্থ আছে তাদের মধ্যে কয়েকটি হল — বংশ, কুল, পরিবার, প্রজাতি, শরীর বা দেহ প্রভৃতি। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় সর্বত্র 'যোনি' শব্দটিকে এই বংশ, কুল, পরিবার, প্রজাতি, শরীর বা দেহ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয় চুরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করার পর মানব জীবন লাভ করা যায়। এখানে যোনি শব্দটির অর্থ হল — চুরাশি লক্ষ প্রজাতির জীবের দেহ বা শরীর। জীব জন্ম গ্রহণ করার পর প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অসার হয়ে যে যে প্রকার কর্মে আসক্ত হয় সে সেই সেই কর্মের যা যা ফল নির্দিষ্ট থাকে সে সেই সেই ফল লাভ করে এবং সেই সেই কর্মফল অনুসারে সে নির্দিষ্ট প্রজাতির শরীর বা দেহ লাভ করে। যেমন কোন মানুষ যদি অতিরিক্ত পরিমাণে মাংস ভক্ষণে আসক্ত হয় তাহলে তাকে পরজন্মে কোন মুচির দোকানের কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে মৃত পশুর চামড়া থেকে নিষ্কাশিত গলিত মাংসে উদর পূর্তি ক'রে জীবন ধারণ করতে হবে। আবার কোন কুকুরও যদি কোন মন্দিরে আশ্রয় লাভ করে সেই মন্দিরের দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগের অবশিষ্ট খেয়ে জীবনধারণ করতে ভালোবাসে তাহলে সেও তার সেই সুকৃতির গুণে পরজন্মে উন্নত প্রজাতির গৃহে জন্মগ্রহণ করবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এ. সি. ভক্তিবেদান্তস্বামী প্রভুপাদ এই শ্লোকে ব্যবহৃত "যোনি" শব্দটির এক অপূর্ব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন — 'আবাসন'। তিনি বলেছেন "জীবের কামনা ও কর্ম অনুসারে জড়া প্রকৃতি তাকে বিভিন্ন আবাসনে প্রেরণ করে। এই সমস্ত আবাসনগুলি অর্জনের জন্য জীব নিজেই দায়ী এবং সেই অনুসারে সে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে থাকে। কোন জীবকে যদি শুকরের দেহে রাখা হয়, তখন সে শুকরের মত বিষ্ঠা খেতে আর সেভাবেই কাজ করতে বাধ্য হয়। তেমনই কোন জীবকে যদি দেবতা শরীরে রাখা হয়, তখন তাকে সেই দেহ অনুসারে আচরণ করতে হয়" (১৩।২০)। এক্ষেত্রে শুকর বা দেবতার দেহ হল সেই জীবাত্মার আবাসন। বস্তুত প্রভুপাদ কর্তৃক 'যোনি' শব্দের 'আবাসন' অর্থের ব্যবহার সত্যই অপূর্ব।।২১।।

উপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ # ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মা ইতি চ অপি উক্তো # দেহে অস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।।২২।।

উপদ্রষ্টা = সাক্ষী; অনুমন্তা = অনুমোদনকারী; ভর্তা = ধারণকারী; ভোক্তা = ভোগকর্তা ; অপি = ও; উক্তঃ = বলা হয়; দেহে অস্মিন্ = এই দেহে; পুরুষঃ পরঃ = পরমপুরুষ।।২২।।

অনুবাদ :- এই দেহে তো পরমপুরুষের বাস। তিনি আবার সাক্ষী, অনুমোদনকারী, ধারণকারী, পালনকারী, জীবরূপে ভোক্তা, মহেশ্বর, পরমাত্মা নামেও পরিচিত।। ২২।।

ব্যাখ্যা :- এখানে আত্মাকে উপদ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী বা তত্ত্বাবধায়ক বলা হয়েছে। সাক্ষী বলা হয় তাকে যে নিজে কিছু না ক'রে নিকট থেকে সব কিছু দেখে। শ্রাদ্ধ, পূজাদি কর্মে একজন পুরোহিত সংশ্লিষ্ট কর্মটি করেন এবং অপর একজন আরও অভিজ্ঞ পুরোহিত সমীপে ব'সে সমস্ত অনুষ্ঠানটি ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা দেখেন। আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে আত্মা নিষ্ক্রিয়, তিনি নিজে কিছুই করেন না কিন্তু ঐ অভিজ্ঞ পুরোহিতের মত সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম অন্তর্যামীরূপে নিকটেই অবস্থান ক'রে সকলের শুভাশুভ কর্মকে নিরীক্ষণ করেন। তাই তিনি উপদ্রষ্টা বা সাক্ষী।

আবার তিনি অনুমন্তা অর্থাৎ অনুমোদনকারী। উপর্যুক্ত পুরোহিত একমনে ব'সে ব'সে সমস্ত অনুষ্ঠানটি দেখেন এবং বেঠিক কিছু না হলে তিনি নীরব থাকেন অর্থাৎ তিনি সেই অনুষ্ঠানের পদ্ধতিটি অনুমোদন করেন। এক্ষেত্রে তিনি সেই কাজটির অনুমন্তা অর্থাৎ অনুমোদনকারী। পরমাত্মাও তেমনই অন্তর্যামীরূপে সকলের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত কর্ম করতে দেখেও কখনও নিবারণ করেন না, তাই তিনি ইন্দ্রিয়াদির কর্মের অনুমন্তা।

আত্মাকে ভর্তাও বলা হয়। তিনি বিষ্ণুরূপে সমগ্র জগতের রক্ষণ এবং পালন করেন। সেইজন্য তাঁকে 'ভর্তা' বলা হয়। তিনি দেবতাদের রূপে সমস্ত যজ্ঞের হবি ও সমস্ত প্রাণীদের রূপে সমস্ত ভোগ্য বস্তু ভোগ করেন। সেইজন্য তাঁকে 'ভোক্তা' বলা হয়। তিনি সমস্ত লোকপাল এবং ব্রহ্মাদি ঈশ্বরকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সেইজন্য তিনি মহেশ্বর। তিনি সর্বপ্রকারে স্বত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সমস্ত গুণের ঊর্ধ্বে। সেই জন্য তিনি 'পরমাত্মা'। সেইজন্য দেখা যাচ্ছে যে পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন নামে ভূষিত করা হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই।।২২।।

য এবং বেত্তি পুরুষং # প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানঃ অপি # ন স ভূয়ঃ অভিজায়তে।।২৩।।

যঃ = যিনি; এবং = এই ভাবে; বেত্তি = জানেন; গুণৈঃ সহ = গুণসমূহের সহিত; সর্বথা = সর্বপ্রকারে; ভূয়ঃ = পুনরায়; অভিজায়তে = জন্মগ্রহণ করেন।।২৩।।

অনুবাদ :- যিনি সেই পুরুষকে এবং গুণসহ প্রকৃতিকে এইরূপ জানেন তিনি সর্বপ্রকারে জড়জগতে অবস্থান করে কর্ম করলেও পুনর্জন্মের আবর্তে পড়েন না।।২৩।।

ব্যাখ্যা :- যখন কোন ব্যক্তি পরমেশ্বরকে এই প্রকারে জানতে সক্ষম হন তখন তাঁর অন্তঃকরণে প্রকৃত জ্ঞানের অগ্নি শিখা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। সেই প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নিতে তাঁর অন্তরের সমস্ত অবিদ্যা ভস্মীভূত হয়ে যায়। ফলে যখন তিনি বর্তমান দেহ পরিত্যাগ করেন তখন তিনি অসীম জ্ঞানস্বরূপ নিষ্পাপ আত্মস্বরূপকে লাভ ক'রে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান অর্থাৎ তিনি মোক্ষলাভ করেন। ফলে তাঁকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না।।২৩।।

ধ্যানেন আত্মনি পশ্যন্তি # কেচিৎ আত্মানম্ আত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন # কর্মযোগেন চ অপরে।।২৪।।

ধ্যানেন = ধ্যানযোগে; আত্মনা আত্মনি = নিজের হৃদয়েই। কেচিৎ = কেউ কেউ; সাংখ্যেন যোগেন = জ্ঞানযোগ দ্বারা।।২৪।।

অনুবাদ :- কেউ কেউ বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা ধ্যানযোগে সেই পরমাত্মাকে নিজের হৃদয়ে দর্শন করেন, কেউ আবার জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং অন্যরা কর্মযোগের দ্বারা তাঁকে লাভ করেন।।২৪।।

ব্যাখ্যা :- পরমেশ্বরের ধ্যান কিরূপ হওয়া উচিত? কতখানি নিষ্ঠা সহকারে পরমেশ্বরের ধ্যান করলে তবে তাঁকে লাভ করা যায় সেই ব্যাপারে ছন্দোগ্যোপনিষদের ৭।৬।১ মন্ত্রে বলা হয়েছে--- "ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরিক্ষং ধ্যায়তীব দৌর্ধ্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্বতা" ইতি। অর্থাৎ যেমন পৃথিবী ধ্যানমগ্ন, যেমন অন্তরিক্ষ ধ্যানমগ্ন যেমন দ্যুলোক ধ্যানমগ্ন, যেমন জল ধ্যানমগ্ন, যেমন পর্বতসমূহ ধ্যানমগ্ন থাকে, তাঁর ভক্তকে সেই প্রকারেই ধ্যানমগ্ন হতে হবে। তবেই সেই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করা যাবে।।২৪।।

অন্যে তু এবম্ অজানন্তঃ # শ্রুত্বা অন্যেভ্য উপাসতে।
তে অপি চ অতিতরন্তি এব # মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ।।২৫।।

অন্যে তু = আবার অন্যেরা; এবম্ = এই তত্ত্ব; অজানন্তঃ = না জানতে পেরে; শ্রুত্বা = শুনে; অন্যেভ্য = অপর উপদেশদানকারিগণের নিকট থেকে; উপাসতে = উপাসনা করেন; তে অপি = তাঁরাও; চ অতিতরন্তি = অতিক্রম করেন; শ্রুতিপরায়ণাঃ = উপদেশ শ্রবণ পরায়ণ হয়ে।।২৫।।

অনুবাদ :- আবার এমন অনেক সাধক আছেন যাঁরা এই তত্ত্ব জানেন না। তাঁরা কোন গুরুর নিকট থেকে উপদেশ শ্রবণ ক'রে উপাসনা করেন। তাঁরাও কিন্তু এই রকম একনিষ্ঠভাবে উপদেশ শ্রবণ পরায়ণ হয়ে ভবসাগর অতিক্রম করতে পারেন।।২৫।।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ # সত্ত্বং স্থাবর-জঙ্গমম্।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ # তদ্বিদ্ধি ভরত-ঋষভ।।২৬।।

যাবৎ = যা কিছু; সংজায়তে = উৎপন্ন হয়; সত্ত্বং = পদার্থসমূহ; স্থাবর-জঙ্গমম্ = চর এবং অচর; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ = অপরা প্রকৃতি এবং আত্মার সংযোগে; তৎ বিদ্ধি = জানবে; ভরত-ঋষভ = ভরতকুল শ্রেষ্ঠ।।২৬।।

অনুবাদ :- হে ভরতকুল শিরোমণি! এই ব্রহ্মাণ্ডে চেতন-অচেতন যা কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয় তার সমস্ত কিছুই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ অপরা প্রকৃতি ও আত্মার সংযোগেই উৎপন্ন হয়ে থাকে ব'লে জানবে।।২৬।।

সমং সর্বেষু ভূতেষু # তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং # যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।২৭।।

সমং = সমানভাবে; সর্বেষু = সকল; ভূতেষু = জীবে; তিষ্ঠন্তং = অবস্থিত; বিনশ্যৎসু = নশ্বর; অবিনশ্যন্তং = অবিনশ্বর; যঃ = যিনি; পশ্যতি = দেখেন।।২৭।।

অনুবাদ :- যে পুরুষ সকল জীবে সমানভাবে অবস্থিত নশ্বর দেহাদির মধ্যে সেই অবিনশ্বর পরমাত্মাকে দর্শন করেন তিনিই যথার্থ দেখেন অর্থাৎ তাঁর দেখাটিই যথার্থ দেখা।।২৭।।

ব্যাখ্যা :- মানুষ তো বহু কিছুই দেখে। কিন্তু তার সব দেখা যথার্থ দেখা নয়। একদল মানুষের মধ্যে কেউ দেখেন কতিপয় নারী ও কতিপয় পুরুষ। এটি তার যথার্থ দেখা নয়। যিনি তত্ত্বজ্ঞানী তিনি সেখানে নারী-পুরুষ দেখেন না, তিনি কেবলই মানুষ দেখেন। তাঁর দেখাই যথার্থ দেখা। শঙ্করাচার্য তাঁর গীতার ভাষ্যে

যথার্থ দেখা কেমন তা সুন্দরভাবে উপমার সাহায্যে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, একজন তিমির (ইংরেজিতে Diplopia বা Double-Vision) রোগে আক্রান্ত রোগী একসঙ্গে একাধিক চাঁদ দেখতে পান। তার দেখাটি যথার্থ দেখা নয়। কিন্তু শুদ্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ সর্বদা একটিই চন্দ্র দেখতে পান। তাঁর দেখাটিই যথার্থ দেখা— "যথা তিমিরদৃষ্টিঃ অনেকং চন্দ্রং পশ্যতি তম্ অপেক্ষ একচন্দ্রদর্শী বিশিষ্যতে স এব পশ্যতি ইতি।"

এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা থেকে মানুষ, পশু, পাখী বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি অনেক পদার্থ আছে। প্রাকৃত দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতিকে পৃথক পৃথকভাবে দেখে থাকে। সেইটি হল তাদের স্থূল দর্শন। কিন্তু যাঁরা আত্মতত্ত্বজ্ঞানী তাঁরা চেতন-অচেতন সমস্ত পদার্থের মধ্যেই সদা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের অস্তিত্ব দর্শন করেন। ভগবান্ বলেছেন তাঁদের এই দেখাটিই যথার্থ দেখা--- "একম্ অবিভক্তং যথোক্তম্ আত্মানং যঃ পশ্যতি স বিভক্তানেকাত্মাবিপরীতদর্শিভো বিশিষ্যতে স এব পশ্যতি ইতি" (শঙ্করাচার্য ।।২৭।।)

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র # সমবস্থিতম্ ঈশ্বরম্।
ন হিনস্তি আত্মনা-আত্মানং # ততো যাতি পরাং গতিম্।।২৮।।

সমং = সমভাবে; পশ্যন্ = দেখে; সর্বত্র = সর্বজীবে; সমবস্থিতম্ = অবস্থিত; ন হিনস্তি = হিংসা করেন না; আত্মনা = মনের দ্বারা; আত্মানং = নিজেকে; ততঃ = সেই হেতু; যাতি পরাং গতিম্ = পরম গতি লাভ করেন।।২৮।।

অনুবাদ :- যিনি দেখতে পান যে পরমেশ্বর সর্বজীবে সমান ও সমভাবে বিরাজ করছেন তিনি কখনো নিজের দ্বারা নিজেকে হিংসা করেন না অর্থাৎ তাঁর চিত্ত কখনও নিম্নগামী হয় না। সেইজন্য তিনি পরম গতি লাভ করেন।।২৮।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে বলেছেন যে যিনি কখনও নিজেকে হিংসা করেন না তিনি মোক্ষলাভ করেন। কিন্তু ভগবানের এই বক্তব্যটি সাধারণের নিকট স্পষ্টভাবে বোধগম্য নয়। সেইজন্য এই বিষয়টির উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা প্রয়োজন। বাস্তবে আমরা স্থূলদৃষ্টিতে কখনই দেখি না যে কেউ নিজেকে হিংসা করছে। তাহলে ভগবানের এই কথা বলার অর্থ কি? ভগবানের এই উক্তির গূঢ় অর্থ হল যে অজ্ঞানী মানুষের দৃষ্টি, চিন্তা, অন্তর সবই অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। সেইজন্য সে সর্বভূতে প্রত্যক্ষ আত্মাকে উপস্থিত না দেখে সব অনাত্মা শরীরকে আত্মা মনে করে এবং ধর্মাধর্ম বিচার না ক'রে কর্ম করে এবং

এইভাবে পাপ অর্জন ক'রে প্রাপ্ত শরীরকে নাশ ক'রে ফেলে। তারপর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে এবং এইভাবে পুনর্বার তার শরীরকে নাশ করে। এইভাবে অনন্ত কাল ধ'রে তার আত্মাকে নাশ করা কর্মটি অব্যাহত থাকে এবং এইভাবে বারে বারে তার নূতন দেহকে নাশ করাটি হল তার নিজের দ্বারা নিজেকে হিংসা করা। কিন্তু যিনি আত্মতত্ত্ব সম্যকভাবে জানেন তিনি কখনও নিজেকে এভাবে হিংসা করেন না। তিনি সর্বভূতে এক অভিন্ন আত্মাকে দেখতে পান। তিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম যথার্থভাবে সম্পাদন ক'রে কর্মবন্ধন মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন হয়ে যান অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন। ফলে তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না।

এর একটি দ্বিতীয় অর্থও হয়। সেটি হল এই যে প্রত্যেকেরই অন্তরে আত্মা বাস করেন। তাহলে যদি কেউ অপর কোন জীবকে হিংসা করে তাহলে তার নিজের আত্মার দ্বারাই সেই অন্য জীবের আত্মাকে হিংসা করা হয় যা কখনও উচিত নয়।।

প্রকৃত্যা এব চ কর্মাণি # ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথা আত্মানম্ # অকর্তারং স পশ্যতি।।২৯।।

প্রকৃত্যা এব = প্রকৃতির দ্বারাই; কর্মাণি ক্রিয়মাণানি = কর্ম ক'রে; সর্বশঃ = সর্ব প্রকারে; যঃ = যিনি; পশ্যতি = দেখেন; তথা = এবং; আত্মানম্ = আত্মাকে; অকর্তারং = অকর্তা অর্থাৎ যিনি কোন কর্ম করেন না; স পশ্যতি = তিনি যথার্থ দেখেন।।২৯।।

অনুবাদ :- জগতে যত কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তার সমস্তই করে ঈশ্বরের মায়াশক্তি প্রকৃতি এবং আত্মা অকর্তা অর্থাৎ তিনি কোন কর্মই করেন না। যিনি এই তত্ত্ব সম্যকভাবে বুঝতে পারেন তিনিই যথার্থ জ্ঞানী।।২৯।।

যদা ভূত-পৃথগ্ ভাবম্ # একস্থম্ অনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং # ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।।৩০।।

যদা = যখন; ভূত-পৃথগ্ ভাবম্ = ভূতগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাব; একস্থম্ = এক প্রকৃতিতে অবস্থিত; অনুপশ্যতি = দেখেন; তত এব চ = এবং তা থেকেই; বিস্তারং = উৎপত্তি; সম্পদ্যতে = লাভ করেন; তদা = তখন।।৩০।।

অনুবাদ :- যখন যিনি জীবসমূহের ভিন্ন ভিন্ন ভাবকে একই প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত দেখেন এবং তাদের সকলের উৎপত্তি ও বিস্তার পরমাত্মা থেকেই দেখেন তখন তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন।। ৩০।।

ব্যাখ্যা :- আত্মদর্শী পুরুষ জগতে বিদ্যমান ব্রহ্মা থেকে সমগ্র জীবকুলকে পৃথক পৃথকভাবে দেখেন না। তিনি সকলের মধ্যে এক পরমাত্মাকে দর্শন করেন। তখন তাঁর ছান্দোগ্যোপনিষদের ৭।২৫।২ মন্ত্র অনুযায়ী সকলই ব্রহ্মময় ব'লে মনে হয় - "আত্মৈবেদং সর্বম্" ইতি। তিনি তখন দেখেন যে আত্মা থেকেই প্রাণ, আশা, সংকল্প, আকাশ, তেজ, জল, অন্ন, সমস্ত কিছুই উৎপন্ন হয়, সমস্ত কিছুরই আত্মাতেই লয় হয় — "আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোহন্নমাত্মতঃ" ইতি (৭।২৬।১)। জ্ঞানীব্যক্তির যখন এইরূপ বোধ জন্মায় তখনই তিনি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে লাভ করেন।।৩০।।

অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ # পরমাত্মা অয়ম্ অব্যয়ঃ।
শরীরস্থঃ অপি কৌন্তেয় # ন করোতি ন লিপ্যতে।।৩১।।

অনাদিত্বাৎ = অনাদিত্ব হেতু; নির্গুণত্বাৎ = নির্গুণত্ব হেতু; অয়ম্ = এই; অব্যয়ঃ = ক্ষয়রহিত; শরীরস্থঃ অপি = দেহের মধ্যে অবস্থিত হয়েও; ন করোতি = কর্ম করেন না; ন লিপ্যতে = কর্মফলে লিপ্ত হন না।।৩১।।

অনুবাদ :- হে কৌন্তেয়! এই পরমাত্মা অনাদি, নির্গুণ এবং ক্ষয়রহিত হওয়ার কারণে তিনি যদিও দেহের মধ্যেই অবস্থান করেন তথাপি তিনি কোন কর্ম করেন না, তিনি কোন কর্ম বন্ধনে লিপ্ত হন না।। ৩১।।

ব্যাখ্যা :- এখানে পরমাত্মাকে অনাদি, অব্যয় ও নির্গুণ বলা হয়েছে। কিন্তু কেন বলা হয়েছে তা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। পরমাত্মা হলেন অনাদি। তিনি অনাদি কারণ তাঁর পূর্বে অপর কেউ ছিল না যার দ্বারা তাঁর সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর কোন সৃষ্টি কর্তা নাই। তিনি নিজেকে নিজেই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই হলেন আদিপুরুষ। যেহেতু তিনি আদি তাই তিনি অবয়ববিহীন আর যেহেতু তিনি অবয়ববিহীন তাই তিনি অব্যয় অর্থাৎ ক্ষয়বিহীন কারণ যার অবয়বই নাই তার ক্ষয় হবে কি প্রকারে? তিনি প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণবিহীন। যে বস্তুর গুণ আছে সেই বস্তুর গুণ ক্ষয় হয়ে গেলে সেই বস্তুটিরও ক্ষয় হয়ে যায়। কিন্তু তিনি গুণহীন। সুতরাং তাঁর গুণের ক্ষয় হওয়ার কোন প্রশ্নই নাই। সুতরাং তিনি অব্যয় অর্থাৎ ক্ষয়রহিত। আত্মা শরীরেই অবস্থান করেন কিন্তু যেহেতু তিনি নির্গুণ সেইজন্য তিনি কোন কর্মই করেন না এবং যেহেতু তিনি কোন কর্মই করেন না সেই হেতু কোন কর্মফলে লিপ্ত হন না। গীতায় পূর্বেই বলা হয়েছে

যে তিনি অকর্তা। যিনি নিজেকে কর্তা মনে করেন তিনিই কর্মফলে লিপ্ত হন। কিন্তু তিনি তো অকর্তা। সেইজন্যই তিনি কর্মফলে লিপ্ত হন না।।৩২।।

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাৎ # আকাশং ন উপলিপ্যতে।
সর্বত্র অবস্থিতো দেহে # তথা আত্মা ন উপলিপ্যতে।।৩২।।

সর্বগতং = সর্বত্র অবস্থিত; সৌক্ষ্মাৎ = সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে; ন উপলিপ্যতে = লিপ্ত হয় না।।৩২।।

অনুবাদ :- আকাশ সর্বত্র অবস্থিত। কিন্তু সে অতীব সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে কোন কিছুর সঙ্গে লিপ্ত হয় না। তেমনই দেব-মনুষ্যাদি সমস্ত দেহের মধ্যে সর্বতোভাবে অবস্থিত হয়েও নির্গুণ হওয়ার জন্য আত্মা শরীরের গুণ-দোষের দ্বারা লিপ্ত হন না।।৩২।।

যথা প্রকাশয়তি একঃ # কৃৎস্নং লোকম্ ইমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং # প্রকাশয়তি ভারত।।৩৩।।

প্রকাশয়তি = প্রকাশ করে; কৃৎস্নং = সমগ্র; লোকম্ = জগতকে; ইমং = এই; ক্ষেত্রং = দেহ; ক্ষেত্রী = আত্মা।।৩৩।।

অনুবাদ :- হে ভারত! একটি সূর্য যেমন সমগ্র জগতকে প্রকাশ করে তেমনই এক আত্মা সকল দেহকে প্রকাশ করেন।।৩৩।।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ এবম্ # অন্তরং জ্ঞান-চক্ষুষা।
ভূত-প্রকৃতি-মোক্ষং চ # যে বিদুর্যান্তি তে পরম্। ৩৪।।

* বিদুর্যান্তি = বিদুঃ যান্তি

এবম্ = এই প্রকারে; অন্তরং = ভেদ; জ্ঞান-চক্ষুষা = জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা; বিদুঃ = জানেন; যান্তি = লাভ করেন; তে = তাঁরা; পরম্ = পরম গতি।।৩৪।।

অনুবাদ :- যাঁরা শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশ থেকে উৎপন্ন আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং অবিদ্যারূপ জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভের উপায় জানেন তাঁরা পরম গতি লাভ করেন।। ৩৪।

ব্যাখ্যা :- এখানে সংক্ষেপে মোক্ষ কাকে বলে তা জেনে নেওয়া যাক। অভিধানে মোক্ষ শব্দের অর্থ বলা হয়েছে — অপবর্গ অর্থাৎ যা মানুষকে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করে। রামানুজাচার্য মোক্ষ শব্দটির খুব সুন্দর ব্যাখ্যা

দিয়ে বলেছেন — 'মোক্ষ্যতে অনেন ইতি মোক্ষঃ'। অর্থাৎ মোক্ষণ বা মোচন বা বিচ্ছিন্ন করে ব'লে একে মোক্ষ বলা হয়। তাহলে আমাদের জানা প্রয়োজন কি থেকে এবং কিভাবে এই মোক্ষণকার্য সংঘটিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই শ্লোকে "ভূত-প্রকৃতি- মোক্ষং" অর্থাৎ ভূত-প্রকৃতি থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখন "ভূত" শব্দের অর্থ কি? প্রকৃতির মধ্যে দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুকে ভূত বলা হয়। কাজেই জড়জগতের সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর প্রতি আসক্তির কারণে অন্তরে যে বন্ধন তৈরী হয় তার কবল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মস্বরূপের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়াকেই মোক্ষ বলা হয়।

এখন প্রশ্ন — কিভাবে এই মোক্ষ লাভ হয়ে থাকে? আমরা দেখেছি এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক থেকে একাদশ শ্লোকে ভগবান্ অমানিত্ব অর্থাৎ নিজের মানের বড়াই না করা, দম্ভহীনত্ব অর্থাৎ নিজের রূপ, যৌবন, বৈভব, ক্ষমতা, শিক্ষা প্রভৃতির জন্য অহমিকা প্রকাশ না করা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা প্রভৃতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে এইগুলিই হল মানুষের চিত্তের প্রকৃত ও আদর্শ জ্ঞান এবং এই সমস্ত বিষয় ব্যতীত আর যা কিছুকে মানুষ জ্ঞান ব'লে মনে করে সেগুলি আসলে সবই হল অজ্ঞান। মানুষ যখন উপর্যুক্ত জ্ঞানসমূহের অধিকারী হয়ে অবশিষ্ট সমস্ত অজ্ঞানের কালিমাকে অন্তর থেকে ঝেড়ে ফেলে ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধীয় বিবেকবিষয়ক সেই জ্ঞানের দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ের মধ্যে ভেদকে জেনে অমানিত্ব, দম্ভহীনত্ব আদি গুণসমূহকে অন্তরে সম্যক উপলব্ধি ক'রে তদনুসারে আচরণ করে তখন সে সর্বপ্রকারে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মস্বরূপের সঙ্গে মিলিত হয়ে মোক্ষ লাভ করে।।৩৪।।

—: ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত :—

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়-বিভাগযোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি # জ্ঞানানাং জ্ঞানম্ উত্তমম্।
যৎ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে # পরাং সিদ্ধিম্ ইতো গতাঃ।।১।।

ভূয়ঃ = পুনরায়; প্রবক্ষ্যামি = বলব; জ্ঞানানাং জ্ঞানম্ উত্তমম্ = জ্ঞানসমূহের মধ্যে উত্তমজ্ঞান; যৎ জ্ঞাত্বা = যা জেনে; মুনয়ঃ সর্বে = মুনিগণ; পরাং সিদ্ধিম্ = মোক্ষ; ইতঃ = এই দেহের বন্ধন থেকে; গতাঃ = লাভ করেছেন।।১।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন—এবার পুনরায় আমি তোমাকে সেই জ্ঞানসমূহের মধ্যে পরম উত্তম জ্ঞান বিষয়ে বলব যা জেনে মুনিগণ এই দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ আত্মরূপ অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেছেন।।১।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখন অর্জুনকে পরম উত্তম জ্ঞান বিষয়ে বলতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আমাদের জানতে হবে পরম উত্তম জ্ঞান কাকে বলে। শঙ্করাচার্য বলেছেন— "পরং পরবস্তুবিষয়ত্বাৎ— জ্ঞানং সর্বেষাং জ্ঞানানাম্ উত্তমম্ উত্তমফলত্বাৎ"(শঙ্করাচার্য গীতাভাষ্য)। অর্থাৎ যে জ্ঞান পরবস্তুবিষয়ক অর্থাৎ যে জ্ঞান পরমাত্মার স্বরূপকে প্রকটিত করে তাকে পরম জ্ঞান বলা হয় এবং যে জ্ঞান উত্তম ফল প্রদান করে অর্থাৎ জীবাত্মাকে প্রকৃতির বন্ধন থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত ক'রে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে তাকে উত্তম জ্ঞান বলা হয়।।১।।

ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য # মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ।
সর্গে অপি ন উপজায়ন্তে # প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।।২।।

ইদং জ্ঞানম্ = এই জ্ঞান; উপাশ্রিত্য = অবলম্বন ক'রে; সাধর্ম্যম্ = স্বরূপ; আগতাঃ = লাভ করে; সর্গে অপি = সৃষ্টির সময়ে; ন উপজায়ন্তে = জন্মলাভ করে না; প্রলয়ে ন ব্যথন্তি = প্রলয়কালে যন্ত্রণা পায় না।।২।।

অনুবাদ :- এই জ্ঞানের সাহায্যে মুনিগণ আমার স্বরূপ লাভ করেন। ফলে তাঁরা সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না আবার প্রলয়কালেও ব্যথিত হন না।।২।।

ব্যাখ্যা :- ঈশ্বরের স্বরূপ লাভ করার অর্থ হল নির্গুণতা লাভ। ঈশ্বর সর্বপ্রকারে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ বিহীন অর্থাৎ তিনি নির্গুণ। পরমেশ্বরের কোন ভক্ত যখন তাঁর স্বরূপ লাভ করেন তখন তাঁর মধ্যে এই তিন প্রকার গুণ কোন ক্রিয়া করতে পারে না। এই তিন প্রকার গুণই হল জাগতিক ত্রিতাপ জ্বালার কারণ। সেইজন্য ত্রিগুণগ্রস্ত মানুষ আত্মতত্ত্ব না জেনে মায়ার দ্বারা ভুল পথে পরিচালিত হয়ে নশ্বর জীবনের আপাত সুখকে সত্য ভেবে জীবনের প্রতি অতি আসক্তি অনুভব করে। তাই মৃত্যুকালে এই মরজগতটির প্রতি মোহ পিছনে ফেলে যাবার সময় সে নিবিড় ব্যথা অনুভব করে। সেইজন্য তাকে আবার পুনর্জন্ম লাভ ক'রে এই মৃত্যুময়, জ্বালাময় মরজগতে বারে বারে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু যাঁরা পরমেশ্বরের ন্যায় নির্গুণতা লাভ করেন তাঁদের অন্তরে ইহ জগতের কোন বস্তুর প্রতি কোন আসক্তি, মমতা, মোহ, লোভ, লালসা, সুখানুভূতি, দুঃখানুভূতি থাকে না। ফলে তাঁরা মৃত্যুর সময় কোন প্রকার ব্যথা অর্থাৎ মনের কষ্ট অনুভব করেন না। আবার প্রলয় কালের পর যখন সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টিকাল আবার ফিরে আসে তখন ব্রহ্মাদি যখন আবার উৎপন্ন হন তখনও তিনি আর জন্মলাভ করেন না কারণ পূর্বজন্মে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মোক্ষপ্রাপ্তি হয়ে যায়।।২।।

মম যোনিঃ মহদ্ব্রহ্ম # তস্মিন্ গর্ভং দধামি অহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং # ততো ভবতি ভারত।।৩।।

যোনিঃ = গর্ভাধানস্থান; মহদ্ব্রহ্ম = প্রকৃতি; তস্মিন্ = তাতে; গর্ভং = সৃষ্টির বীজ; দধামি = স্থাপন করি; অহম্ = আমি; সম্ভবঃ = উৎপত্তি; সর্বভূতানাং = সমগ্র জীবকুলের; ততঃ = তার থেকে; ভবতি = হয়।। ৩।।

অনুবাদ :- হে ভারত! আমার গর্ভাধানস্থান হল মহদ্ব্রহ্ম প্রকৃতি। এই মহদ্ব্রহ্মের গর্ভে আমি বীজ স্থাপন করি এবং তার ফলেই সমগ্র জীবকুলের সৃষ্টি হয়।।৩।।

ব্যাখ্যা :- ঈশ্বরের মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়ী প্রকৃতি হল সর্বজীবের জন্মস্থান। প্রকৃতিকে শাস্ত্রে অনেক সময় 'মহদ্ব্রহ্ম' নামে অভিহিত করা হয়েছে। মুণ্ডকোপনিষদের ১।১।৯ মন্ত্রে প্রকৃতিকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়েছে — "যঃ সর্বজ্ঞঃ

সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে” ইতি। অর্থাৎ যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ এবং সর্বজ্ঞত্বই যাঁর তপস্যা সেই ব্রহ্ম থেকেই এই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম, নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়।

প্রকৃতিকে দেশ-কালভেদে কোনভাবেই বিভক্ত করা যায় না। সেইজন্য প্রকৃতি 'মহান'। আবার তার সমস্ত কাজের বৃদ্ধির কারণে সে 'ব্রহ্ম'--- “দেশতঃ কালতশ্চানবচ্ছিন্নত্বান্মহদ্‌বৃংহণত্বাৎস্বকার্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্বা ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ” (শ্রীধরস্বামী, গীতাভাষ্য)। রামানুজাচার্য বলেছেন যে, অচেতনা প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কারাদি সমস্ত বিকারের কারণ। সেইজন্য প্রকৃতিকে 'মহদ্ব্রহ্ম' বলা হয় — “অচেতনা প্রকৃতিঃ মহদহঙ্কারাদিবিকারাণাং কারণতয়া 'মহদ্ব্রহ্ম' ইতি উচ্যতে।”

ভগবান্ ক্ষিতি (ভূমি), অপ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু), ব্যোম (আকাশ), মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটভাগে বিভক্ত তাঁর মায়াস্বরূপ মহদ্ ব্রহ্ম প্রকৃতির গর্ভে গর্ভসঞ্চার করেন। এর অর্থ হল প্রলয়কালে নিজ নিজ সংস্কারসহ পরমেশ্বরের মধ্যে যে সমস্ত জীব আশ্রয় গ্রহণ করে, সৃষ্টিকালের প্রারম্ভে ভগবান্ এই অপরা প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মধ্যে আশ্রিত সেই সমস্ত জীবরূপা পরা শক্তিকে বিশেষভাবে সংযুক্ত ক'রে দেন এবং তার ফলেই প্রকৃতি থেকে সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়। এইটিই হল প্রকৃতির গর্ভে ভগবানের গর্ভস্থাপন করা। এখানে যোনি শব্দটি জরায়ু অর্থে নয়, প্রকৃতির জীব সৃষ্টির ক্ষেত্রের রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।। ৩।।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় # মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিঃ # অহং বীজপ্রদঃ পিতা।। ৪।।

তাসাং = তাদের; সম্ভবন্তি = উৎপন্ন হয়; অহং = আমি।। ৪।।

অনুবাদ :- হে কুন্তীপুত্র অর্জুন! দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজাতিতে যে সমস্ত শরীর উৎপন্ন হয় তাদের মাতা হল অচেতন প্রকৃতি এবং যেহেতু আমি সমগ্র জীবকুলকে সেই প্রকৃতির মধ্যে স্থাপন করি সেইজন্য আমি তাদের সকলের পিতা।।৪।।

সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি # গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো # দেহে দেহিনম্ অব্যয়ম্।।৫।।

প্রকৃতি-সম্ভবাঃ = প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন; নিবধ্নতি = বন্ধন করে; দেহিনম্ = আত্মাকে ; অব্যয়ম্ = অবিনাশী।।৫।।

অনুবাদ :- হে মহাবাহো! অচেতন প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ দেহের মধ্যে অবিনাশী আত্মাকে ধারণ ও বন্ধন ক'রে রাখে।।৫।।

ব্যাখ্যা :- আত্মা তো সর্বপ্রকারে বিকাররহিত। সেইজন্য তাঁকে তো বন্ধন করা যায় না। তাহলে ভগবান্ এখানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের দ্বারা আত্মাকে দেহের সঙ্গে বন্ধন ক'রে রাখার বিষয় বলেছেন কেন? সেই বন্ধন কিরূপ? প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যার কারণে আত্মার এইরূপ বন্ধনের কথা মনে করা হয়। এই তিনটি গুণ নিজ নিজ অনুরূপ ভোগে এবং শরীরে এবং তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত পদার্থে তার মমত্ব, আসক্তি এবং অভিমান উৎপন্ন করে। তারাই এই তিনটি গুণকে তাদের শরীরের সঙ্গে বন্ধন সৃষ্টি করে। অর্থাৎ জীবাত্মার তিন গুণ থেকে শরীরে এবং তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত পদার্থে যে মমত্ব, আসক্তি এবং অভিমান উৎপন্ন হয় সেইটিই হল দেহের সঙ্গে আত্মার বন্ধন।।৫।।

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ # প্রকাশকম্ অনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি # জ্ঞানসঙ্গেন চ অনঘ।। ৬।।

নির্মলত্বাৎ = নির্মল হওয়ার কারণে; অনাময়ম্ = দোষবিহীন; বধ্নাতি = বন্ধন করে; অনঘ = নিষ্পাপ।।৬।।

অনুবাদ :- হে নিষ্পাপ অর্জুন! এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল হওয়ার কারণে পবিত্র ও প্রকাশক এবং নির্দোষ। সেইজন্য এই সত্ত্বগুণ আত্মাকে যে বন্ধন ক'রে তা আত্মাকে সুখ ও জ্ঞান প্রদান করে অর্থাৎ এই বন্ধন পুরুষের অন্তরে নির্মল সুখ ও জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে।।৬।।

ব্যাখ্যা :- প্রকৃতপক্ষে আত্মা নির্বিকার, তাঁর সুখ-দুঃখ ব'লে কিছুই নাই। কিন্তু অবিদ্যার কারণে মানুষ আত্মাকে সুখ-দুঃখের বন্ধনে আবদ্ধ ব'লে ভাবে। যখন বিষয়রূপ সুখকে বিষয়ী আত্মার সঙ্গে 'আমি সুখী' এই ধরণের সম্বন্ধ সৃষ্টি ক'রে আত্মাকে সুখের সঙ্গে ভ্রান্তভাবে যুক্ত করা হয় তখন তাকে অবিদ্যা বলা হয়— "সুখী অহম্ ইতি বিষয়ভূতস্য সুখস্য বিষয়িণি আত্মনি সংশ্লেষাপাদনং মৃষা

এব সুখে সঞ্জনম্ ইতি। সা এষা অবিদ্যা” (শঙ্করাচার্য গীতাভাষ্য)। শঙ্করাচার্য বলেছেন যে বিষয়ী অর্থাৎ আত্মার কোন বিষয়ধর্ম থাকে না— “ন হি বিষয়ধর্মো বিষয়িণো ভবতি।” ইচ্ছা থেকে ধৃতি পর্যন্ত সমস্ত ধর্মই হল বিষয়রূপ ক্ষেত্রের ধর্ম। কিন্তু সত্ত্বগুণ জ্ঞানের সাহায্যে আত্মাকে সুখের সঙ্গে সংযুক্ত অর্থাৎ আসক্ত ক'রে দেয়। সুতরাং যে আত্মার সঙ্গে সুখের কোন সম্বন্ধ নাই তাকে সেই সুখের মধ্যে সত্ত্বগুণ যুক্ত ক'রে দেয়। আবার যেহেতু সত্ত্বগুণ জ্ঞান প্রদান করে এবং যেহেতু জ্ঞান সুখ প্রদান করে সেই হেতু এই জ্ঞান ক্ষেত্র অর্থাৎ অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু অবিদ্যার কারণে মানুষ জ্ঞানের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ আছে ভেবে নেয়। সেইজন্য তার মনে এদের প্রতি আসক্তি জন্মে যা কর্মবন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় কারণ সুখের প্রতি আকর্ষণের ন্যায় জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ও আসক্তি সৃষ্টি করে যা কর্মবন্ধনের কারণ “সুখে ইব স্বা জ্ঞানাদৌ সঙ্গো মন্তবো।” ইতি (শঙ্করাচার্য)। সেই জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞানের সঙ্গে আসক্তির তথাকথিত সম্বন্ধকেও ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।।৬।।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি # তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভবম্।
তৎ নিবধ্নাতি কৌন্তেয় # কর্মসঙ্গেন দেহিনম্।৭।।

রজঃ = রজোগুণ; রাগাত্মকং = কামনা-বাসনা সৃষ্টিকারী; বিদ্ধি = জানবে; তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভবম্ = আসক্তি-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিকারী; নিবধ্নাতি = বন্ধন করে; কর্মসঙ্গেন = কর্মের প্রতি আসক্তির দ্বারা; দেহিনম্ = আত্মাকে।।৭।।

অনুবাদ :- হে কুন্তীপুত্র অর্জুন! রজোগুণ রাগাত্মক অর্থাৎ কামনা-বাসনা ও আসক্তি-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিকারী। এই রজোগুণই কর্মের প্রতি আসক্তির দ্বারা আত্মাকে বন্ধন করে।।৭।।

তমঃ তু অজ্ঞানজং বিদ্ধি # মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদ-আলস্য-নিদ্রাভিঃ # তৎ নিবধ্নাতি ভারত।।৮।।

অজ্ঞানজং = অজ্ঞানতা থেকে উৎপন্ন; বিদ্ধি = জানবে; মোহনং = মোহ সৃষ্টি কারী; সর্বদেহিনাম্ = সকল জীবের; নিবধ্নাতি = বদ্ধ করে।।৮।।

অনুবাদ :- তমোগুণ অজ্ঞানতা থেকে উৎপন্ন হয় এবং মোহ সৃষ্টি করে। এই গুণ প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতির দ্বারা জীবাত্মাকে আবদ্ধ করে।।৮।।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি # রজঃ কর্মণি ভারত।

জ্ঞানম্ আবৃত্য তু তমঃ # প্রমাদে সঞ্জয়তি উত।।৯।।

সঞ্জয়তি = আসক্ত করে; আবৃত্য = ঢেকে দিয়ে; উত = বলা হয়।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! সত্ত্বগুণের কাজ হল জীবকে নির্মল সুখের সঙ্গে যুক্ত করা, রজোগুণের লক্ষ্য হল জীবকে কামনা-বাসনা-আসক্তির সঙ্গে যুক্ত করা এবং তমোগুণের কাজ হল জ্ঞানকে আবৃত ক'রে জীবের অন্তঃকরণে অজ্ঞানতা, প্রমাদ প্রভৃতি সৃষ্টি করা।। ৯।।

রজঃ তমঃ চ অভিভূয় # সত্ত্বং ভবতি ভারত।

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব # তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।।১০।।

*তমশ্চৈব = তমঃ চ এব; রজস্তথা = রজঃ তথা।

অভিভূয় = প্রতিহত ক'বে; ভবতি = হয়।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! সত্ত্বগুণ রজঃ এবং তমোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে এবং তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে প্রতিহত ক'রে বৃদ্ধিলাভ করে।।১০।।

সর্বদ্বারেষু দেহে অস্মিন্ # প্রকাশ উপজায়তে।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ # বিবৃদ্ধং সত্ত্বম্ ইতি উত।।১১।।

সর্বদ্বারেষু = সকল ইন্দ্রিয়ে; দেহে অস্মিন্ = এই দেহে; প্রকাশ উপজায়তে জ্ঞানং = জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে; যদা = যখন; তদা = তখন; বিদ্যাৎ = জানবে; বিবৃদ্ধং = বৃদ্ধি ঘটেছে; উচ্যতে = বলা হয়।।১১।।

অনুবাদ :- যখন শরীরের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে তখন বুঝবে যে দেহে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি ঘটেছে।।১১।।

লোভঃ প্রবৃত্তিঃ আরম্ভঃ # কর্মণাম্ অশমঃ স্পৃহা।

রজসি এতানি জায়ন্তে # বিবৃদ্ধে ভরত-ঋষভ।।১২।।

আরম্ভ = কর্মে উদ্যম; অশমঃ = অশান্তি; জায়ন্তে = উৎপন্ন হয়; বিবৃদ্ধে = বৃদ্ধি পেলে।।১২।।

অনুবাদ :- রজোগুণ বৃদ্ধি পেলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্মে উদ্যম, অশান্তি, স্পৃহা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।।।১২।।

অপ্রকাশঃ অপ্রবৃত্তিঃ চ # প্রমাদো মোহ এব চ।

তমসি এতানি জায়ন্তে # বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।।১৩।।

অপ্রকাশঃ = বিবেকের অভাব; অপ্রবৃত্তিঃ = নিষ্ক্রিয়তা; তমসি = তমোগুণ; এতানি = এই সমস্ত; জায়ন্তে = উৎপন্ন হয়; বিবৃদ্ধে = বৃদ্ধি হলে।।১৩।।

অনুবাদ :- হে কুরুনন্দন! তমোগুণের বৃদ্ধি হলে বিবেকহীনতা, উদ্যমহীনতা প্রমাদ এবং মোহ উৎপন্ন হয়।।১৩।।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু # প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।

তদা উত্তম-বিদাং লোকান্ # অমলান্ প্রতিপদ্যতে।।১৪।।

যদা = যখন; প্রবৃদ্ধে = বৃদ্ধি হয়; প্রলয়ং = মৃত্যু; যাতি = গমন করে; দেহভৃৎ = জীব; তদা = তখন; উত্তম-বিদাং = উত্তম আত্মজ্ঞানিগণ; লোকান্ অমলান্ = পবিত্র লোকসমূহ; প্রতিপদ্যতে = লাভ করেন।।১৪।।

অনুবাদ :- যখন জীবাত্মার মধ্যে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় তখন মৃত্যু হলে সেই উত্তম আত্মজ্ঞানিগণ পবিত্র লোকসমূহে গমন করেন।।১৪।।

রজসি প্রলয়ং গত্বা # কর্মসঙ্গিষু জায়তে।

তথা প্রলীনঃ তমসি # মূঢ়-যোনিষু জায়তে।।১৫।।

প্রলয়ং গত্বা = মৃত্যু হলে; কর্মসঙ্গিষু = কর্মে আসক্ত মানুষদের মধ্যে; জায়তে = জন্মগ্রহণ করে; প্রলীনঃ = মৃত্যু হলে; তমসি = তমোগুণের বৃদ্ধি হলে; মূঢ়-যোনিষু = ইতর পশু-পক্ষীকুলে।।১৫।।

অনুবাদ :- যখন রজোগুণের বৃদ্ধি হয় তখন মৃত্যু হলে জীব কর্মোদ্যোগী মানুষদের পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে। আর যখন তমোগুণের বৃদ্ধি হয় তখন মৃত্যু হলে জীবের ইতর পশু-পক্ষী আদি মূঢ়কুলে জন্ম হয়।। ১৫।।

কর্মণঃ সুকৃতস্য আহুঃ # সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।

রজসঃ তু ফলং দুঃখম্ # অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্।।১৬।।

কর্মণঃ সুকৃতস্য = পবিত্র সাত্ত্বিক কর্মের; আহুঃ = বলা হয়।।১৬।।

অনুবাদ :- পণ্ডিতগণ বলেন যে, সুকৃত অর্থাৎ পবিত্র সাত্ত্বিক কর্ম করলে যে ফল পাওয়া যায় তা নির্মল সুখ দান করে। কিন্তু রজোগুণের ফল দুঃখদায়ক এবং তমোগুণের প্রভাবে যে কর্ম করা হয় তার ফলে অজ্ঞানতা লাভ হয়।।১৬।।

ব্যাখ্যা :- সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস কর্ম কাকে বলে এবং সেই সব কর্মের পরিণাম কি সেই বিষয়ে ভগবান্ এই শ্লোকে অর্জুনকে অবহিত করছেন। শাস্ত্রবিহিত যে সমস্ত কর্ম নিরাসক্ত চিত্তে সম্পাদন করা হয় তাদেরকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়। এইরূপ কর্মের সংস্কার থেকে চিত্তে জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রভৃতি নির্মল ভাবের উদয় হয় এবং এই কর্মের সুফল মানুষকে দেহান্তরপ্রাপ্তির সময় এক দুঃখবিহীন নির্মল লোকে নিয়ে যায় যেখান থেকে পরবর্তীকালে তিনি কোন আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাত্ত্বিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

রাজস কর্ম হল সেই সমস্ত কর্ম যা কেবল ভোগপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকে। এই সকল কর্ম করার সময় মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় যা পরিণামে তাকে দুঃখই দিয়ে থাকে। এইরূপ কর্মের সংস্কার থেকে অন্তরে অহর্নিশ কামনা, বাসনা, ভোগ, লালসা প্রভৃতির জন্ম হয় যা মানুষের অন্তরের প্রশান্তি ধ্বংস ক'রে চিত্তকে নিবিড় দুঃখে পরিপূর্ণ করে আর অবিদ্যার ও অজ্ঞানতার দ্বারা পরিচালিত অন্ধ মানুষ তাকেই সুখ মনে করে যা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিদারুণ দুঃখস্বরূপ। এই কর্ম মানুষের চিত্তকে ভোগের প্রতি অপরিসীম আসক্তিতে আক্রান্ত ক'রে তাকে পুনঃ পুনঃ নিবিড় দুঃখস্বরূপ জন্ম-মৃত্যুরূপ কালচক্রে নিক্ষিপ্ত করে।

যে সমস্ত কর্ম হঠকারীর ন্যায় কোন রকম ভাবনা চিন্তা ছাড়াই পরিণামের কথা চিন্তা না ক'রে মূর্খতাবশতঃ করা হয় তাদেরকে তামস কর্ম বলা হয়। এই সমস্ত কর্মের মধ্যে হিংসা, আক্রোশ প্রভৃতি নিহিত থাকে। এইরূপ কর্মের সংস্কার মানুষকে পাপের পথে পরিচালিত করে যার ফলে মানুষের অন্তঃকরণ নিবিড়ভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই কর্ম করার ফলস্বরূপ মানুষ মৃত্যুর পর অন্ধকারময় নরকে পতিত হয় এবং পুনঃ পুনঃ তাকে জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রজাতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এইসব জন্মে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কোন উপায় না থাকায় তার মুক্তির সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায়।।১৬।।

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং # রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদ-মোহৌ তমসো # ভবতঃ অজ্ঞানম্ এব চ।।১৭।।

সংজায়তে = উৎপন্ন হয়; ভবতঃ = হয়।

অনুবাদ :- সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান, রজোগুণ থেকে লোভ এবং তমোগুণ থেকে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞান উৎপন্ন হয়।।১৭।।

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা # মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্য-গুণ-বৃত্তিস্থা # অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ।।১৮।।

গচ্ছন্তি = গমন করে; সত্ত্বস্থা = সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ; তিষ্ঠন্তি = অবস্থান

করে; জঘন্য-গুণ-বৃত্তিস্থা = নিকৃষ্ট বৃত্তিযুক্ত; অধঃ = নিম্নে অর্থাৎ নরকে; গচ্ছন্তি = গমন করে; তামসাঃ = তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা।।১৮।।

অনুবাদ :- যাঁরা সত্ত্বগুণসম্পন্ন তাঁরা উর্ধ্বলোক অর্থাৎ স্বর্গলোকে স্থান লাভ করেন, যারা রজোগুণ সম্পন্ন তারা মধ্যস্থলে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে স্থান পায়। আর যারা নিকৃষ্ট বৃত্তিতে আসক্ত তমোগুণ সম্পন্ন তাদের গতি হয় অধোগামী অর্থাৎ তারা নরকে পতিত হয়।।১৮।।

ন অন্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং # যদা দ্রষ্টা অনুপশ্যতি।
গুণেভ্যঃ চ পরং বেত্তি # মদ্ভাবং সঃ অধিগচ্ছতি।।১৯।।

যদা = যখন; অনুপশ্যতি = দেখেন; গুণেভ্যঃ = গুণসমূহ থেকে; পরং = গুণাতীত; বেত্তি = জানেন; মদ্ভাবং = আমাতে ভাব অর্থাৎ আমাতে ভক্তি; অধিগচ্ছতি = লাভ করেন।। ১৯।।

অনুবাদ :- যখন দ্রষ্টা জ্ঞানী পুরুষ কার্য, কারণ ও বিষয়ের আকারে পরিণত গুণসমূহকেই কর্তা মনে করেন এবং ভাবেন যে গুণসমূহ ব্যতীত আর কোন কর্তা নাই এবং উপর্যুক্ত তিন গুণের উর্ধ্বে অন্তর্যামী অকর্তা আত্মাকে জানতে পারেন তখনই তিনি আমার ভাব অর্থাৎ আমাতে ভক্তি লাভ করেন।।১৯।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ তৃতীয় অধ্যায়ের ২৮তম শ্লোকে বলেছেন যে প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ সমস্ত কাজ করে চলেছে। এতে কোন ব্যক্তির কোন ভূমিকা নাই। যারা অজ্ঞানী তারা এই সত্যটি সঠিকভাবে জানেন না বলে তাঁদের মধ্যে 'আমি', 'আমার' এই ভ্রান্ত অহং বোধ দেখা যায়। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের অন্তরে পারমার্থিক জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত হওয়ার কারণে তাঁরা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের প্রভাব অতিক্রম করতে পারার ফলে তাঁরা সম্যক বুঝতে পারেন যে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কোন কর্মেরই কর্তা নন, তিনি যা করেন তার সমস্তই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণগুলি করে থাকে, আত্মা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়, ত্রিগুণাতীত। তখন তাঁরা ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত প্রকারের কামনা ও বাসনা মুক্ত হয়ে আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং তখনই তাঁরা পরমেশ্বরে পরা ভক্তি লাভ করেন।।১৯।।

গুণান্ এতান্ অতীত্য ত্রীন্ # দেহী দেহ-সমুদ্ভবান্।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ # বিমুক্তঃ অমৃতম্ অশ্নুতে।।২০।।

গুণান্ = গুণসমূহ; এতান্ = এই সমস্ত; অতীত্য = অতিক্রম ক'রে, ত্রীন্ =

তিন; দেহী = জীব; দেহ-সমুদ্ভবান্ = দেহ থেকে উদ্ভূত; বিমুক্তঃ = মুক্ত হয়ে; অমৃতম্ = মোক্ষ; অশ্নুতে = লাভ করেন।।২০।।

অনুবাদ :- এই দেহী অর্থাৎ জীবাত্মা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এই তিনগুণকে অতিক্রম ক'রে জন্ম, মৃত্যু, জরা, দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে অমৃতরূপ মোক্ষ লাভ করেন।।২০।।

অর্জুন উবাচ

কৈঃ লিঙ্গৈঃ ত্রীন্ গুণান্ # এতান্ অতীতো ভবতি প্রভো।
কিম্ আচারঃ কথং চ এতান্ # ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ততে।।২১।।

কৈঃ = কোন কোন; লিঙ্গৈঃ = লক্ষণের দ্বারা; ত্রীন্ গুণান = তিন গুণ থেকে; এতান্ = এই; অতীতো = মুক্ত; ভবতি = হয়; কিম্ = কেমন; আচারঃ = আচরণ; কথং চ = এবং কিভাবে; ত্রীন্ গুণান্ = তিনটি গুণকে; অতিবর্ততে = অতিক্রম করা যায়।।২১।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন — হে প্রভু! কোন কোন লক্ষণের দ্বারা বোঝা যায় যে কোনও ব্যক্তি এই-তিনটি গুণকে অতিক্রম করেছেন? ত্রিগুণ অতিক্রমকারী সেই ব্যক্তির ব্যবহার কেমন? আর তিনি কিভাবে এই তিন গুণকে অতিক্রম করেছেন? ।। ২১।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ # মোহম্ এব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি # ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।।২২।।

প্রকাশং = জ্ঞান; ন দ্বেষ্টি = বিরাগ পোষণ করেন না; সংপ্রবৃত্তানি = প্রবৃত্ত হলে; নিবৃত্তানি = নিবৃত্ত হলে অর্থাৎ দূর হলে; ন কাঙ্ক্ষতি = আকাঙ্ক্ষা করেন না।।২২।।

অনুবাদ :- (অর্জুনের প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কি তার উত্তরে) ভগবান্ বললেন— যে পুরুষ সত্ত্বগুণের ফল জ্ঞান, রজোগুণের ফল কর্মে প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের ফল অজ্ঞান ও মোহ- এই সব লাভ করলে তাদের প্রতি বিরাগ পোষণ করেন না আবার এই বিষয়গুলি অন্তর থেকে দূর হয়ে গেলে তাদেরকে পাবার আকাঙ্ক্ষা করেন না তিনি সমস্ত গুণ অতিক্রম করেছেন ব'লে গণ্য হন।।২২।।

উদাসীনবৎ আসীনো # গুণৈঃ যঃ ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইতি এব # যঃ অবতিষ্ঠতি ন ইঙ্গতে।।২৩।।

উদাসীনবৎ = উদাসীনের মত; আসীনো = অবস্থিত; গুণৈঃ = তিনটি গুণের

কাজের দ্বারা; যঃ ন বিচাল্যতে = যিনি বিচলিত হন না; গুণা বর্তন্তে = গুণসমূহ নিজের নিজের কাজ করছে; ইতি এবং = এই রকম মনে ক'রে; যঃ অবতিষ্ঠতি = যিনি অবস্থান করেন; ন ইঙ্গতে = চঞ্চল হন না।।২৩।।

অনুবাদ :- যিনি উদাসীনের মত অবস্থিত হয়ে তিনটি গুণের কাজের দ্বারা বিচলিত না হয়ে মনে করেন যে গুণসমূহ নিজের নিজের কাজ করছে এবং গুণসমূহের সেই সমস্ত কাজের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নাই এবং এই রকম মনে ক'রে যিনি অচঞ্চল চিত্তে পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে চলেন তাঁর মধ্যে কখনও চিত্তচাঞ্চল্য দেখা যায় না (তিনি গুণসমূহের প্রভাব অতিক্রম করেছেন বলা হয়)।।২৩।।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ # সম-লোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ।

তুল্য প্রিয় অপ্রিয়ো ধীরঃ # তুল্য নিন্দা-আত্ম-সংস্তুতিঃ।।২৪।।

স্বস্থঃ = আত্মস্বরূপে অবস্থিত অর্থাৎ নিজের মধ্যেই নিজে থাকেন; লোষ্ট = মাটির পিণ্ড বা ঢিল; অশ্ম- = পাথরের খণ্ড; কাঞ্চনঃ = সোনা; সংস্তুতিঃ = প্রশংসা।।২৪।।

অনুবাদ :- যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিত অর্থাৎ নিজের মধ্যেই নিজে থাকেন, যাঁর নিকট সুখ ও দুঃখ দুই সমান, যিনি মাটির পিণ্ড বা ঢিল, পাথরের খণ্ড অথবা সোনা সকলকেই সমান চোখে দেখেন অর্থাৎ যাঁর কাছে কোনটিই মূল্যবান বা মূল্যহীন নয়, যিনি প্রিয় বা অপ্রিয় যেটিই লাভ করুন না কেন উভয় ক্ষেত্রেই শান্ত ধীর থাকেন, যাঁর নিকট নিন্দা বা প্রশংসা সমতুল্য অর্থাৎ যাঁকে কেউ নিন্দা করলে ক্রুদ্ধ বা প্রশংসা করলে আনন্দে উদ্বেলিত হন না (তিনি গুণসমূহের প্রভাব অতিক্রম করেছেন বলা হয়)।।২৪।।

মান-অপমানয়োঃ তুল্যঃ # তুল্যো মিত্র অরি-পক্ষয়োঃ।

সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী # গুণাতীতঃ স উচ্যতে।।২৫।।

অরি = শত্রু ; সর্ব-আরম্ভ = সকল প্রচেষ্টা; গুণাতীতঃ = গুণসমূহের প্রভাব অতিক্রম করেছেন; উচ্যতে = বলা হয়।।২৫।।

অনুবাদ :- যাঁর কাছে মান, অপমান, বন্ধু, শত্রু সমস্তই সমতুল্য, যিনি দেহধারী হয়েও সমস্ত প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেছেন তিনি গুণসমূহের প্রভাব অতিক্রম করেছেন বলা হয়।।২৫।।

ব্যাখ্যা :- সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী পদটির অর্থ কি? 'আরম্ভ' শব্দের অর্থ হল উদ্যোগ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণাতীত পুরুষের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, এবং বুদ্ধিদ্বারা যা কিছু শাস্ত্রানুকূল কর্ম প্রারব্ধানুসারে মানুষকে খারাপ পথ থেকে

তুলে এনে ভালো পথে স্থাপন করার উদ্দেশ্যে করা হয় তাকেই 'আরম্ভ' বলা হয়। শঙ্করাচার্য তাঁর গীতা ভাষ্যে বলেছেন যে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফললাভের জন্য যে সমস্ত কর্ম করা হয় তাকে 'আরম্ভ' বলা হয়— "দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি কর্মাণি আরভ্যন্তে ইতি আরম্ভাঃ"।

আবার বলেছেন — 'ইহামুত্রফলভোগার্থানি কামহেতূনি কর্মাণি সর্বারম্ভা' অর্থাৎ ইহ" অর্থাৎ এই ইহলোকে এবং 'অমুত্র' অর্থাৎ পরলোকে ফলভোগের জন্য যে সমস্ত কামনামূলক কর্ম করা হয় তাদেরকে 'সর্বারম্ভ' বলা হয়। তারপর তিনি বলেছেন - "তান্ পরিত্যক্তং শীলম্ অস্য ইতি সর্বারম্ভপরিত্যাগী" অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্মসমূহকে পরিত্যাগ করার 'শীল' অর্থাৎ স্বভাব যাঁর তাঁকে "সর্বারম্ভ পরিত্যাগী" বলা হয়। অর্থাৎ ভগবান্ এই কথার দ্বারা বলেছেন যে অন্তরে পার্থিব বা পারমার্থিক যে কোন ফলভোগের বাসনা নিয়ে যে কর্ম করা হয় সেগুলি কর্মবন্ধনের কারণ এবং তাদেরকে অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করার স্বভাব গড়ে তুলতে না পারলে কারোরই পক্ষে তাঁর প্রিয়ভক্ত হওয়া সম্ভব নয়।।২৫।।

মাং চ যঃ অব্যভিচারেণ # ভক্তিযোগেন সেবতে।

স গুণান্ সমতীত্য এতান্ # ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।২৬।।

মাং = আমাকে; যঃ = যিনি; অব্যভিচারেণ = একনিষ্ঠভাবে; ভক্তিযোগেন = ভক্তিযোগের দ্বারা; সেবতে = ভজনা করেন; গুণান্ = গুণসমূহ; সমতীত্য = অতিক্রম ক'রে; এতান্ = এই সমস্ত; ব্রহ্মভূয়ায় = ব্রহ্মভাব লাভের যোগ্য; কল্পতে = বিবেচিত হন।। ২৬।।

অনুবাদ :- যিনি একনিষ্ঠভাবে ভক্তিযোগের দ্বারা আমার ভজনা করেন তিনি এই সমস্ত গুণসমূহ অতিক্রম ক'রে ব্রহ্মভাব লাভ করতে পারেন।।২৬।।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠা অহম্ # অমৃতস্য অব্যয়স্য চ।

শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য # সুখস্য ঐকান্তিকস্য চ।।২৭।।

ব্রহ্মণঃ = ব্রহ্মের; হি = নিশ্চয়ই; প্রতিষ্ঠা = আশ্রয়; অহম্ = আমি।।২৭।।

অনুবাদ :- কারণ আমিই সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম যিনি অবিনাশী, নির্বিকার, শাশ্বত ধর্মস্বরূপ যাঁকে জ্ঞানযোগরূপ ধর্মদ্বারা লাভ করা যায় এবং যিনি ঐকান্তিক সুখস্বরূপ অর্থাৎ ব্যভিচারহীন আনন্দময় সেই ব্রহ্মের আমিই পরম আশ্রয়।।২৭।।

—: চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত :—

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তমযোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ

ঊর্ধ্বমূলম্ অধঃশাখম্ # অশ্বত্থং প্রাহুঃ অব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি # যস্তং বেদ স বেদবিৎ।।১।।

* যস্তং = যঃ তং

ঊর্ধ্বমূলম্ = যার মূল উপর দিকে; অধঃশাখম্ = যার শাখা নিচের দিকে; প্রাহুঃ = বলেন; অব্যয়ম্ = অবিনাশী; ছন্দাংসি = বেদসমূহ; যস্য = যার; পর্ণানি = পাতা; যঃ = যিনি; তং = তাঁকে; বেদ = জানেন; স = তিনি; বেদবিৎ = বেদজ্ঞ।।১।।

অনুবাদ :- ভগবান্ বললেন - সংসার একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় যার মূল উপরের দিকে, শাখা নিচের দিকে। এই গাছ অবিনাশী। বেদসমূহ হল এই বৃক্ষের পাতা। যিনি এই বৃক্ষকে সম্যকভাবে জানেন তিনি বেদজ্ঞ।।১।।

ব্যাখ্যা :- শাস্ত্রে অশ্বত্থবৃক্ষকে সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র মনে করা হয়। সেইজন্য ভগবান্ সংসারকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভগবান্ বলেছেন যে সংসাররূপী এই বৃক্ষের মূল উপরের দিকে এবং শাখাগুলি নিচের দিকে অবস্থিত। কঠোপনিষদের ২।৩।১ মন্ত্রেও সংসারকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এই বৃক্ষের মূল উপরের দিকে এবং শাখা নিচের দিকে --- "ঊর্ধ্বমূলঃ অবাক্শাখ এষঃ অশ্বত্থঃ সনাতনঃ।" বাস্তবদৃষ্টিতে আমরা যে সমস্ত অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখে থাকি তাদের শাখার উপরের দিকে শাখামূল উৎপন্ন হয় এবং শাখাগুলি নিচের দিকে ঝুলে থাকে। কিন্তু এখানে 'মূল' শব্দটি 'শিকড়' অর্থে নয়, তত্ত্বগতভাবে 'কারণ' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সংসারবৃক্ষের সৃষ্টি ও বিস্তার করেছেন স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ। সেইজন্য তিনি এই সংসারবৃক্ষের মূল অর্থাৎ কারণ। শাস্ত্রে অবস্থান অনুযায়ী

ক্রমশ নিচে থেকে উপর পর্যন্ত বায়ুলোক, চন্দ্রলোক, বিদ্যুৎলোক, সূর্যলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক প্রভৃতি বিভিন্ন লোকের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সমস্ত লোকের ঊর্ধ্বে হল ব্রহ্মলোক যেখানে ব্রহ্মা বাস করেন এবং সকল লোকের অধিপতি হলেন নারায়ণ। যেহেতু নারায়ণই সংসারবৃক্ষের মূল স্রষ্টা এবং যেহেতু তিনি সকলের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন সেইজন্য বলা হয়েছে যে এই সংসারবৃক্ষের মূল অর্থাৎ কারণ উপরের দিকে থাকে।

নারায়ণ যখন সংসার সৃষ্টি করেন তখন তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেন ব্রহ্মাকে। সেইজন্য যেহেতু তিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন সেইজন্য ব্রহ্মা এই সংসার বৃক্ষের শাখাস্বরূপ। প্রথমে বৃক্ষের জন্ম হয় এবং তারপর তার অপর শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মা নারায়ণের অধীন। সেইজন্য শাখারূপ ব্রহ্মার স্থান নারায়ণের নিচে এবং অন্যান্য শাখা যথা—দেবতা, মানুষ, পশু, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদির অবস্থান যোগ্যতা অনুযায়ী পরপর নিচের দিকে। সেই কারণে বলা হয়েছে যে সংসারবৃক্ষের শাখা নিচের দিকে।

এখানে সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে অবিনাশী বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অশ্বত্থ বৃক্ষ অমর হয় না। কোন না কোন মানুষ কখনও না কখনও কোন না কোন অশ্বত্থবৃক্ষকে মরতে দেখে। কিন্তু সংসার বৃক্ষ অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান এবং তার অন্তিমকাল দর্শন করা কারোরই পক্ষে সম্ভব হয় না। একমাত্র প্রলয়কালেই সংসারবৃক্ষের সাময়িকভাবে অন্ত হয়ে থাকে এবং ভগবানের ইচ্ছায় আবার তার পুনরাবির্ভাব হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই প্রলয়কাল দর্শন করা সম্ভব নয়। সেইজন্য এই সংসারবৃক্ষকে অবিনাশী বলা হয়েছে। তাছাড়া নারায়ণ হলেন এই বৃক্ষের মূল এবং তিনি অবিনাশী। বৃক্ষের মূল যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন গাছের মৃত্যু হবে না। সেই জন্যও সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে অবিনাশী বলা হয়েছে।

ভগবান্ বেদসমূহকে সংসাররূপ বৃক্ষের পত্ররূপে বর্ণনা করেছেন। বৃক্ষে আগে শাখার জন্ম হয় তারপর তার অগ্রভাগে পত্রের সৃষ্টি হয়। ভগবান্ প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং তারপর ব্রহ্মার নিকট থেকে বেদসমূহ সৃষ্টি হয়। ফলে যেহেতু ব্রহ্মাকে শাখাস্বরূপ বলা হয়েছে সেইজন্য তাঁর সৃষ্ট বেদসমূহকে সেই শাখাস্থিত পত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বৃক্ষের পত্ররাজি যেমন বৃক্ষের রক্ষা ও বৃদ্ধির কাজ করে, বেদসমূহও তেমনই ধর্ম-অধর্ম, তার কারণ এবং ফলকে

প্রকাশিত ক'রে এই সংসাররূপ বৃক্ষকে রক্ষা ও বর্ধিত করে। সেইজন্য বেদসমূহকে সংসার বৃক্ষের পত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবান্ বলেছেন যে, যিনি সংসাররূপ এই অশ্বত্থবৃক্ষের তত্ত্ব সম্যক জানেন তিনি বেদজ্ঞ। বস্তুত মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল মোক্ষলাভ। মানুষ যদি সংসারের প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত হতে না পারে তাহলে তার মোক্ষলাভের কোন রাস্তা নাই। সেইজন্য মানুষকে মোক্ষলাভের জন্য এই সংসারবৃক্ষের বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। কিন্তু কোন শক্ত বৃক্ষকে ছেদন করতে গেলে ধারালো অস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু সেই অস্ত্র সে কোথায় পাবে? বেদ হল সেই অস্ত্র যার জ্ঞান ও তদ্বিহিত কর্মানুষ্ঠান মানুষকে সংসারের বন্ধন ছিন্ন করতে সাহায্য করে। বেদের সম্যক জ্ঞান মানুষকে জানায় যে এই সংসারবৃক্ষের মূল হলেন সচ্চিদানন্দঘন নারায়ণ এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাঁরই অংশ এবং এই সংসার নশ্বর কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্য। মূলসহিত এই সংসারবৃক্ষ ব্যতীত অন্য কোনই জানার বস্তু নাই। সেই জন্য ভগবান্ বলেছেন যে, যিনি এই সংসাররূপ বৃক্ষের মূল থেকে পত্র পর্যন্ত অর্থাৎ নারায়ণ থেকে বেদ পর্যন্ত যথার্থভাবে জানেন তিনি সর্বজ্ঞ হন এবং তাঁর পক্ষে মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হওয়ার পথে অপারগতা থাকে না।

এই প্রসঙ্গে সাধারণ পাঠকের জ্ঞাতার্থে বেদ শব্দের অর্থ কি তা আলোচনা করা প্রয়োজন। বেদ শব্দের অর্থ নিম্নরূপ—

(১) "বিদ্ জ্ঞানে" — এই এই ধাতু থেকে বেদ শব্দ এসেছে যার অর্থ হল যে বেদ হল সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার;

(২) "বিদ্ বিচারণে" — এই ধাতু থেকেও বেদ শব্দ নিষ্পন্ন হয় যার অর্থ হয় যে ঐহিক অর্থাৎ জড়জগতের বিষয় বিবেচনা করার সময় পারমার্থিক বিষয় বিবেচনা করা যায় যার সাহায্যে তাকে বেদ বলা হয়;

(৩) "বিদ্ সত্তায়াম্" — এই ধাতু থেকেও বেদ শব্দ নিষ্পন্ন হয় যার অর্থ হয় যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সারমর্ম যার সাহায্যে জানা যায় তাকে বেদ বলা হয়;

(৪) "বিদ্ লৃ লাভে" — এই ধাতু থেকে বেদ শব্দ নিষ্পন্ন করা হলে বেদ শব্দের অর্থ হয় যে যার অনুশীলনের সাহায্যে ঐহিক জগতের মধ্যে থেকেও ব্রহ্মানন্দ সুখ অর্থাৎ ব্রহ্মের অনুভব বা জ্ঞান লাভের মাধ্যমে চিদানন্দ লাভ করা যায় তাকে বেদ বলা হয়।।১।।

অধশ্চ ঊর্দ্ধং প্রসৃতাঃ তস্য শাখা # গুণ-প্রবৃদ্ধা বিষয়-প্রবালাঃ।

অধশ্চ মূলানি অনুসন্ততানি # কর্ম-অনুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে।।২।।

* অধশ্চ = অধঃ চ

প্রসৃতাঃ = বিস্তৃত; তস্য = তার; গুণ-প্রবৃদ্ধা = গুণত্রয় দ্বারা বর্ধিত; বিষয়-প্রবালাঃ = বিষয়রূপ পল্লব বা ডাল বিশিষ্ট; মূলানি = মূলসমূহ; অনুসন্ততানি = সদা বিস্তৃত হচ্ছে; কর্ম-অনুবন্ধীনি = কর্মপ্রবাহসমূহ।।২।।

অনুবাদ :- এই বৃক্ষের শাখাসমূহ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের দ্বারা নিম্ন ও উপরদিকে বর্ধিত হয়। যে শাখাগুলি তমোগুণের দ্বারা বর্ধিত হয় তারা নিম্নমুখী, যেগুলি রজোগুণের দ্বারা বর্ধিত হয় সেগুলি সমানভাবে থাকে এবং যেগুলি সত্ত্বগুণের দ্বারা বর্ধিত সেগুলি ঊর্দ্ধমুখী। বিষয়সমূহ এই বৃক্ষের পল্লব বা ডাল। মনুষ্যলোকে কর্মের ফল অনুসন্ধানকারী জটাগুলি সদা নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে।।২।।

ব্যাখ্যা :- সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ব্রহ্মা থেকে অন্যান্য দেবতাসমূহ, মনুষ্য-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি এই বৃক্ষের শাখাস্বরূপ। মানুষ সত্ত্বগুণের দ্বারা কর্ম করলে তার উচ্চ কুলে জন্ম হয় কিন্তু তমোগুণের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে অসৎ কর্ম করলে তার জন্ম হয় পশু-কীটপতঙ্গাদি নিম্নকুলে। মানুষের বাসনা ক্রমাগত কর্মের ফল অনুসন্ধান ক'রে বেড়ায় অর্থাৎ মনের বাসনা মনকে কর্মের ফলের প্রতি আসক্ত করে। ফলে কর্মবন্ধন সৃষ্টি করে। সংসারবৃক্ষের উপরিভাগে অবস্থিত জড় অর্থাৎ শিকড়গুলি হল মনের সেই বাসনা যা মানুষকে নিম্নগামী করে।।২।।

ন রূপম্ অস্য ইহ তথা উপলভ্যতে ন অন্তো ন চ আদিঃ ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থম্ এনং সুবিরূঢ়মূলম্ অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।।৩।।
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গত্বা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চ আদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।।৪।।

অস্য = এই বৃক্ষের; ইহ = এই জগতে; উপলভ্যতে = পাওয়া যায়; সংপ্রতিষ্ঠা = সম্যক স্থিতি; এনং = এই; সুবিরূঢ়মূলম্ = অত্যন্ত দৃঢ় মুল বিশিষ্ট; অসঙ্গশস্ত্রেণ = বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা; দৃঢ়েন ছিত্ত্বা = ছিন্ন ক'রে; ততঃ = তারপর; পদং তৎ = ভগবানের চরণ; পরিমার্গিতব্যং = খোঁজ করা কর্তব্য; যস্মিন্ গত্বা = যা লাভ

করলে; ন নিবর্তন্তি = পুনর্জন্ম হয় না; ভূয়ঃ = পুনরায়; তমেব = সেই; আদ্যং পুরুষং = আদি পুরুষকে; প্রপদ্যে = শরণ গ্রহণ করছি; যতঃ = যেখান থেকে; প্রবৃত্তিঃ = সংসার প্রবাহ; প্রসৃতা = বিস্তৃত হয়েছে; পুরাণী = চিরন্তন।। ৩-৪।।

অনুবাদ :- এই জগতে এইরূপ কোন বৃক্ষ পাওয়া যায় না। এর না আছে আদি, না আছে অন্ত, এর স্থিতিও বুঝতে পারা যায় না। এই দৃঢ়মূল বৃক্ষকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদন ক'রে আমি সেই আদিপুরুষের শরণ গ্রহণ করলাম এই দৃঢ় ব্রত নিয়ে তারপর সেই পরম পুরুষের শ্রীচরণ অন্বেষণ করা উচিৎ। সেই পরমপদ একবার লাভ করতে পারলে আর পুনর্জন্মরূপ আবর্তে ফিরে আসতে হয় না।।৩-৪।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ যদিও এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে এই সংসারবৃক্ষের কথা বলেছেন তথাপি তিনি নিজেই উপর্যুক্ত দুটি শ্লোকে বলছেন যে শাস্ত্রে এই বৃক্ষের যে রূপ বর্ণনা করা হয়েছে তাকে সেইভাবে কেউই উপলব্ধি করতে পারে না কারণ এর আদি, অন্ত বা স্থিতি নাই।

সেইজন্য শঙ্করাচার্য তাঁর গীতা ভাষ্যে ভগবান্ কথিত এই বৃক্ষকে স্বপ্নবৎ, মরীচিকার জল ও মায়ারচিত নগরীর সমান বলেছেন যা দেখতে দেখতে নষ্ট হয়ে যায় এবং এই কারণে তার অন্ত না থাকার জন্য তার সমাপ্তিও নাই—"স্বপ্নমরীচ্যুদকমায়াগন্ধর্বনগরসমত্বাদ্ দৃষ্টনদৃষ্টস্বরূপো হি স ইতি অত এব ন অন্তো ন পর্যন্তো নিষ্ঠা সমাপ্তিঃ বা বিদ্যতে।" সেইজন্য এই বৃক্ষের প্রভাব মন থেকে সম্পূর্ণ দূর ক'রে ফেলা অতীব দুষ্কর। বাহ্যিকভাবে এই বৃক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেও অন্তরে অহঙ্কার, বাসনা, আসক্তি প্রভৃতি সব থেকে যায়। ফলে এই সংসারবৃক্ষকে মন থেকে উচ্ছেদ করা যায় না। সেইজন্য ভগবান্ বলছেন যে অন্তরে বিষয়ের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য তৈরী হলে তবেই তার দ্বারা সংসারবৃক্ষকে ছেদন করা যাবে এবং তারপরেই সেই পরম পদের অন্বেষণ করা কর্তব্য এবং একবার সেই পরম পদ লাভ করতে পারলে আর পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর কালচক্রে পতিত হতে হয় না অর্থাৎ তখন মোক্ষ লাভ হয়।।৩-৪।।

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা # অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসজ্ঞৈঃ # গচ্ছন্তি অমূঢ়াঃ পদম্ অব্যয়ং তৎ।।৫।।

নির্মানমোহাঃ = মান ও মোহরহিত (নিঃ অর্থাৎ নাই মান যার = নির্মান);

জিতসঙ্গদোষাঃ = আসক্তিরূপ দোষবর্জিত; অধ্যাত্মনিত্যাঃ = আত্ম-জ্ঞান নিরত; বিনিবৃত্যকামাঃ = বিশেষভাবে কামনাশূন্য; বিমুক্তাঃ = মুক্ত; সুখদুঃখসজ্ঞৈ দ্বন্দ্বৈঃ = সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব থেকে; গচ্ছন্তি = লাভ করেন; অমূঢ়াঃ = যাঁদের অবিদ্যা দূর হয়েছে সেই বিবেকী পুরুষগণ; পদম্ = পরম পদ; অব্যয়ং = শাশ্বত।।৫।।

অনুবাদ :- যে ব্যক্তির অন্তরে অভিমান ও মোহের বোধ নাই, যিনি বিষয়ের প্রতি আসক্তি দোষ বর্জন করেছেন, যিনি সদা অধ্যাত্ম চিন্তায় ডুবে থাকেন, যাঁর অন্তরে কোন প্রকার কামনা-বাসনা নাই, যিনি অন্তরে সুখ-দুঃখ বোধের দ্বন্দ্ব অনুভব করেন না এবং যাঁর হৃদয় থেকে অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয়েছে সেই বিবেকী পুরুষ শাশ্বত পরমপদ লাভ করেন।।৫।।

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো # ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যৎ গত্বা ন নিবর্তন্তে # তদ্ধাম পরমং মম।।৬।।

ভাসয়তে = প্রকাশ করে; শশাঙ্কঃ = চন্দ্র; পাবকঃ = অগ্নি, যৎ গত্বা = যাঁকে লাভ করলে; ন নিবর্তন্তে = ফিরে আসেন না; তদ্ধাম পরমং মম = আমার পরম ধাম।।৬।।

অনুবাদ :- সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি যে ধামকে প্রকাশ করতে পারে না, যে পদ লাভ করলে সাধক আর সংসারে ফিরে আসেন না সেইটিই হল আমার অব্যয় পরম ধাম অর্থাৎ আমার স্বরূপ।।৬।।

ব্যাখ্যা :- ভগবানের পরম ধাম কেমন তার স্বরূপের বর্ণনা দিয়ে বৃহজ্জাবাল উপনিষদের অষ্টম ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে যেখানে সূর্য কিরণ দেয় না, যেখানে বায়ু বয় না, যেখানে চন্দ্র কিরণ প্রদান করে না, যেখানে তারকাগণ জ্বলজ্বল করে না, যেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না, যেখানে মৃত্যু প্রবেশ করতে পারে না, দুঃখ প্রবেশ করতে পারে না, যেখানে যোগী প্রবেশ করলে তাঁকে আর জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে ফিরে আসতে হয় না সেইটিই হল সদানন্দ, পরমানন্দ, শান্ত সনাতন, সদা কল্যাণস্বরূপ, ব্রহ্মাদি দেবতাদির দ্বারা বন্দিত যোগিগণের সর্বদা ধ্যেয় ভগবানের পরম পদ অর্থাৎ ভগবানের পরম ধাম— "যত্র ন সূর্যস্তপতি যত্র ন বায়ুর্বাতি যত্র ন চন্দ্রমা ভাতি যত্র ন নক্ষত্রাণি ভান্তি যত্র ন অগ্নিঃ দহতি যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি যত্র ন দুঃখানি প্রবিশন্তি সদানন্দং পরমানন্দং শান্তং শাশ্বতং সদাশিবং ব্রহ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেয়ং পরং পদং যত্র গত্বা ন নিবর্তন্তে যোগিনঃ।"

অনুরূপভাবে কঠোপনিষদের ২।২।১৫ মন্ত্রেও বলা হয়েছে —

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং ন ইমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতঃ অয়ম্ অগ্নিঃ।
তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি।।

অর্থাৎ সেই পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মাকে সূর্য প্রকাশ করে না, চন্দ্রতারকাও প্রকাশ করে না, অগ্নিরও ক্ষমতা নাই তাঁকে প্রকাশ করার। তিনি স্বয়ং প্রকাশমান। তাঁর দ্বারাই নিখিল জগৎ আলোকিত হয়। সেই জন্যই নিখিল জগৎ বিভিন্নভাবে দৃশ্যমান হয়।

এই শ্লোকে ভগবান্ বলেছেন যে সূর্য বা চন্দ্র বা অগ্নি কেউই তাঁর সেই পরম পদ অর্থাৎ পরম ধামকে প্রকাশ করতে পারে না। ভগবানের এই কথার অর্থটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। রাত্রিকালে যখন আকাশে সূর্য বা চন্দ্র থাকে না বা আগুন জ্বালানো হয় না তখন চারিদিকের বস্তুকে দেখা যায় না। কিন্তু যখনই আকাশে সূর্য বা চন্দ্রের উদয় হয় বা আগুন জ্বালানো যায় তখনই তার আলোয় চারিদিকের সকল বস্তু চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে অর্থাৎ সূর্য, বা চন্দ্র বা অগ্নি সেই সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করে। কিন্তু যদি একটি টর্চকে সূর্যের দিকে মুখ ক'রে জ্বালানো যায় তাহলে সূর্য মোটেই তার দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠে না কারণ সূর্যই সেই টর্চটিকে প্রকাশ করে অর্থাৎ সূর্য হল টর্চটির প্রকাশক। কেউ কোনদিন তারই প্রাকাশককে প্রকাশ করতে পারে না। অনুরূপভাবে পরব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানই তাঁর স্বীয় প্রভায় সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি সমস্ত বস্তুকেই প্রকাশ ক'রে থাকেন অর্থাৎ আলোকিত করেন। সুতরাং পরমাত্মাই হলেন সূর্য, চন্দ্র, অগ্নিসহ এই মহাবিশ্বের সকলের প্রকাশক। সুতরাং ঐ সমস্ত বস্তুর সাধ্য কি যে তারা তাদেরই মহান প্রকাশকর্তাকেই প্রকাশ করে?

এখানে ভগবানের পরম ধাম বলতে যা বোঝানো হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সেটি স্বয়ং ভগবানেরই নামান্তর। ভগবানের এই নিত্যধামই হল তাঁর সেই সচ্চিদানন্দঘন চির অবিনাশী শাশ্বত নিত্য ব্রহ্মেরই স্বরূপ।।৬।।

মম এব অংশো জীবলোকে # জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি # প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।।৭।।

মম এব = আমারই; জীবলোকে = এই জগতে; জীবভূতঃ = বিভিন্নাংশ জীব; সনাতনঃ = শাশ্বতঃ; মনঃ ষষ্ঠানি = মন এবং অপর পঞ্চ ইন্দ্রিয় মোট ছয়টি ইন্দ্রিয়;

ইন্দ্রিয়াণি = ইন্দ্রিয়সমূহকে; প্রকৃতিস্থানি = প্রকৃতিতে অবস্থিত; কর্ষতি = আকর্ষণ করে।। ৭।।

অনুবাদ :- এই জগতের সকল জীব আমারই সনাতন অংশ। তারা জীবলোকে প্রকৃতিতে অবস্থিত মন সহিত ছয়টি ইন্দ্রিয়কে সংসারে আকর্ষণ করে।।৭।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলছেন যে সমগ্র জীবকুল তাঁরই অংশ। এরা কেউই ঈশ্বর নয়। কিন্তু অজ্ঞানী মানুষ এদেরকেই ঈশ্বর ভেবে ভুল করে। এই জীবাত্মা দেহরূপ জীবলোকে অবস্থান করে এবং সেই দেহ পরিত্যাগ ক'রে যখন সে যে দেহে গমন করে তখন সে মন এবং অপর পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে এবং সঙ্গে ক'রে সেই দেহে নিয়ে যায়।

জীব যে ব্রহ্মের অংশ সেকথা ঋগ্বেদেও বলা হয়েছে — "পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি" (ঋগ্বেদ, ১০।৯০।৩)। অর্থাৎ জীবসমূহ তাঁরই একটি "পাদ" অর্থাৎ অংশ (এক চতুর্থাংশ নয়)। জীব কখনও পরমাত্মা হতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে — "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" (২।৩।৪৩)। একটি পাতা গাছের অংশ কিন্তু সেটি একটি পূর্ণবৃক্ষ নয়। তেমনই জীব পরমাত্মা পূর্ণব্রহ্মের অংশ, কিন্তু সে কখনও পরমাত্মা পূর্ণব্রহ্ম হতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে — "প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ" (২।৩।৪৬)। অর্থাৎ সূর্যের প্রভা নিঃসন্দেহে সূর্যের অংশ কিন্তু সূর্যের স্বরূপ ও স্বভাব তার প্রভার থেকে ভিন্ন। তেমনই জীব ব্রহ্মের অংশ হলেও ব্রহ্মের স্বভাব ও স্বরূপ জীবের স্বভাব ও স্বরূপ থেকে ভিন্ন।

পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে 'জীবাত্মা' কেন বলা হয় সেই বিষয়টি আর একটু ব্যাখ্যা ক'রে বলা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে আত্মা ও পরমাত্মাতে কোন প্রভেদ নাই। আত্মা হল পরমাত্মারই অংশবিশেষ। তাহলে জীবাত্মা কাকে বলে? জীবের দেহ প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু আত্মা এই তিন গুণ থেকে মুক্ত। সেই আত্মা যখন এই তিন গুণের দ্বারা পরিচালিত জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করেন তখন তাঁকে জীবাত্মা বলা হয়।।৭।।

শরীরং যৎ অবাপ্নোতি # যৎ চ অপি উৎক্রামতি ঈশ্বরঃ।
গৃহীত্বা এতানি সংযাতি # বায়ুঃ গন্ধান্ ইব আশয়াৎ।।৮।।

যৎ = যখন; অবাপ্নোতি = লাভ করে; অপি = ও; উৎক্রামতি = পরিত্যাগ

করে; গৃহীত্বা = গ্রহণ ক'রে; এতানি = এই ছয় ইন্দ্রিয়কে; সংযাতি = গমন করে; আশয়াৎ = ফুল থেকে।।৮।।

অনুবাদ :- এই শরীরের অধীশ্বর জীবাত্মা যখন কোন শরীর পরিত্যাগ এবং যখন কোন দেহ গ্রহণ করেন। তখন বাতাস যেমন ফুলের মধ্যে থেকে গন্ধকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায় তেমনই জীবও তার সঙ্গে মন সহ অপর পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ ক'রে সঙ্গে নিয়ে যান।।৮।।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ # রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনঃ চ অয়ং # বিষয়ান্ উপসেবতে।।৯।।

শ্রোত্রং = কর্ণ; স্পর্শনং = ত্বক; চ = এবং; রসনং = জিহ্বা; ঘ্রাণমেব = নাসিকা; অধিষ্ঠায় = আশ্রয় ক'রে; অয়ং = এই জীব; বিষয়ান্ উপসেবতে = বিষয় ভোগ করে।।৯।।

অনুবাদ :- চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং তার সঙ্গে মন এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় ক'রে এই বদ্ধজীবসমূহ শব্দাদি বিষয়সকল ভোগ করে।। ৯।।

ব্যাখ্যা :- রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ— ইন্দ্রিয় সমূহের এই পাঁচটি বিষয়কে শব্দাদি বিষয় বলা হয়।। ৯।।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বা অপি # ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া ন অনুপশ্যন্তি # পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।।১০।।

* নানুপশ্যন্তি = ন অনুপশ্যন্তি

উৎক্রামন্তং = দেহ পরিত্যাগ করার সময়; স্থিতং বা অপি = দেহে অবস্থান কালে; ভুঞ্জানং = বিষয় ভোগ কালে; গুণান্বিতম্ = প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণের প্রভাবে; বিমূঢ়া = মূঢ় ব্যক্তিগণ; ন অনুপশ্যন্তি = দেখতে পায় না; পশ্যন্তি = দেখতে পায়; জ্ঞানচক্ষুষঃ = বিবেকী পুরুষগণ যাদের জ্ঞান চক্ষু আছে।।১০।।

অনুবাদ :- সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ দ্বারা গঠিত দেহে জীবাত্মা কিভাবে অবস্থান করে, বিষয় ভোগ করে বা কিভাবে দেহান্তরে গমন করে তা অজ্ঞ ও মূঢ় ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু বিবেকী জ্ঞানিগণ তাঁদের জ্ঞানচক্ষুর মাধ্যমে তা সম্যক অনুধাবন করতে পারেন।।১০।।

যতন্তো যোগিনঃ চ এনং # পশ্যন্তি আত্মনি অবস্থিতম্।
যতন্তঃ অপি অকৃত আত্মানো # ন এনং পশ্যন্তি অচেতসঃ।।১১।।

যতন্তঃ = যত্নবান; যোগিনঃ = যোগিগণ; এনং = এই আত্মাকে; পশ্যন্তি = দেখতে পান; আত্মনি = নিজ দেহে; অকৃত-আত্মানঃ = অশুদ্ধচিত্ত; এনং = এই আত্মাকে; অচেতসঃ = বিবেকহীনব্যক্তিগণ।।১১।।

অনুবাদ :- সাধন ভজনে যত্নবান যোগিগণ এই আত্মাকে নিজ দেহে অবস্থিত দেখতে পান। কিন্তু অশুদ্ধচিত্ত অবিবেকী ব্যক্তিগণ চেষ্টা করেও এই আত্মাকে দেখতে পান না।।১১।।

যদ্ আদিত্যগতং তেজো # জগৎ ভাসয়তে অখিলম্।
যৎ চন্দ্রমসি যৎ চ অগ্নৌ # তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্।।১২।।

যৎ = যে; আদিত্যগতং = সূর্যস্থিত; ভাসয়তে = আলোকিত করে; অখিলম্ = সম্পূর্ণ; তৎ তেজঃ = সেই তেজ; বিদ্ধি = জানবে; মামকম্ = আমার।।১২।।

অনুবাদ :- সূর্য এবং চন্দ্র ও অগ্নিতে অবস্থিত যে তেজ সমগ্র জগতকে আলোকিত করে সে সমস্তই আমার তেজ ব'লে জানবে।। ১২।।

গাম্ আবিশ্য চ ভূতানি # ধারয়ামি অহম্ ওজসা।
পুষ্ণামি চ ওষধীঃ সর্বাঃ # সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।।১৩।।

গাম্ = পৃথিবীতে; আবিশ্য = প্রবেশ ক'রে; ভূতানি = জীব সমুদায়কে; ধারয়ামি = ধারণ করি; অহম্ = আমি; ওজসা = নিজের শক্তি দ্বারা; পুষ্ণামি = বর্ধিত করি; ওষধীঃ সর্বাঃ = ওষধি সকলকে; সোমঃ = চন্দ্র; ভূত্বা = হয়ে; রসাত্মকঃ = রসময়।।১৩।

অনুবাদ :- আমি পৃথিবীতে প্রবেশ ক'রে নিজ শক্তিবলে জীবসকলকে ধারণ করি এবং আমি রসময় চন্দ্ররূপে ধান, যব প্রভৃতি ওষধিকে বৃদ্ধি করি।।১৩।।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা # প্রাণিনাং দেহম্ আশ্রিতঃ।
প্রাণ-অপান-সমাযুক্তঃ # পচামি অন্নং চতুর্বিধম্।।১৪।।

অহং = আমি; বৈশ্বানরঃ = জঠরাগ্নি; ভূত্বা = হয়ে; প্রাণিনাং = প্রাণিগণের; দেহম্ আশ্রিতঃ = দেহে অবস্থান ক'রে; প্রাণ-অপান = প্রাণ ও অপান বায়ু;

সমাযুক্তঃ = সহযোগে; পচামি = পরিপাক করি; অন্নং চতুর্বিধম্ = চার প্রকার অন্ন।।১৪।।

অনুবাদ :- আমি বৈশ্বানর অর্থাৎ জঠরাগ্নি হয়ে প্রাণিগণের দেহে অবস্থান ক'রে প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় এই চার প্রকার অন্ন পরিপাক করি।।১৪।।

সর্বস্য চ অহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতিঃ জ্ঞানম্ অপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈঃ অহম্ এব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদ্ এব চ অহম্।।১৫।।

* বেদৈশ্চ = বেদৈঃ চ

সর্বস্য = সকলের; হৃদি = হৃদয়ে; সন্নিবিষ্টঃ = অবস্থিত; মত্তঃ = আমার থেকেই; স্মৃতিঃ জ্ঞানম্ অপোহনম্ = উভয়ের নাশ; সর্বৈঃ = সকল; অহম্ এব = আমিই; বেদ্যঃ = জ্ঞেয়; বেদান্তকৃৎ = বেদান্তকর্তা; বেদবিৎ = বেদজ্ঞ।।১৫।।

অনুবাদ :- আমি নিখিল বিশ্বের সকল জীবের হৃদয়ে পরমেশ্বর হিসাবে উপস্থিত আছি। আমার দ্বারাই প্রাণিগণের জ্ঞান, স্মৃতি বিষয়ের উদ্ভব ও লোপ হয়ে থাকে। সকল বেদের আমিই প্রতিপাদ্য বিষয়, আমিই বেদান্তের কর্তা এবং বেদজ্ঞ।।১৫।।

দ্বৌ ইমৌ পুরুষৌ লোকে # ক্ষরঃ চ অক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি # কূটস্থঃ অক্ষর উচ্যতে।।১৬।।

দ্বৌ = দুই; ইমৌ = এই; পুরুষৌ = পুরুষ; লোকে = জগতে; ক্ষরঃ = নশ্বর; চ অক্ষর = অবিনাশী; সর্বাণি = সকল; ভূতানি = জীবের; কূটস্থঃ = বিকারহীন আত্মা; উচ্যতে = বলা হয়।।১৬।।

অনুবাদ :- জগতে পুরুষ দুই প্রকার — ক্ষর অর্থাৎ নশ্বর বা বিনাশীল ও অক্ষর অর্থাৎ অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জীব সমুদায় হল ক্ষর পুরুষ এবং যিনি কূটস্থ অর্থাৎ চির অপরিবর্তনশীল পুরুষ তিনি অক্ষর পুরুষ।।১৬।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে ব্যবহৃত ক্ষর, অক্ষর ও কূটস্থ শব্দ তিনটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই সৃষ্টির সকল জীবকে ক্ষর পুরুষ বলা হয়। ব্রহ্মা থেকে স্তম্ভ পর্যন্ত

সমষ্টিগতভাবে যত জীব আছে তার সবই নশ্বর এবং সবই ক্ষর পুরুষ। যদিও এদের সংখ্যা বহু তথাপি এদের জড় জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে এদের সমষ্টিকে একটিই উপাধি 'পুরুষ' দ্বারা নির্দেশ করা হয়। সেইজন্য 'পুরুষ' শব্দটি একবচনে ব্যবহার করা হয়। ক্ষর পুরুষের সম্পর্ক বিনাশশীল জড় জগতের সঙ্গে। এরা সকলেই এক সময় জন্ম গ্রহণ করে আবার এক সময় বিনষ্ট হয়ে যায়। কূটস্থ পুরুষকে অক্ষর পুরুষ বলা হয়। যে সকল মুক্ত আত্মার জড় জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না এবং নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকেন তাঁদের 'কূটস্থ' বলা হয়। তাঁরা জড় জগতের সঙ্গে সংসর্গরহিত হওয়ার কারণে জড় প্রকৃতির পরিণামস্বরূপ তাঁদেরকে ব্রহ্মাদি শরীর ধারণ করতে হয় না। সেইজন্য তাঁদের 'কূটস্থ' বলা হয়। এই ক্ষেত্রেও জড়জগতের সঙ্গে সংসর্গের অভাব হওয়ায় কূটস্থ পুরুষকেও একবচনের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কূটস্থ পুরুষ কখনই বিনাশপ্রাপ্ত হন না। সেইজন্য তাঁকে অক্ষর বলা হয়।। ১৬।।

উত্তমঃ পুরুষঃ তু অন্যঃ # পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ।
যো লোক-ত্রয়ম্ আবিশ্য # বিভর্তি অব্যয় ঈশ্বরঃ।।১৭।।

উদাহৃতঃ = বলা হয়; লোক-ত্রয়ম্ = ত্রিলোক; আবিশ্য = প্রবেশ করে; বিভর্তি = পালন করেন; অব্যয় ঈশ্বরঃ = অবিনাশী ঈশ্বর।।১৭।।

অনুবাদ :- পূর্ব কথিত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ ব্যতীত অন্য একজন পরম উত্তম পুরুষ আছেন যিনি ত্রিলোকে প্রবেশ ক'রে সকলকে পালন করেন। তিনি হলেন পরমাত্মা অবিনাশী পরমেশ্বর পুরুষোত্তম নারায়ণ।।১৭।।

যস্মাৎ ক্ষরম্ অতীতঃ অহম্ # অক্ষরাৎ অপি চ উত্তমঃ।
অতঃ অস্মি লোকে বেদে চ # প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।১৮।।

যস্মাৎ = যেহেতু; ক্ষরম্ = ক্ষরের; অক্ষরাৎ অপি = অক্ষরের থেকেও; অতঃ = অতএব; অস্মি = হই; লোকে বেদে চ = জগতে এবং বেদে; প্রথিতঃ = বিখ্যাত।১৮।।

অনুবাদ :- যেহেতু আমি ক্ষরের ঊর্ধ্বে এবং অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম সেইজন্য আমি জগতে এবং বেদসমূহে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।।১৮।।

ব্যাখ্যা :- ছান্দোগ্যোপনিষদের ৮।১২।৩ মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে উত্তম পুরুষ বলা হয়েছে — "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য

স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ” ইতি। বিষ্ণুপুরাণে (৫/১৭/৩৪) পরাশর ঋষি বলেছেন—

তস্মাদহং ভক্তিবিনম্রচেতা ব্রজামি সর্বেশ্বরমীশ্বরাণাম্।
অংশবতারং পুরুষোত্তমস্য অনাদিমধ্যান্তময়স্য বিষ্ণোঃ।।

অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর পরমেশ্বর বিষ্ণুর অংশাবতার।। ১৮।।

যো মাম্ এবম্ অসংমূঢ়ো # জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং # সর্বভাবেন ভারত।।১৯।।

যঃ = যিনি; মাম্ = আমাকে; এবম্ = এইভাবে; অসংমূঢ়ঃ = মোহমুক্ত হয়ে; জানাতি = জানেন; পুরুষোত্তমম্ = পুরুষোত্তমরূপে; সঃ = তিনি; সর্ববিদ্ = সর্বজ্ঞ; ভজতি = ভজনা করেন; মাং = আমাকে; সর্বভাবেন = সর্বপ্রকারে।।১৯।।

অনুবাদ :- হে ভারত! যে মোহমুক্ত পুরুষ আমাকে এই প্রকারে পুরুষোত্তমরূপে জানেন তিনি সমস্ত কিছুই জানেন এবং তিনি সর্বতোভাবে আমার ভজনা করেন।।১৯।।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্ # ইদম্ উক্তং ময়া অনঘ।
এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ # কৃতকৃত্যশ্চ ভারত।।২০।।

* কৃতকৃত্যশ্চ = কৃতকৃত্যঃ চ।

গুহ্যতমং শাস্ত্রম্ = পরম গোপনীয় শাস্ত্র; ইদম্ = এই; উক্তং = বলা হল; ময়া = আমার দ্বারা; অনঘ = নিষ্পাপ; এতদ্ = এইটি; বুদ্ধা = বুঝে; বুদ্ধিমান্ = জ্ঞানী; স্যাৎ = হয়; কৃতকৃত্যঃ = কৃতার্থ।।২০।।

অনুবাদ :- হে নিষ্পাপ অর্জুন! এতক্ষণ আমি তোমাকে যে পরম শাস্ত্র বর্ণনা করলাম তা অতি রহস্যময় ও গোপনীয়। এই শাস্ত্র বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করলে পুরুষ সম্যক জ্ঞানী ও কৃতার্থ হন।।২০।।

ব্যাখ্যা :- এই অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে ভগবান্ কথিত কয়েকটি শব্দের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন যেমন — শাস্ত্র ও অনঘ।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একটি মহান শাস্ত্র যার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে

আছে পরম জ্ঞান যা মানবজীবনের কল্যাণে অতীব কার্যকরী, মূল্যবান ও অপরিহার্য। ভগবান্ এই শ্লোকে 'শাস্ত্র' শব্দটি ব্যবহার ক'রে এই অধ্যায়টিকে শাস্ত্রের এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন কারণ তিনি যে কেবল এই অধ্যায়ে সমগ্র গীতার সারাংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন তাই নয়, তিনি এখানে সমগ্র বেদসমূহেরও সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করেছেন।

ভগবান্ এই শ্লোকে অর্জুনকে অনঘ অর্থাৎ নিষ্পাপ ব'লে সম্বোধন করেছেন। এর দ্বারা ভগবান্ বোঝাতে চেয়েছেন যে পাপী ও অসৎ ব্যক্তিরা এই মহান তত্ত্ব শোনার যোগ্য নয় বা এই মহান তত্ত্ব তাদের নিকট বর্ণনারও যোগ্য নয়। অন্তরে পাপ সঞ্চিত থাকলে এই পরম গভীর, রহস্যময় ও গোপনীয় তত্ত্বের উপযুক্ত মূল্যায়ন বা মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব নয়। সেইজন্য ভগবান্ এখানে প্রকারান্তরে অসৎ, পাপী, সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের নিকট এই শাস্ত্রবিষয়ে বর্ণনা করা নিষেধ ক'রে গিয়েছেন।

পরিশেষে এই অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করা প্রয়োজন। এই শ্লোকে ভগবান্ সকল শাস্ত্রের সার মাত্র কুড়িটি শ্লোকে বর্ণনা করেছেন। এই কুড়ি সংখ্যাটি একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্য পূরণের জন্য দুইটি মার্গ বা পথ আছে— একটি লৌকিক জীবনের জন্য নির্দিষ্ট প্রবৃত্তি মার্গ যেখানে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কামনা পূরণের জন্য কর্ম করার কথা বলা হয়েছে এবং অপরটি হল নিবৃত্তি মার্গ যেখানে মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রসূত সকল কর্মের অবলুপ্তির কথা বলা হয়েছে। প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী যখন দীক্ষা দেন তখন তিনি শিষ্যকে তিনটি মন্ত্র দান করেন। সেই তিনটি মন্ত্রের মধ্যে প্রথম মন্ত্রে থাকে তিনটি পদ, দ্বিতীয় মন্ত্রে থাকে ছয়টি পদ এবং তৃতীয় মন্ত্রে থাকে এগারোটি পদ মোট কুড়িটি পদ। ভগবান্ এখানে অপাপবিদ্ধ প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে প্রবৃত্তিমার্গের প্রথা অনুযায়ী তাঁর সমস্ত শাস্ত্রের সার এই উপদেশ এই অধ্যায়ে কুড়িটি শ্লোকের মাধ্যমে দিয়েছেন।।২০।।

—: পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত:—

ষোড়শ অধ্যায়
দৈবাসুর-সম্পদ্-বিভাগযোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ # জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ # স্বাধ্যায়ঃ তপ আর্জবম্।।১।।

* দমশ্চ = দমঃ চ, যজ্ঞশ্চ = যজ্ঞঃ চ

অহিংসা সত্যম্ অক্রোধঃ # ত্যাগঃ শান্তিঃ অপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষু অলোলুপ্ত্বং # মার্দবং হ্রীঃ অচাপলম্।।২।।
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্ # অদ্রোহো ন অতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীম্ # অভিজাতস্য ভারত।।৩।।

সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ = চিত্তের শুদ্ধি; জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতিঃ = জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা; দমঃ = বাহ্যশুদ্ধি; স্বাধ্যায়ঃ = শাস্ত্রপাঠ; আর্জবম্ = সরলতা; অপৈশুনম্ = পরনিন্দাবর্জন; অলোলুপ্ত্বং = লোভহীনতা; মার্দবং = কমনীয়তা; হ্রীঃ = লজ্জা; অচাপলম্ = চপলতাহীনতা; তেজঃ = তেজস্বিতা; ধৃতিঃ = ধৈর্য্য; শৌচম্ = শুদ্ধি; অদ্রোহঃ = কারও সঙ্গে বিরোধিতা না করা; ন অতিমানিতা = অভিমান শূন্যতা; ভবন্তি = হয়; সম্পদং দৈবীম্ = দৈবী সম্পদের; অভিজাতস্য = অভিমুখে অগ্রসর।।১-৩।।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন — ভয়হীনতা, চিত্তের শুদ্ধি, জ্ঞানযোগের প্রতি নিষ্ঠা, দান, বাহ্যশুচি, যজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা, সরলতা। অহিংসা, সত্যবাদিতা, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জন, জীবে দয়া, লোভহীনতা,

কমনীয়তা, লজ্জা, চপলতাহীনতা, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শুদ্ধি, কারও সঙ্গে বিরোধিতা না করা, অভিমান শূন্যতা এইগুলি হল দৈবী সম্পদ। যে সকল পুরুষ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট তাঁরা এই সকল গুণের অধিকারী হয়ে থাকেন।। ১-৩।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে তিনটি শ্লোকে চারটি আশ্রম ও চারটি বর্ণের প্রত্যেকটির ধর্ম সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। প্রথমে তিনি বলেছেন যে সন্ন্যাসীদের ধর্ম হল— অভয় অর্থাৎ ভয়হীনতা, সত্ত্বসংশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তের পবিত্রতা ও জ্ঞানযোগে ব্যবস্থিতি অর্থাৎ জ্ঞানযোগের প্রতি নিষ্ঠা। তারপর তিনি বলেছেন যে গৃহস্থদের ধর্ম হল— দান, দম অর্থাৎ বাহ্যসংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠ। তারপর তিনি বলেছেন যে বানপ্রস্থের ধর্ম হল তপস্যা। এই তপস্যা হল তিন প্রকার যথা কায়িক, মানসিক ও বাচনিক। অষ্টাদশ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তারপর তিনি বলেছেন যে ব্রাহ্মণদের ধর্ম হল — আর্জব অর্থাৎ সরলতা, অহিংসা, সত্যবাদিতা, অক্রোধ অর্থাৎ ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন অর্থাৎ পরনিন্দাবর্জন, জীবে দয়া, অলোলুপ্ত্ব অর্থাৎ লোভহীনতা, মার্দব অর্থাৎ কমনীয়তা, হ্রী অর্থাৎ শাস্ত্র বিগর্হিত কর্মে লজ্জা, অচাপল্য অর্থাৎ চপলতাহীনতা। তারপর তিনি বলেছেন যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হল— তেজ অর্থাৎ তেজস্বিতা অর্থাৎ তুচ্ছব্যক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার না করা, ক্ষমা অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি অসমান ব্যক্তি অবজ্ঞা করে তাহলে তার প্রতি কুপিত না হওয়া, ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্য অর্থাৎ শরীরে অবসাদ এলেও সেই অবসাদকে অতিক্রম করার প্রচেষ্টা করা। তারপর তিনি বৈশ্যদের ধর্ম বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে তাদের ধর্ম হল — শৌচ অর্থাৎ বাণিজ্যে প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাভাষণের আশ্রয় গ্রহণ না করা, অদ্রোহ অর্থাৎ অপরকে হত্যার ইচ্ছায় অস্ত্র ধারণ না করা। সব শেষে তিনি বলেছেন যে শূদ্রদের ধর্ম হল নাতিমানিতা অর্থাৎ নিজেকে বড় না ভেবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা।

সংসারবৃক্ষের দুইটি ফল— একটি ফল মানুষকে বিষয়াসক্ত করে এবং কর্মবন্ধনে জড়িত করে। অপর ফলটি মানুষকে তত্ত্বজ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। এই গুণ সাত্ত্বিকচিত্ত ব্যক্তিরাই লাভ করে। এই গুণকেই ভগবান্ দৈবী সম্পদ বলেছেন।। ১-৩।।

দম্ভো দর্পঃ অভিমানশ্চ # ক্রোধঃ পারুষ্যম্ এব চ।
অজ্ঞানং চ অভিজাতস্য # পার্থ সম্পদম্ আসুরীম্।।৪।।

পারুষ্যম্ = নিষ্ঠুরতা; অভিজাতস্য = অভিমুখে গত।।৪।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! যে সমস্ত ব্যক্তি আসুরী সম্পদের অভিমুখে গমন করে তারা দম্ভ, দর্প, অতিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞান এইসব বৈশিষ্ট্য লাভ করে। এইসব দুর্গুণ রাজসিক ও তামসিক চরিত্রের ব্যক্তিরা লাভ ক'রে থাকে।।৪।।

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় # নিবন্ধায় আসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীম্ # অভিজাতঃ অসি পাণ্ডব।।৫।।

বিমোক্ষায় = মোক্ষলাভের উপায়; নিবন্ধায় = বন্ধনের কারণ; মা শুচঃ = শোক কোরো না; অভিজাতঃ = অভিমুখে জাত।।৫।।

অনুবাদ :- দৈবী সম্পদ মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ। আসুরীসম্পদ বন্ধনের কারণ। তুমি শোক করবে না কারণ তুমি দৈবী সম্পদের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছ।। ৫।।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকে অস্মিন্ # দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত # আসুরং পার্থ মে শৃণু।। ৬।।

দ্বৌ = দুই প্রকার; ভূতসর্গৌ = জীব সৃষ্টি; লোকে = জগতে; অস্মিন্ = এই; বিস্তরশঃ = বিস্তারিতভাবে; প্রোক্ত = বলা হয়েছে; মে = আমার মুখে; শৃণু = শোন।।৬।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! এই জগতে দুই প্রকার জীব সৃষ্টি হয়েছে — একপ্রকার দৈবী এবং অপর প্রকার হল আসুরী। দৈবী প্রকৃতির জীব সম্পর্কে আমি বিস্তারিতভাবে বলেছি। এখন তুমি আমার মুখ থেকে আসুরী প্রকৃতির জীবদের সম্পর্কে শোন।। ৬।।

ব্যাখ্যা :- মানুষ যখন শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ ক'রে রাগ ও দ্বেষের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অশাস্ত্রীয় কর্ম করে তখন তাকে আসুরী ও রাক্ষসী প্রবৃত্তিগ্রস্ত বলা হয়।। ৬।।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ # জনা ন বিদুঃ আসুরাঃ।
ন শৌচং ন অপি চ আচারো # ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।।৭।।

প্রবৃত্তিং = ধর্মে প্রবৃত্তি; নিবৃত্তিং = অধর্ম থেকে নিবৃত্তি; ন বিদুঃ = জানে না; শৌচং = শুচিতা; আচারঃ = আচার; তেষু = তাদের মধ্যে; ন বিদ্যতে = থাকে না।।৭।।

অনুবাদ :- যারা আসুরী প্রবৃত্তির তারা ধর্মে প্রবৃত্ত হতে বা অধর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে জানে না। তাদের মধ্যে শৌচ, আচার সত্যবাদিতা প্রভৃতি কিছুই নাই।।৭।।

অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠং তে # জগৎ আহুঃ অনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং # কিম্ অন্যৎ কামহৈতুকম্।।৮।।

অসত্যম্ = মিথ্যা; অপ্রতিষ্ঠং = আশ্রয়হীন; তে = তারা; আহুঃ = বলে; অনীশ্বরম্ = ঈশ্বরশূন্য; অপরস্পরসম্ভূতং = পরস্পর সংসর্গজাত; = কামহৈতুকম্ = কেবলমাত্র কামজনক।।৮।।

অনুবাদ :- আসুরী প্রবৃত্তির মানুষেরা বলে যে জগতটি মিথ্যা, আশ্রয়হীন, ঈশ্বরশূন্য, নারী-পুরুষ পরস্পরের সংসর্গজাত, কেবলমাত্র কামজনক। এর বাইরে তারা জগতটাকে অন্য কিছু ভাবে না।।৮।।

এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য # নষ্টাত্মানঃ অল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্তি উগ্রকর্মাণঃ # ক্ষয়ায় জগতঃ অহিতাঃ।।৯।।

এতাং = এই প্রকার; দৃষ্টিম্ = দৃষ্টিভঙ্গি; অবষ্টভ্য = আশ্রয় ক'রে; নষ্টাত্মানঃ = আত্মতত্ত্বজ্ঞানহীন; অল্পবুদ্ধয়ঃ = অল্পবুদ্ধি; প্রভবন্তি = জন্মলাভ করে; উগ্রকর্মাণঃ = হিংস্র কর্মপরায়ণ; ক্ষয়ায় = ধ্বংস করার জন্য; অহিতাঃ = অমঙ্গলকারী অসুরেরা।।৯।।

অনুবাদ :- এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি আশ্রয় ক'রে হিংস্র কর্মপরায়ণ আত্মতত্ত্বজ্ঞানহীন অল্পবুদ্ধি অমঙ্গলকারী অসুরেরা জগৎকে ধ্বংস করার জন্য জন্মলাভ করে।।৯।।

কামম্ আশ্রিত্য দুষ্পূরং # দম্ভ-মান-মদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বা অসদ্ গ্রাহান্ # প্রবর্তন্তে অশুচিব্রতাঃ।।১০।।

আশ্রিত্য = আশ্রয় ক'রে; দুষ্পূরং = দুর্বার; মোহাৎ = মোহ বশতঃ;

গৃহীত্বা = গ্রহণ ক'রে; অসদ্ গ্রাহান্ = অসৎ বিষয়ে আগ্রহ; প্রবর্তন্তে = প্রবৃত্ত হয়; অশুচিব্রতাঃ = অশুচি কাজে ব্রতী।।১০।।

অনুবাদ :- যাদের প্রবৃত্তি আসুরিক তারা দম্ভ, অহঙ্কার ও গর্বে মত্ত হয়ে দুর্বার কামকে আশ্রয় ক'রে মোহবশতঃ অসৎ বিষয়ে আগ্রহ অবলম্বন ক'রে অশুচি কর্মে ব্রতী হয়।।১০।।

চিন্তাম্ অপরিমেয়াং চ # প্রলয়ান্তাম্ উপাশ্রিতাঃ।
কাম-উপভোগ-পরমা # এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ।।১১।।

আশা-পাশ-শতৈঃ বদ্ধাঃ # কাম-ক্রোধ-পরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কাম-ভোগার্থম্ # অন্যায়েন অর্থ-সঞ্চয়ান্।।১২।।

অপরিমেয়াং = অপরিমেয়; প্রলয়ান্তাম্ = প্রলয় পর্যন্ত; উপাশ্রিতাঃ = আশ্রয় ক'রে; কাম-উপভোগ-পরমা = চূড়ান্ত কামের উপভোগ প্রিয়; এতাবৎ ইতি = এইরূপ; নিশ্চিতাঃ = নিশ্চয় ক'রে; পাশ = রজ্জু বা দড়ি; শতৈঃ = শত শত; বদ্ধাঃ = বেঁধে; ঈহন্তে = চেষ্টা করে; কামভোগার্থম্ = বিষয়ভোগের জন্য; অন্যায়েন = অন্যায়ভাবে; অর্থ-সঞ্চয়ান্ = অর্থ সঞ্চয় ক'রে।।১১-১২।।

অনুবাদ :- এই প্রকার ব্যক্তিগণ মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বিষয় ভোগের চিন্তা করে। তারা মনে করে যে বিষয় ভোগই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এছাড়া জীবনের আর কোন লক্ষ্য নাই। তাদের এই চিন্তাকে ধ্রুবসত্য ভেবে তারা শত শত আশারূপ রজ্জু বা দড়িতে বাঁধা প'রে কাম-ক্রোধ-মোহের তাড়নায় বিষয়ভোগের জন্য অন্যায় পথে অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করে।।১১-১২।।

ইদম্ অদ্য ময়া লব্ধম্ # ইমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদম্ অস্তি ইদম্ অপি মে # ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্।।১৩।।

ইদম্ = এই; অদ্য = আজ; ময়া = আমার দ্বারা; লব্ধম্ = পাওয়া হল; ইমং

= এই; প্রাপ্স্যে = পাব; মনোরথম্ = মনোবাঞ্ছা; অস্তি = আছে; ইদম্ অপি = এইটিও; মে = আমার; ভবিষ্যতি = হবে; পুনঃ = পুনরায়; ধনম্ = সম্পদ।।১৩।।

অনুবাদ :- (আসুরী প্রবৃত্তির মানুষেরা ভাবে) আজ আমি এইটি পেলাম, পরে আরও পাব। আমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে, আমার এই ধন আছে, ওই ধন পরে আমি লাভ করব।।১৩।।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুঃ # হনিষ্যে চ অপরান্ অপি।
ঈশ্বরঃ অহম্ অহং ভোগী # সিদ্ধঃ অহং বলবান্ সুখী।।১৪।।

অসৌ = সে; ময়া হতঃ = আমার দ্বারা হত হয়েছে; শত্রুঃ হনিষ্যে = শত্রুকেও বধ করব; চ = এবং; অপরান্ = অন্যান্য; অপি = ও; অহং = আমি।।১৪।।

অনুবাদ :- (আসুরী প্রবৃত্তির মানুষেরা ভাবে) আমি ঐ শত্রুকে বধ করেছি, অন্য শত্রুদেরকেও বধ করব, আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি কৃতকার্য, আমি বলবান, আমি সুখী।।১৪।।

আঢ্যঃ অভিজনবান্ অস্মি # কঃ অন্যঃ অস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য # ইতি অজ্ঞান বিমোহিতাঃ।।১৫।।

আঢ্যঃ = ধনবান; অভিজনবান্ = কুলীন; অস্মি = হই; কঃ অন্যঃ অস্তি = অন্য কে আছে; সদৃশঃ = সমান; ময়া = আমার; যক্ষ্যে = যাগ করব; দাস্যামি = দান করব; মোদিষ্য = আনন্দ করব; ইতি অজ্ঞান = এই অজ্ঞানে; বিমোহিতাঃ = আচ্ছন্ন থাকে।।১৫।।

অনুবাদ :- (আসুরী প্রবৃত্তির মানুষেরা ভাবে) আমি ধনবান, আমি অভিজাত শ্রেণীর, আমার তুল্য আর কেউ নাই, আমি যাগ করব, দান করব, আনন্দ করব এবং তারা এই সব অজ্ঞান ধারণায় সদা আচ্ছন্ন থাকে।।১৫।।

অনেক চিত্তবিভ্রান্তা # মোহ-জাল-সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু # পতন্তি নরকে অশুচৌ।।১৬।।

অনেক চিত্তবিভ্রান্তাঃ = অনেক চিন্তায় চিত্তের বিভ্রান্তি; মোহ-জাল-সমাবৃতাঃ

= মোহজালে আবৃত; প্রসক্তাঃ = আসক্ত; কামভোগেষু = বিষয়ভোগে; পতন্তি নরকে = নরকে পতিত হয়; অশুচৌ = অপবিত্র হয়।।১৬।।

অনুবাদ :- এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় তাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত, মোহজালে আবৃত, বিষয়ভোগে অতীব আসক্ত। সেইজন্য তারা অপবিত্র এবং দুঃখদায়ক নরকে পতিত হয়।।১৬।।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা # ধন-মান-মদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈঃ তে # দম্ভেন অবিধিপূর্বকম্। ১৭।।

আত্মসম্ভাবিতাঃ = আত্ম অহমিকার; স্তব্ধা = অন্ধ; ধনমানমদান্বিতাঃ = ধন, মান, গর্বে পরিপূর্ণ; যজন্তে = যজ্ঞ করে; নামযজ্ঞৈঃ = নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা; তে = তারা; দম্ভেন = দম্ভ সহকারে; অবিধিপূর্বকম্ = শাস্ত্রবিহিত নিয়ম পালন না ক'রে।।১৭।।

অনুবাদ :- তারা আত্ম অহমিকায় অন্ধ, ধন ও মানের অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। তারা শাস্ত্রবিহিত নিয়ম-পদ্ধতি পালন না ক'রে দম্ভ সহকারে নামমাত্র যজ্ঞ করে।।১৭।।

অহঙ্কারং বলং দর্পং # কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মাম্ আত্ম-পর-দেহেষু # প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ।।১৮।।

সংশ্রিতাঃ = আশ্রয় করে; মাম্ = আমাকে; আত্ম-পর-দেহেষু = নিজের এবং অপরের দেহে; প্রদ্বিষন্তঃ = দ্বেষ করে; অভ্যসূয়কাঃ = সাধুদের গুণে দোষারোপ করে।।১৮।।

অনুবাদ :- সেই সমস্ত ব্যক্তিরা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধকে আশ্রয় ক'রে তাদের নিজের ও অপরের দেহে অবস্থিত আমার নিন্দা করে এবং সাধুদের গুণে দোষারোপ করে।।১৮।।

তান্ অহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ # সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপামি অজস্রম্ অশুভান্ # আসুরীষু এব যোনিষু।।১৯।।

তান্ = সেই সকলকে; অহং = আমি; দ্বিষতঃ = দ্বেষকারী;

ক্রূরান্ = হিংস্র; সংসারেষু = সংসারে; নরাধমান্ = নরাধমদের; ক্ষিপামি = নিক্ষেপ করি; যোনিষু = প্রজাতিতে, বংশে।১৯।।

অনুবাদ :- এই রকম দ্বেষকারী হিংস্র অশুভ কর্মকারী আসুরিক ক্রূরমতি নরাধম পুরুষদের আমি বারে বারে আসুরী প্রজাতিতে নিক্ষেপ করি।।১৯।।

আসুরীং যোনিম্ আপন্না # মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মাম্ অপ্রাপ্য এব কৌন্তেয় # ততো যান্তি অধমাং গতিম্।।২০।।

আপন্না = লাভ ক'রে; মূঢা = সেই মূঢ়গণ; জন্মনি জন্মনি = জন্ম জন্মান্তর ধ'রে, মাম্ = আমাকে; অপ্রাপ্য = না পেয়ে; ততঃ = তারপর; যান্তি = লাভ করে; অধমাং গতিম্ = অধম গতি।।২০।।

অনুবাদ :- হে কৌন্তেয়! হিংস্র আসুরী কুলে জন্মলাভ ক'রে সেই মূঢ়গণ জন্ম জন্মান্তর ধ'রে আমাকে না পেয়ে অধম গতি লাভ করে।।২০।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে বলছেন যে আসুরী প্রবৃত্তিসম্পন্ন কুমতিপূর্ণ মানুষরা দেব, মনুষ্য প্রভৃতি কুলে জন্মগ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা বাঘ, সিংহ, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি কুলে জন্মগ্রহণ করে। মুক্তির একমাত্র উপায় তো ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ। কিন্তু এই সব জন্মে তাদের ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে না। ফলে তাদের অর্জিত পাপের ক্ষয় হওয়ার কোন উপায় থাকে না। সেইজন্য তারা ধীরে ধীরে আরও অধঃপতিত হয়ে মহাযন্ত্রণাময় কুম্ভীপাক, মহারৌরব, তামিশ্র, অন্ধতামিশ্র প্রভৃতি ঘোর নরকে পতিত হয়।।২০।।

ত্রিবিধং নরকস্য ইদং # দ্বারং নাশনম্ আত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ # তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ।।২১।।

ত্রিবিধং = তিন প্রকার; ইদং = এই; দ্বারং = দরজা; নাশনম্ = ধ্বংস করার; আত্মনঃ = আত্মাকে; তস্মাৎ = সেইজন্য; এতৎ ত্রয়ং = এই তিনটিকে; ত্যজেৎ

= ত্যাগ করা উচিত।।২১।

অনুবাদ :- নরকে প্রবেশের তিনটি দরজা আছে। সেগুলি হল কাম, ক্রোধ এবং লোভ। এরা আত্মার নাশ ঘটায়। সেইজন্য এই তিনটিকে ত্যাগ করা উচিত।।২১।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে বলেছেন যে কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটি রিপু আত্মার নাশ ঘটায়। কিন্তু আমরা পূর্বের আলোচনায় জেনেছি যে আত্মাকে তো কোনকিছুই স্পর্শ করতে পারে না। আত্মা তো পদ্মপত্রে নীর। তাহলে জীবের কৃতকর্মের জন্য আত্মার নাশ হবে কিভাবে? প্রকৃতপক্ষে আত্মার 'নাশ' বলতে এখানে জীবের অধোগতির কথা বলা হয়েছে। মানুষ যখন থেকে কাম, ক্রোধ এবং লোভের কবলে পড়ে তখন থেকেই তার বুদ্ধি, বিবেক, চিন্তা, ভাবনা সব নিম্নরুচি সম্পন্ন হয়ে যায়। সে হিতাহিত জ্ঞান সব হারিয়ে ফেলে। কাম, ক্রোধ এবং লোভের কবলে প'ড়ে সে এমন এমন কাজ করে যে তাতে তার শরীরের হানি হয়, মন সমস্ত শুভবোধ হারিয়ে ফেলে, চিন্তার শুচিতা নষ্ট হয়ে যায়, তার সমস্ত কর্মই অপবিত্র হয়ে যায়। ফলে তার জীবনের সব সুখ, শান্তি হারিয়ে তার জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। মৃত্যুর পর তার আসুরী অর্থাৎ কীটপতঙ্গাদি নিম্ন শ্রেণীর প্রজাতিতে জন্ম হয়। এই কারণেই ভগবান্ কাম, ক্রোধ এবং লোভকে আত্মার নাশকারী বলেছেন।।২১।।

এতৈঃ বিমুক্তঃ কৌন্তেয় # তমোদ্বারৈঃ ত্রিভিঃ নরঃ।
আচরতি আত্মনঃ শ্রেয়ঃ # ততো যাতি পরাং গতিম্।২২

এতৈঃ = এই; বিমুক্তঃ = মুক্ত হয়ে; তমোদ্বারৈঃ = অন্ধকারময় নরকের দরজা থেকে; ত্রিভিঃ = তিনটি; নরঃ = মানুষ; আচরতি = আচরণ করে; আত্মনঃ = নিজের; শ্রেয়ঃ = কল্যাণ; ততঃ = তার ফলে; যাতি = লাভ করে; পরাং গতিম্ = পরম গতি অর্থাৎ মোক্ষ।।২২।।

অনুবাদ :- হে কৌন্তেয়! এই তিনটি নরকের দ্বারের কবল থেকে মুক্তি লাভ করতে পারলে মানুষের নিজের কল্যাণ হয় এবং তারপর সে পরম গতি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে।।২২।।

যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য # বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিম্ অবাপ্নোতি # ন সুখং ন পরাং গতিম্।।২৩।।

যঃ = যে; উৎসৃজ্য = পরিত্যাগ ক'রে; বর্ততে = প্রবৃত্ত হয়; কামকারতঃ = স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হয়ে; সিদ্ধিম্ = সাফল্য; অবাপ্নোতি = লাভ করে; পরাং গতিম্ = পরম গতি অর্থাৎ মোক্ষ।।২৩।।

অনুবাদ :- যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ ক'রে স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হয়ে কর্ম করে, সে সুখ, সাফল্য বা পরম গতি অর্থাৎ মোক্ষ কোনটাই লাভ করতে পারে না।।২৩।।

তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে # কার্য-অকার্য-ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র-বিধান-উক্তং # কর্ম কর্তুম্ ইহ অর্হসি।।২৪।।

তস্মাৎ = সুতরাং; তে = তোমার; ব্যবস্থিতৌ = নির্ধারণে; জ্ঞাত্বা = জেনে; উক্তং = যা বলা হয়েছে; কর্তুম্ = করতে; ইহ = এই কর্ম বিষয়ে বা এই জগতে; অর্হসি = উচিত।।২৪।।

অনুবাদ :- সেইজন্য কার্য-অকার্য, কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞানলাভের উপায়। সেইজন্য শাস্ত্র যে রকম বিধান দিয়েছে সেই রকমভাবেই তুমি কর্ম কর।।২৪।।

—: ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত :—

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য # যজন্তে শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ # সত্ত্বম্ আহো রজঃ তমঃ।।১।।

যে = যারা; উৎসৃজ্য = ত্যাগ ক'রে; যজন্তে = উপাসনা করে; শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ = শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত হয়ে; তেষাং = তাদেরকে; তু = কিন্তু; কা = কি; সত্ত্বম্ = সাত্ত্বিকী; আহো = অথবা; রজঃ = রাজসিক; তমঃ = তামসিক।।১।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন — হে কৃষ্ণ! যাঁরা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ ক'রে শ্রদ্ধার সঙ্গে যজ্ঞ, উপাসনা করেন, তাঁদের নিষ্ঠা কোন প্রকারের — সাত্ত্বিকী, রাজসী না তামসী ? ।। ১।।

ব্যাখ্যা:- ভগবান্ বাসুদেবের সহস্র নাম আছে। কিন্তু এই শ্লোকে অর্জুন তাঁকে সহস্র নামের মধ্য থেকে "কৃষ্ণ" বলে সম্বোধন করেছেন। এর কারণ কি? আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিটি শ্লোক বা পদ গভীর অর্থ বহন করে। তাই তার প্রতিটি শব্দ বা পদের অর্থ খুব মনোযোগ দিয়ে বোঝার প্রয়োজন আছে। পাণ্ডব গীতার ৫৫তম শ্লোকে বশিষ্ঠ বলেছেন-

কৃষ্ণ ইতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচা প্রবর্ততে।

ভস্মী-ভবন্তি তস্য অশুভ মহাপাতক কোটয়ঃ।।

অর্থাৎ "কৃষ্ণ" নামটি অত্যন্ত শুভ। যার জিহ্বায় এই শুভ নাম বিরাজ করে অর্থাৎ যে এই সবচেয়ে শুভ নামটি উচ্চারণ করে, তার সমস্ত পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যায় অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যায়।

অর্জুন ভেবেছেন যে তিনি রাজা পুরুর বংশধর, ভীষ্মের পৌত্র, মহীয়সী মাতা

কুন্তীর পুত্র, সেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন মহাত্মা ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য! এতে নিশ্চয়ই তাঁর মহাপাপ হবে। সেই পাপের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। সেইজন্য তিনি পাণ্ডবগীতার বক্তব্য অনুযায়ী সম্ভাব্য পাপ থেকে মুক্তি পাবার মানসে শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নামের মধ্য থেকে 'কৃষ্ণ' নামটিই উচ্চারণ ক'রে ভগবানকে সম্বোধন করেছেন।। ১।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা # দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চ এব # তামসী চ ইতি তাং শৃণু।।২।।

উবাচ = বললেন; ত্রিবিধা = তিন প্রকার; ভবতি = হয়; দেহিনাং = জীবগণের অর্থাৎ মানুষের; সা = সেইগুলি; স্বভাবজা = পূর্জন্মের স্বভাবজনিত; তাং = সেগুলি; শৃণু = শোন।।২।।

অনুবাদ :- ভগবান্ বললেন — জীবগণের এই শ্রদ্ধা তিন প্রকারের — সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। এগুলি তাদের পূর্বজন্মের স্বভাব থেকে আসে। সেগুলি তুমি শোন।।২।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এই শ্লোকে জীবের পূর্বজন্মের স্বভাবের কথা বলেছেন। জীব জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে ধর্ম-অধর্ম, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম করে, তাদের সমুদায় সংস্কার তার চিত্তে বদ্ধমূল হয়ে থাকে এবং মৃত্যুর সময় সে এগুলিকে পরজন্মে সঙ্গে নিয়ে আসে। এই গুলিকেই স্বভাব বলা হয়। এই স্বভাব থেকে মনুষ্য ভেদে তিন প্রকারের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। সেগুলিকে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী বলা হয়। যাঁদের সত্ত্বগুণ সমন্বিত হয়ে মৃত্যু ঘটেছে তাঁরা দৈবী সম্পদের অধিকারী হয়ে দেবপূজাদিবিষয়ক শ্রদ্ধা লাভ করেন। যাঁরা রজোগুণযুক্ত হয়ে মৃত্যুপথে যাত্রা করেন তাঁরা যক্ষ-রক্ষ আদি পূজাবিষয়ক শ্রদ্ধা লাভ করেন এবং যারা তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে মারা যায় তারা প্রেত-পিশাচ প্রভৃতি পূজাবিষয়ক শ্রদ্ধা লাভ করে। সুতরাং ভগবানের বক্তব্য হল যে, যখন জীব বহু জন্ম অতিক্রম ক'রে মনুষ্যজীবন লাভ করবে তখন তাকে সর্ব প্রকারে চিত্ত সংযত ও মনকে বশ ক'রে পবিত্র কর্মে

জীবন ব্যয় করতে হবে। তবেই তাঁরা তাঁর অর্থাৎ পরমেশ্বরের করুণা লাভ করবেন।।২।।

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য # শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়ঃ অয়ং পুরুষো # যো যৎ শ্রদ্ধঃ স এব সঃ।।৩।।

সত্ত্বানুরূপা = নিজ অন্তঃকরণের অনুরূপ; সর্বস্য = সকলের; ভবতি = হয়; অয়ং পুরুষঃ = এই জীব; যঃ = যে; যৎ = যে রকম; শ্রদ্ধঃ = শ্রদ্ধাযুক্ত; স এব = সেই ভাবেই; সঃ = সে।।৩।।

অনুবাদ :- হে ভারত! যার যে রকম অন্তঃকরণ তার সেই রকম শ্রদ্ধা হয়। মনুষ্য শ্রদ্ধাময়। যে পুরুষের যে রকম গুণের প্রতি শ্রদ্ধা আছে সে সেই রকম গুণের প্রতিই শ্রদ্ধাবান হয়ে থাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তির সাত্ত্বিক গুণের প্রতি শ্রদ্ধা আছে তিনি দৈবী সম্পদের অধিকারী হয়ে সৎ ও পবিত্র কর্মে রত হন এবং যে ব্যক্তির রাজসী বা তামসী গুণের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে সে আসুরী বা রাক্ষসী চরিত্র লাভ ক'রে অধর্ম ও অপবিত্র পথে জীবন যাপন করে।।৩।।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ # যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণান্ চ অন্যে # যজন্তে তামসা জনাঃ।।৪।।

যজন্তে = উপাসনা করে; দেবান্ = দেবতাদের; যক্ষরক্ষাংসি = যক্ষ ও রাক্ষসদের; প্রেতান্ ভূতগণান্ = প্রেত ও ভূতগণের; চ অন্যে জনাঃ = এবং অন্যরা।।৪।।

অনুবাদ :- সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা দেবতাদের পূজা করে, রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষ ও রাক্ষসদের পূজা করে এবং তামসিক ব্যক্তিরা প্রেত ও ভূতগণের পূজা করে।।৪।।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং # তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভ-অহঙ্কারসংযুক্তাঃ # কাম-রাগ-বলান্বিতাঃ।।৫।।
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং # ভূতগ্রামম্ অচেতসঃ।
মাং চ এব অন্তঃ শরীরস্থং # তান্ বিদ্ধি আসুর-নিশ্চয়ান্।।৬।।

অশাস্ত্রবিহিতং = শাস্ত্রবিরুদ্ধ; ঘোরং তপ্যন্তে = ঘোর তপস্যা করে; তপঃ =

তপস্যা; জনাঃ = ব্যক্তি; কাম = বাসনা; রাগ = আসক্তি; বলান্বিতা = বলবান; কর্শয়ন্তঃ = কষ্ট দেয়; ভূতগ্রামম্ = ভূতসমূহকে; অচেতসঃ = বিবেকহীনভাবে; মাং = আমার; অন্তঃ = অন্তরে; তান্ = তাকে; বিদ্ধি = জানবে; আসুরঃ = আসুরিক।।৫-৬।।

অনুবাদ :- যে সমস্ত লোক শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘোর তপস্যা করে তারা দাম্ভিক, অহঙ্কারযুক্ত এবং কামনা-আসক্তিপূর্ণ ও বলদর্পিত। সেই সব পুরুষ শরীরের ভিতরে অবস্থিত ভূতসমূহকে এবং সেই সঙ্গে শরীরের ভিতর অবস্থিত আমার অংশস্বরূপ জীবাত্মাকে কষ্ট দেয়। সেইজন্য তাদেরকে আসুরী স্বভাবযুক্ত বলে জানবে।।৫-৬।।

ব্যাখ্যা :- এখানে ভূতসমূহ বলতে পঞ্চ মহাভূত যথা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, দশ ইন্দ্রিয়, এবং পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয় যথা রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই তেইশটি তত্ত্বের সমষ্টিকে বোঝানো হয়েছে।।৫-৬।।

আহারঃ তু অপি সর্বস্য # ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞঃ তপঃ তথা দানং # তেষাং ভেদং ইমং শৃণু।।৭।।

সর্বস্য = সকলের; ত্রিবিধঃ = তিন রকম; ভবতি = হয়; তেষাং = তাদের; ইমং = এই; শৃণু = শোন।। ৭।।

অনুবাদ :- মানুষের তিন প্রকার আহার প্রিয়। সেইরকম যজ্ঞ, দান ও তপস্যা তিন প্রকার। তাদের ভেদগুলি শোন।।৭।।

আয়ুঃ-সত্ত্ব-বল-আরোগ্য # সুখ-প্রীতি-বিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা # আহারাঃ সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ।।৮।।

সত্ত্ব = উৎসাহ; বিবর্ধনা = বৃদ্ধিকারী; রস্যাঃ = রসযুক্ত; স্থিরা = স্থায়ী; হৃদ্যা = মনোরম।।৮।।

অনুবাদ :- আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, আরোগ্য, সুখ এবং চিত্তের প্রসন্নতা ও প্রীতিবৃদ্ধিকারী রসাল, স্নিগ্ধ, মনোরম আহার সাত্ত্বিক পুরুষদের প্রিয়।।৮।।

কটু-অম্ল-লবণ-অতি-উষ্ণ # তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ।

আহারা রাজসস্য ইষ্টা # দুঃখ-শোক-আময়প্রদাঃ।। ৯।।

বিদাহিনঃ = প্রদাহকর; রাজসস্য = রাজসী ব্যক্তির; ইষ্টা = প্রিয়; আময়প্রদাঃ = রোগপ্রদ।।৯।।

অনুবাদ :- অতিশয় তিক্ত, অতিশয় টক, অতিশয় নোনতা, অতিশয় গরম, অতিশয় ঝাল, অতিশয় তীক্ষ্ণ, অতিশয় শুকনো, অতিশয় প্রদাহকর এবং দুঃখ, শোক, রোগ সৃষ্টিকারী আহার রাজসী পুরুষদের প্রিয়।। ৯।।

যাতযামং গতরসং # পূতি পর্যুষিতং চ যৎ।

উচ্ছিষ্টম্ অপি চ অমেধ্যং # ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।। ১০।।

যাতযামং = যে খাবার অনেক আগে রান্না করা হয়েছে; গতরসং = যার রস শুকিয়ে গিয়েছে; পূতি = দুর্গন্ধযুক্ত; পর্যুষিতং = বাসি; চ = এবং; যৎ = যা; অপি চ অমেধ্যং = এবং অপবিত্রও; তামসপ্রিয়ম্ = তামসী ব্যক্তিদের প্রিয়।।১০।।

অনুবাদ :- যে খাবার অনেক আগে রান্না করা হয়েছে, যার রস শুকিয়ে গিয়েছে, যা দুর্গন্ধযুক্ত, বাসি, অপরের উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র সেই সব আহার তামসিক ব্যক্তিদের প্রিয়।।১০।।

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যজ্ঞো # বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।

যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ # সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ।।১১।।

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ = যাঁরা কর্মের ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না; বিধিদৃষ্টো = শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে; ইজ্যতে = অনুষ্ঠিত হয়; যষ্টব্যম্ = অনুষ্ঠান করা উচিত; এব ইতি = এইভাবেই; মনঃ সমাধায় = মনকে স্থির করে।।১১।।

অনুবাদ :- ফলের আকাঙ্ক্ষা না ক'রে যজ্ঞ করা উচিত— এইভাবে যাঁরা মনকে স্থির ক'রে শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাঁরা সাত্ত্বিক পুরুষ।।১১।।

অভিসন্ধায় তু ফলং # দম্ভার্থম্ অপি চৈব যৎ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ # তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্।।১২।।

অভিসন্ধায় তু ফলং = কিন্তু ফল কামনা ক'রে; দম্ভার্থম্ = দম্ভ প্রকাশ করার জন্য; যৎ = যে যজ্ঞ; ইজ্যতে = অনুষ্ঠান করা হয়; তং যজ্ঞং = সেই যজ্ঞকে; বিদ্ধি = জানবে; রাজসম্ = রাজসিক।।১২।।

অনুবাদ :- কিন্তু হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফল কামনা ক'রে দম্ভ প্রকাশ করার জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয় সেই যজ্ঞকে রাজস যজ্ঞ ব'লে জানবে।।১২।।

বিধিহীনম্ অসৃষ্টান্নং # মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণম্।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং # তামসং পরিচক্ষতে।।১৩।।

বিধিহীনম্ = শাস্ত্রের বিধিহীন; অসৃষ্টান্নং = অন্নদানহীন; মন্ত্রহীনম্ = মন্ত্রহীন; অদক্ষিণম্ = দক্ষিণাদানহীন; শ্রদ্ধাবিরহিতং = শ্রদ্ধাহীন; পরিচক্ষতে = বলা হয়।।১৩।।

অনুবাদ :- যে যজ্ঞে শাস্ত্রবিধি মানা হয় না, অন্নদান করা হয় না, যে যজ্ঞ মন্ত্রহীন, যে যজ্ঞে দক্ষিণা দান করা হয় না, যে যজ্ঞ শ্রদ্ধা সহকারে করা হয় না সেই যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলা হয়।।১৩।।

দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ # পূজনং শৌচম্ আর্জবম্।

ব্রহ্মচর্যম্ অহিংসা চ # শারীরং তপ উচ্যতে।।১৪।।

প্রাজ্ঞ = বিদ্বান; পূজনং = পূজা; শৌচম্ = শুদ্ধি; আর্জবম্ = সরলতা; উচ্যতে = বলা হয়।।১৪।।

অনুবাদ :- দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, ও বিদ্বানগণের পূজা, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শুদ্ধি, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা— এইগুলিকে শরীরিক সম্বন্ধীয় তপস্যা বলা হয়।। ১৪।।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং # সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।

স্বাধ্যায় অভ্যসনং চৈব # বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।।১৫।।

অনুদ্বেগকরং = যা কারও মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করে না; প্রিয়হিতং = যা প্রিয়

ও হিতকর; যৎ = যা; যয়া = যার দ্বারা; স্বাধ্যায় = শাস্ত্র পাঠের জন্য; অভ্যসনং = অভ্যাস; বাঙ্ময়ং তপ = বাচিক তপস্যা; উচ্যতে = বলা হয়।।১৫।।

অনুবাদ :- যে বাক্যে কারও মনে উদ্বেগ সৃষ্টি হয় না, যা সত্য, প্রিয়, হিতকর এইসব বাক্য এবং বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠ, স্তোত্রাদি পাঠ ও অভ্যাসকে বাচিক তপস্যা বলা হয়।।১৫।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এই শ্লোকে সখা তথা শিষ্য অর্জুনকে স্বাধ্যায় অর্থাৎ বিভিন্ন শাস্ত্রপাঠের বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। অমরকোষে শাস্ত্রের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে— "নির্দেশগ্রন্থয়ো শাস্ত্রং" (নানার্থবর্গ ৩য় কাণ্ড)। অর্থাৎ যে গ্রন্থ আমাদেরকে চলার পথে নির্দেশ প্রদান করে তাকে শাস্ত্র বলা হয়। বস্তুত মানুষের পক্ষে জীবনপথে সঠিকভাবে চলা অনেক সময় সম্ভব হয় না। সেই কারণে তার পক্ষে পিতা, গুরু প্রভৃতি প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট থেকে উপযুক্ত নির্দেশের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ তো গেল প্রাকৃত বিষয়। মানুষের জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য তার এমন গ্রন্থের প্রয়োজন যা তাকে পারমার্থিক শিক্ষা লাভের পথপ্রদর্শনস্বরূপ উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে তাকে মোক্ষলাভের উপযুক্ত ক'রে তুলবে। বেদ পুরাণাদি গ্রন্থসমুহ মানুষকে এইরূপ নির্দেশ দান করে বলে তাদেরকে শাস্ত্র বলা হয়। এই হিসাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও একটি অমূল্য শাস্ত্র। এই গ্রন্থে ভগবান্ অর্জুনকে কেবলমাত্র জ্ঞান বা উপদেশই দান করেননি, উপযুক্ত স্থানে তিনি উপযুক্ত গুরুর ন্যায় তাঁকে প্রয়োজনীয় নির্দেশও প্রদান করেছেন যেমন তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (১৮ ÷ ৬) তিনটি ষটকের প্রত্যেকটিতে দুইটি ক'রে মোট ছয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি প্রথম ষটকের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে অর্জুনকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন —'কুরু কর্ম' অর্থাৎ তুমি কর্ম কর, ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪৬তম শ্লোকে বলেছেন —'যোগী ভব', অর্থাৎ যোগী হও, দ্বিতীয় ষটকের নবম অধ্যায়ের ৩৩তম শ্লোকে বলেছেন — 'ভজস্ব মাম্' অর্থাৎ আমার ভজনা কর, এই নবম অধ্যায়েরই ৩৪তম শ্লোকে বলেছেন — 'মাং নমস্কুরু' অর্থাৎ আমাকে প্রণাম কর। তৃতীয় ষটকের অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৩২তম শ্লোকে বলেছেন — 'তমেব শরণং গচ্ছ' অর্থাৎ তাঁর অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ কর, এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬তম শ্লোকে বলেছেন — 'মামেকং শরণং ব্রজ' অর্থাৎ একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও। সেইজন্য দেখা যাচ্ছে যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

একদিকে যেমন অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের ন্যায় মানবকল্যাণে বিভিন্ন অমূল্য জ্ঞানের ভাণ্ডাররূপে প্রতিভাত হয়েছেন অপরদিকে তেমনই জীবনের প্রকৃত পরিচালকের ন্যায় অর্জুনের মাধ্যমে সমগ্র মানবকুলকে সঠিক পথে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। সেইকারণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এক পরম শাস্ত্র।।১৫।।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং # মৌনম্ আত্মবিনিগ্রহঃ।

ভাবসংশুদ্ধিঃ ইতি এতৎ # তপো মানসম্ উচ্যতে।।১৬।।

মনঃপ্রসাদঃ = চিত্তের প্রসন্নতা; সৌম্যত্বং = সরলতা; আত্মবিনিগ্রহঃ = চিত্ত সংযম; ভাবসংশুদ্ধিঃ = ব্যবহারে কপটতাহীনতা; ইতি এতৎ = এই গুলিকে; তপঃ মানসম্ = মানসিক তপস্যা; উচ্যতে = বলা হয়।।১৬।।

অনুবাদ :- চিত্তের প্রসন্নতা, সরলতা, মৌনভাব, চিত্ত সংযম, অপরের সঙ্গে ব্যবহারে কপটতাহীনতা - এই গুলিকে মানসিক তপস্যা বলা হয়।।১৬।।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং # তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যুক্তৈঃ # সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে।।১৭।।

শ্রদ্ধয়া = শ্রদ্ধাসহকারে; পরয়া = পরম; তপ্তং = অনুষ্ঠিত; তপস্তৎ = সেই তপস্যাকে; ত্রিবিধং = তিন প্রকার; নরৈঃ = মানুষের দ্বারা; অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ = ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিত; যুক্তৈঃ = একাগ্রচিত্ত; পরিচক্ষতে = বলা হয়।।১৭।।

অনুবাদ :- ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে পরম শ্রদ্ধা সহকারে কোন পুরুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত পূর্বোক্ত তিন প্রকার তপস্যাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলা হয়।।১৭।।

সৎকার-মান-পূজার্থং # তপো দম্ভেন চ এব যৎ।

ক্রিয়তে তৎ ইহ প্রোক্তং # রাজসং চলম্ অধ্রুবম্।।১৮।।

সৎকার-মান-পূজার্থং = সৎকার, মান এবং পূজা পাবার জন্য; দম্ভেন = দম্ভ সহকারে; যৎ = যা; ক্রিয়তে = করা হয়; ইহ = এই লোকে; প্রোক্তং = বলা হয়; চলম্ = অনিত্য; অধ্রুবম্ = অনিশ্চিত।।১৮।।

অনুবাদ :- সৎকার, মান, এবং পূজা পাবার জন্য দম্ভ সহকারে যে তপস্যা করা হয় তা অনিত্য ও অনিশ্চিত। এই তপস্যাকে রাজস তপস্যা বলা হয়।।১৮।।

মূঢ়গ্রাহেণ আত্মনো যৎ # পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্য উৎসাদনার্থং বা # তৎ তামসম্ উদাহৃতম্।।১৯।।

মূঢ়-আগ্রহেণ = মূঢ় আগ্রহের দ্বারা; আত্মনঃ = নিজের; যৎ = যা; পীড়য়া = পীড়ার দ্বারা; ক্রিয়তে = করে; তপঃ = তপস্যা; পরস্য = পরের; উৎসাদনার্থং = বিনাশের জন্য; বা = অথবা; তৎ = তাকে; তামসম্ = তামস; উদাহৃতম্ = বলা হয়।।১৯।।

অনুবাদ :- বোকার মত বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজেকে কষ্ট দেবার জন্য বা অপরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা করা হয় তাকে তামস তপস্যা বলা হয়।।১৯।।

দাতব্যম্ ইতি যৎ দানং # দীয়তে অনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ # তৎ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।।২০।।

দাতব্যম্ = দান করা কর্তব্য; যৎ = যা; দীয়তে = দেওয়া হয়; অনুপকারিণে = অনুপকারিকে; তৎ = সেই; স্মৃতম্ = বলা হয়।।২০।।

অনুবাদ :- 'দান করা কর্তব্য' এই কথা ভেবে দেশ, কাল ও পাত্রে অনুপকারিকে অর্থাৎ যে অপরের নিকট থেকে উপকার পেয়ে সেই উপকারীর কোন প্রত্যুপকার করে না সেই রকম ব্যক্তিকে যে দান করা হয় তাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়।।২০।।

যৎ তু প্রতি-উপকারার্থং # ফলম্ উদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং # তৎ দানং রাজসং স্মৃতম্।।২১।।

যৎ = যা; তু = কিন্তু; প্রতি-উপকারার্থং = বিনিময়ে উপকার পাবার আশায়; ফলম্ উদ্দিশ্য = ফল আশা করে; দীয়তে = দেওয়া হয়; পরিক্লিষ্টং = মনের মধ্যে কষ্ট রেখে; তৎ = সেই; স্মৃতম্ = বলা হয়।।২১।।

অনুবাদ :- কিন্তু যে দান বিনিময়ে উপকার পাবার আশায় বা পুনরায় ফললাভের উদ্দেশ্যে করা হয় বা যে দানের মধ্যে মনে কষ্ট থাকে সেই দানকে রাজস দান বলা হয়।।২১।।

অদেশ-কালে যৎ দানম্ # অপাত্রেভ্যঃ চ দীয়তে।

অসৎকৃতম্ অবজ্ঞাতম্ # তৎ তামসম্ উদাহৃতম্।।২২।।

অদেশ-কালে = অযোগ্য দেশে ও অশুভ সময়ে; যৎ দানম্ = যে দান; অপাত্রেভ্যঃ = চোর, মদ্যপ, জুয়াড়ী প্রভৃতি অনুপযুক্ত পাত্রে; দীয়তে = দেওয়া হয়; অসৎকৃতম্ = অনাদরে; অবজ্ঞাতম্ = অবজ্ঞা সহকারে; তৎ = তাকে; তামসম্ উদাহৃতম্ = তামস বলা হয়।।২২।।

অনুবাদ :- অযোগ্য দেশে ও অশুভ সময়ে, চোর, মদ্যপ, জুয়াড়ী প্রভৃতি অনুপযুক্ত পাত্রে বা অনাদরে, অবজ্ঞা সহকারে যে দান করা হয় তাকে তামস দান বলা হয়।।২২।।

ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দেশো # ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।

ব্রাহ্মণাঃ তেন বেদাশ্চ # যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা।।২৩।।

ইতি নির্দেশঃ = এই নাম; ব্রহ্মণঃ = ব্রহ্মের; ত্রিবিধঃ = তিন প্রকার; স্মৃতঃ = বলা হয়েছে; বিহিতাঃ = সৃষ্টি হয়েছে; পুরা = পুরাকালে।।২৩।।

অনুবাদ :- শাস্ত্রে ব্রহ্মের 'ওঁ তৎ সৎ' - এই তিনটি নাম বলা হয়েছে। পুরাকালে এই তিনটি নাম থেকেই ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞসমূহ সৃষ্টি হয়েছে।।২৩।।

তস্মাৎ ওঁ ইতি উদাহৃত্য # যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াঃ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ # সততং ব্রহ্মবাদিনাম্।।২৪।।

তস্মাৎ = সেইজন্য; ওঁ ইতি = ওঁ এই নাম; উদাহৃত্য = উচ্চারণ ক'রে; প্রবর্তন্তে = অনুষ্ঠিত হয়; বিধানোক্তাঃ = শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী; সততং = সর্বদা; ব্রহ্মবাদিনাম্ = ব্রহ্মবাদিগণের।।২৪।।

অনুবাদ :- সেইজন্য ব্রহ্মবাদিগণ সর্বদাই 'ওঁ শব্দ উচ্চারণ করার পর শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন।।২৪।।

তদ্ ইতি অনভিসন্ধায় # ফলং যজ্ঞ-তপঃ-ক্রিয়াঃ।

দানক্রিয়াঃ চ বিবিধাঃ # ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।।২৫।।

তৎ ইতি = 'তৎ' এই শব্দ; অনভিসন্ধায় = আকাঙ্ক্ষা না করে; ফলং = ফলের; ক্রিয়ন্তে = অনুষ্ঠান করেন; মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ = যাঁরা মুক্তি কামনা করেন।।২৫।।

অনুবাদ :- যাঁরা মোক্ষ কামনা করেন তাঁরা ফলের কামনা না ক'রে 'তৎ' এই শব্দ উচ্চারণের পর যজ্ঞ, তপ, দান প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন।।২৫।।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ # সৎ ইতি এতৎ প্রযুজ্যতে।

প্রশস্তে কর্মণি তথা # সৎ শব্দঃ পার্থ যুজ্যতে।।২৬।।

এতৎ = এই; প্রযুজ্যতে = প্রয়োগ করা হয়; প্রশস্তে = শুভ; কর্মণি = কর্মে; তথা = সেইরকম; যুজ্যতে = প্রয়োগ করা হয়।।২৬।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! সৎ ভাবে ও সাধুভাবে 'সৎ' এই শব্দ প্রয়োগ করা হয়। তেমনই শুভ কর্মেও 'সৎ' এই নাম প্রয়োগ করা হয়।।২৬।।

ব্যাখ্যা :- 'সৎ' শব্দের অর্থ হল যার অস্তিত্ব সদা বিদ্যমান থাকে, যা অবিনশ্বর, যেমন ব্রহ্ম আর 'অসৎ' শব্দের অর্থ হল যার অস্তিত্ব নাই, যা নশ্বর যেমন জীবদেহ। সেইজন্য যে কোন মাঙ্গলিক কাজে সেই কর্মের পরিণাম স্থায়ী হোক এই কামনায় 'সৎ' এই শুভ শব্দ উচ্চারণ করা হয়।। ২৬।।

যজ্ঞে তপসি দানে চ # স্থিতিঃ সৎ ইতি চ উচ্যতে।

কর্ম চ এব তদ্ অর্থীয়ং # সদ্ ইতি এব অভিধীয়তে।।২৭।।

যজ্ঞে তপসি দানে = যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে; চ = এবং; স্থিতিঃ = স্থির ভাবনা অর্থাৎ নিষ্ঠা; উচ্যতে = বলা হয়; কর্ম তৎ = সেই কার্য; অর্থীয়ং = অর্থে; অভিধীয়তে = বলা হয়।।২৭।।

অনুবাদ :- যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে স্থিরতা অর্থাৎ নিষ্ঠাকে 'সৎ' নামে অভিহিত করা হয়। আবার এই উদ্দেশ্যে যে সব পবিত্র কর্ম করা হয় সেই সমস্ত কাজকেও 'সৎ' নামে অভিহিত করা হয়।।২৭।।

ব্যাখ্যা :- শঙ্করাচার্য বলেছেন যে ব্রহ্মের ‘ওঁ তৎ সৎ’এই তিনটি নামের এমনই মাহাত্ম্য যে যজ্ঞ, তপ ইত্যাদি কর্ম যদি অসাত্ত্বিক ও গুণহীনও হয় তাহলেও শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবানের এই তিনটি নাম উচ্চারণ করলে এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি সগুণ ও সাত্ত্বিক রূপ লাভ করে — “এতদ্ যজ্ঞতপ - আদি কর্ম অসাত্ত্বিকং বিগুণম্ অপি শ্রদ্ধাপূর্বকং ব্রহ্মণঃ অভিধানত্রয়প্রয়োগেন সগুণং সাত্ত্বিকং সম্পাদিতং ভবতি”।।২৭।।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং # তপঃ তপ্তং কৃতং চ যৎ।

অসদ্ ইতি উচ্যতে পার্থ # ন চ তদ্ প্রেত্য নো ইহ।।২৮।।

অশ্রদ্ধয়া = অশ্রদ্ধা সহকারে; হুতং = হোম; দত্তং = দান; তপ্তং = অনুষ্ঠিত; কৃতং = করা হয়; যৎ = যা; অসৎ = যা সৎ নয়; উচ্যতে = বলা হয়; তৎ = সেটি; প্রেত্য = পরকালে; ন = নয়; ইহ = ইহলোকে।।২৮।।

অনুবাদ :- অশ্রদ্ধা সহকারে হোম, দান, তপ আর যা কিছু করা হয় সেগুলি সবই ‘অসৎ’ অর্থাৎ বৃথা। কি পরলোকে কি ইহলোকে তারা কোন ফলই দেয় না।।২৮।।

—: সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত :—

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষসন্ন্যাসযোগ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো # তত্ত্বম্ ইচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ # পৃথক্ কেশি-নিষূদন।।১।।

কেশী = কেশী নামক অসুর; নিষূদন = হত্যাকারী; সন্ন্যাসস্য = সন্ন্যাসের; ত্যাগস্য = ত্যাগের; চ = এবং; তত্ত্বং = রহস্য; পৃথক্ = ভিন্ন ভিন্নভাবে; বেদিতুম্ = জানতে; ইচ্ছামি = ইচ্ছা করি।।১।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন— হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশীদৈত্য নিধনকারী! সন্ন্যাস এবং ত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব কি তা আমি পৃথকভাবে জানতে চাই।।১।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং # সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং # প্রাহুঃ ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।।২।।

কাম্যানাং কর্মণাং = কাম্যকর্মসমূহকে; ন্যাসং = ত্যাগ; কবয়োঃ = পণ্ডিতগণ; বিদুঃ = জানেন; প্রাহুঃ = বলেন।

অনুবাদ :- শ্রীভগবান্ বললেন — পণ্ডিতগণ বলেন যে কাম্যকর্মকে ত্যাগ করাই হল 'সন্ন্যাস' এবং বিচক্ষণগণ বলেন যে সর্বকর্মের ফল বর্জন করার নাম হল 'ত্যাগ'।।২।।

ব্যাখ্যা :- স্ত্রী, পুত্র, সম্পদ এবং স্বর্গাদি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তি, রোগ, সঙ্কটাদি অপ্রিয় বিষয় থেকে মুক্তি পাওয়া, শাস্ত্রবিহিত দান, যজ্ঞ, তপ, উপাসনা ইত্যাদি শুভকর্ম যেগুলি করার ইচ্ছা হলে সেগুলি করা এবং যদি সেগুলি করতে ইচ্ছা না হয় এবং সেগুলি না করলে যদি কোন ক্ষতি না হয় তাহলে সেগুলি না করা—এই সমস্ত শুভকর্মকে কাম্যকর্ম বলা হয়।

'সর্বকর্ম' বলতে এখানে ঈশ্বরভক্তি, দেবতাদের পূজা, মাতা-পিতাকে ভক্তি, গুরুজনদের সেবা, দান, ধ্যান, তপস্যা, যে যে বর্ণের জন্য শাস্ত্র নির্ধারিত জীবিকানির্বাহ ও শরীর সম্বন্ধীয় আহারাদি যা যা কর্ম নির্ধারিত আছে যেগুলি না করলে নীতি, ধর্ম ও কর্মপরম্পরায় বাধা সৃষ্টি হয় সেই সমস্ত কর্মকে বোঝানো হয়েছে।।২।।

ত্যাজ্যং দোষবৎ ইতি একে # কর্ম প্রাহুঃ মনীষিণঃ।
যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম # ন ত্যাজ্যম্ ইতি চ অপরে।।৩।।

ত্যাজ্যং = ত্যাগ করা উচিত; দোষবৎ = দোষদুষ্ট; একে = কোন কোন; প্রাহুঃ = বলেন; মনীষিণঃ = পণ্ডিতগণ।।৩।।

অনুবাদ :- কোন কোন পণ্ডিতের মতে প্রতিটি কর্মের মধ্যই কিছু না কিছু দোষ থাকে এবং সেইজন্য কোন কর্মই করা উচিত নয়। আবার অপর (মীমাংসকগণের) মতে যজ্ঞ, দান ও তপঃকর্ম এই সব কর্মের মধ্যে কোন দোষ নাই। সেইজন্য এই সব কর্ম করা উচিত।।৩।।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র # ত্যাগে ভরতসত্তম।।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র # ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ।।৪।।

শৃণু = শোন; ভরতসত্তম = শ্রেষ্ঠ ভরত বংশীয়; নিশ্চয়ং = সিদ্ধান্ত; সংপ্রকীর্তিতঃ = বলা হয়েছে।।৪।।

অনুবাদ :- হে শ্রেষ্ঠ ভরত বংশীয়! হে পুরুষোত্তম! এখন ত্যাগ সম্পর্কে আমার স্থির সিদ্ধান্ত শোন। ত্যাগ হল তিন প্রকার।।৪।।

যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম # ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব # পাবনানি মনীষিণাম্।।৫।।

পাবনানি = পবিত্র।।৫।।

অনুবাদ :- যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা হল পবিত্র কর্ম। সুতরাং এগুলি ত্যাগ করা উচিত নয়। এই কর্মগুলি বিদ্বানগণেরও চিত্ত শুদ্ধ করে।।৫।।

এতানি অপি তু কর্মাণি # সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানি ইতি মে পার্থ # নিশ্চিতং মতম্ উত্তমম্।। ৬।।

এতানি অপি = এইগুলিও; তু = কিন্তু; কর্মাণি = কর্মসমূহ; সঙ্গং = আসক্তি; ত্যক্ত্বা = ত্যাগ করে।।৬।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! আমি মনে করি যে এই সমস্ত কর্মও (যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা) মন থেকে আসক্তি ও ফলের কামনা ত্যাগ ক'রে করা উচিত।।৬।।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ # কর্মণো ন উপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ # তামসঃ পরিকীর্তিতঃ।।৭।।

নিয়তস্য = নিত্যকর্ম; ন উপপদ্যতে = উপযুক্ত নয়; পরিকীর্তিতঃ = বলা হয়।।৭।।

অনুবাদ :- কিন্তু নিয়ত কর্মকে (যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা) ত্যাগ করা চলে না। মোহবশতঃ এগুলিকে ত্যাগ করলে সেই ত্যাগকে তামস ত্যাগ বলা হয়।।৭।।

ব্যাখ্যা :- 'নিয়ত কর্ম' বলতে বোঝায় সেই সমস্ত কর্মকে যেগুলি বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের জন্য যজ্ঞ, দান, তপ, অধ্যয়ন, শিক্ষাদান, উপদেশ, যুদ্ধ, প্রজাপালন, পশুপালন, কৃষি, ব্যবসায়, সেবা, আহারাদি যে যে কর্ম শাস্ত্র অবশ্য করণীয় বলে বিধান দিয়েছে। নিয়ত কর্ম কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ নিয়ত কর্ম হল মানুষের কর্তব্য কর্ম। এই কর্মগুলিকে ত্যাগ করা শাস্ত্রের অভিমত অনুযায়ী পাপ বলে গণ্য হয়। এই সমস্ত কর্ম করা না হলে সমাজ তথা দেশের সমূহ ক্ষতি হবে।।৭।।

দুঃখম্ ইতি এব যৎ কর্ম # কায়-ক্লেশ-ভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং # নৈব ত্যাগফলং লভেৎ।।৮।।

ভয়াৎ = ভয়ের কারণে; ত্যজেৎ = ত্যাগ করে; কৃত্বা = ক'রে; লভেৎ = লাভ করে।।৮।।

অনুবাদ :- আবার অনেকে শরীরের কষ্ট হবে এই ভয়ে কর্ম ত্যাগ করে। এই রকম ত্যাগকে রাজস ত্যাগ বলা হয়। এই রকম ত্যাগের দ্বারাও ত্যাগের সুফল পাওয়া যায় না।।৮।।

ব্যাখ্যা :- সপ্তম শ্লোকে ভগবান্ যে নিয়ত কর্মগুলি করার কথা বলেছেন সেগুলি প্রত্যেকেরই অবশ্য করণীয়। কিন্তু এই সকল কর্ম তো অনায়াসেই করা যায় না। এই কর্মগুলি করতে হলে মানুষের শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের বেশকিছু পরিশ্রম করতে হয়, অনেক প্রকার বস্তু যোগাড় করতে হয়, অনেক বিধি-নিষেধ অতিক্রম করতে হয়, শরীরের আরাম ত্যাগ করতে হয়, ব্রত, উপবাস প্রভৃতির কষ্ট সহ্য করতে হয়। সেইজন্য কিছু মানুষ এগুলিকে শরীরের পক্ষে পীড়াদায়ক জ্ঞানে এইসব কর্মকে ত্যাগ করে। এই ত্যাগ প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ কথিত আদর্শ ত্যাগ নয়, এগুলি ভগবানের মতে রাজস ত্যাগ। এই ত্যাগ মানুষকে কোনপ্রকার শুভ ফল দান করে না। সর্বদা মনে রাখা কর্তব্য যে ভগবান্ কখনও সমস্ত প্রকার কর্মত্যাগের কথা বলেননি। তিনি বলেছেন অসৎ কর্ম পরিত্যাগ করতে এবং সৎ কর্ম করলেও সেই কর্মের ফলের প্রতি সর্ব প্রকার আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে সেই সৎ কর্ম করতে। কর্মে যদি আসক্তি থাকে তাহলে সেই শুভ কর্ম করেও কখনই ভগবানের করুণা লাভ করা যাবে না।।৮।।

কার্যম্ ইতি এব যৎ কর্ম # নিয়তং ক্রিয়তে অর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চ এব # স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ।। ৯।।

ক্রিয়তে = করা হয়; সঙ্গং = আসক্তি; ত্যক্ত্বা = ত্যাগ ক'রে।।৯।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা কর্তব্য এই ভেবে আসক্তি ও কর্মের ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে নিয়ত কর্ম করলে সেই ত্যাগকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলা হয়।।৯।।

ন দ্বেষ্টি অকুশলং কর্ম # কুশলে ন অনুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো # মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ।।১০।।

ন দ্বেষ্টি = দ্বেষ করেন না; ন অনুষজ্জতে = আসক্ত হন না; সত্ত্বসমাবিষ্টঃ = যিনি সত্ত্বগুণে সমাবিষ্ট অর্থাৎ অধিষ্ঠিত; ছিন্নসংশয়ঃ = যার সংশয় ছিন্ন বা দূর হয়েছে অর্থাৎ যিনি নিঃসংশয়।।১০।।

অনুবাদ :- নিত্য কর্ম করার জন্য যিনি অকুশল অর্থাৎ কষ্টকর কার্য যেমন শীতকালে সকালে স্নানে বিরত হন না আবার কুশল কর্ম অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে দুপুরে আরামদায়ক স্নানের প্রতি আকৃষ্ট হন না, যার বুদ্ধি চঞ্চল নয় অর্থাৎ যিনি স্থিরবুদ্ধি, যিনি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, যিনি নিঃসংশয় অর্থাৎ যার মনে এইভাবে

কর্তব্য কর্ম করলে তার ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে কি যাবে না এইরকম কোন সংশয় নাই তিনিই প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগী পুরুষ।।১০।।

ন হি দেহভৃতা শক্যং # ত্যক্তুং কর্মাণি অশেষতঃ।
যঃ তু কর্মফলত্যাগী # স ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে।। ১১।।

হি = অবশ্যই; দেহভৃতা = দেহধারী; শক্যং = সক্ষম; ত্যক্তুং = ত্যাগ করতে; কর্মাণি = কর্মসমূহ; অশেষতঃ = সম্পূর্ণরূপে; অভিধীয়তে = বলা হয়।।১১।।

অনুবাদ :- দেহধারী মানুষ কখনই সম্পূর্ণরূপে কর্ম ত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু যিনি কর্ম ক'রে সেই কর্মের ফলের প্রতি আসক্ত হন না তাঁকেই প্রকৃত ত্যাগী বলা হয়।।১১।।

অনিষ্টম্ ইষ্টং মিশ্রং চ # ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবতি অত্যাগিনাং প্রেত্য # ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ।।১২।।

অনিষ্টম্ = খারাপ কাজ; ইষ্টং = ভালো কাজ; মিশ্রং = ভালো মন্দ মেশানো কাজ; অত্যাগিনাং = যারা কর্মের ফলের আসক্তি ত্যাগ করতে পারে না; প্রেত্য = পরলোকে; সন্ন্যাসিনাং = সন্ন্যাসীদের; ক্বচিৎ = কখনও।।১২।।

অনুবাদ :- কর্ম তিন প্রকার — অনিষ্ট কর্ম অর্থাৎ খারাপ কাজ, ইষ্টকর্ম অর্থাৎ ভালো কাজ এবং মিশ্রকর্ম অর্থাৎ অনিষ্ট ও ইষ্টকর্ম উভয় অর্থাৎ যে কাজে ভালোও আছে এবং মন্দও আছে। যারা কর্মের ফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করতে পারে না তারা পরলোকে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং এই তিন প্রকার কৃত কর্ম অনুসারে ফলভোগ করে। কিন্তু যাঁরা ফলের আসক্তি ত্যাগ করতে পারেন সেই সব সন্ন্যাসীরা কর্ম করলেও মৃত্যুর পর কোন কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। সেইজন্য তাঁদেরকে কোন কর্মফল ভোগ করতে হয় না।।১২।।

ব্যাখ্যা :- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বহুস্থলে আমরা কর্মফলের কথা শুনতে পাই। এখন আমাদের সম্যকভাবে জানা প্রয়োজন কর্মের ফল বলতে কি বোঝায়। কর্মের ফলের প্রকৃত অর্থ কি শঙ্করাচার্য তার অতি সংক্ষেপে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, যে পদার্থ বাহ্যিক কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া আদি অনেক প্রকার কারক দ্বারা নিষ্পন্ন হয় এবং যা বাজিকরের মায়ার ন্যায়, অবিদ্যাজনিত, মহামোহকারক এবং যাকে ভ্রান্ত দৃষ্টিতে জীবাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত মনে হয় এবং যা মূলত অসার হওয়ার কারণে দ্রুত লয় অর্থাৎ বিনষ্ট হয়ে যায় তাকেই কর্মের ফল বলা হয়—

"বাহ্যানেককারকব্যাপারনিষ্পন্নং সদ্ অবিদ্যাকৃতম্ ইন্দ্রজালমায়োপমং মহামোহকরং প্রত্যগাত্মোপসর্পি ইব ফল্গুতয়া লয়ম্ অদর্শনং গচ্ছতি ইতি ফলম্ ইতি ফলনির্বচনম্"।।১২।।

পঞ্চ-ইমানি মহাবাহো # কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি # সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্।১৩।।

ইমানি = এইসব; কারণানি = কারণসমূহ; নিবোধ = শোন; সাংখ্যে = বেদান্তে; কৃতান্তে = কর্মসমাপ্তি বিষয়ে; প্রোক্তানি = বলা হয়েছে; সিদ্ধয়ে = সিদ্ধির বিষয়ে; সর্বকর্মণাম্ = সকল কর্মের।।১৩।।

অনুবাদ :- হে মহাবাহো! সাংখ্যে অর্থাৎ বেদান্তে বলা হয়েছে যে সকল কর্মের সিদ্ধির পিছনে পাঁচটি কারণ থাকে। আমি সেগুলি তোমাকে বলছি, তুমি সেগুলি শোন।।১৩।।

ব্যাখ্যা :- অনেকের মনে প্রশ্ন আসে সাংখ্য বলতে কি বোঝায়। শঙ্করাচার্য খুব সুন্দরভাবে অতি সংক্ষেপে 'সাংখ্য' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে, যে শাস্ত্রে জানার যোগ্য পদার্থসমূহের সংখ্যা অর্থাৎ গণনা করা হয় তাকে সাংখ্য অর্থাৎ বেদান্ত বলা হয় — "সাংখ্যে জ্ঞাতব্যাঃ পদার্থাঃ সংখ্যায়ন্তে যস্মিন্ শাস্ত্রে তৎ সাংখ্যং বেদান্তঃ।" আবার রামানুজাচার্য বলেছেন যে সংখ্যা শব্দের অর্থ হল বুদ্ধি — "সংখ্যা বুদ্ধিঃ" ইতি। সুতরাং যে শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞানকে বিষয় ক'রে জ্ঞানযোগের প্রতিপাদন করা হয় তাকে সাংখ্য বলা হয়।

তাহলে আমাদের জানা প্রয়োজন যে কোন সেই তত্ত্ব যা সাংখ্যের বিষয়বস্তু যাকে জানা আমাদের প্রয়োজন। এই তত্ত্ব হল আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ পরমাত্মাকে জানা। এই পরমাত্মা কিরূপ সে সম্পর্কে শতপথব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে যিনি আত্মার মধ্যে বাস করেন কিন্তু আত্মার অপেক্ষাও অন্তরতম, যাঁকে আত্মা জানেন না, আত্মা হল যাঁর শরীর, যিনি আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থান ক'রে আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই হলেন সকলের জ্ঞাতব্য পরমতত্ত্ব অমৃতরূপ পরমাত্মা — "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাৎমনোন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরম্ য আত্মানমন্তরো যময়তি ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" (১৪।৫।৩০)। এই পরমতত্ত্ব হল সেই জ্ঞান যা শাস্ত্রীয় বুদ্ধির মাধ্যমে যোগীকে অবহিত করায় যে যাঁর উপকরণ হল শরীর,

ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং জীবাত্মা সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মাই হলেন সকল কর্মের প্রকৃত কর্তা। এই পরম সত্য না জানলে জীবের অন্তরে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে না এবং ফলতঃ সে ভগবানের পরমপদ অর্থাৎ পরম আশ্রয় লাভের উপযোগী হয়ে উঠতে পারবে না।। ১৩।।

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা # করণং চ পৃথগ্ বিধম্।
বিবিধাঃ চ পৃথক্ চেষ্টা # দৈবং চ এব অত্র পঞ্চমম্।১৪।।

অধিষ্ঠানং = কর্মের স্থান অর্থাৎ শরীর; কর্তা = যিনি করেন অর্থাৎ জীবাত্মা; করণং = মন ও হাত, পা ইত্যাদি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়।।১৪।।

অনুবাদ :- উপর্যুক্ত কারণগুলি হল— (১) অধিষ্ঠান অর্থাৎ কর্মের স্থান অর্থাৎ শরীর, (২) কর্তা অর্থাৎ যিনি করেন অর্থাৎ জীবাত্মা, (৩) করণ অর্থাৎ মন ও হাত, পা ইত্যাদি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, (৪) বিভিন্ন প্রকার চেষ্টা এবং (৫) পঞ্চম ও মুখ্য কারণ হলেন দৈব অর্থাৎ এই জগতের পরিচালক পরব্রহ্ম।।১৪।।

ব্যাখ্যা :- (১) শরীরকে অধিষ্ঠান বলা হয় কারণ এখানে জীবাত্মা অধিষ্ঠিত থাকেন। (২) জীবাত্মা হলেন কর্তা। (৩) মন ও বাক্য এবং হাত, পা প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয় হল করণ। যার সাহায্যে কোন কিছু করা হয় তাকে করণ বলা হয়। কাজেই মন, বাক্য, হাত, পা আদি ইন্দ্রিয়সমূহ হল করণ যেহেতু এদের দ্বারাই ভাবনা, চিন্তা, স্থানান্তরে যাওয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালানো প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম হয়ে থাকে। (৪) শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহকে ধারণকারী প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটি বায়ুর ক্রিয়াকে চেষ্টা বলা হয়। যে কোন কাজে সাফল্যলাভের জন্য চেষ্টা করতে হয়। দেহকে বাঁচিয়ে রাখার মত কর্মে সফল হওয়ার জন্য এই পাঁচ প্রকার বায়ুকে প্রতিনিয়ত উদ্যোগ নিতে হয়। তাদের এই উদ্যোগই হল চেষ্টা। (৫) ভগবান্ দৈব বা পরব্রহ্মকে প্রধান কারণ বলেছেন। এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন আসে। পরব্রহ্ম যদি কর্ম-সিদ্ধির প্রধান কারণ হন তাহলে জীবাত্মা তাঁর অংশ হওয়ার কারণে তার তো কর্ম করার কিছু থাকে না কারণ প্রধান যেখানে সব কর্ম করে সেখানে তার প্রতিনিধির তো কোন কাজ করার থাকে না। তাহলে জীবাত্মাকে সঠিকভাবে কর্মসিদ্ধির অপর কারণ বলা সমীচীন হয় না। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে — "কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু

বিহিত-প্রতিসিদ্ধাহবৈয়র্য্যাদিভ্যঃ।।” (২/৩/৪২) অর্থাৎ পরব্রহ্ম নিজে কিছু করেন না কিন্তু তিনি জীবাত্মা যে কর্ম করেন তাতে অনুমতি প্রদান ক'রে জীবাত্মাকে কর্মে প্রবৃত্ত করেন। জীবাত্মার সুখ-দুঃখ প্রভৃতি তার নিজহাতে তৈরী। জীবাত্মা পরব্রহ্মের দ্বারাই নিয়োজিত হয়ে কর্মপ্রচেষ্টায় রত হয়। ভগবানের কাজে কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। ভগবান্ অনুকূল থেকে জীবাত্মার কর্মপ্রচেষ্টায় সার্থকতা বিধান করেন। সেইজন্য পরমাত্মা ও নিজ বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্ত হওয়ার কারণে জীবাত্মাও কর্মসিদ্ধির একটি কারণ।।১৪।।

শরীর-বাক্-মনোভিঃ যৎ # কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা # পঞ্চ এতে তস্য হেতবঃ।।১৫।।

শরীর = কায়; বাক্ = বাক্য; মনোভিঃ = মন; প্রারভতে = আরম্ভ করে; এতে = এই; তস্য = তার।।১৫।।

অনুবাদ :- কায়, মন ও বাক্যদ্বারা মানুষ ভালো বা মন্দ যে কাজই করুক না কেন তাদের সকলেরই এই পাঁচটিই কারণ।।১৫।।

তত্র এবং সতি কর্তারম্ # আত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যতি অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ # ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ।।১৬।।

এবং = এইরূপ; সতি = হলেও; পশ্যতি = দেখে; অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ = বুদ্ধিহীনতার কারণে।।১৬।।

অনুবাদ :- প্রকৃতপক্ষে সকল কার্যের এই পাঁচটিই কারণ হলেও যে একমাত্র জীবাত্মাকেই সকল কার্যের কর্তা ব'লে ভাবে সে বুদ্ধিহীন ও দুর্মতি। সেইজন্য সে এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে না।।১৬।।

যস্য ন অহংকৃতো ভাবো # বুদ্ধিঃ যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বা অপি স ইমান্ লোকান্ # ন হন্তি ন নিবধ্যতে।।১৭।।

অহংকৃতঃ ভাবঃ = 'আমিই সব' এই অহং বোধ; ন লিপ্যতে = আসক্ত হন না; হত্বা = হত্যা ক'রে; অপি = ও; ন হন্তি = হত্যা করেন না; ন নিবধ্যতে = আবদ্ধ হন না।।১৭।।

অনুবাদ :- যার মনের ভিতরে 'আমিই সব' এই অহং বোধ নাই, যিনি কোন কর্মে আসক্ত হন না তিনি এই সব মানুষদের হত্যা করলেও তিনি প্রকৃত পক্ষে কাউকে হত্যা করেন না বা কোন কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না।।১৭।।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা # ত্রিবিধা কর্ম-চোদনা।
করণং কর্ম কর্তা ইতি # ত্রিবিধঃ কর্ম-সংগ্রহঃ।। ১৮।।

জ্ঞেয়ং = জানার যোগ্য; পরিজ্ঞাতা = যিনি জ্ঞান অর্জন করেন; চোদনা = প্রেরণা, শাস্ত্রের বিধিবাক্য; কর্ম-সংগ্রহঃ = কর্মের আশ্রয়।।১৮।।

অনুবাদ :- জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা থেকেই কর্মের মানসিক প্রেরণা পাওয়া যায় এবং এই মানসিক প্রেরণার ফলে করণ, কর্ম ও কর্তা এই তিনের সমন্বয়ে কর্মের যে বাহ্যিক প্রকাশ তাকে কর্মসংগ্রহ বলা হয়।।১৮।।

ব্যাখ্যা :- এখানে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটি শব্দের অর্থ ভালোভাবে বোঝা প্রয়োজন। যেমন মোটরগাড়ী তৈরী করতে হবে। এই কাজটি করতে হলে একজনকে প্রয়োজন যিনি কাজটি জানেন। তিনি হলেন জ্ঞাতা। কাজটি করার আগে তাকে মোটরগাড়ী আসলে কেমন তা তাকে জানতে হবে। এখানে মোটরগাড়ী হল হল জ্ঞেয় বস্তু। তাঁর আবার সেই কাজটি করার কৌশলটি জানা চাই। এইটিই হল জ্ঞান এবং এই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার প্রেরণার ফলে যে মোটর গাড়িটি তৈরি হল সেইটিই হল কর্মসংগ্রহ।।১৮।।

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ # ত্রিধা এব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে # যথাবৎ শৃণু তানি অপি।।১৯।।

গুণভেদতঃ = গুণ ভেদে; প্রোচ্যতে = বলা হয়; গুণসংখ্যানে = সাংখ্য শাস্ত্রে; শৃণু = শোন; যথাবৎ = যথাযথরূপে; তানি = সেই সকল।।১৯।।

অনুবাদ :- সাংখ্যশাস্ত্রে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের ভিত্তিতে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার তিন প্রকার ভেদ বর্ণনা করা হয়েছে। আমি সেগুলির বিষয়ে বর্ণনা করছি। তুমি শোন।।১৯।।

সর্বভূতেষু যেন একং # ভাবম্ অব্যয়ম্ ঈক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু # তৎ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্।। ২০।।

যেন = যে জ্ঞানের দ্বারা; ঈক্ষতে = দেখা যায়; অবিভক্তং = একই পরমাত্মায় অবস্থিত; বিভক্তেষু = আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত; বিদ্ধি = জানবে।।২০।।

অনুবাদ :- যে জ্ঞানের দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের থেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে অবস্থিত এই জগৎ সংসারের সকল জীবাত্মাকে সেই একই পরমাত্মাতে অবিভক্তরূপে অবস্থিত দেখা যায় সেই জ্ঞান হল সাত্ত্বিক জ্ঞান।।২০।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি সার তত্ত্বের পুনরুল্লেখ করেছেন। তিনি পূর্বেই বলেছেন যে জীব জন্মে জন্মে তার কর্মফল অনুযায়ী দেব, মনুষ্য, জীব, জন্তু, বৃক্ষলতা প্রভৃতি বিভিন্ন দেহ লাভ করে থাকে। সেইজন্য পুনর্জন্মের পর তাদেরকে পৃথক পৃথক দেহবিশিষ্ট দেখা যায়। কিন্তু তাদেরকে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন দেখতে মনে হলেও তাদের সকলের মধ্যে যিনি বাস করেন সেই জীবাত্মা কিন্তু পৃথক পৃথক দেহে ভিন্ন ভিন নন। যেমন ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন জড়-চেতন সমস্ত বস্তুর উপর সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়। সেই সমস্ত জড় ও চেতন বস্তু প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের উপর প্রতিফলিত হয় যে সূর্যরশ্মি সে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নয়। সে এক এবং অভিন্ন। সেইরকম পরমাত্মার অংশবিশেষ একই অভিন্ন জীবাত্মা অখণ্ডরূপে সকল জীবদেহে অবস্থান করেন। পরমাত্মা যেহেতু অখণ্ড সেই হেতু তাঁর অংশস্বরূপ জীবাত্মাও এক, অভিন্ন, অখণ্ড। প্রশ্ন হতে পারে জীবাত্মা যদি পরমাত্মার অংশ হয় তাহলে তো পরমাত্মা আর অখণ্ড থাকে না কারণ অংশ যত ক্ষুদ্রই হোক, মূল বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তো মূল বস্তুর সেই পরিমাণ অংশ কম হয়ে যায়। এই ধারণার কারণ হল শাস্ত্রবিষয়ে অজ্ঞানতা। ঈশাবাস্যোপনিষদে বলা হয়েছে — "পূর্ণস্য পূর্ণম্ আদায় পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে" অর্থাৎ পূর্ণ থেকে পূর্ণ গ্রহণ করা হলে যা অবশিষ্ট থাকে সেটিও পূর্ণ থাকে। যেমন একটি জ্বলন্ত বাতি থেকে হাজারটা বাতি জ্বাললেও মূল বাতিটির আগুন কখনই কমে যায় না আবার সেখান থেকে যে বাতিগুলি জ্বালা হল সেগুলির আগুনও মূল বাতির আগুন অপেক্ষা কখনও কম হয় না। পরব্রহ্ম পূর্ণ। সেইজন্য সেই পূর্ণ ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন কার্যব্রহ্মও পূর্ণ। পূর্ণ ব্রহ্ম থেকে কার্যব্রহ্ম উৎপন্ন হওয়ার পর পরব্রহ্ম পূর্ণই থাকেন।

কিন্তু একই আত্মা একই সময়ে কিভাবে সকল জীবের মধ্যে বাস করেন? শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ থেকে একটি উদাহরণ দিলে আর কারও মনে এই বিষয়টি বোঝার বিষয়ে সংশয় থাকবে না। পূর্ণাবতার পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অত্যাচারী ভৌমাসুরকে হত্যা ক'রে নারী সুরক্ষার মহান স্বার্থে ভৌমাসুরের কারাগারে বন্দিনী যোলহাজার রমণীদেরকে বিবাহ করলেন তখন যোল হাজার রমণীদের বিবাহের জন্য যোল হাজার পৃথক পৃথক গৃহে এক একজনের বিবাহের আয়োজন হয়েছিল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সকলের বিবাহ একটিই পুণ্যলগ্নে

সুসম্পন্ন হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি গৃহে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন সাজ ও সজ্জায় অখণ্ড অব্যয়রূপে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন —

অথো মুহূর্তে একস্মিন্ নানাগারেষূ তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
যথোপযেমে ভগবাংস্তাবদ্রূপধরোঽব্যয়ঃ।।

(১০।৫৯।৪২)

কেবলমাত্র তাই নয়। ভগবানের এই বিবাহের পর দেবর্ষি নারদের একদিন কৌতূহল হল ভগবান্ এত সংখ্যক রমণীর সঙ্গে বিবাহ ক'রে কিভাবে বিবাহিত জীবন যাপন করছেন তা স্বচক্ষে দেখার। সেইজন্য একদিন তিনি ভগবানের সেই যোলহাজার স্ত্রীদের ষোলহাজার গৃহে গেলেন এবং দেখলেন যে ভগবান্ প্রত্যেকটি গৃহে স্বয়ং উপস্থিত আছেন—

ইত্যাচরন্তং সদ্ধর্মান্ পাবনান্ গৃহমেধিনাম্।
তমেব সর্বগেহেষু সন্তমেকং দদর্শ হ।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১০।৬৯।৪১

দেবর্ষি নারদ দেখলেন যে ভগবান্ কোন গৃহে পত্নী ও উদ্ধবের সঙ্গে পাশা খেলছেন, কোন গৃহে তিনি শিশুপুত্রদের লালন-পালনে ব্যস্ত, কোথাও তিনি দেবতাদের আরাধনা করছেন, কোথাও সন্ধ্যাহ্নিক করছেন, কোথাও মন্ত্রীদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করছেন, কোথাও তিনি ব্রাহ্মণদের অর্থ, অলঙ্কার, গোধন ইত্যাদি দান করছেন, কোথাও তিনি পত্নীর সঙ্গে আলাপনে রত, কোথাও তিনি যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করছেন, কোথাও যাগ-যজ্ঞ করছেন, কোথায় অশ্বারোহণ ক'রে মৃগয়া করছেন, কোথাও ছদ্মবেশে সকলের অভিপ্রায় অবগত হওয়ার জন্য গোপনে বিচরণ করছেন। নারদ যেখানেই তাঁকে দর্শন করছেন সেখানেই ভগবান্ অখণ্ড অব্যয়রূপে বিরাজমান ছিলেন।

(শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ ১০।৬৯।২০-৩৯)

সুতরাং অবিদ্যাজনিত বুদ্ধির প্রকোপে প্রাকৃত মানুষের কাছে খণ্ড-অখণ্ডের যা ধারণা তা ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সেই জন্য তিনি যত স্থানেই উপস্থিত থাকুন না কেন সর্বত্রই তিনি অভিন্ন অখণ্ডরূপে বিদ্যমান। সুতরাং মনুষ্যাদি বিভিন্ন জীব যতই ভিন্ন ভিন্নভাবে দৃশ্যমান হোক না কেন যাঁরা প্রকৃতই তত্ত্বজ্ঞানী তাঁরা সর্বজীবে সেই এক পরমাত্মাকে দর্শন করেন, ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মাকে নয়। তাঁদের এই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলা হয়।।২০।।

পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানং # নানাভাবান্ পৃথগ্ বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু # তৎ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্।২১।।

পৃথক্ত্বেন = পৃথক পৃথক আকৃতির কারণে; পৃথগ্ বিধান্ = ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়; বেত্তি = জানে; বিদ্ধি = জানবে।।২১।।

অনুবাদ :- এক এক রকম জীবের আকৃতি এক এক রকম। যে জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির কারণে মনে করে যে প্রত্যেকটি জীবের দেহে আলাদা আলাদা জীবাত্মা বাস করে সেই জ্ঞানকে রাজস জ্ঞান বলে।।২১।।

যৎ তু কৃৎস্নবৎ একস্মিন্ # কার্যে সক্তম্ অহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবৎ অল্পং চ # তৎ তামসম্ উদাহৃতম্।।২২।।

কৃৎস্নবৎ = সম্পূর্ণরূপে; একস্মিন্ = একটিমাত্র; সক্তম্ = আসক্ত; অহৈতুকম্ = স্বাভাবিক কিন্তু অযৌক্তিক; অতত্ত্বার্থবৎ = তাত্ত্বিক অর্থবিহীন; অল্পং = তুচ্ছ।।২২।।

অর্থ :- যে জ্ঞান একটিমাত্র বিষয়কেই সম্পূর্ণ ব'লে ধ'রে নিয়ে তাতেই আসক্ত হয় এবং যা স্বাভাবিক হলেও যুক্তিবিরুদ্ধ, অযথার্থ, অল্প ও তুচ্ছ তাকে তামস জ্ঞান বলা হয়।।২২।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ বলেছেন যে তামসিক জ্ঞান স্বাভাবিক হলেও অযৌক্তিক, তাত্ত্বিক অর্থবিহীন এবং তুচ্ছ। প্রকৃতপক্ষে তামস জ্ঞান কোন জ্ঞান নয়, এটি আসলে হল বিপরীত জ্ঞান, বাস্তবে এটি হল অজ্ঞান। এই জ্ঞান বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান দেয় না। এই জ্ঞান মানুষের মনে ধারণা সৃষ্টি করে যে প্রকৃতপক্ষে জড় শরীরটাই আসল সত্য। তারা মনে করে শরীর এবং আত্মা একই পদার্থ, এর উপরে আর কিছুই নাই। সেইজন্য সে স্নান-আহার-বিহার ইত্যাদি কর্মকেই একমাত্র সত্য ভেবে তার প্রতি আসক্ত হয়। শঙ্করাচার্য বিষয়টিকে সুন্দর উপমার সাহায্যে প্রকাশ করেছেন — "যথা নগ্নক্ষপণকাদীণাং শরীরানুবর্তী দেহপরিমাণো জীব ঈশ্বরো বা পাষাণদার্বাদিমাত্র ইতি এবম্ একস্মিন্ কার্যে সক্তম্" অর্থাৎ যেমন নগ্ন দিগম্বর সাধুরা মনে করেন যে, যেহেতু আত্মা শরীরের মধ্যেই বাস করেন সেইজন্য শরীর এবং আত্মার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, অথবা পাথর বা কাষ্ঠ নির্মিত প্রতিমামাত্রই ঈশ্বর — এই ধরণের একটি কার্যে আসক্ত

জ্ঞান হল তামসিক যা পরিত্যজ্য। সেইজন্য ভগবান্ সাত্ত্বিক ও রাজসিকের ক্ষেত্রে 'জ্ঞান' শব্দটি ব্যবহার করলেও তামসের ক্ষেত্রে কিন্তু 'জ্ঞান' শব্দটি বর্জন করেছেন।। ২২।।

নিয়তং সঙ্গ-রহিতম্ # অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম # যৎ তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে।।২৩।।

নিয়তং = সদা সর্বদা; সঙ্গ-রহিতং = আসক্তি বিহীন; অরাগদ্বেষতঃ = রাগ ও দ্বেষ মুক্ত; অফলপ্রেপ্সুনা = আকাঙ্ক্ষা রহিত; উচ্যতে = বলা হয়।।২৩।।

অনুবাদ :- মনে ফলের প্রতি কর্তৃত্ত্বাভিমান, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি না রেখে যে নিয়ত কর্ম করা হয় এবং যে কর্ম করার পিছনে ভালো লাগা বা বিরক্তি কোনটিই থাকে না সেই কর্মকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়।।২৩।।

যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম # সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুল আয়াসং # তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্।।২৪।।

ঈপ্সু = পেতে ইচ্ছুক; সাহঙ্কারেণ = অতীব অহঙ্কারের সহিত; = ক্রিয়তে = করা হয়; আয়াসং = কষ্টসাধ্য।।২৪।।

অনুবাদ :- কিন্তু অন্তরে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অতীব অহঙ্কারের সঙ্গে বহু পরিশ্রমে অনেক কষ্টসাধ্য যে কাজ করা হয় সেই কাজকে রাজস কর্ম বলা হয়।।২৪।।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাম্ # অনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাৎ আরভ্যতে কর্ম # যৎ তৎ তামসম্ উচ্যতে।।২৫।।

অনুবন্ধং = কাজটির ভাবী কুফল; ক্ষয়ং = ধর্মজ্ঞান, অর্থ, মান, পরিশ্রম প্রভৃতির ক্ষতি; অনপেক্ষ্য = বিচার না ক'রে; আরভ্যতে = করা হয়; উচ্যতে = বলা হয়।।২৫।।

অনুবাদ :- যে কাজটি করলে তার ভাবী কুফল কি হবে, তার দ্বারা ধর্মজ্ঞান, অর্থ, মান, পরিশ্রম, প্রভৃতির কিরূপ ক্ষতি হবে, নিজের জীবনের কি ক্ষতি হবে বা অপরের উপর কোন অত্যাচার বা পীড়ন করা হবে কিনা, তার নিজের সামর্থ্য কতটুকু এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা না ক'রে কেবলমাত্র মোহগ্রস্ত হয়ে বুদ্ধিহীনের মত যে কাজ করা হয় তাকে তামস কর্ম বলা হয়।। ২৫।।

মুক্তসঙ্গঃ অনহংবাদী # ধৃতি-উৎসাহ-সমন্বিতঃ।
সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ # কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।। ২৬।।

মুক্তসঙ্গঃ = যিনি সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি থেকে মুক্ত; অনহংবাদী = যার কোন অহং বোধ নাই; ধৃতি = ধৈর্য; উচ্যতে = বলা হয়।।২৬।।

অনুবাদ :- যাঁর অন্তরে কোন বিষয় সম্পর্কে কোন আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা নাই, যিনি কখনও অহঙ্কার করেন না এবং যিনি ধৈর্য ও উৎসাহ সহকারে কর্ম করেন, যিনি সফলতা ও বিফলতাকে সমান জ্ঞান করেন তিনি সাত্ত্বিক কর্তা হিসাবে গণ্য হন।। ২৬।।

রাগী কর্মফল-প্রেপ্সুঃ # লুব্ধো হিংসাত্মকঃ অশুচিঃ।
হর্ষ-শোকান্বিতঃ কর্তা # রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ।। ২৭।।

রাগী = অনুরাগী অর্থাৎ যার মনে বাসনা আছে; প্রেপ্সুঃ = লাভ করতে ইচ্ছুক; লুব্ধঃ = লোভী; পরিকীর্তিতঃ = গণ্য হয়।।২৭।।

অনুবাদ :- যিনি বিষয়ের প্রতি আসক্ত, কর্মের ফললাভের প্রতি যাঁর অন্তরে বাসনা থাকে, যিনি লোভী, যিনি অপরকে হিংসা করেন, যিনি অন্তর ও বাহির পবিত্র রাখার জন্য বিধিপূর্ণ নিত্য-নৈমিত্তিক শৌচকর্ম পালন করেন না, যিনি নিজের সফলতায় উল্লসিত এবং ব্যর্থতায় শোকগ্রস্ত হন তিনি রাজস কর্তারূপে গণ্য হন।।২৭।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এই শ্লোকে সাত্ত্বিক জীবন লাভের নিমিত্ত উপযুক্তরূপে শৌচকর্ম পালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৯তম শ্লোকে ‘সংযম’ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শৌচকর্মের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শৌচকর্ম কাকে বলে সে বিষয়ে শাস্ত্রে বলা হয়েছে —

অভক্ষ্যপরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
স্বধর্মে চ ব্যবস্থানং শৌচমিত্যভিধীয়তে।।

অর্থাৎ অভক্ষ্য ভোজন না করা, কুসংসর্গ না করা, নিজের ধর্মে অবস্থান করা— এইগুলিকে শৌচ বা শুদ্ধি বলা হয়ে থাকে।

এখন অভক্ষ্য ভক্ষণ কাকে বলে এবং কেন অভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত নয় তা জেনে রাখা প্রয়োজন। মদ্য, মাংস প্রভৃতি অভক্ষ্য বস্তু। ভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলেছেন যে তিনি বৈশ্বানর অর্থাৎ জঠরাগ্নিরূপে সকল জীবের

দেহাভ্যন্তরে সদা বিরাজমান। মদ্য, মাংস প্রভৃতি অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ ক'রে কদাপি মন্দিরে যাওয়া উচিত নয়। আমাদের দেহ হল একটি মন্দির এবং সেই মন্দিরে অবস্থান করেন পরমাত্মা পরমপুরুষ পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁর পবিত্র স্পর্শে সেই দেহমন্দিরখানি পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছে। সেইজন্য সেই দেহরূপ পবিত্র মন্দিরের অভ্যন্তরে মদ্য, মাংসাদি অভক্ষ্য বস্তুর প্রবেশ ঘটানো কখনই সমীচীন নয়।

পবিত্র শুদ্ধ আহার কিভাবে মানুষের কল্যাণ করে সে বিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে —

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।
স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।। (৭।২৬।২)

অর্থাৎ শুদ্ধ আহার থেকে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে অক্ষয় স্মৃতিশক্তি লাভ হয়, অক্ষয় স্মৃতিশক্তি লাভ হলে চরাচরের সকল বন্ধন শিথিল হয়ে অচিরেই মোক্ষলাভ হয়।।২৭।।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ # শঠো নৈষ্কৃতিকঃ অলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ # কর্তা তামস উচ্যতে।।২৮।।

অযুক্তঃ = যে ব্যক্তি সৎ ও শাস্ত্রবিহিত কর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়; প্রাকৃতঃ = যে বিদ্যাহীন ও অসভ্য; স্তব্ধঃ = যার মধ্যে নম্রতাবোধ নাই; নৈষ্কৃতিকঃ = যে অপরকে অপমান করে; বিষাদী = বিষাদযুক্ত।।২৮।।

অনুবাদ :- যে ব্যক্তি সৎ ও শাস্ত্রবিহিত কর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়, যে বিদ্যাহীন ও অসভ্য, যার মধ্যে নম্রতাবোধ নাই, যে শঠ, যে অপরকে অপমান করে, যে অলস, বিষাদগ্রস্ত, দীর্ঘসূত্রী অর্থাৎ কোন কাজ করতে অযথা অনেক বেশী সময় ব্যয় করে তাকে তামস কর্তা বলা হয়।।২৮।।

বুদ্ধেঃ ভেদং ধৃতেঃ চ এব # গুণতঃ ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানম্ অশেষেণ # পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়।।২৯।।

ভেদং = সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ এই তিনের ভেদ; ধৃতেঃ = ধৈর্যের; প্রোচ্যমানম্ = যা বলা হবে; অশেষেণ = সম্পূর্ণরূপে।।২৯।।

অনুবাদ :- হে ধনঞ্জয়! সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ অনুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির যে তিন প্রকার ভেদ আছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পৃথকভাবে তোমার কাছে বর্ণনা করছি। তুমি শোন।।২৯।।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ # কার্য-অকার্যে ভয়-অভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি # বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।। ৩০।।

প্রবৃত্তিং = ন্যায়পরায়ণ কর্মে আগ্রহ; নিবৃত্তিং = অন্যায় কর্মে অনাগ্রহ; কার্য-অকার্যে = ভালো কাজে ও মন্দ কাজে; ভয়-অভয়ে = ভয় ও নির্ভয়; বন্ধং = সংসারের বন্ধন; মোক্ষং = সংসার থেকে মুক্তি; বেত্তি = জানে।। ৩০।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! যে বুদ্ধিদ্বারা মানুষ ন্যায়পরায়ণ কর্মে আগ্রহ ও অন্যায় কর্মে অনাগ্রহ অনুভব করে, শাস্ত্রে যে কর্ম অনুমোদন করা হয়নি সেই খারাপ কাজ করতে যে ভয় পায় এবং শাস্ত্রে যে কর্ম অনুমোদন করা হয়েছে সেই ভালো কর্ম যে নির্ভয়ে করে, সংসারের বন্ধন কি এবং সংসার থেকে মুক্তির উপায় কি সেই বিষয় সম্যক জানতে পারে সেই বুদ্ধিই হল সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।।৩০।।

যয়া ধর্মম্ অধর্মং চ # কার্যং চ অকার্যম্ এব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি # বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী।। ৩১।।

যয়া = যার দ্বারা; অযথাবৎ = অযথার্থভাবে; প্রজানাতি = জানতে পারা যায়।। ৩১।।

অনুবাদ :- যে বুদ্ধির দ্বারা কোনটি ধর্ম ও কোনটি অধর্ম, কোন কাজটি করা উচিত ও কোন কাজটি করা উচিত নয় এই বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝা যায় না সেই বুদ্ধিকে রাজসী বুদ্ধি বলা হয়।। ৩১।।

অধর্মং ধর্মম্ ইতি যা # মন্যতে তমসা-আবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতান্ চ # বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।।৩২।।

মন্যতে = মনে করে; তমসা-আবৃতা = মোহের দ্বারা আবৃত; সর্বার্থান্ = সমস্ত বিষয়কে।। ৩২।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন যে বুদ্ধির কারণে মানুষ অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সমস্ত ভালো বিষয়ের উল্টোটিকে সঠিক ব'লে বিবেচনা করে সেই বুদ্ধিকে তামসী বুদ্ধি বলা হয়।।৩২।।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে # মনঃ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ।
যোগেন অব্যভিচারিণ্যা # ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।। ৩৩।।

ধৃত্যা = ধৃতি অর্থাৎ অবিচল ধৈর্যের দ্বারা; যয়া = যে; ধারয়তে = ধারণ করে; অব্যভিচারিণ্যা = কোন পুরুষ বা নারী পরস্ত্রী বা পরপুরুষে আকৃষ্ট হলে তাকে ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী বলা হয়। এখানে অব্যভিচারী বলতে একাগ্রচিত্ত মানুষকে বোঝানো হয়েছে।।৩৩।।

অনুবাদ :- হে পার্থ! যে অবিচল ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্যের সাহায্যে ধ্যানযোগবলে একাগ্রচিত্তে মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কর্মসমূহকে ধারণ অর্থাৎ নিয়মিত ক'রে রাখা যায় তাকে সাত্ত্বিকী ধৃতি বলা হয়।।৩৩।।

যয়া তু ধর্ম-কাম-অর্থান্ # ধৃত্যা ধারয়তে অর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী # ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী।।৩৪।।

যয়া = যার দ্বারা; তু = কিন্তু; ধৃত্যা = ধৈর্য সহকারে; ধারয়তে = ধারণ করে; প্রসঙ্গেন = প্রসঙ্গক্রমে।।৩৪।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! হে পার্থ! যে ধৃতির সাহায্যে সকাম মানুষ ধর্ম, অর্থ ও কাম উপভোগেই মত্ত থাকে এবং এইসব বিষয়ের ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা করে তাকে রাজসী ধৃতি বলা হয়।।৩৪।।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং # বিষাদং মদম্ এব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা # ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী।।৩৫।।

মদম্ = হর্ষ; ন বিমুঞ্চতি = পরিত্যাগ করে না; দুর্মেধা = দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি; ধৃতিঃ = ধৈর্য।। ৩৫।।

অনুবাদ :- যে ধৃতির কারণে দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, এবং মদ অর্থাৎ বিষয়ভোগজনিত গর্ব ত্যাগ করতে পারে না তাকে তামসী ধৃতি বলা হয়।।৩৫।।

সুখং তু ইদানীং ত্রিবিধং # শৃণু মে ভরত-ঋষভ।
অভ্যাসাৎ রমতে যত্র # দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি।।৩৬।।

ইদানীং = এখন; ত্রিবিধং = তিনপ্রকার; শৃণু = শোন; ভরত ঋষভ = কুরু বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ; অভ্যাসাৎ = অভ্যাসের দ্বারা; রমতে = চিত্তে রমণীয়তা

অর্থাৎ আনন্দ লাভ করে; দুঃখান্তং = দুঃখের অবসান; চ = এবং; নিগচ্ছতি = লাভ করে।।৩৬।।

অনুবাদ :- হে শ্রেষ্ঠ ভরতবংশীয় অর্জুন! এখন তুমি আমার মুখ থেকে তিন প্রকার সুখের বিষয় শোন যা থেকে মানুষের অভ্যাসের ফলে ধীরে ধীরে আনন্দ লাভ হয় এবং তার দুঃখের অবসান হয়।।৩৬।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে বলেছেন যে এখন তিনি যে সুখের কথা অর্জুনকে বলতে যাচ্ছেন সেই সুখ অভ্যাসের দ্বারাই পাওয়া যায়। ভগবান্ এখানে বলতে চেয়েছেন যে এই সুখের কথা শুনলেই তাকে পাওয়া যাবে না, মানুষ যখন ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ক্ষণস্থায়ী ভোগ ও সুখের আসক্তিকে অন্তর থেকে দূর ক'রে নিরন্তর পরমাত্মার স্বরূপের চিন্তার অভ্যাস গ'ড়ে তুলতে সক্ষম হবে তখনই তার অন্তরে পরমেশ্বরের সান্নিধ্যলাভরূপ পরম সুখের অনুভব হবে এবং যেমন যেমন তার অন্তরে এই প্রকার সুখের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটবে তেমন তেমনই তার অন্তর থেকে সমস্ত দুঃখবোধের অবসান হয়ে চিত্তে নিবিড় প্রশান্তি বিরাজ করবে। পরমাত্মার সান্নিধ্যলাভের সুখ নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারাই লাভ করা যায়, অন্য কোন উপায়ে নয়।।৩৬।।

যৎ তৎ অগ্রে বিষম্ ইব # পরিণামে অমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ # আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজম্।। ৩৭।।

যৎ = যা; তৎ = তা; বিষম্ ইব = বিষের মত; পরিণামে = অবশেষে; অমৃতোপমম্ = অমৃততুল্য; প্রোক্তম্ = বলা হয়েছে; প্রসাদজম্ = প্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্নতা দানকারী।।৩৭।।

অনুবাদ :- যে সুখ প্রথমে বিষতুল্য কিন্তু পরিণামে অমৃতের সমান এবং যা নির্মল আত্মবুদ্ধি থেকে উৎপন্ন হয় সেই সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলা হয়।।৩৭।।

ব্যাখ্যা :- পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য একাগ্রচিত্তে নিরন্তর পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন থাকার যে অভ্যাসযোগকে অর্জন করতে হয় তা প্রথমাবস্থায় বড়ই পীড়াদায়ক ও বিড়ম্বনাময় মনে হয়। এই অবস্থায় যোগীকে অসীম কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। যারা রাজসিক ও তামসিক ভোগসুখে অভ্যস্ত তাদের পক্ষে এই অবস্থায় বেশীদিন টিকে থাকা সম্ভব হয় না। সেইজন্য তারা মধ্যপথে সেই পথ পরিত্যাগ করে।।৩৭।।

বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগাদ্ # যৎ তৎ অগ্রে অমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষম্ ইব # তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্।। ৩৮।।

বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগাৎ = ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের সঙ্গে সংযোগের ফলে; অমৃতোপমম্ = অমৃততুল্য; বিষম্ ইব = বিষের তুল্য; তৎ সুখং = সেই সুখ; স্মৃতং = বলা হয়।।৩৮।।

অনুবাদ :- বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটার কারণে যে সুখ উৎপন্ন হয় এবং যা প্রথমে অমৃতের মত স্বাদু মনে হলেও পরিণামে বিষের মত মনে হয় সেই সুখকে রাজস সুখ বলা হয়।।৩৮।।

যৎ অগ্রে চ অনুবন্ধে চ # সুখং মোহনম্ আত্মনঃ।
নিদ্রা-আলস্য-প্রমাদ-উত্থং # তৎ তামসম্ উদাহৃতম্।।৩৯।।

যৎ = যা; অনুবন্ধে = শেষকালে; মোহনম্ = মোহ উদ্রেককারী; আত্মনঃ = আত্মার; প্রমাদ = কোন কাজটি করা উচিত ও কোন কাজটি করা উচিত নয় এই জ্ঞানের অভাব; উত্থং = উৎপন্ন হয়; তৎ = তাকে; উদাহৃতম্ = বলা হয়।।৩৯।।

অনুবাদ :- যে সুখ অগ্রে অর্থাৎ ভোগের সময় এবং অনুবন্ধে অর্থাৎ ভোগের পরে আত্মাকে মোহগ্রস্ত করে অর্থাৎ বোকা বানিয়ে রাখে এবং যে সুখ নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ এই তিনটি বিষয় থেকে উৎপন্ন হয় সেই সুখকে তামস সুখ বলা হয়।। ৩৯।।

ন তদ্ অস্তি পৃথিব্যাং বা # দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈঃ মুক্তং # যৎ এভিঃ স্যাৎ ত্রিভিঃ গুণৈঃ।।৪০।।

অস্তি = আছে; পৃথিব্যাং = পৃথিবীতে; দিবি = স্বর্গে; প্রকৃতিজৈঃ = প্রকৃতিজাত; এভিঃ = এই; ত্রিভিঃ = তিন; স্যাৎ = হয়।।৪০।।

অনুবাদ :- পৃথিবী, স্বর্গ বা দেবতাদের মধ্যেও এমন কেউ নাই যে প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ থেকে মুক্ত।।৪০।।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং # শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি # স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ।।৪১।।

বিশাং = বৈশ্যগণের; প্রবিভক্তানি = বিভক্ত হয়েছে; স্বভাবপ্রভবৈঃ = পূর্বজন্মের সংসার থেকে উৎপন্ন।।৪১।।

অনুবাদ :- হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মসমূহ তাদের স্বভাবজাত গুণ অনুসারেই বিভক্ত হয়েছে।।৪১।।

শমো দমঃ তপঃ শৌচং # ক্ষান্তিঃ আর্জবম্ এব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যং # ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্।।৪২।।

শমঃ = মনের সংযম; দমঃ = বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম; তপঃ = শাস্ত্রীয় কৃচ্ছ্রসাধন; শৌচং = ভিতর এবং বাইরের শুচিতা; ক্ষান্তিঃ = সহিষ্ণুতা; আর্জবম্ = সরলতা; আস্তিক্যং = শাস্ত্রীয় বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস।।৪২।।

অনুবাদ :- শম অর্থাৎ মন এবং দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সংযম, তপ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কৃচ্ছ্রসাধন, শৌচ অর্থাৎ ভিতর এবং বাইরের শুচিতা, ক্ষান্তি অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, আর্জব অর্থাৎ সরলতা, আস্তিক্য অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস প্রভৃতি হল ব্রাহ্মণদের স্বভাবজাত কর্ম।।৪২।।

শৌর্যং তেজো ধৃতিঃ দাক্ষ্যং # যুদ্ধে চ অপি অপলায়নম্।
দানম্ ঈশ্বরভাবঃ চ # ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।।৪৩।।

ধৃতিঃ = ধৈর্য; দাক্ষ্যং = কর্মদক্ষতা; অপলায়নম্ = পলায়ন না করা; ঈশ্বরভাবঃ = প্রজাসমূহের উপর শাসনদক্ষতা; ক্ষাত্রং = ক্ষত্রিয়ের; স্বভাবজম্ = স্বভাবজাত।।৪৩।।

অনুবাদ :- ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত ধর্ম হল শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য, কর্মদক্ষতা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে না যাওয়া, নিঃসঙ্কোচে দান, প্রজাসমূহের উপর শাসনদক্ষতা, ঈশ্বরভাব প্রভৃতি।।৪৩।।

কৃষি-গৌরক্ষ্য-বাণিজ্যং # বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম # শূদ্রস্য অপি স্বভাবজম্।।৪৪।।

অনুবাদ :- বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম হল কৃষিকাজ, গোরক্ষা ও বাণিজ্য এবং সেবামূলক কাজ হল শূদ্রদের স্বভাবজাত কর্ম।।৪৪।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকে বর্ণিত শূদ্রদের সম্পর্কে এখানে একটি আলোচনা করা প্রয়োজন। বর্তমান সমাজে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে অপারগ হয়ে মানুষ মত পোষণ করে যে শাস্ত্রে 'শূদ্র' নামক এক শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে বড়ই হীন চোখে দেখা হয়েছে এবং সমাজের অপর উচ্চশ্রেণীর মানুষদের পদলেহন

করাকেই তাদের কর্ম ব'লে চিহ্নিত ক'রে তাদেরকে গভীরভাবে অসম্মান ক'রে এসেছে। কিন্তু তারা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। 'কলা' শব্দটি উচ্চারণ করলে কেউ ভাবে — একটি রসাল ফল আবার কেউ ভাবে শিল্প। যার যেমন মানসিক অবস্থিতি সে সেইরকমভাবেই সবকিছুর বিচার করে। যখনই গীতা পাঠ করা হবে তখনই মন থেকে সমস্ত স্থূল চিন্তাধারা পরিত্যাগ করতে হবে নচেৎ গীতার মধুর অমৃতময় রসের স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখানে শূদ্রদের কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ ক'রে গিয়েছেন পরম নিষ্পাপ, পরম পবিত্র, সকল প্রকার অসূয়াবিহীন, চির অমলিন চিত্তবিশিষ্ট, সর্ব জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন, সকল জীবের প্রতি প্রকৃত সম্মানবোধ পোষণকারী, সর্বজীবে অনন্ত প্রেমময় পুরুষশ্রেষ্ঠ, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যিনি কদাপি কাউকেই ছোট চোখে দেখতে পারেন না বা সমাজের বুকে কাউকেই হীন প্রতিপন্ন করতে পারেন না। সেই তিনি বলেছেন যে শূদ্রের কর্তব্য হল 'ন অতিমানিতা' (১৬৩) অর্থাৎ অভিমানশূন্যতা, কারোরই নিকট থেকে সম্মান আকাঙ্ক্ষা না করা, নিজেকে কারোরই অপেক্ষা বড় না ভাবা বরং নিজেকে সকলের চাইতে দীন ভাবা এবং অপরের সেবা করা। ভগবানের এই কথাটির তাৎপর্য যে কত গভীর, কত ব্যাপক, তাঁর এই বক্তব্যের দ্বারা সমগ্র মানব সমাজের জন্য যে কত বড় উপদেশ তিনি দিয়ে গিয়েছেন তা সাধারণ মানুষের চিন্তায় ধরা পড়েনি। বস্তুত নিজেকে সবচাইতে বড় ভাবা বর্তমান সমাজের মানুষদের একটা ভয়ানক চিত্তব্যাধি যা মানব সমাজকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শূদ্রদের অভিমানহীন, অহঙ্কারহীন চিত্ত, অপরের প্রতি সেবা পরায়ণ হওয়ার বিধান দিয়ে সমগ্র মানব সমাজের উদ্দেশ্যে এক মহান বার্তা দিয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি আবার এই পৃথিবীতে অভিমানহীন, :অহঙ্কারহীন চিত্তযুক্ত পরম পবিত্র শূদ্রভাব নিয়ে মানুষকে ত্রাণ করার জন্য নেমে আসবেন এই মাটির ধরার বুকে। সেইজন্য তিনি একদা নেমে এলেন নদীয়ার পরম পবিত্র মাটিতে নিমাই এর রূপ ধারণ ক'রে। তাই দেখি সেই নিমাই পরম পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও তরু হতেও সহিষ্ণু, তৃণ হতেও দীনতর হয়ে অন্তরে পরম পবিত্র শূদ্রভাব নিয়ে কৃষ্ণজ্ঞানে আদ্বিজচণ্ডাল, ম্লেচ্ছ সকলের পা জড়িয়ে ধরলেন, পরমানন্দে জীবসেবার মাহাত্ম্য প্রচারে রত হলেন। বস্তুত অন্তর পরম পবিত্র শূদ্রভাবে পরিপূর্ণ না হলে কখনই সার্থকভাবে অপরের সেবা করা

সম্ভব নয় আর সেবাই তো পরম ধর্ম! সেইজন্য শাস্ত্র কখনই শূদ্রদের ছোট করেনি। বরং একজন পবিত্রচিত্ত শূদ্রের চিত্তের মধ্যে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম তথা বৈশিষ্ট্য — অহঙ্কারশূন্য চিত্ত ও সেবাধর্মের সৌরভ সমাহিত করেছিল যা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। মানুষ শাস্ত্রের বক্তব্যের সম্যক অর্থ, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটা শাস্ত্রের দোষ নয়, দোষ দাম্ভিক, অজ্ঞানী মানুষদের।।৪৪।।

স্বে স্বে কর্মণি অভিরতঃ # সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম-নিরতঃ সিদ্ধিং # যথা বিন্দতি তৎ শৃণু।।৪৫।।

স্বে স্বে = নিজ নিজ; অভিরতঃ = যুক্ত; সংসিদ্ধিং = জ্ঞানযোগ্যতা; বিন্দতি = লাভ করা যায়; শৃণু = শোন।।৪৫।।

অনুবাদ :- নিজের নিজের কাজে নিষ্ঠা সহকারে যুক্ত থাকলে সিদ্ধিলাভ হয়। নিজের কাজে নিষ্ঠা সহকারে যুক্ত থাকলে কিভাবে এই সিদ্ধিলাভ করা যায় সে বিষয়ে তোমাকে বলছি। তুমি শোন।।৪৫।

যতঃ প্রবৃত্তিঃ ভূতানাং # যেন সর্বম্ ইদং ততম্।
স্বকর্মণা তম্ অভ্যর্চ্য # সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।৪৬।।

যতঃ = যাঁর থেকে; প্রবৃত্তিঃ = কর্মপ্রচেষ্টা; ভূতানাং = জীব সমূহের; যেন = যাঁর দ্বারা; ইদং = এই; ততম্ = ব্যাপ্ত; স্বকর্মণা = নিজের কর্ম দ্বারা; তম্ = তাঁকে; অভ্যর্চ = অর্চনা ক'রে; বিন্দতি = লাভ করে।।৪৬।।

অনুবাদ :- যিনি সর্ব জীব ও তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, মানুষ নিজের কাজের মাধ্যমে তাঁর পূজা করলে সিদ্ধি লাভ করতে পারে।।৪৬।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে নিষ্কাম কর্মযোগ পালনের কথাই বলেছেন।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ # পরধর্মাৎ স্ব-অনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম # কুর্বন্ ন আপ্নোতি কিল্বিষম্।। ৪৭।।

শ্রেয়ান্ = শ্রেষ্ঠ; বিগুণঃ = দোষযুক্ত; পরধর্মাৎ = অপরের ধর্ম থেকে; স্ব-অনুষ্ঠিতাৎ = উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত; স্বভাবনিয়তং = স্বভাববিহিত; কুর্বন্ = করলে; ন আপ্নোতি = লাভ করে না; কিল্বিষম্ = পাপ।।৪৭।।

অনুবাদ :- অপরের ধর্ম অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কর্তব্যকর্ম যদি উত্তমও হয় এবং নিজের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কর্তব্যকর্ম যদি দোষযুক্তও হয় তাহলেও অপরের ধর্ম গ্রহণ করার চাইতে নিজের শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্য নিষ্ঠাসহকারে সঠিকভাবে পালন করাই সর্বাপেক্ষা ভালো। উপযুক্তরূপে নিজের স্বভাবনিয়ত কর্তব্য পালন করলে কারও পাপ হয় না।।৪৭।।

ব্যাখ্যা :- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র — এই চারি বর্ণের জন্য শাস্ত্র কর্ম নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে এবং সেই সেই কর্ম করার জন্যই এক এক বর্ণের মানুষকে নিয়োজিত করেছে। এইটি করাই তার ধর্ম। সেইজন্য এইটিই ঈপ্সিত যে প্রতিটি ব্যক্তি শাস্ত্রনির্দিষ্ট তার কর্মই সে করবে। সেই কাজ সে স্বেচ্ছায় কোন বাসনার বশবর্তী হয়ে করছে না। শাস্ত্রই তাকে এই কর্তব্য পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং শাস্ত্র কাউকে কলুষিত পথে অগ্রসর হতে প্ররোচিত করে না। সেইজন্য নিজের নিজের শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্ম করলে কেউ পাপে লিপ্ত হয় না। যেমন জল্লাদের কর্ম হল আইনের দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত দোষীকে ফাঁসি দেওয়া। এই কাজটি সে স্বেচ্ছায় করছে না। আইন তাকে এই কাজে নিযুক্ত করেছে। সেইজন্য এই কর্ম করলে সে কোন অপরাধে লিপ্ত হয় না। কিন্তু সে যদি সেই অপরাধীর প্রতি করুণা দেখাতে গিয়ে তাকে ফাঁসিকাঠে না চড়ায় তাহলে অপরাধীর শাস্তি হবে না এবং সমাজে অপরাধের সংখ্যা বেড়ে যাবে। ফলে জল্লাদের কাজটি না করলে তার পাপ অর্জিত হবে। কিন্তু কাজটি করলে সে অপরাধে লিপ্ত হবে না যেহেতু সে নরহত্যা কাজটি করছে আইনের নির্দেশ অনুসারে। এইটিই তার কর্তব্য, এইটিই তাঁর ধর্ম। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে বান্ধব হত্যার কথা চিন্তা ক'রে সে যদি তার ক্ষত্রধর্ম পরিত্যাগ করে এবং যুদ্ধ পরিত্যাগ ক'রে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে তাহলে সেটি তার পক্ষে অপরাধ হবে কিন্তু সে যুদ্ধ করলে তার কোন পাপ হবে না কারণ শাস্ত্রই তার কর্ম বর্ণাশ্রম বিধি অনুসারে নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে। এবিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কোথাও 'ধর্ম' শব্দটি তথাকথিত Religion অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, এই শ্লোকে "ধর্ম" শব্দটি চারিটি বর্ণের জন্য নির্ধারিত কর্তব্য পালন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন অর্জুনের ধর্ম তার প্রজাদের কল্যাণের জন্য সঠিক উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা বস্তুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অনেক ধর্মের মধ্য থেকে কোন একটি বিশেষ ধর্মের অনুকূলে কথা বলার কোন প্রয়োজন হয়নি বা তার প্রশ্নই ওঠে না কারণ তখন একটি মাত্রই ধর্ম অর্থাৎ

সনাতন ধর্ম প্রচলিত ছিল। ফলে যেহেতু সেই সময় সনাতন ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না, সেইজন্য ধরে নেওয়া যায় যে তিনি সমাজ পরিচালনার বৃহত্তর স্বার্থে সমাজের প্রত্যেককে সনাতন ধর্মের নিজ নিজ আচরণবিধি মেনে চলার কথাই বলেছেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে যখন বিশ্বে বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব বা প্রতিষ্ঠা হয়েছে তখনও এই শ্লোকে বর্ণিত ভগবানের বক্তব্যের মূল নির্যাস টেনে বলা যায় যে তিনি বলেছেন যে কারোরই পক্ষে নিজধর্ম ত্যাগ ক'রে অন্য ধর্মের আচরণ বিধির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকের পক্ষেই নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সহকারে নিজ নিজ ধর্মের মধ্যে অবস্থান করাই সকলের পক্ষে কল্যাণকর।। ৪৭।।

সহজং কর্ম কৌন্তেয় # সদোষম্ অপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ # ধূমেন অগ্নিঃ ইব আবৃতাঃ।।৪৮।।

সহজং কর্ম = স্বভাবজাত কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণদ্বারা নির্দিষ্ট; সদোষম্ = দোষযুক্ত; অপি = ও; ন ত্যজেৎ = ত্যাগ করা উচিত নয়; সর্বারম্ভা হি = সমস্ত কাজই; দোষেণ = দোষের দ্বারা; ধূমেন = ধোঁয়ার দ্বারা; অগ্নিঃ ইব = আগুনের মত; আবৃতাঃ = ঢাকা থাকে।।৪৮।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! সহজ অর্থাৎ নিজের স্বভাবজাত অর্থাৎ যে কর্ম তুমি তোমার জন্মের সঙ্গেই নিয়ে এসেছ সেই কর্ম দোষযুক্ত হলেও তাকে পরিত্যাগ করা উচিত নয় কারণ আগুন যেমন ধোঁওয়ার দ্বারা ঢাকা থাকে তেমনই সমস্ত কর্মেই কিছু না কিছু দোষ থাকে।।৪৮।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ বলেছেন যে সহজ অর্থাৎ স্বভাবজাত কর্ম অর্থাৎ যে কর্ম মানুষ জন্মের সঙ্গেই নিয়ে আসে সেই কর্ম দোষযুক্ত হলেও তাকে পরিত্যাগ করা উচিত নয় কারণ সমস্ত কর্মেই কিছু না কিছু দোষ থাকে। যেমন ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য রন্ধন করা মানুষের স্বভাবজাত কর্ম। এই কর্ম না করলে মানুষের ক্ষুধা নিবারণ হবে না। আবার, রন্ধনের জন্য উনুন জ্বালানোর প্রয়োজন। কিন্তু উনুন জ্বালাতে গেলে তার মধ্যে অবস্থিত পিপীলিকা আদি অনেক কীট-পতঙ্গের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই চিন্তা ক'রে রন্ধন ক্রিয়া ত্যাগ করলে সেটির অর্থ হবে তার স্বভাবজাত কর্মকে অস্বীকার করা যা বৃহত্তর অর্থে সমীচীন নয়। তেমনই সমাজরক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ করা তার স্বভাবজাত কর্ম। যুদ্ধের পরিণাম তো রক্তপাত, মৃত্যু প্রভৃতি। কিন্তু অর্জুন যদি এই চিন্তায় যুদ্ধ পরিত্যাগ করেন তাহলে সেটি তাঁর পক্ষে অনুচিত হবে কারণ সেটি তাঁর সমাজের প্রতি অপরাধ হিসাবে

গণ্য হবে। সেইজন্য ভগবান্ তাঁকে বলেছেন যে কোন ব্যক্তির তার স্বভাবজাত কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ।।৪৮।।

অসক্ত-বুদ্ধিঃ সর্বত্র # জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিং পরমাং # সন্ন্যাসেন অধিগচ্ছতি।।৪৯।।

অসক্তঃ = আসক্তিহীন; জিতাত্মা = যিনি মনকে জয় করেছেন; বিগতস্পৃহঃ যাঁর অন্তরে কোন বিষয়ের প্রতি স্পৃহা নাই; নৈষ্কর্ম্য = কর্মচক্র থেকে নিষ্কৃতি; পরমাং = শ্রেষ্ঠ; সন্ন্যাসেন = কর্মত্যাগের দ্বারা; অধিগচ্ছতি = লাভ করেন।।৪৯।।

অনুবাদ :- যিনি সর্ববিষয়ে আসক্তিহীন, যিনি মনকে সর্বপ্রকারে জয় করেছেন, যাঁর অন্তরে কোন বিষয়ের প্রতি স্পৃহা নাই, তিনি কর্মফলের প্রতি বাসনা ত্যাগের মাধ্যমে পরম শ্রেষ্ঠ নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ কর্মচক্র থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন।।৪৯।।

ব্যাখ্যা :- এখানে ‘নৈষ্কর্ম্য’ শব্দটির সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। শাস্ত্রে সর্ববিষয়ে আসক্তিত্যাগ এবং কর্মের ফলের প্রতি সর্বপ্রকার স্পৃহা ত্যাগ ক’রে কর্ম করা হলে তাকে নৈষ্কর্ম্য’ বলা হয়। শঙ্করাচার্য বলেছেন যে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই হলেন আত্মা। মানুষের অন্তরে যখন এই জ্ঞানের সম্যক উদয় হয় তখন তার সর্বকর্ম থেকে নিবৃত্তি হয়ে যায়। তখন তাঁকে ‘নিষ্কর্মা’ বলা হয় এবং নিষ্কর্মার ভাবকে নৈষ্কর্ম্য’ বলা হয় এবং নিষ্কর্মতারূপ সিদ্ধিকে অর্থাৎ লাভ করাকে বলা হয় নৈষ্কর্ম্য ‘সিদ্ধি’ — “যস্মাৎ নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মসম্বোধাৎ স নিষ্কর্মা তস্য ভাবো নৈষ্কর্ম্যং নৈষ্কর্ম্যং চ তৎ সিদ্ধিঃ চ সা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ”।। ৪৯।।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম # তথা আপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেন এব কৌন্তেয় # নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা।। ৫০।।

সিদ্ধিং = নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি; যথা = যেভাবে; তথা = সে বিষয়ে; আপ্নোতি = লাভ করেন; নিবোধ = শোন; মে = আমার মুখে; সমাসেন = সংক্ষেপে; নিষ্ঠা = গতি; জ্ঞানস্য = জ্ঞানের; পরা = পরম।। ৫০।।

অনুবাদ :- হে কৌন্তেয়! নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ কর্মচক্র থেকে নিষ্কৃতি লাভ ক’রে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। এইটিই হল জ্ঞানের পরম প্রাপ্তি। এইরূপে কিভাবে ব্রহ্মকে লাভ করা যায় সে বিষয়ে আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলছি। তুমি শোন।।৫০।।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো # ধৃত্যা আত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা # রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।।৫১।।

(এইটি একটি বিশেষক শ্লোক সেইজন্য এই শ্লোকটির অর্থ প্রকাশের জন্য অনুবাদে ৫৩তম শ্লোকটি থেকে 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' অর্থাৎ 'ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভবের যোগ্য হতে পারেন' অংশটি গ্রহণ করা হবে)।

বুদ্ধ্যা = সাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা; ধৃত্যা = ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্যের দ্বারা; শব্দাদীন্ = শব্দ আদি; বিষয়ান্ = ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; ত্যক্ত্বা = ত্যাগ ক'রে; ব্যুদস্য = পরিত্যাগের দ্বারা।।৫১।।

অনুবাদ :- সাত্ত্বিক বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে, ধৈর্যের দ্বারা মনকে সংযত ক'রে, শব্দাদি বিষয় ত্যাগ ক'রে, অন্তর থেকে সকল কিছুর প্রতি অনুরাগ বা ঈর্ষা দূর ক'রে মানুষ ('ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভবের যোগ্য হতে পারেন)।।৫১।।

বিবিক্তসেবী লঘু-আশী # যত-বাক্-কায়-মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং # বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।।৫২।।

(পূর্বের শ্লোকটির ন্যায় এই বিশেষক শ্লোকটিরও অর্থ প্রকাশের জন্য অনুবাদে ৫৩তম শ্লোকটি থেকে 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' অর্থাৎ 'ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভবের যোগ্য হতে পারেন' অংশটি গ্রহণ করা হবে)

বিবিক্তসেবী = নির্জন স্থানে বসবাসকারী; লঘু-আশী = অল্প ভোজনকারী; যত = সংযত; ধ্যানযোগপরো = ভগবৎ চিন্তায় যোগযুক্ত হয়ে; নিত্যং = সদা; সমুপাশ্রিতঃ = আশ্রয় ক'রে।।৫২।।

অনুবাদ :- নির্জন স্থানে বসবাসকারী অল্প ভোজনকারী ব্যক্তি বাক্য, দেহ ও মনকে সংযত ক'রে, শরীরযাত্রার জন্য যেটুকু সুখভোগ প্রয়োজন তার অতিরিক্ত সমস্ত সুখভোগ ত্যাগ ক'রে বৈরাগ্যকে আশ্রয় ক'রে সদা পরমেশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থেকে ('ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভবের যোগ্য হতে পারেন)।।৫২।।

অহঙ্কারং বলং দর্পং # কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো # ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।৫৩।।

পরিগ্রহম্ = সাংসারিক ভোগের সামগ্রী; বিমুচ্য = পরিত্যাগ ক'রে; নির্মমঃ = মমতা অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ; শান্তঃ = প্রশান্তচিত্ত; ব্রহ্মভূয়ায় = ব্রহ্মভাব লাভের যোগ্য; কল্পতে = সক্ষম হন।।৫৩।।

অনুবাদ :- অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, দানাদি ভৌতিক পদার্থ গ্রহণ ত্যাগ ক'রে মমতাশূন্য অর্থাৎ আসক্তিহীন ও শান্ত অর্থাৎ একমাত্র আত্মানুভবের মধ্যেই সুখী পুরুষ ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভবের যোগ্য হতে পারেন।।৫৩।।

ব্যাখ্যা :- আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অনেক শব্দ বর্তমানে প্রচলিত অর্থ থেকে কিছুটা ভিন্ন। কাজেই আমরা এখানে অহঙ্কার, বল, দর্প এই শব্দগুলির একটু ভিন্ন অর্থ পাই। আমরা সাধারণতঃ 'অহঙ্কার' শব্দের যে অর্থ বুঝি সেটি হল মানুষের নিজের, দেহ, যৌবন, অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি পার্থিব বস্তুর কারণে অন্তরে অহমিকা। শঙ্করাচার্য অহঙ্কার, বল, দর্প এই তিনটি শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদিতে মানুষের যে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ অহংবোধ তাকে অহঙ্কার বলা হয়— "অহঙ্করণম্ অহঙ্কারো দেহেন্দ্রিয়াদিষু।" এই অহঙ্কারের কারণে মানুষের অন্তরে কর্তৃত্বাপন জাগে। সে ভাবে মন, বুদ্ধি ও শরীর দ্বারা যে সমস্ত কর্ম করা হয় সেগুলি সেই করে। এই দেহাভিমানকে সর্বপ্রকারে ত্যাগ করাকে অহঙ্কার ত্যাগ করা বলা হয়। ভগবানের করুণা লাভ করতে হলে মানুষের এই দেহাভিমান সম্পূর্ণ ত্যাগ করা কর্তব্য। 'বল' এর সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য বলেছেন যে কামনা ও আসক্তির সঙ্গে যুক্ত যে সামর্থ্য তাকে 'বল' বলা হয় — 'বলং সামর্থ্যং কামরাগাদিযুক্তং"। ভগবান্ বলেছেন এই 'বল' সর্বথা বর্জনীয়। এখানে লক্ষণীয় যে শরীরের যে ক্ষমতা তাকে বল নামে অভিহিত করা হয়নি কারণ সেই শক্তি শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম। এই শক্তি বর্জন করা কখনও সমীচীন নয়। কিন্তু মানুষ কামনাসক্ত হয়ে কোন কিছু অন্যায়ভাবে লাভ করার জন্য অপরের উপর যে বল প্রয়োগ করে সেই বল অনুচিত এবং সর্বথা পরিত্যজ্য। শঙ্করাচার্য বলেছেন যে মানুষ যখন বৃথাগর্বিত ও হর্ষিত হওয়ার কারণে উদ্ধত হয়ে ধর্ম লঙ্ঘন করে তখন তার সেই হর্ষকে দর্প বলা হয় — "দর্পো নাম হর্ষান্তরভাবী ধর্মাতিক্রমহেতুঃ"।।৫৩।।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্ন-আত্মা # ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু # মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।৫৪।।

ব্রহ্মভূতঃ = ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত; প্রসন্ন-আত্মা = প্রসন্নচিত্ত; ন শোচতি = অনুশোচনা করে না; ন কাঙ্ক্ষতি = আকাঙ্ক্ষা করে না; সমঃ = সমদর্শী; সর্বেষু ভূতেষু = সকল জীবে; মদ্ভক্তিং = আমার ভক্তি; লভতে = লাভ করেন; পরাম্ = পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।।৫৪।।

অনুবাদ :- কোন ব্যক্তি যখন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন তখন তিনি চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করেন, কোন হৃতবস্তুর জন্য শোক করেন না বা কোন বস্তু লাভ করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না, জগতের সকল জীবকেই সমান দৃষ্টিতে দেখেন অর্থাৎ সকল জীবের মধ্যেই পরমাত্মার উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন এবং তিনি আমার প্রতি পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভক্তি অর্জন করেন।।৫৪।।

ব্যাখ্যা :- ভক্ত কখন ঈশ্বরের প্রতি পরাভক্তি লাভ করেন? যিনি সকলের ঈশ্বর, অখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা, সর্বপ্রকারে সমস্ত দোষের সংসর্গরহিত, অপার, অসংখ্য কল্যাণময় গুণের আধার, লাবণ্যসুধার পারাবার, অনন্ত শ্রীসম্পন্ন, কমলদলের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট জীবনস্বামী সেই প্রভুকে প্রেমলক্ষণ দিয়ে যখন ভক্ত অনুভব করেন তখনই তিনি ঈশ্বরের পরাভক্তি লাভ করেন।।৫৪।।

ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি # যাবান্ যঃ চ অস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা # বিশতে তদনন্তরম্।।৫৫।।

মাম্ = আমাকে; অভিজানাতি = জানতে পারেন; যাবান্ = যেরূপ; যঃ = যা; অস্মি = হই; তত্ত্বতঃ = স্বরূপত; জ্ঞাত্বা = জেনে; বিশতে = প্রবেশ করেন; তদন্তরম্ = তারপর।।৫৫।।

অনুবাদ :- আমার ভক্ত আমার প্রতি পরাভক্তি অর্জন করতে সক্ষম হলে তিনি তত্ত্বগতভাবে বুঝতে পারেন আমি কে, আমার স্বরূপ কি, আমার স্বভাব কি প্রকার, আমার বিভূতির কারণে আমি কত বিশাল এবং আমার স্বরূপ সম্পর্কে এই সমস্ত জ্ঞান অর্জন ক'রে আমার ভক্ত আমাতেই চিত্ত সমাহিত করেন।।৫৫।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে বলতে চেয়েছেন যে তার রূপ অনন্ত প্রকার যথা নির্গুণ নিরাকার, সগুণ নিরাকার, সগুণ সাকার, নিরাকারের মধ্যেই সাকার, সাকারের মধ্যেই নিরাকার প্রভৃতি। যোগী যখন পরাভক্তি লাভ করেন তখন তিনি ভগবানের অদ্বৈত, অজর, অমর, অভয়, অবিনাশী এই সমস্ত প্রকার রূপই যথার্থভাবে জানতে পারেন। তখন তাঁর অন্তরে আর কোন ভেদভাব থাকে না। তাঁর দৃষ্টিতে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।।৫৫।।

সর্ব-কর্মাণি-অপি সদা # কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদ্ অবাপ্নোতি # শাশ্বতং পদম্ অব্যয়ম্।।৫৬।।

কুর্বাণঃ = ক'রে; মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ = আমাকে আশ্রয় ক'রে; মৎপ্রসাদাৎ = আমার অনুগ্রহে; অবাপ্নোতি = লাভ করে।

অনুবাদ :- আমার পরম ভক্ত আমার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে সমস্ত কর্ম ক'রেও আমার অনুগ্রহে চিরস্থায়ী অবিনাশী পরমপদ অর্থাৎ অক্ষয় বৈকুণ্ঠ লাভ করেন।।৫৬।।

চেতসা সর্বকর্মাণি # ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য # মচ্চিত্তঃ সততং ভব।।৫৭।।

চেতসা = মনের দ্বারা; ময়ি = আমাতে; সংন্যস্য = সমর্পণ করে; মৎপরঃ = আমাকেই একমাত্র পুরুষার্থ জেনে আমাতেই চিত্ত সমাহিত; উপাশ্রিত্য = আশ্রয় ক'রে।। ৫৭।।

অনুবাদ :- মনে মনে আমাতেই সমস্ত কর্ম সমর্পণ ক'রে আমাকেই একমাত্র পুরুষার্থ জেনে আমাতেই চিত্ত সমাহিত ক'রে বুদ্ধিযোগ অবলম্বন ক'রে অর্থাৎ আমিই তোমার একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন এই স্থির চিন্তাযুক্ত হয়ে আমাতেই তোমার চিত্ত অর্পণ ক'রে তোমার সকল কাজ-কর্ম কর।।৫৭।।

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি # মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বম্ অহঙ্কারাৎ # ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।।৫৮।।

মচ্চিত্তঃ = আমাতে সমর্পিতচিত্ত; সর্বদুর্গাণি = সব দুর্গ অর্থাৎ বাধাবিঘ্ন; তরিষ্যসি = অতিক্রম করতে পারবে; অথ = কিন্তু; চেৎ = যদি; ত্বম্ = তুমি; অহঙ্কারাৎ = অহঙ্কারবশতঃ; ন শ্রোষ্যসি = না শোন; বিনঙ্ক্ষ্যসি = ধ্বংস হবে।।৫৮।।

অনুবাদ :- তুমি যদি আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর তাহলে আমার কৃপায় তুমি জীবনে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে পারবে। কিন্তু যদি তুমি অহঙ্কারবশতঃ আমার উপদেশ না শোন তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।। ৫৮।।

যৎ অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য # ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যা এষঃ ব্যবসায়ঃ তে # প্রকৃতিঃ তাং নিয়োক্ষ্যতি।। ৫৯।।

আশ্রিত্য = বশবর্তী হয়ে; ন যোৎস্য = যুদ্ধ করব না; মন্যসে = মনে কর; এষঃ = এই; ব্যবসায়ঃ = নিশ্চয়; তাং = তোমাকে; নিয়োক্ষ্যতি = নিযুক্ত করবে।।৫৯।।

অনুবাদ :- তুমি যদি অহঙ্কারবশতঃ মনে কর যে তুমি যুদ্ধ করবে না তাহলে জেনে রেখো এ তোমার মিথ্যা সংকল্প। তুমি না চাইলেও প্রকৃতি তোমাকে এই যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে।।৫৯।।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় # নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং ন ইচ্ছসি যৎ মোহাৎ # করিষ্যসি অবশঃ অপি তৎ।। ৬০।।

স্বভাবজেন = স্বভাবজাত; নিবদ্ধঃ = আবদ্ধ; স্বেন = নিজের; কর্তুং = করতে; করিষ্যসি = করবে; অবশঃ = অবশ হয়ে।।৬০।।

অনুবাদ :- হে কুন্তীপুত্র অর্জুন! প্রতিটি মানুষ তার স্বভাবজ কর্মে আবদ্ধ থাকে। তুমি ক্ষত্রিয়। তোমার স্বভাবজ কর্ম হল যুদ্ধ করা। কিন্তু তুমি মোহগ্রস্ত হয়ে তোমার স্বভাবজ কর্ম অস্বীকার ক'রে যুদ্ধ করবে না বলছ। কিন্তু তোমার স্বভাবজ কর্মের তাড়নায় এবং আমার মায়াবলের প্রভাবে অবশ হয়ে তুমি যুদ্ধ করতে বাধ্য হবে।।৬০।।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং # হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি # যন্ত্র-আরূঢ়ানি মায়য়া।। ৬১।।

সর্বভূতানাং = সকল জীবের; হৃদ্দেশে = হৃদয়ে; তিষ্ঠতি = বাস করেন; ভ্রাময়ন্ = ভ্রমণ করান; সর্বভূতানি = সকল জীব; যন্ত্র-আরূঢ়ানি = যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে; মায়য়া = মায়ার দ্বারা।।৬১।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করেন। তিনি মায়ার দ্বারা যন্ত্রসম আমাদের দেহের মধ্যে জীবাত্মাকে বসিয়ে সমস্ত কর্মের মধ্যে ভ্রমণ করিয়ে নিয়ে বেড়ান অর্থাৎ সমস্ত কর্মের সঙ্গে যুক্ত করান।। ৬১।।

তম্ এব শরণং গচ্ছ # সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং # স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।। ৬২।।

তম্ এব = তাঁরই; শরণং গচ্ছ = শরণ গ্রহণ কর; সর্বভাবেন = সর্ব প্রকারে; তৎপ্রসাদাৎ = তাঁর করুণায়; পরাং স্থানং = পরম আশ্রয়; প্রাপ্স্যসি = লাভ করবে; শাশ্বতম্ = নিত্য।। ৬২।।

অনুবাদ :- হে ভারত! তুমিও সর্বান্তকরণে সেই পরমেশ্বরের শরণাগত হও। তাঁর অনুগ্রহে তুমি অবশ্যই পরম শান্তি ও পরম আশ্রয় লাভ করবে।।৬২।।

ইতি তে জ্ঞানম্ আখ্যাতং # গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্য এতৎ অশেষেণ # যথা ইচ্ছসি তথা কুরু।। ৬৩।।

ইতি = এইভাবে; তে = তোমাকে; আখ্যাতং = বর্ণনা করলাম; গুহ্যাদ্ = গোপন থেকে; গুহ্যতরং = গোপনতর; ময়া = আমার দ্বারা; বিমৃশ্য = বিচার বিবেচনা ক'রে; এতৎ = এইটি; অশেষেণ = সম্পূর্ণরূপে; যথা = যা; ইচ্ছসি = ইচ্ছা কর; তথা = তাই; কুরু = কর।। ৬৩।।

অনুবাদ :- এইভাবে আমি তোমাকে গুহ্য থেকে গুহ্যতর জ্ঞানের কথা বর্ণনা করলাম। এইবার তুমি ভালোভাবে বিচার-বিবেচনা ক'রে তোমার যা ইচ্ছা হয় সেটিই কর।।৬৩।।

ব্যাখ্যা :- এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্যকভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। অজ্ঞানী ও অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে করে থাকতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হওয়া সত্ত্বেও অর্জুনকে তাঁর স্বজনদের বিরুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের ভয়ানক বিনাশকারী যুদ্ধে প্রেরিত করেছিলেন। কিন্তু তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে তারা এই রকম ভেবে থাকে।

অর্জুন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিলেন এবং তাঁর নিকট থেকে তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে যথাযোগ্য উপদেশ প্রার্থনা করেছিলেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের গুরুপদে আসীন হয়ে তাকে সত্য কি এবং অসত্য কি এই সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান প্রদান করেছিলেন এবং পরিশেষে একজন প্রজ্ঞাবান এবং দায়িত্বশীল প্রকৃত গুরুর ন্যায় অর্জুনকে এই বহুমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন— আমি তোমার প্রার্থনা অনুসারে তোমাকে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত উপদেশ দান করলাম। সত্য কি এবং অসত্য কি, মানুষের পক্ষে কোন বিষয়টি পালন করা উচিৎ আর

কোন বিষয়কে পরিহার করা উচিৎ এই সত্য তোমার সামনে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরলাম। এখন তুমি কি করবে বা কি করা থেকে বিরত থাকবে, তুমি কিভাবে কোন পথে অগ্রসর হবে অর্থাৎ তুমি যুদ্ধ করবে না যুদ্ধ পরিহার করবে এই সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন।

সুতরাং এখানে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কখনই কাউকে তাঁর নিজের মত ও পথ অনুসরণ করার জন্য বাধ্য করেননি। বরং যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ ছিলেন সেইজন্য তিনি সংসারের ঠিক এবং ভুল এই দুই এর মধ্যে প্রভেদ এবং উভয়ের পরিণামের বিষয়ে তাঁর প্রিয়তম শিষ্যকে সম্যকরূপে অবহিত করা নিজের পবিত্রতম কর্তব্য ব'লে মনে করেছিলেন এবং একমাত্র এই মহান উদ্দেশ্যেই তিনি কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দণ্ডায়মান হয়ে অর্জুনকে পবিত্র শ্রীমদ্ভবদ্গীতার এই মহান উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এই উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে কোন কিছু প্রাপ্তির বাসনা তাঁর ছিল না কারণ কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি নাই, কোন কিছু প্রাপ্তির কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা তিনি করেন না, তিনি পরিপূর্ণরূপে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের অনন্ত ঊর্ধ্বে।।৬৩।।

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ # শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টঃ অসি মে দৃঢ়ম্ ইতি # ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।। ৬৪।।

সর্বগুহ্যতমং = সর্বাপেক্ষা গোপনীয়; ভূয়ঃ = পুনরায়; শৃণু = শোন; মে = আমার; বচঃ = উপদেশ; ইষ্টঃ = প্রিয়; অসি = হও; দৃঢ়ম্ = অত্যন্ত; ততঃ = সেইজন্য; বক্ষ্যামি = বলছি; তে = তোমার; হিতম্ = মঙ্গলের জন্য।।৬৪।।

অনুবাদ :- তুমি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। সেইজন্য এখন তোমাকে আমি আমার সর্বাপেক্ষা গোপনীয় ও তোমার পক্ষে পরম হিতকর উপদেশ পুনরায় দান করছি। তুমি শোন।।৬৪।।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো # মদ্যাচী মাং নমস্কুরু।
মাম্ এব এষ্যসি সত্যং তে # প্রতিজানে প্রিয়ঃ অসি মে।।৬৫।।

মন্মনা = আমাতে মন স্থাপন কর; মদ্ভক্তঃ = আমার ভক্ত; মদ্যাচী = আমার পূজক; এষ্যসি = লাভ করবে; প্রতিজানে = প্রতিজ্ঞা করছি।।৬৫।।

অনুবাদ :- তুমি আমাতেই মন স্থির কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর। তুমি আমার অতি প্রিয়। সেইজন্য আমি তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি যে তুমি আমাকেই পাবে।।৬৫।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ এখানে তাঁর প্রিয় শিষ্য পরম সখা অর্জুনের নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছেন যে ভক্ত একাগ্র ও শুদ্ধচিত্তে এইভাবে তাঁর ভজন, পূজন, সাধন, আরাধনে মগ্ন থাকলে সে অবশ্যই তাঁকে লাভ করতে পারবে। ভগবানের পরমপদ লাভ করতে হলে ভগবানকেই সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সর্বজ্ঞ, সর্বান্তরযামী, সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপী, সর্ব সৌন্দর্য, মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের আধার জ্ঞানে অনন্যচিত্তে তাঁরই ভজন, পূজন, সাধন, আরাধনে সমগ্র অন্তর সমর্পণ করে, মুহূর্তের জন্যও তাঁকে বিস্মৃত না হয়ে, ভগবানকেই তার একমাত্র ভরণ-পোষণকারী, প্রভু, রক্ষক, পরম গতি ও পরম আশ্রয় জ্ঞানে তাঁরই মধ্যে নিজেকে লীন ক'রে দিয়ে নিজের কোন রকম স্বতন্ত্র সত্ত্বার বোধ না রেখে, সদা তাঁরই উপর নির্ভর করে, সর্ব অবস্থাতেই তাঁর সমস্ত বিধানকে অম্লান বদনে সত্য ও সঠিক ব'লে নতমস্তকে গ্রহণ করে, তাঁর সমস্ত আদেশ ও উপদেশ সর্বপ্রকারে শিরোধার্য করে, হৃদয়ের সমস্ত প্রেম-ভক্তি নিঃশেষে তাঁরই শ্রীচরণে অর্পণ ক'রে দিয়ে, নিখিল জগতের সমগ্র জীবকুলের মধ্যে তাঁর সদা উপস্থিতি দর্শন ক'রে তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রেম, ভক্তি, সেবা প্রদান করা প্রভৃতি বিবিধ কাজে রত হলে তবেই ভক্ত ভগবানের পরমতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং একমাত্র তা হলেই ভক্ত তার পরম পদ পরম আশ্রয় লাভ করতে পারে। বস্তুত তাঁকে লাভ করার এইটিই হল একমাত্র পথ। অন্য কোন উপায়ে তাঁকে লাভ করা যাবে না। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৩।৮ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে তাঁর সত্যস্বরূপকে জানা ব্যতীত তাঁর পরম পদ লাভ করার দ্বিতীয় কোন পথ নাই — "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।।৬৫।।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য # মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো # মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।৬৬।।

সর্বধর্মান্ = সকল প্রকার ধর্ম; পরিত্যজ্য = পরিত্যাগ করে; মামেকং = একমাত্র আমাতেই; শরণং ব্রজ = শরণ গ্রহণ কর; অহং = আমি; ত্বাং = তোমাকে; সর্বপাপেভ্যঃ = সমস্ত পাপ থেকে; মোক্ষয়িষ্যামি = মুক্তি দেব; মা শুচঃ = চিন্তা করবে না।।৬৬।।

অনুবাদ :- তুমি সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র আমারই শরণ নাও। আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে উদ্ধার করব, তুমি শোক করবে না।।৬৬।।

ব্যাখ্যা :- সাধারণতঃ ধর্ম বলতে বোঝায় সেই সকল কর্মানুষ্ঠান যা ঈশ্বরলাভ, স্বর্গলাভ, পারমার্থিক মঙ্গল লাভের জন্য করা হয় যেমন বেদোক্ত ধর্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম, গার্হস্থ্য ধর্ম, সন্ন্যাস ধর্ম, রাজধর্ম, পাতিব্রতধর্ম, দানধর্ম, অহিংসাধর্ম ইত্যাদি। এখানে কিন্তু 'ধর্ম' শব্দটি এই অর্থে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে ধর্ম অর্থে Religion নয়, মানুষ যা কিছু ভালো-মন্দ কর্ম করে তাদের সমুদায়কে 'ধর্ম' শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যে দেবতাদের পূজায় যুক্ত থাকে সে দেবতাদের পূজারূপ তার ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ করুক, আবার কেউ চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনকারী হলে সেও তার চৌর্যবৃত্তিরূপ ধর্মকে পরিত্যাগ ক'রে শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমাহিত করুক। শঙ্করাচার্য বলেছেন যে এখানে 'ধর্ম' শব্দের দ্বারা অসৎ কর্মকেও গ্রহণ করা হয়েছে — "ধর্মশব্দেন অত্র অধর্মঃ অপি গৃহ্যতে।" মানুষ পূর্বজন্মের সংস্কারবশতঃ যা যা কর্ম করে সেগুলিই হল তার ধর্ম সে ভালোই হোক বা মন্দই হোক। জীবের লক্ষ্য হল পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চরণে অন্তিম আশ্রয় লাভ। যাঁরা সৎ কর্মে যুক্ত আছেন সেই সাধু প্রকৃতির যোগিগণ তাঁদের সুকৃতির জোরে তাঁর চরণে অবশ্যই আশ্রয় পাবেন। কিন্তু যারা পাপকর্মে লিপ্ত তাদের কি হবে? পাপীর আশ্রয় তো তাঁর শ্রীচরণে হতে পারে না। তাহলে উপায়? পাপীকেও তো অন্তিমে তাঁর চরণের অভয় আশ্রয় পেতে হবে! তাহলে কিভাবে তার অন্তরের নিদ্রিত বাসনা পূরণ হবে? কঠোপনিষদের ১।২।২৪ মন্ত্রে এর উপায়স্বরূপ বলা হয়েছে যে পাপী পাপের পথ পরিহার না করলে সে আত্মাকে লাভ করতে পারে না — "নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ।" অর্থাৎ পাপী পাপের পথ পরিত্যাগ করলে সে তাঁর করুণা লাভের যোগ্য হতে পারবে আর শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই বলেছেন যে, যে কোন কাজেই সে পবিত্র কর্ম হলেও তার মধ্যে কিছু না কিছু দোষ থেকেই যায়। তাহলে সাধু প্রকৃতির ব্যক্তিগণও তাঁদের অজান্তে কিছু কিছু পাপ কর্মে জড়িয়ে পরেন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ সর্বাগ্রে সকলকে সকল প্রকার ধর্ম অর্থাৎ কর্ম পরিত্যাগ ক'রে তাঁর চরণে আশ্রয় গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন যাতে তাদের মুক্তিলাভের পথ ত্বরান্বিত হতে পারে।

বস্তুত পরম পুরুষ পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দঘন সর্বেশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বহৃদয়স্বামী সর্বব্যাপক সর্বজ্ঞান-সমাহৃতি সর্বজন-অভয়াশ্রয় সর্বস্রোত-পরিণতি পরম দয়ালু শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আখরাবতার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মহান উপদেশাবলীর সমাপ্তি হয়েছে

এই শ্লোকের মধ্য দিয়ে। এখানে আমাদের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশের সারাংশ বিশ্লেষণের প্রয়োজন। আমরা দেখেছি যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল উপদেশ হল এই যে মানুষের জীবনের একমাত্র অন্তিম লক্ষ্য হল স্বর্গ নয় মোক্ষ লাভ এবং মানুষকে সেই মোক্ষকে লাভ করার প্রয়াস করতে হবে।

তাহলে আমাদের ভাবতে হবে এই মোক্ষ লাভের নিমিত্ত যে দুটি পথের বর্ণনা ভগবান্ করেছেন যথা জ্ঞান লাভ এবং আসক্তিহীন কর্ম — এদের মধ্যে কোনটি আমাদের অনুসরণ করতে হবে। আমাদের অন্তরে এই সংশয়ের উদয় হওয়ার সঙ্গত কারণ আছে। ভগবান্ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে বলেছেন — "যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে" অর্থাৎ যা জানলে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যায় এবং এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঞ্চপঞ্চাশতম (৫৫) শ্লোকে ভগবান্ বলেছেন— "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদন্তরম্"— আমাকে তত্ত্বতঃ জানলে আমার মধ্যে প্রবেশ করা যায়। এই উভয় ক্ষেত্রে ভগবান্ মোক্ষলাভের জন্য ভক্তকে জ্ঞানযোগ অবলম্বনের কথা বলেছেন। আবার তিনি অর্জুনকে কর্ম করতে বলেছেন — যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি" (২।৪৮) অর্থাৎ তুমি যোগস্থ হয়ে কর্ম কর, আবার বলছেন যে নিরাসক্তচিত্তে কর্ম ক'রে পুরুষ পরম পদ লাভ করতে পারেন — "অসক্তো হি আচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ" (৩।১৯), আবার বলছেন যে জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম ক'রেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন — "কর্মণা এব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতা জনকাদয়ঃ" (৩।২০)। কিন্তু ভগবানের এই উভয়বিধ উক্তি থেকে মনে এরূপ সংশয়ের উদ্রেক হওয়ার কোন কারণ নাই। ভগবান্ তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন — "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্" অর্থাৎ সাংখ্যদের জন্য জ্ঞানযোগ এবং কর্মীদের জন্য কর্মযোগ। অর্থাৎ তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে জ্ঞান বা কর্ম যে কোনটিই মোক্ষসাধনের উপায়। কিন্তু সমগ্র গীতার তত্ত্ব সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যায় ভগবান্ কিন্তু জ্ঞানকেই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় বলেছেন। এই কথা বললে অবশ্য আবার মনে একটি সংশয়ের উদয় হবে। মনে হবে ভগবান্ যদি জ্ঞানকেই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় বলে থাকেন তাহলে কর্মের স্বপক্ষে এত যুক্তি দিয়ে অর্জুনকে বিভ্রান্ত করার কি প্রয়োজন ছিল? কিন্তু মনে এই প্রশ্নের উদয় হবে তখনই যখন গীতোক্ত 'জ্ঞান' শব্দটিকে বৃহত্তর অর্থে বিচার না ক'রে সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা হবে। ভগবান্ 'জ্ঞান' বলতে বুঝিয়েছেন ব্রহ্মের বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রলব্ধ আসক্তিহীন প্রজ্ঞাকে যা অবশ্যই যোগীকে মোক্ষ প্রদান করে।

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ যে কর্মের বিষয় বলেছেন তার মধ্যেও কিন্তু অন্তর্লীন হয়ে আছে জ্ঞানের বিষয়। ভগবান্ বলেছেন যে আসক্তিবিহীন, মমতাহীন, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, অনুকূল-প্রতিকূল বোধের দ্বন্দ্ববিহীন, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন চিত্তে, সমস্ত কর্মের ফল পরমেশ্বরে সমর্পণ ক'রে কর্ম করলে সেই কর্ম তাকে পরম পদ লাভের উপযুক্ত ক'রে তোলে। এইভাবে কর্ম করলে কর্মযোগীর অন্তরে নিবিড় প্রশান্তি ও পরম জ্ঞানের উদয় হয়। অবিদ্যার কারণে আত্মার মধ্যে ক্রিয়া, কারক ও ফলবিষয়ক ভেদবুদ্ধি সদা ক্রিয়া করে। অনাদিকাল থেকে অবিদ্যারই কারণে মানুষের অন্তরে 'কর্ম আমারই, আমিই সকল কর্মের কর্তা, আমি ফললাভের জন্য কর্ম করি' এইসব অজ্ঞান ধারণার জন্মলাভ ঘটে। কিন্তু মানুষ যখন আসক্তিবিহীন, বিষয়ের প্রতি মমতাহীন, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, অনুকূল-প্রতিকূল বোধের দ্বন্দ্ববিহীন, ফলাকাঙ্ক্ষাহীনচিত্তে, সমস্ত কর্মের ফল পরমেশ্বরে সমর্পণ ক'রে কর্ম করার অভ্যাস গড়ে তুলতে সমর্থ হয় তখন তার মধ্যে অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয়ে আত্মতত্ত্বের এক পরম জ্ঞানের উদয় হয়। তখন মানুষ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারে যে সে কিছুই করে না। এতদিন সে যে দেহটিকে 'আমি' ব'লে ভেবে আসছিল আসলে সেই দেহটা 'সে' নয়। 'সে' হল সেই নশ্বর দেহের ভিতরে বিদ্যমান চির অবিনশ্বর আত্মা। সে যা কিছু করে সবই প্রকৃতপক্ষে করেন সেই আত্মাই যিনি কর্ম করলেও অকর্তা, ক্রিয়ারহিত, কর্মফলরহিত যাঁর সঙ্গে এই স্থূল দেহের কোন সম্বন্ধ নাই। তখন তার অন্তর থেকে কর্মপ্রবৃত্তির ভেদবুদ্ধির অবসান হয়ে যায় আর তখনই এই পরমজ্ঞানের কারণে তার ভগবানের পরম পদ লাভ হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একমাত্র অর্জিত জ্ঞানই যোগীকে মোক্ষলাভের উপযোগী ক'রে তোলে হতে পারে সে জ্ঞান বেদাদি শাস্ত্রলব্ধ বা নিষ্কাম কর্মের অনুশীলন লব্ধ।।৬৬।।

ইদং তে ন অতপস্কায় # ন অভক্তায় কদাচন।
ন চ অশুশ্রূষবে বাচ্যং # ন চ মাং যঃ অভ্যসূয়তি।। ৬৭।।

অতপস্কায় = তপস্যাবিহীন; অভক্তায় = যারা ভক্তি করে না; কদাচন = কখনও; অশুশ্রূষবে = যে শুনতে চায় না; অভ্যসূয়তি = অশ্রদ্ধা করে।।৬৭।।

অনুবাদ :- যে তপস্যাবিহীন, যে ভক্তিমান নয়, যে শুনতে চায় না, যে আমাকে অশ্রদ্ধা করে সেই প্রকার লোককে তুমি কখনই আমার এই গীতারূপী পরম রহস্যময় উপদেশ জানাবে না।।৬৭।।

যঃ ইদং পরমং গুহ্যং # মদ্ভক্তেষু অভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা # মাম্ এব এষ্যতি অসংশয়ঃ।।৬৮।।

ইদং = এই; মদ্ভক্তেষু = আমার ভক্তদের মধ্যে; অভিধাস্যতি = বর্ণনা করবে; এষ্যতি = লাভ করবে; অসংশয়ঃ = নিঃসন্দেহে।।৬৮।।

অনুবাদ:- যিনি আমার এই পরম গোপনীয় তত্ত্ব আমার ভক্তদের নিকট বর্ণনা করবেন তিনি তার দ্বারা আমার প্রতি শ্রেষ্ঠ ভক্তি অর্পণ করবেন এবং তিনি নিঃসন্দেহে আমাকে লাভ করবেন।।৬৮।।

ন চ তস্মাৎ মনুষ্যেষু # কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাৎ # অন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।। ৬৯।।

তস্মাৎ = তাঁর চাইতে; কশ্চিৎ = কেউ; প্রিয়কৃত্তমঃ = সর্বাপেক্ষা অধিক তুষ্টকারী; ভুবি = পৃথিবীতে; ন ভবিতা = হবে না।।৬৯।।

অনুবাদ :- (যিনি আমার এই পরম গোপনীয় তত্ত্ব আমার ভক্তদের নিকট বর্ণনা করবেন) তাঁর চাইতে আমার অধিক প্রিয় এই পৃথিবীতে আর অপর কেউ হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কেউ হবে না।।৬৯।।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং # ধর্ম্যং সংবাদম্ আবয়োঃ।
জ্ঞান-যজ্ঞেন তেন অহম্ # ইষ্টঃ স্যাম্ ইতি মে মতিঃ।। ৭০।।

অধ্যেষ্যতে = অধ্যয়ন করবেন; ইমং = এই; সংবাদম্ = কথোপকথন; আবয়োঃ = আমাদের; ইষ্টঃ = পূজিত; স্যাম্ = হব।।৭০।।

অনুবাদ :- কেউ আমাদের দুই জনের এই ধর্মময় সংবাদ অধ্যয়ন করলে সেটি তার পক্ষ থেকে আমাকে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পূজা করা হবে ব'লে আমি মনে করি।।৭০।।

ব্যাখ্যা :- ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে ভক্তদের প্রতি পরিষ্কারভাবে বার্তা দিয়েছেন যে তাঁর পূজা করতে হলে ভক্তদের অপর কিছু করার প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে নিয়মিত পাঠ করলে ও তা অপর ভক্তদের নিকট ব্যাখ্যা করলে সেটিই শ্রীকৃষ্ণকে উত্তমরূপে পূজা করার সমতুল্য হিসাবে গণ্য হবে।।৭০।।

শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ চ # শৃণুয়াৎ অপি যো নরঃ।
সঃ অপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ # প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্।।৭১।।

অনসূয়ঃ = যিনি অপরকে অসূয়া অর্থাৎ ঈর্ষা করেন না; শৃণুয়াৎ অপি = শুনেও; প্রাপ্নুয়াৎ = লাভ করেন।।৭১।।

অনুবাদ :- যদি কোন ব্যক্তি ঈর্ষা রহিত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে কেবলমাত্র গীতাপাঠ শোনেন তাহলেও তিনি পাপমুক্ত হয়ে অন্যান্য সকল পুণ্যবান ব্যক্তিদের মতই বৈকুণ্ঠের মত পুণ্যলোকসমূহ লাভ করতে পারেন।। ৭১।।

কচ্চিৎ এতৎ শ্রুতং পার্থ # ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিৎ অজ্ঞান-সম্মোহঃ # প্রনষ্টঃ তে ধনঞ্জয়।।৭২।।

একাগ্রেণ চেতসা = একাগ্র চিত্তে; অজ্ঞান-সম্মোহঃ = অজ্ঞানজনিত মোহ; প্রনষ্টঃ = দূর হয়েছে।।৭২।।

অনুবাদ :- হে অর্জুন! তুমি একমনে আমার কথা শুনলে তো? ধনঞ্জয়! এখন কি তোমার মন থেকে অজ্ঞানতার মোহ দূর হয়েছে?।।৭২।।

অর্জুন উবাচ
নষ্টো মোহঃ স্মৃতিঃ লব্ধা # ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়া অচ্যুত।
স্থিতঃ অস্মি গতসন্দেহঃ # করিষ্যে বচনং তব।।৭৩।।

নষ্টঃ = দূরীভূত; স্মৃতিঃ = কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে জ্ঞান; লব্ধা = লাভ ক'রে; ত্বৎপ্রসাদাৎ = আপনার করুণায়; ময়া = আমার দ্বারা; স্থিতঃ অস্মি = স্থির হয়েছে; গতসন্দেহঃ = সংশয় দূর হয়েছে; করিষ্যে = পালন করব; বচনং = উপদেশ।।৭৩।।

অনুবাদ :- অর্জুন বললেন — হে অচ্যুত! আপনার অসীম করুণায় আমার সমস্ত মোহ দূর হয়েছে, আমি আমার স্মৃতি ফিরে পেয়েছি (অর্থাৎ আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি ক্ষত্রিয় এবং আমার কর্তব্য হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আমার সেই লুপ্ত জ্ঞান আমি ফিরে পেয়েছি)। আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে। আমি আপনার আদেশ পালন করবো অর্থাৎ এখন আমি যুদ্ধ করতে রাজী।।৭৩।।

সঞ্জয় উবাচ

ইতি অহং বাসুদেবস্য # পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদম্ ইমম্ অশ্রৌষম্ # অদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।।৭৪।।

ইমম্ = এই; অশ্রৌষম্ = শুনলাম।।৭৪।।

অনুবাদ :- সঞ্জয় বললেন — মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জুনের মুখ থেকে আমি এইরূপ অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সংবাদ শুনলাম।।৭৪।।

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবান্ # এতৎ গুহ্যম্ অহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ # সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্।৭৫।।

ব্যাসপ্রসাদাৎ = ব্যাসদেবের করুণায়; শ্রুতবান্ = শুনলাম; এতৎ = এই; যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ = যোগের কৃষ্ণের নিকট থেকে; সাক্ষাৎ = সরাসরি; কথয়তঃ = বললেন; স্বয়ম্ = নিজেই।।৭৫।।

অনুবাদ :- আমি আজ ব্যাসদেবের করুণায় স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে এই পরম গোপনীয় যোগ শুনলাম।।৭৫।।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য # সংবাদম্ ইমম্ অদ্ভুতম্।
কেশব-অর্জুনয়োঃ পুণ্যং # হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ।।৭৬।।

সংস্মৃত্য = স্মরণ ক'রে; ইমম্ = এই; হৃষ্যামি = আনন্দিত হচ্ছি; মুহুর্মুহুঃ = বারে বারে।।৭৬।।

অনুবাদ :- হে রাজন্! কেশব ও অর্জুনের এই অদ্ভুত পুণ্য বচন বারবার স্মরণ ক'রে আমার অঙ্গ প্রতি মুহূর্তে পুলকিত হচ্ছে।।৭৬।।

তৎ চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য # রূপম্ অতি-অদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ # হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।।৭৭।।

সংস্মৃত্য = স্মরণ ক'রে; রূপম্ = বিশ্বরূপ; হৃষ্যামি = পুলকিত হচ্ছি।।৭৭।।

অনুবাদ :- হে রাজন্! শ্রীহরির সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ ক'রে আমি অতিশয় বিস্মিত ও পুলকিত হচ্ছি।।৭৭।।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো # যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীঃ বিজয়ো ভূতিঃ # ধ্রুবা নীতিঃ মতিঃ মম।। ৭৮।।

শ্রীঃ = রাজ্যলক্ষ্মী; ভূতিঃ = ঐশ্বর্য বৃদ্ধি; ধ্রুবা নীতিঃ = স্থায়ী ন্যায়পরায়ণতা।।৭৮।।

অনুবাদ :- যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং ধনুর্ধর অর্জুন আছেন, সেখানেই শ্রী, বিজয় এবং নীতি অটুট থাকে এই আমার অভিমত।।৭৮।।

ব্যাখ্যা :- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্তিম শ্লোকের মাধ্যমে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রথের সারথি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চেয়েছেন যে এই যুদ্ধে কৌরব পক্ষের পরাজয় সুনিশ্চিত। সেইজন্য তিনি যদি তাঁর পুত্রদের মঙ্গল চান তাহলে তিনি যেন সময় থাকতে জড়ত্ব ত্যাগ ক'রে অবস্থার হাল ধরেন যাতে তাঁর পুত্ররা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আসন্ন বিনাশের হাত থেকে নিস্তার পায়।

পরিশেষে আর দুটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা না করলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রথমতঃ মহান গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিশ্বের সমগ্র মানব সমাজের উদ্দেশ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়ে গিয়েছেন সে বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। ভগবান্ এই গ্রন্থে বলেছেন যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই তিনটি গুণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কঠিন। সত্ত্বগুণ মানুষকে পবিত্র পুণ্য কর্মের পথে পরিচালিত করে এবং রজঃ ও তমোগুণ মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে ধ্বংস ক'রে তাকে নরকপথগামী ক'রে তোলে। সমাজে পাপী ও পুণ্যাত্মা চিরদিন থাকবে। কিন্তু মানুষের কখনই পাপীকে বা পাপের পথকে অনুসরণ করা বা তাকে সমর্থন করা উচিত নয়। পাপীর সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। দুষ্টকে তার পাপের পথ থেকে সরিয়ে আনার সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। যদি যথাসাধ্য প্রয়াস নিতান্তই ফলপ্রসূ না হয় তাহলে তাকে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে দমন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীমদ্ভবদ্গীতার অন্তিম শ্লোকে ব্যাসদেব সঞ্জয়ের মুখ দিয়ে মানব সমাজের উদ্দেশ্যে এক পরমতম উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন যে মানব জীবনের পরম অবলম্বন হলেন একমাত্র পরমপুরুষ পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই মানুষের পরম গতি, পরম জ্ঞান, পরম আশ্রয় - যেথা সত্য সেথা কৃষ্ণ, সেথা জয়।।৭৮।।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
সমাপ্ত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মাহাত্ম্য

সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা # সর্বদেবময়ো হরিঃ।
সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা # সর্ববেদময়ো মনুঃ।।
গীতা সুগীতা কর্তব্যা # কিমন্যৈঃ শাস্ত্র-বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভায় # মুখপদ্ম-বিনিসৃতা।।
মলনির্মোচনং পুংসাং # গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে।
সকৃৎ গীতা-অম্ভসি স্নানং # সংসারমল-নাশনম্।।
সংসারসাগরং ঘোরং # তর্তুম্ ইচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সামাসাদ্য # পারং যাতি সুখেন সঃ।।
যত্র গীতা বিচারশ্চ # পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো # ভগবান্ রাধয়া সহ।।
গীতা ইতি উচ্চার-সংযুক্তো # ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ।
যদ্ যৎ কর্ম চ সর্বত্র # গীতাপাঠ প্রকীর্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম চ নির্দোষং # ভূত্বা পূর্তমাপ্নুয়াৎ।।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ # গীতা মে সারম্ উত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানম্ অত্যুগ্রং # গীতা মে জ্ঞানম্ অব্যয়ম্।।
গীতা মে চ উত্তমং স্থানং # গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং # গীতা মে পরমো গুরুঃ।।
গীতা আশ্রয়ে অহং তিষ্ঠামি # গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য # ত্রিলোকীং পালয়ামি অহম্।।
গীতা মে পরমা বিদ্যা # ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্ধমাত্রাহরা নিত্যম্ # অনির্বাচ্য-পদাত্মিকা।।
গীতা নামানি বক্ষ্যামি # গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্তনাৎ সর্বপাপানি # বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ।।
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী # সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা # ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী।।

অর্ধমাত্রা চিতা নন্দা # ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা # তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী।।৫০।।
ইতি এতানি জপেৎ নিত্যং # নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেৎ নিত্যং # তথা অন্তে পরমং পদম।
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা # মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠো ভবেৎ তস্য # শ্রম এব হি উদাহৃতঃ।।

তারপর ক্ষমাভিক্ষার মন্ত্র পাঠ করতে হবে —

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনং চ যদভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং ত্বৎ প্রসাদাৎ জনার্দন।।
জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা।

তারপর ভগবানের প্রণাম মন্ত্র পাঠ করতে হবে —

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে।
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তুতে।।
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

এরপর তিনবার কৃষ্ণ মহানাম মন্ত্র পাঠ করা করা বিধেয় —

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে।।

তারপর গীতাপাঠ সমাপ্তির পর শান্তিপাঠ করতে হবে —

ওঁ দ্যৌ শান্তি: অন্তরিক্ষ শান্তি:
পৃথ্বী শান্তি: অপ: শান্তি: ঔষধয়: শান্তি:
বনস্পতয়: শান্তি: বিশ্বে দেবা: শান্তি: ব্রহ্ম: শান্তি:
সর্বং শান্তি: শান্তিরেব শান্তি: সা মা শান্তিরেধি।
সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুখঃভাক্ ভবেৎ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

বর্ণনানুক্রমিক শ্লোকসূচী

অ

	অ	শ্লো
অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি	২	৩৪
অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং	৮	৩
অক্ষরাণাম্ অকার অস্মি	১০	৩৩
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ	৮	২৪
অচ্ছেদ্যো অয়ম্ অদাহ্য অয়ম্	২	২৪
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা	৪	৬
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ	৪	৪০
অত্র শূরা মহেষ্বাসাঃ	১	৪
অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ম্	৩	৩৬
অথ চিত্তং সমাধাতুং	১২	৯
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যম্	২	৩৩
অথ চৈনং নিত্যজাতম্	২	২৬
অথবা যোগিনামেব	৬	৪২
অথবা বহুনৈতেন	১০	৪২
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা	১	২০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি	১২	১১
অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি	১১	৪৫
অদেশকালে যদ্দানম্	১৭	২২
অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্	১২	১৩
অধর্মং ধর্মমিতি যা	১৮	৩২
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ	১	৪০
অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতা	১৫	২
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ	৮	৪

	অ	শ্লো
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র	৮	২
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা	১৮	১৪
অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্বং	১৩	১১
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং	১৮	৭০
অনন্তবিজয়ং রাজা	১	১৬
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাম্	১০	২৯
অনন্যচেতাঃ সততম্	৮	১৪
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্	৯	২২
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ	১২	১৬
অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ	১৩	৩১
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যম্	১১	১৯
অনাশ্রিতঃ কর্মফলম্	৬	১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ	১৮	১২
অনুদ্বেগকরং বাক্যম্	১৭	১৫
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাম্	১৮	২৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ	১৬	১৬
অনেকবক্ত্রনয়নম্	১১	১০
অনেকবাহুদরবক্ত্রনেত্রম্	১১	১৬
অন্তকালে চ মামেব	৮	৫
অন্তবত্তু ফলং তেষাম্	৭	২৩
অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ	২	১৮

	অ	শ্লো
অন্নাদ্ভবতি ভূতানি	৩	১৪
অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ	১	৯
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ	১৩	২৫
অপরং ভবতো জন্ম	৪	৪
অপরে নিয়তহারাঃ	৪	২৯
অপরেয়মিতস্তন্যাং	৭	৫
অপর্যাপ্তং তদাস্মাকম্	১	১০
অপানে জুহ্বতি প্রাণং	৪	২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারো	৯	৩০
অপি চেদসি পাপেভ্য	৪	৩৬
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য	১	৩৫
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ	১৪	১৩
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো	১৭	১১
অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ	১৬	১
অভিসন্ধায় তু ফলম্	১৭	১২
অভ্যাসযোগযুক্তেন	৮	৮
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোসি	১২	১০
অমানিত্বমদম্ভিতম্	১৩	৭
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য	১১	২৬
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘাঃ	১১	২১
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো	৬	৩৭
অয়নেষু চ সর্বেষু	১	১১

	অ	শ্লো
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ	১৮	২৮
অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ	৯	১১
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্	২	৩৬
অবিনাশি তু তদবিদ্ধি	২	১৭
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু	১৩	১৬
অব্যাক্তাদীনি ভূতানি	২	২৮
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ	৮	১৮
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তঃ	৮	২১
অব্যক্তোঽয়ম্ চিন্ত্যোয়ম্	২	২৫
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং	৭	২৪
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং	১৭	৫
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং	২	১১
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ	৯	৩
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং	১৭	২৮
অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং	১০	২৬
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র	১৮	৪৯
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ	১৩	৯
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে	১৬	৮
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুঃ	১৬	১৪
অসংযতাত্মনা যোগো	৬	৩৬
অসংশয়ং মহাবাহো	৬	৩৫
অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে	১	৭

	অ	শ্লো
অহঙ্কারং বলং ... সংশ্রিতাঃ	১৬	১৮
অহঙ্কারং বলং ... পরিগ্রহম্	১৮	৫৩
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ	৯	১৬
অহমাত্মা গুড়াকেশ	১০	২০
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা	১৫	১৪
অহং সর্বস্য প্রভবঃ	১০	৮
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং	৯	২৪
অহিংসাসত্যমক্রোধঃ	১৬	২
অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ	১০	৫
অহোবৎ মহৎ পাপং	১	৪৪

আ

	অ	শ্লো
আখ্যাহি মে কো ভবান্	১১	৩১
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি	১৬	১৫
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ	১৬	১৭
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র	৬	৩২
আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ	১০	২১
আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং	২	৭০
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ	৮	১৬
আয়ুধানামহং বজ্রং	১০	২৮
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য	১৭	৮
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং	৬	৩
আবৃতং জ্ঞানমেতেন	৩	৩৯
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ	১৬	১২
আশ্চর্যবৎ পশ্যতি	২	২৯
আসুরীং যোনিমাপন্নাঃ	১৬	২০
আহারস্ত্বপি সর্বস্য	১৭	৭
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সবে	১০	১৩

ই

	অ	শ্লো
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন	৭	২৭
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং	১৩	৬
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রং	১৫	২০
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং	১৮	৬৩
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং	১৩	১৮
ইত্যর্জুনং বাসুদেবঃ	১১	৫০
ইত্যহং বাসুদেবস্য	১৮	৭৪
ইদন্তু তে গুহ্যতমং	৯	১
ইদং তে নাতপস্কায়	১৮	৬৭
ইদমদ্য ময়া লব্ধং	১৬	১৩
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য	১৪	২
ইদং শরীরং কৌন্তেয়	১৩	১
ইন্দ্রিস্যেন্দ্রিয়স্যার্থে	৩	৩৪
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং	২	৬৭
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ	৩	৪২
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ	৩	৪০

	অ	শ্লো
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং	১৩	৮
ইমং বিবস্বতে যোগং	৪	১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি	৩	১২
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং	১১	৭
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো	৫	১৯
ঈ		
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং	১৮	৬১
উ		
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং	১০	২৭
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি	১৫	১০
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ	১৫	১৭
উৎসন্নকুলধর্মাণাং	১	৪৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ	৩	২৪
উদারাঃ সর্ব এবৈতে	৭	১৮
উদাসীনবদাসীনো	১৪	২৩
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং	৬	৫
উপদ্রষ্টানুমন্তা চ	১৩	২২
ঊ		
ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ	১৪	১৮
ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্	১৫	১
ঋ		
ঋষিভির্বহুধা গীতম্	১৩	৪
এ		
এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য	১১	৩৫
এতদযোনীনি ভূতানি	৭	৬
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ	৬	৩৯
এতান্যপি তু কর্মাণি	১৮	৬
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য	১৬	৯
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ	১০	৭
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়	১৬	২২
এবমুক্তো হৃষিকেশো	১	২৪
এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে	১	৪৬
এবমুক্ত্বা ততো রাজন্	১১	৯
এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং	২	৯
এবমেতদয্ যথাত্থ ত্বম্	১১	৩
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্	৪	২
এবং প্রবর্তিতং চক্রং	৩	১৬
এবং বহুবিধা যজ্ঞা	৪	৩২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা	৩	৪৩
এবং সততযুক্তা যে	১২	১
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম	৪	১৫

	অ	শ্লো
এষা তেভিহিতা সাংখ্যে	২	৩৯
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ	২	৭২

ও

	অ	শ্লো
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম	৮	১৩
ওঁ তৎসদিতি নির্দেশঃ	১৭	২৩

ক

	অ	শ্লো
কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ	১৮	৭২
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টঃ	৬	৩৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ	১৭	৯
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ	১	৩৮
কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে	২	৪
কথং বিদ্যামহং যোগিন্	১০	১৭
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি	২	৫১
কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ	১৪	১৬
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্	৩	২০
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যম্	৪	১৭
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ	৪	১৮
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে	২	৪৭
কর্মং ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি	৩	১৫
কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য	৩	৬
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থম্	১৭	৬
কবিং পুরাণম্	৮	৯
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্	১১	৩৭
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং	৪	১২
কাম এষ ক্রোধ এষঃ	৩	৩৭
কামক্রোধবিযুক্তানাং	৫	২৬
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং	১৬	১০
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ	২	৪৩
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ	৭	২০
কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং	১৮	২
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা	৫	১১
কার্পণ্যদোষোপহস্বভাবঃ	২	৭
কার্যকারণকর্তৃত্বে	১৩	২০
কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম	১৮	৯
কালস্মি লোকক্ষয়কৃৎ	১১	৩২
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ	১	১৭
কিং কর্ম কিমকর্মেতি	৪	১৬
কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মম্	৮	১
কিং নো রাজ্যেন	১	৩২
কিং পুনর্বাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ	৯	৩৩
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্	১১	৪৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ	১১	১৭
কুতস্তাকস্মলমিদম্	২	২

	অ	শ্লো
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি	১	৩৯
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম্	১৮	৪৪
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীনগুণানেতান্	১৪	২১
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ	২	৬৩
ক্লেশোধিকতরস্তেষাম্	১২	৫
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ	২	৩
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা	৯	৩১
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবম্	১৩	৩৪
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি	১৩	২

গ

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য	৪	২৩
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী	৯	১৮
গামাবিশ্য চ ভূতানি	১৫	১৩
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্	১৪	২০
গুরুনহত্বা মহানুভাবান্	২	৫

চ

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ	৬	৩৪
চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্	৭	১৬
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্	৪	১৩
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ	১৬	১১
চেতসা সর্বকর্মাণি	১৮	৫৭

	অ	শ্লো

জ

জন্মকর্ম চ মে দিব্যম্	৪	৯
জরামরণমোক্ষায়	৭	২৯
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ	২	২৭
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য	৬	৭
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে	৯	১৫
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা	৬	৮
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ	১৮	১৯
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা	১৮	১৮
জ্ঞানং তেহং সবিজ্ঞানম্	৭	২
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানম্	৫	১৬
জ্ঞেয়ং যত্তু প্রবক্ষ্যামি	১৩	১২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী	৫	৩
জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে	৩	১
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ	১৩	১৭

ত

ত ইমে অবস্থিতা যুদ্ধে	১	৩৩
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য	১৮	৭৭
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যম্	১৫	৪
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ	১	১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে	১	১৪

	অ	শ্লো		অ	শ্লো
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো	১১	১৪	তস্মাদসক্তঃ সততং	৩	১৯
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃকচ	১৩	৩	তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং	২	২৫
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো (৩/২৮),	৩	২৮	তস্মাদোমিতুদাহৃত্য	১৭	২৪
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং	৬	৪৩	তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো	২	৬৮
তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ	১৪	৬	তস্য সংজনয়নহর্ষং	১	১২
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ	১	২৬	তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্	২	১
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃষ্ণম্	১১	১৩	তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ	৬	২৩
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা	৬	১২	তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্	১৬	১৯
তত্রৈবং সতি কর্তারং	১৮	১৬	তানসমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ	১	২৭
তদিত্যনভিসন্ধায়	১৭	২৫	তানি সর্বাণি সংযম্য	২	৬১
তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন্	৪	৩৪	তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী	১২	১৯
তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মনঃ	৫	১৭	তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্	১৬	৩
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী	৬	৪৬	তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং	৯	২১
তপাম্যহমহং বর্ষং	৯	১৯	তেষামহং সমুদ্ধর্তা	১২	৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি	১৪	৮	তেষামেবানুকম্পার্থম্	৭	১৭
তমুবাচ ঋষিকেশঃ	২	১০	তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ	১০	১১
তমেব শরণং গচ্ছ	১৮	৬২	তেষাং সততযুক্তানাং	১০	১০
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে	১৬	২৪	ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং	৪	২০
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায়	১১	৪৪	ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে	১৮	৩
তস্মাৎত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ	৩	৪১	ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ	৭	১৩
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব	১১	৩৩	ত্রিবিধং নরকস্যেদম্	১৬	২১
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু	৮	৭	ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা	১৭	২
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং	৪	৪২	ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ	২	৪৫

	অ	শ্লো
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ	৯	২০
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্	১১	১৮
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ	১১	৩৮

দ

	অ	শ্লো
দণ্ডো দময়তামস্মি	১০	৩৮
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ	১৬	৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে	১১	২৫
দাতব্যমিতি যদ্দানং	১৭	২০
দিবি সূর্যসহস্রস্য	১১	১২
দিব্যমাল্যাম্বরধরং	১১	১১
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম	১৮	৮
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ	২	৫৬
দূরেণ হ্যবরং কর্ম	২	৪৯
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং	১	২
দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং	১১	৫১
দৃষ্ট্বেমান স্বজনান্ কৃষ্ণ	১	২৮
দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ	১৭	১৪
দেবান্ ভাবয়তানেন	৩	১১
দেহিনোঽস্মিনযথা দেহে	২	১৩
দহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং	২	৩০
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং	৪	২৫
দৈবীসম্পদবিমোক্ষায়	১৬	৫
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী	৭	১৪
দোষৈরেতৈঃ কূলঘ্নানাং	১	৪২
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং	১১	২০
দ্যূতং ছলয়তামস্মি	১০	৩৬
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞাঃ	৪	২৮
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ	১	১৮
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ	১১	৩৪
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে	১৫	১৬
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকে	১৬	৬

ধ

	অ	শ্লো
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে	১	১
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ	৩	৩৮
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ	৮	২৫
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে	১৮	৩৩
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ	১	৫
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি	১৩	২৪
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ	২	৬২

ন

	অ	শ্লো
ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি	৫	১৪
ন কর্মণামনারম্ভাৎ	৩	৪
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু	১৮	৬৯

	অ	শ্লো
ন চ মৎস্থানি ভূতানি	৯	৫
ন চ মাং তানি কর্মাণি	৯	৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং	১	৩০
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি	১	৩১
ন চৈতদবিদ্মঃ কতরন্নো	২	৬
ন চ জায়তে ম্রিয়তে বা	২	২০
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা	১৮	৪০
ন তদভাসয়তে সূর্যো	১৫	৬
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম্	১১	৮
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং	২	১২
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম	১৮	১০
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য	৫	২০
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ	৩	২৬
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং	১১	২৪
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে	১১	৪০
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি	৪	১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনোঃ মূঢ়াঃ	৭	১৫
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যম্	৩	২২
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ	১০	২
ন রূপমেস্যেহ তথোপলভ্যতে	১৫	৩
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ	১১	৪৮
নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা	১৮	৭৩

	অ	শ্লো
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি	৩	৫
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং	৪	৩৮
ন হি দেহভৃতা শক্যং	১৮	১১
ন হি প্রপশ্যামি মম	২	৮
নাত্যশ্নতস্তু যোগস্তি	৬	১৬
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং	৫	১৫
নান্তোস্তি মম দিব্যানাং	১০	৪০
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং	১৪	১৯
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য	৪	৩১
নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ	২	১৬
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য	২	৬৬
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য	৭	২৫
নাহং বেদৈর্ন তপসা	১১	৫৩
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ	১৮	৭
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং	৩	৮
নিয়তং সঙ্গরহিতং	১৮	২৩
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা	৪	২১
নির্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা	১৫	৫
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র	১৮	৪
নেহাভিক্রমনাশেঽস্তি	২	৪০
নৈতে স্মৃতী পার্থ জানন্	৮	২৭
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি	২	২৩

	অ	শ্লো
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি	৫	৮
নৈব তস্য কৃতেনার্থো	৩	১৮

প

	অ	শ্লো
পঞ্চৈমানি মহাবাহো	১৮	১৩
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং	৯	২৬
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যো	৮	২০
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম	১০	১২
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি	১৪	১
পরিত্রাণায় সাধূনাং	৪	৮
পবনঃ পবতামস্মি	১০	৩১
পশ্য মে পার্থ রূপাণি	১১	৫
পশ্যাদিত্যানবসূন্	১১	৬
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব	১১	১৫
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং	১	৩
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো	১	১৫
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্	১	৩৬
পার্থ নৈবেহ নামুত্র	৬	৪০
পিতাসি লোকস্য	১১	৪৩
পিতাহমস্য জগতো	৯	১৭
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ	৭	৯
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি	১৩	২১
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ	৮	২২
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাম্	১০	২৪
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব	৬	৪৪
পৃথকত্বেন তু যজজ্ঞানং	১৮	২১
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ	১৪	২২
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব	১৩	১৯
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য	৯	৮
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ	৩	২৯
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি	৩	২৭
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি	১৩	২৯
প্রজহাতি যদা কামান্	২	৫৫
প্রযত্নাদযতমানস্তু	৬	৪৫
প্রয়াণকালে মনসাচলেন	৮	১০
প্রলেপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্	৫	৯
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা	১৬	৭
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে	১৮	৩০
প্রসান্তমনসং হ্যেনং	৬	২৭
প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ	৬	১৪
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং	২	৬৫
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং	১০	৩০
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্	৬	৪১

ব

	অ	শ্লো
বলং বলবতামস্মি	৭	১১

	অ	শ্লো
বহিরন্তশ্চ ভূতানাং	১৩	১৫
বহূনাং জন্মনামন্তে	৭	১৯
বহূনি মে ব্যতীতানি	৪	৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য	৬	৬
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা	৫	২১
বীজং মাং সর্বভূতানাং	৭	১০
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ	২	৫০
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ	১০	৪
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব	১৮	২৯
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ	১৮	৫১
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং	১০	৩৫
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্	১৪	২৭
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি	৫	১০
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা	১৮	৫৪
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ	৪	২৪
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং	১৮	৪১
ভ		
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য	১১	৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি	১৮	৫৫
ভয়াদ্রণাদুপরতং	২	৩৫
ভবানভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ	১	৮
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং	১১	২
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ	১	২৫
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং	৮	১৯
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ	৭	৪
ভূয় এব মহাবাহো	১০	১
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং	৫	২৯
ভোগৈশ্বর্য প্রসক্তানাং	২	৪৪
ম		
মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি	১৮	৫৮
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ	১০	৯
মৎকর্মকৃন্মৎপরমো	১১	৫৫
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ	৭	৭
মদনুগ্রহায় পরমং	১১	১
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং	১৭	১৬
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু	৭	৩
মন্মনা ভব মৎপরায়ণঃ	৯	৩৪
মন্মনা ভব প্রিয়োঽসি মে	১৮	৬৫
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং	১১	৪
মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম	১৪	৩
মমৈবাংশো জীবলোকে	১৫	৭
ময়া ততমিদং সর্বং	৯	৪
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ	৯	১০
ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং	১১	৪৭

	অ	শ্লো
ময়ি চানন্যযোগেন	১৩	১০
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি	৩	৩০
ময্যাবেশ্য মনো যে মাং	১২	২
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ	৭	১
ময্যেব মন আধৎস্ব	১২	৮
মহর্ষঃ সপ্ত পূর্বে	১০	৬
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং	১০	২৫
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ	৯	১৩
মহাভূতান্যহঙ্কারো	১৩	৫
মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ	১৪	২৬
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ	১	৩৪
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়	১১	৪৯
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়	২	১৪
মানাপমানয়োস্তুলাঃ	১৪	২৫
মামুপেত্য পুনর্জন্ম	৮	১৫
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য	৯	৩২
মুক্তোসঙ্গোহনহংবাদী	১৮	২৬
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ	১৭	১৯
মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্	১০	৩৪
মোঘাশা মোঘকর্মাণো	৯	১২

য

	অ	শ্লো
য ইদং পরমং গুহ্যং	১৮	৬৮
য এনং বেত্তি হন্তারং	২	১৯
য এবং বেত্তি পুরুষং	১৩	২৩
যচ্চাপি সর্বভূতানাং	১০	৩৯
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি	১১	৪২
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্	১৭	৪
যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহম্	৪	৩৫
যততো হ্যপি কৌন্তেয়	২	৬০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং	১৫	১১
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং	১৮	৪৬
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ	৫	২৮
যতো যতো নিশ্চরতি	৬	২৬
যৎ করোষি যদশ্নাসি	৯	২৭
যত্তদগ্রে বিষমিব	১৮	৩৭
যৎ তু কামেপ্সুন কর্ম	১৮	২৪
যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্	১৮	২২
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং	১৭	২১
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিম্	৮	২৩
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ	১৮	৭৮
যত্রোপরমতে চিত্তং	৬	২০
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে	৫	৫
যথাকাশস্থিতো নিত্যং	৯	৬
যথা দীপো নিবাতস্থো,	৬	১৯
যথা নদীনাং বহবোহম্বু	১১	২৮
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ	১৩	৩৩
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং	১১	২৯
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাৎ	১৩	৩২
যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নিঃ	৪	৩৭
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি	৮	১১

	অ	শ্লো
যদগ্রে চানুবন্ধে চ	১৮	৩৯
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য	১৮	৫৯
যদা তে মোহকলিলং	২	৫২
যদাদিত্যগতং তেজঃ	১৫	১২
যদা ভূতপৃথগ্ভাবম্	১৩	৩০
যদা যদা হি ধর্মস্য	৪	৭
যদা বিনিয়তং চিত্তং	৬	১৮
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু	১৪	১৪
যদা সংহরতে চায়ং	২	৫৮
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু	৬	৪
যদি মামপ্রতীকারং	১	৪৫
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং	৩	২৩
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং	২	৩২
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো	৪	২২
যদযদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ	৩	২১
যদযদবিভূতিমৎ সত্ত্বম্	১০	৪১
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি	১	৩৭
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং	১৮	৩৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং	৮	৬
যয়া তু ধর্মকামার্থান্	১৮	৩৪
যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ	১৮	৩১
যং লব্ধা চাপরং লাভং	৬	২২
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুঃ	৬	২
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে	২	১৫
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য	১৬	২৩
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহঃ	২	৫৭

	অ	শ্লো
যজ্ঞদানতপঃ কর্মঃ	১৮	৫
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো	৩	১৩
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোন্যত্র	৩	৯
যজ্ঞে তপসি দানে চ	১৭	২৭
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ	৩	১৭
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা	৩	৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহং	১৫	১৮
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো	১২	১৫
যস্য নাহংকৃতো ভাবো	১৮	১৭
যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ	৪	১৯
যাতযামং গতরসং	১৭	১০
যা নিশা সর্বভূতানাং	২	৬৯
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং	২	৪২
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ	১৩	২৬
যাবদেতান্ নিরীক্ষেহং	১	২১
যাবানর্থ উদানে	২	৪৬
যান্তি দেবব্রতা দেবান্	৯	২৫
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা	৫	১২
যুক্তাহারবিহারস্য	৬	১৭
যুঞ্জন্নেবং . নিয়তমানসঃ	৬	১৫
যুঞ্জন্নেবং . বিগতকল্মষঃ	৬	২৮
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ	১	
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবাঃ	৭	১২
যে তু ধর্মামৃতমিদং	১২	২০
যে তু সর্বাণি কর্মাণি	১২	৬
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যং	১২	৩

	অ	শ্লো
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো	৩	৩২
যেপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ	৯	২৩
যে মে মতমিদং নিত্যম্	৩	৩১
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে	৪	১১
যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য	১৭	১
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং	৭	২৮
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা	৫	২২
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামঃ	৫	২৪
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা	৫	৭
যোগসংন্যস্তকর্মাণাং	৪	৪১
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি	২	৪৮
যোগিনামপি সর্বেষাং	৬	৪৭
যোগী যুঞ্জীত সততং	৬	১০
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং	১	২৩
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি	১২	১৭
যো মামজমনাদিঞ্চ	১০	৩
যো মামেবমসংমূঢ়ো	১৫	১৯
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র	৬	৩০
যো যো যাং যাং তনুং	৭	২১
যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ	৬	৩৩
র		
রজসি প্রলয়ং গত্বা	১৪	১৫
রজস্তমশ্চাভিভূয়	১৪	১০
রসোহমপ্সু কৌন্তেয়	৭	৮
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু	২	৬৪
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি	১৪	৭
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সু	১৮	২৭
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য	১৮	৭৬

	অ	শ্লো
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্	৯	২
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি	১০	২৩
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ	১১	২২
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং	১১	২৩
ল		
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণং	৫	২৫
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ	১১	৩০
লোকেঽস্মিন্দ্বিবিধা নিষ্ঠা	৩	৩
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ	১৪	১২
ব		
বক্তুমর্হস্যশেষেণ	১০	১৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা	১১	২৭
বহিরন্তশ্চ ভূতানাং	১৩	১৫
বায়ুর্যমোগ্নির্বরুণঃ	১১	৩৯
বাসাংসি জীর্ণানি যথা	২	২২
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে	৫	১৮
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং	১৭	১৩
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী	১৮	৫২
বিষয়া বিনিবর্তন্তে	২	৫৯
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ	১৮	৩৮
বিস্তরেণাত্মনো যোগং	১০	১৮
বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্	২	৭১
বীজং মাং সর্বভূতানাং	৭	১০
বীতরাগভয়ক্রোধাঃ	৪	১০
বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি	১০	৩৭
বেদানাং সামবেদোস্মি	১০	২২

	অ	শ্লো
বেদাবিনাশিনং নিত্যং	২	২১
বেদাহং সমতীতানি	৭	২৬
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু	৮	২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে	১	২৯
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ	২	৪১
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন	৩	২
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবান্	১৮	৭৫

শ

	অ	শ্লো
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং	৫	২৩
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্	৬	২৫
শমো দমস্তপঃশৌচং	১৮	৪২
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ	১৮	১৫
শরীরং যদবাপ্নোতি	১৫	৮
শুক্লকৃষ্ণে গতি হ্যেতে	৮	২৬
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য	৬	১১
শুভাশুভফলৈরেবং	৯	২৮
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং	১৮	৪৩
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং	১৭	১৭
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ	১৮	৭১
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং	৪	৩৯
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে	২	৫৩
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদযজ্ঞাৎ	৪	৩৩
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো . ভয়াবহঃ	৩	৩৫
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো . কিল্বিষম্	১৮	৪৭
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ	১২	১২
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে	৪	২৬
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ	১৫	৯

স

	অ	শ্লো
স এবায়ং ময়া তেহদ্য	৪	৩
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো	৩	২৫
সখেতি মত্বা প্রসভং	১১	৪১
ষ ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং	১	১৯
সঙ্করো নরকায়ৈব	১	৪১
সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্	৬	২৪
সততং কীর্তয়ন্তো মাং	৯	১৪
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ	৭	২২
সত্ত্বং রজস্তম ইতি	১৪	৫
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি	১৪	৯
সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং	১৪	১৭
সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য	১৭	৩
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ	৩	৩৩
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ	১৭	২৬
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী	১২	১৪
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো	৫	৬
সৎকারমানপূজার্থং	১৭	১৮
সন্ন্যাসস্য মহাবাহো	১৮	১
সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ	৫	১
সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ	৫	২
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ	১৪	২৪
সমং কায়শিরোগ্রীবং	৬	১৩
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র	১৩	২৮
সমং সর্বেষু ভূতেষু	১৩	২৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ	১২	১৮

	অ	শ্লো
সমোঽহং সর্বভূতেষু	৯	২৯
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ	১০	৩২
সর্বকর্মাণি মনসা	৫	১৩
সর্বকর্মাণ্যপি সদা	১৮	৫৬
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ	১৮	৬৪
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ	১৩	১৩
সর্বদ্বারাণি সংযম্য	৮	১২
সর্বদ্বারেষু দেহেস্মিন্	১৪	১১
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য	১৮	৬৬
সর্বভূতস্থমাত্মানং	৬	২৯
সর্বভূতস্থিতং যো মাং	৬	৩১
সর্বভূতানি কৌন্তেয়	৯	৭
সর্বভূতেষু যেনৈকং	১৮	২০
সর্বমেতদৃতং মন্যে	১০	১৪
সর্বযোনিষু কৌন্তেয়	১৪	৪
সর্বস্য চাহং হৃদি	১৫	১৫
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি	৪	২৭
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং	১৩	১৪
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো	৪	৩০
সহজং কর্ম কৌন্তেয়	১৮	৪৮
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা	৩	১০
সহস্রযুগপর্যন্তম্	৮	১৭

	অ	শ্লো
সংনিয়মোন্দ্রিয়গ্রামং	১২	৪
সাধিভূতাধিদৈবং মাং	৭	৩০
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ	৫	৪
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম	১৮	৫০
সুখেদুঃখে সমে কৃত্বা	২	৩৮
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্	৬	২১
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং	১৮	৩৬
সুদুর্দর্শমিদং রূপং	১১	৫২
সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীন	৬	৯
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে	১	২১
স্থানে হৃষীকেশ তব	১১	৩৬
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা	২	৫৪
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্	৫	২৭
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য	২	৩১
স্বভাবজেন কৌন্তেয়	১৮	৬০
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং	১০	১৫
স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ	১৮	৪৫
হ		
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং	২	৩৭
হন্ত তে কথয়িষ্যামি	১০	১৯